গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

দশম খণ্ড ১৩৬৭

সম্পাদক: সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার

১০ম খণ্ড :: ১৩৬৭

নির্ঘণ্ট

প্রবন্ধ

লেখকের নামানুসারে বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত

পরিষদ কথা

গ্রন্থাগার সংবাদ

বার্তা বিচিত্রা

সাধারণ সংবাদ

গ্রন্থসমালোচনা

সম্পাদকীয়

বৈশাখ ১৩৬৭

মিউজিয়াম গ্রন্থাগার

সন্তোষ বসু

মুখবন্ধ

ব্যক্তিগত অথবা গোষ্ঠীগত গৌরব ও শক্তিমত্তার প্রতীক হিসাবে গণ্য হওয়ার কাল, শুধুমাত্র আজব জিনিষের সংগ্রহ হিসাবে গণ্য হওয়ার সময়, কিম্বা কেবলমাত্র সংরক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে গণ্য হওয়ার যুগ অতিক্রম করিয়া আধুনিক মিউজিয়াম জনশিক্ষার প্রতিষ্ঠান রূপে স্বীকৃত। সাধারণ বিদ্যালয়গুলির ন্যায় মিউজিয়াম কেবলমাত্র কিশোরদের মধ্যে সীমাবন্ধ নয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির ন্যায় শুধুমাত্র শিক্ষিতদের মধ্যে সীমাবন্ধ নয়, সাধারণ গ্রন্থাগারের ন্যায় শুধুমাত্র শিক্ষিতদের মধ্যে সীমাবন্ধ নয়, সাধারণ গ্রন্থাগারের ন্যায় অক্ষরজ্ঞান সম্পন্নদের জন্য নির্দিষ্ট নয়—চাক্ষুষ শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানলাভের সুযোগদানে মিউজিয়ামের দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত।

অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ন্যায় মিউজিয়াম পরিচালনায় বিভাগীয় গ্রন্থাগার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের সাংগঠনিক প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও সমস্যাবলীর আলোচনাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

পুস্তক নির্বাচন

মিউজিয়ম গ্রন্থাগারের পুস্তক নির্বাচন মিউজিয়ামের অবস্থিতি, পরিচালনা সংস্থা, দর্শক ও অন্যান্য আগন্তুক এবং প্রদর্শিত দ্রব্যসামগ্রীর দ্বারা প্রভাবিত হয়। পুস্তক নির্বাচনকালে এর যে কোন একটির উপর প্রয়োজনের অধিক

গুরুত্ব আরোপ করিলে মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের কর্মক্ষমতা ও উপযোগিতা হ্রাস প্রাপ্ত হয়। সমস্ত প্রকারের মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে মিউজিয়াম পরিচালনা বিদ্যা সম্পর্কিত পুস্তক সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা বিদ্যমান।[১] চাক্ষুষ শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষাপদ্ধতি সম্পর্কিত গ্রন্থ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তাও মিউজিয়াম নির্বিশেষে সার্বজনীন। নিজ বিষয়ে অর্থ সংগ্রহ বিভিন্ন মিউজিয়ামের বিশেষ প্রকৃতি দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। জনসাধারণের মিউজিয়ামে একাধারে সর্বসাধারণের বোধগম্য সুচিত্রিত পুস্তক ও অন্যদিকে গবেষণা কার্য উপযোগী গ্রন্থসমূহের সংগ্রহ গড়িয়া তুলিতে হইবে। আঞ্চলিক মিউজিয়াম আপন দর্শকদিগের প্রয়োজন ও প্রদর্শিত দ্রব্যসামগ্রীর প্রকৃতি বিবেচনা করিয়া আঞ্চলিক ইতিহাস, সমাজ পদ্ধতি, শাসন ব্যবস্থা, ভূ-প্রকৃতি, কৃষি ইত্যাদি সম্পর্কিত পুস্তক সংগ্রহ করিবেন। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় মিউজিয়ামে ছাত্রদিগের পাঠসূচী ও পাঠক্রম সংক্রান্ত সংগ্রহ রাখিতে হইবে কারণ প্রতিষ্ঠানগত পাঠক্রমের উপর ভিত্তি করিয়া মিউজিয়ামসমূহে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ইতিহাস সম্পর্কিত সুলিখিত ও কৌতুহলোদ্দীপক পুস্তক সংগ্রহ করিতে হইবে। বিজ্ঞান ও শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক মিউজিয়ামগুলিতে প্রদর্শিত দ্রব্য সামগ্রীর সম্পর্কে বস্তু নিষ্ঠা ও তথ্যবহুল পুস্তকের সংগ্রহ আবশ্যক। জীবনীমূলক মিউজিয়ামে উল্লিখিত মনীষীর স্বরচিত জীবনীমূলক পুস্তক ও তাঁহার সম্পর্কে অন্যান্য লেখকদিগের গ্রন্থাদি থাকিলে ভালো হয়। বিদ্বৎ সমাজ ও গবেষণাকেন্দ্র সংশ্লিস্ট মিউজিয়ামসমূহে উচ্চমানের সংগ্রহের দিকে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিতে হইবে।

সকল প্রকার মিউজিয়াম গ্রন্থাগারেই নিজ নিজ মিউজিয়াম কর্তৃক প্রকাশিত সমস্ত প্রকারের পুস্তক, পুস্তিকা, পত্রিকা ও চিত্রাদির সংগ্রহ রাখিতে হইবে। বিষয় দ্বারা বিভক্ত ও সময়ের দ্বারা সীমিত ও সাধারণ পুস্তকের ন্যায় নম্বরীকৃত ফাইলসমূহে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত মিউজিয়াম সংক্রান্ত সংবাদ প্রবন্ধ আলোচনা ও চিত্রাদির সংগ্রহ গড়িয়া তুলিতে হইবে।

মিউজিয়াম গ্রন্থাগারিক অনাবশ্যক ভাবে একাধিক পুস্তক ক্রয় করিয়া মিউজিয়াম গ্রন্থাগারকে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিবেন না।*

কারণ মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের পুস্তক সংগ্রহের সার্থকতা মূলতঃ মিউজিয়াম প্রদর্শনীর ব্যাখ্যা, গবেষণা, পর্য্যালোচনা ও উপলব্ধির দ্বারা নির্ণীত হইয়া থাকে।

সাধারণ পুস্তক নির্বাচন সরঞ্জাম ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় মিউজিয়াম পরিষদ ও মিউজিয়াম প্রকাশিত পত্রিকাদি মিউজিয়ম গ্রন্থাগারিককে পুস্তক নির্বাচন ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য দান করিবে।[২]

পুস্তক নির্বাচন ব্যাপারে মিউজিয়াম গ্রন্থাগারিক বিভাগীয় সংরক্ষক, অধ্যাপক, শিক্ষাবিদ প্রভৃতির পরামর্শ লইয়া পুস্তক সংগ্রহ করিবেন। একাধিক বিভাগ সমন্বিত বৃহৎ মিউজিয়ামে উপযুক্ত ব্যক্তিদের লইয়া গঠিত ও পরিচালক সংস্থার কর্তৃত্বাধীনে কর্ম্মরত পুস্তক নির্বাচন সমিতি কেন্দ্রীয় কার্য্যক্রমের মাধ্যমে পুস্তক সংগ্রহে নিযুক্ত থাকিলে তাহা সাংগঠনিক দিক হইতে দৃঢ় সংবন্ধ ও অধিকতর কার্য্যক্ষম হইয়া উঠিতে পারিবে।

মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের কর্মীদিগকে তাঁহাদের নিজ নিজ বিষয় সম্পর্কে সঠিক উত্তরদানের জন্য মিউজিয়াম গ্রন্থাগার সমূহে যথেষ্ট পরিমাণে বিষয়ানুগ বিশ্বকোষ (Subject Encyclopaedia), অভিধান, নির্দেশিকা রাখা কর্ত্তব্য। অন্যান্য সমপ্রকৃতির মিউজিয়াম সম্পর্কে প্রশ্ন আসিলে তাহার জন্য অন্যান্য মিউজিয়াম কর্তৃক প্রকাশিত, দ্রব্যতালিকা, পত্রিকা, প্রদর্শনী সহায়ক পুস্তিকা ইত্যাদির সংগ্রহ রাখিতে হইবে।

বর্গীকরণ

মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের ন্যায় বিশেষিত সংস্থায় একই পুস্তকে মিউজিয়ামে প্রদর্শিত বিভিন্ন দ্রব্য-সামগ্রী লইয়া একাধিক আলোচনা থাকিতে পারে। ইহা ছাড়াও মিউজিয়াম গ্রন্থাগার মিউজিয়াম সংক্রান্ত বিশেষ প্রয়োজন দ্বারা সীমাবদ্ধ। এই সকল কারণে মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের বর্গীকরণ ও তালিকা প্রণয়ন পদ্ধতি— যথেষ্ট সূক্ষ্ম ও সম্পূর্ণ বিষয়ানুগ হওয়া প্রয়োজন। ডিউই বর্গীকরণ পদ্ধতি এই ব্যাপারে অত্যন্ত স্থিতিশীল বলিয়া প্রতীয়মান হয় বিশেষতঃ এশিয়া দেশগুলির জন্য এই পদ্ধতি নিশ্চিতভাবেই অসম্পূর্ণ। শ্রীরঙ্গনাথনের "কোলন" পদ্ধতি অথবা U. D. C. ব্যবহার দ্বারা মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের কার্য্য অধিকতর সাফল্য লাভ করিবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে পারী সহরস্থিত International Museum Documentation Centre লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের বর্গীকরণ পদ্ধতির class AM (Museums) ভিত্তি করিয়া একটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও তীক্ষ্ণ বিচার সমন্বিত বর্গীকরণ পদ্ধতি উদ্ভাবন করিয়াছেন (ইহাতে মূলে

বিভাগীয় বর্গীকরণ সংখ্যাগুলির পার্শ্বে U. D. C. সংখ্যাও উল্লিখিত হইয়াছে) যাহা কেবলমাত্র মিউজিয়াম ও তৎসংক্রান্ত পুস্তকাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ।[৬] কিন্তু আমাদের স্মরণে রাখা কর্ত্তব্য যে মিউজিয়াম গ্রন্থাগার কেবলমাত্র মিউজিয়াম সংক্রান্ত পুস্তকাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ হওয়া উচিত নয়। প্রত্যেক মিউজিয়াম গ্রন্থাগারকে আপন বিষয়ের উপর প্রচুর সাধারণ গ্রন্থাদি রাখিতে হয় এমন কি এই শ্রেণীর পুস্তক সংগ্রহ ব্যতীত মিউজিয়ম পরিচালনাকার্য্য বহুল পরিমাণে ব্যাহত হয় এবং উৎসাহী পাঠক ও দর্শকের নিকট মিউজিয়ম গ্রন্থাগারের উপযোগিতা কমিয়া যায়। তবে মিউজিয়াম সম্পর্কিত কাগজ পত্রাদি ও অন্যান্য পুস্তকের মধ্যে বিভিন্ন বর্গীকরণ ব্যবহার করিলে প্রথমোক্ত পুস্তকগুলিকে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে শ্রেণী বিন্যস্ত করা যাইতে পারে।

তালিকা প্রণয়ন

মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের পূর্ব্ব লিখিত বিশেষত্ব সমূহের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্লেষিত (Analytical) তালিকা প্রণয়নের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রত্যেক পুস্তকের জন্য বিষয়-নাম-লেখক বিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যবহার করিতে হইবে। সাধারণ মিউজিয়াম তালিকা পত্রের নিম্নে প্রদর্শিত দ্রব্য সামগ্রী ঐ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পুস্তকের বর্গীকরণ সংখ্যা উল্লিখিত হইলেও একই সময়ে মিউজিয়াম গ্রন্থাগার তালিকা পত্রের নিম্নে প্রদর্শিত দ্রব্যের বর্গীকরণ অথবা অবস্থান নির্দেশক সংখ্যা ব্যবহার করিলে মিউজিয়ামের সাধারণ প্রদর্শনী, (General Exhibition) সংরক্ষিত সংগ্রহ (Reserve collection) ও মিউজিয়ম গ্রন্থাগারের মধ্যে একটি সহজ বোধ্য ও যুক্তিপূর্ণ যোগসূত্র স্থাপন করা যাইতে পারে। এই পদ্ধতিতে মিউজিয়ামকর্মী, দর্শক ও অন্যান্য সকল শ্রেণীর মিউজিয়াম ব্যবহারকারী যথেষ্ট উপকৃত হইবেন। কারণ এই পদ্ধতির মাধ্যমে প্রদর্শনী হইতে গ্রন্থে ও গ্রন্থ হইতে প্রদর্শনীর দিকে যাতায়াত বহুল পরিমাণে সুগম ও অর্থ সমন্বিত হইয়া উঠে ও গবেষক, সাধারণ ছাত্র ও উৎসাহী দর্শকবৃন্দ মিউজিয়াম তালিকার দ্বারা তৃপ্ত না হইলে মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে আগমন পূর্ব্বক কোন বিশেষ দ্রব্য অথবা তাহার প্রতিকৃতি ও চিত্রাদি সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থ সমূহে বিস্তৃততর জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হন অন্যদিকে পুস্তক পাঠে উদ্রিক্ত কৌতুহল বশে সহজেই প্রদর্শনী কক্ষ সমূহে গমন করিয়া ঈপ্সিত দ্রব্যসামগ্রী অবলোকন করিতে পারেন।

মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের অবস্থান কেবলমাত্র বিভাগীয় কর্মীদের সুবিধা অথবা শুধুমাত্র দর্শকদিগের সাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইলে মিউজিয়াম কার্য্য পরিচালনায় ব্যাঘাতের সৃষ্টি হইয়া থাকে। দর্শকদিগের সুবিধার্থে মিউজিয়াম গ্রন্থাগার সাধারণ প্রবেশদ্বারের নিকটে অবস্থিত হওয়া উচিত। মিউজিয়াম কর্মীদের সুবিধার্থে মিউজিয়াম গ্রন্থাগার মিউজিয়ামের শাসনকার্য্যে পরিচালনা দপ্তর সমূহের নিকটে অবস্থিত হওয়া আবশ্যক। সুষ্ঠু মিউজিয়াম পরিকল্পনায় এই দুই পরস্পর বিরোধের উদ্দেশ্যের ভিতর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া থাকে।

মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠ কার্যকরী সম্পর্কে যুক্ত হওয়া দরকার। গ্রন্থাগারিকের কার্যস্থলকে কেন্দ্রে রাখিয়া পাঠস্থান, পুস্তক সংরক্ষণ স্থান, গবেষকদিগের ব্যবহার যোগ্য পাঠস্থল, মিউজিয়াম বিশেষের আয়তন ও ব্যবহার পদ্ধতি অনুসারে একই কক্ষের অভ্যন্তরে অথবা পরস্পর যুক্ত কক্ষ সমূহে বিস্তৃত থাকিতে পারে।[৪]

মূল মিউজিয়াম প্রদর্শনী প্রথমতলায় থাকিলে একাধিক তল বিশিষ্ট গ্রন্থাগার গৃহের দ্বিতলে সোপানাবলীর নিকটস্থ মিউজিয়াম গৃহের সম্মুখ ভাগই গ্রন্থাগার গৃহের পক্ষে সর্বোত্তম স্থান। সহরাঞ্চলে সম্মুখস্থিত কক্ষগুলি সহজেই আলোকিত করা যাইতে পারে।

মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে প্রবেশ পথের সম্মুখেই গ্রন্থাগারিকের কার্যস্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত। পাঠস্থল মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় অংশ। ইহার দেওয়ালগুলিকে মিউজিয়াম সংগ্রহের প্রকৃতি ও মিউজিয়াম প্রদর্শনী সংস্থান নির্দেশক নক্সা, মানচিত্র ইত্যাদির দ্বারা সজ্জিত করা যাইতে পারে।

গ্রন্থাগার কক্ষ অথবা কক্ষসমূহের সম্মুখে মিউজিয়াম তালিকা রাখিলে সকলের পক্ষে সুবিধাজনক হয়।

মিউজিয়াম গৃহ পরিকল্পনা কালে গ্রন্থ সংরক্ষণস্থান সম্প্রসারণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। অনেক সময়ে স্থপতিরা সাধারণ গ্রন্থাগারের পরিমাণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের প্রয়োজন প্রকৃতি বিচারে অপারগ হইয়া পড়েন। স্মরণে রাখিতে হইবে যে সকল শ্রেণীর মিউজিয়ামে বিশেষ করিয়া শিল্প ও চারুকলা বিষয় বা

মিউজিয়ামগুলিতে প্রচুর পরিমাণে সাধারণ অপেক্ষা বৃহৎ আয়তনের পুস্তক ও চিত্রাদির রক্ষণ করিতে হয় সেখানে মিউজিয়াম গ্রন্থ সংরক্ষণ মঞ্চ সমূহ অনুরূপ ভাবে নির্মীত হওয়া উচিত।

আধুনিক মিউজিয়াম গ্রন্থাগার সমূহে চিত্রসংগ্রহ ও লণ্ঠন স্লাইড রক্ষিত হইয়া থাকে তবে ইহার জন্য পৃথক সংরক্ষণ স্থানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের পাঠকক্ষ ও গ্রন্থাগারিকের কর্মস্থল প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম আলোকের সমন্বয়ে আলোকিত করা সম্ভব। পুস্তক ও চিত্রাদি সংরক্ষণ স্থানে সর্ব্বসময়েই কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করিতে হইবে।

সকল মিউজিয়াম গ্রন্থাগারেরই দুষ্প্রাপ্য ও অত্যাধিক মূল্যবান সংগ্রহ বিদ্যমান এই কারণে যে মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের সহিত একটি নিজস্ব পুস্তক গ্রহণ বিভাগ থাকিলে অর্থনৈতিক আশ্রয় ও নিরাপত্তার দিক হইতে সুবিধা লাভ করা যায়।

মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে সংগৃহীত পুস্তকাদির পরিমাণ মিউজিয়াম বিশেষের আয়তন; অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও কার্যসূচীর দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। ইতিহাস সম্বন্ধীয় মিউজিয়ামগুলিতে গ্রন্থের সংখ্যা অন্যান্য প্রকৃতির মিউজিয়াম অপেক্ষা দ্রুততালে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

পরিচালন পদ্ধতি

সাধারণতঃ মিউজিয়াম গ্রন্থাগারিক, মিউজিয়াম পরিচালক (Director) অথবা মিউজিয়াম সংরক্ষকদিগের (curator, keeper) অধস্তন কর্মচারী হিসাবে কর্মপরিচালনা করিয়া থাকেন। আয়তনের দিক দিয়া বৃহৎ ও বহুশাখায় বিভক্ত মিউজিয়াম সমূহে মিউজিয়াম পরিচালক সমিতির আয়ত্তাধীনে গঠিত গ্রন্থাগার সমিতি মিউজিয়াম গ্রন্থাগার পরিচালনা কার্য সংগঠিত করিতে পারেন। তবে দৈনন্দিন কার্যক্রমে মিউজিয়াম গ্রন্থাগারিককে অধিকতর কর্ত্তৃত্ব অর্পণ করিতে হইবে। মিউজিয়াম গ্রন্থাগার প্রধানতঃ মিউজিয়ম কর্মী ও বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষভাবে গবেষক, ছাত্র, অধ্যাপক ও উৎসাহী দর্শকের জন্য সংগঠিত হয় এবং মিউজিয়াম গৃহের মধ্যে পুস্তক পাঠের আয়োজন করিয়া থাকে। এই সকল কারণে মিউজিয়াম গ্রন্থাগারে জটিল গ্রন্থ সঞ্চালন পদ্ধতি বর্জন করিতে হইবে। নিয়মিত পুস্তক ক্রয়ের ও মিউজিয়াম গ্রন্থাগার পরিচালনার অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য সকল মিউজিয়াম তহবিলে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের

ব্যবস্থা করিতে হইবে। একই মিউজিয়ামে কার্য্য পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিভাগীয় গ্রন্থাগারের পরিবর্ত্তে পরস্পর সংযুক্ত কক্ষ সমূহের কার্যরত কেন্দ্রীয় মিউজিয়াম গ্রন্থাগার সর্ব্বাধিক কার্য্যক্ষমতার অধিকারী হয়।

বর্ত্তমান পরিস্থিতি

ভারতের প্রায় দুই শতাধিক মিউজিয়ামের মধ্যে মাত্র এক চতুর্থাংশের জন্য কোন প্রকারের বিভাগীয় গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা রহিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট মিউজিয়ামগুলির জন্য সাধারণতঃ পৃথক ব্যবস্থা নাই—ইহারা ঐ শিক্ষালয়গুলির সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবহার করিয়া থাকে। বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও পণ্ডিত সমাজ সংশ্লিষ্ট মিউজিয়াম একই গৃহে ও একই পরিচালনাধীনে অবস্থিত। গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য সমস্ত দেশব্যাপী কোন সাধারণ নিয়মতন্ত্রের ব্যবস্থা নাই। কোন কোন মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের—"গ্রন্থাগারিক-সংরক্ষক" (Librarian Curator) এমন কি "গ্রন্থাগারিক-গুদামরক্ষক" (Librarian storekeeper) রূপে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই সমস্ত নৈরাশ্যজনক তথ্যাদি সত্ত্বেও ইহা আশাপ্রদ যে ভারতের মিউজিয়াম পরিচালকগণ আধুনিক মিউজিয়াম গ্রন্থাগার সম্পর্কে ক্রমশই সচেতন হইয়া উঠিতেছেন এবং কয়েকটি অধুনা-সম্পূর্ণ ও নির্মীয়মান মিউজিয়ামগৃহে যথোপযুক্ত গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হইতেছে।[৫]

উপসংহার

মিউজিয়াম প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ দর্শনযোগ্য বস্তু অথবা তাহার প্রতিকৃতির প্রাণবন্ত প্রদর্শনীর সাহায্যে—দর্শকমনে স্থায়ী অভিজ্ঞতার সৃষ্টি করিয়া থাকে সুতরাং মিউজিয়াম গ্রন্থাগারকে নিশ্চয়ই এমন অবস্থায় উন্নীত করা অনুচিত যাহাতে মিউজিয়ামের প্রদর্শনকার্য্য ব্যাহত হইয়া যায়। গ্রন্থাগার ধর্মী মিউজিয়াম অথবা মিউজিয়াম সদৃশ গ্রন্থাগার—মিউজিয়ম ও গ্রন্থাগার উভয়ের উদ্দেশ্যকেই শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ করিয়া দেয়। চাক্ষুষ শিক্ষা (Visual Education) ও গ্রন্থকেন্দ্রিক অধ্যয়ন এই দুইয়ের ক্ষেত্র ও উপযোগিতা পৃথক—ইহাদের মধ্যে একটিকে অবহেলা করিলে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতির সমস্ত সরঞ্জাম ব্যবহার করিয়া বিশ্বের কয়েকটি অঞ্চল "উন্নত" ও সমৃদ্ধিশালী-স্থানরূপে পরিগণিত হইয়াছে অন্যান্য

অঞ্চলে সামাজিক অবস্থা "অনুন্নত" অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী অঞ্চলের সহিত "অনুন্নত" ও পশ্চাৎপদ অঞ্চলের সহঅবস্থিতি—মানব মনে সহস্র অসংগতির সৃষ্টি করিয়া বিশ্বগণতন্ত্র ও শান্তির পক্ষে অন্তরায় হইয়াছে। মিউজিয়াম, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ করিলে "উন্নত" "অনুন্নতের" এই অসংগতি সহজেই অপসারিত হইবে।*

(১) মিউজিয়াম প্রদর্শন, আলোক সম্পাত, প্রদর্শন পরিকল্পনা, মিউজিয়াম শিক্ষা, সংরক্ষণ ও মিউজিয়াম সম্প্রসারণ কার্যক্রম (Museum Extension Service) প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কিত পুস্তক সমূহ মিউজিয়ম পরিচালন বিদ্যা সংক্রান্ত গ্রন্থ রূপে অভিহিত হয়।

(২) এই ব্যাপারে আমেরিকান মিউজিয়াম এসোসিয়েশন প্রকাশিত Museum News; রিটীশ মিউজিয়াম এসোসিয়েসন প্রকাশিত The Museums Journal; ইউনেস্কো প্রকাশিত ত্রৈমাসিক Museums; International Council of Museums প্রকাশিত ICOM News; এবং নিউ ইয়র্কস্থিত মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিষ্ট্রি প্রকাশিত Curator বিশেষ কার্যকরী।

(৩) Icom News পত্রিকার vol. II No. 2–3 (1958) দ্রষ্টব্য।

(৪) জনৈক বিখ্যাত মিউজিয়াম পরিচালক মিউজিয়াম গ্রন্থাগারের স্থান পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে মিউজিয়াম গ্রন্থাগার ও তাহার আনুষঙ্গিক অংশগুলি একটি মূলবৃন্তস্থিত এমন একটি অসম ত্রিপত্রের ন্যায় বিন্যস্ত হওয়া উচিত যাহার মূল বৃন্তে প্রবেশদ্বারের সম্মুখে গ্রন্থাগারিকের ডেস্ক, তাহার পশ্চাতে ক্ষুদ্র পত্রটিতে গ্রন্থাগারিকের কার্যস্থল, দক্ষিণ দিকের পত্রে পাঠকক্ষ ও বাম দিকের পত্রে পুস্তক ও চিত্রাদি সংরক্ষণ কক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হইবে।

(৫) এই প্রসঙ্গে দিল্লীস্থিত জাতীয় মিউজিয়াম ও আধুনিক কলা সম্পর্কিত জাতীয় আর্ট গ্যালারী, আহমদাবাদ সহরস্থিত মিউনিসিপাল মিউজিয়াম প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

(৬) মিউজিয়াম ও গ্রন্থাগার সমূহের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ব্যাপারে বলা যাইতে পারে যে কলিকাতাস্থিত এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহ হইতেই বর্ত্তমানের

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়ামের উৎপত্তি হইয়াছে এবং ইহা ছাড়াও বর্তমানে সোসাইটির নিজস্ব মিউজিয়াম ও গ্রন্থাগার একই গৃহে একই সংস্থায় রহিয়াছে।

মাদ্রাজ সহরের লিটারারি সোসাইটির উদ্যোগে বিখ্যাত "কন্নেমারা পাব্লিক লাইব্রেরী" ও "মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্ট মিউজিয়ামের" উৎপত্তি হয়। বহুকাল একই গৃহে অবস্থানের পর উহারা পৃথকীকৃত হইয়াছে।

রাজমন্দ্রী সহরের "অন্ধ্র ঐতিহাসিক গবেষণা সমিতি", পুণা সহরের "ভারতীয় ইতিহাস সংশোধক মণ্ডল", অমৃতসর সহরের "কেন্দ্রীয় শিখ মিউজিয়ম" (দরবার সাহেব পরিচালিত), কলিকাতার "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" প্রভৃতি সংস্থার মিউজিয়াম ও সাধারণ গ্রন্থাগার একই স্থানে অবস্থিত।

পূর্বে রাজস্থানের অন্তর্গত যোধপুরের "সর্দার মিউজিয়াম", উদয়পুরের "ভিক্টোরিয়া হল মিউজিয়াম" প্রভৃতি সাধারণ গ্রন্থাগারের সহিত যুক্ত ছিল— বর্তমানে উহাদের পৃথক করা হইয়াছে।

মধ্যপ্রদেশের রায়পুর সহরের "মহান্ত ঘাসিদাস স্মৃতি মিউজিয়ামে"র সহিত এখনও একটি সাধারণ গ্রন্থাগার যুক্ত রহিয়াছে।

অন্যদিকে নিজ গৃহে স্থানান্তরণের পূর্বে আমরেলি সহরের "গিরধরভাই শিশু মিউজিয়াম" ঐ সহরের "ওয়াকার লাইব্রেরী"র গৃহে অবস্থিত ছিল।

কাঁঠালপাড়ার ঋষি বঙ্কিম লাইব্রেরী ও মিউজিয়াম, শান্তিনিকেতনের রবীন্দ্র সদন এবং সবরমতী, নিউদিল্লী, মাদুরাই, বাঙ্গালোর, কল্পি প্রভৃতি সহরের গান্ধী স্মারক সংগ্রহালয় ইত্যাদি জীবনীমূলক মিউজিয়ামে বিস্তৃত গ্রন্থাগার রহিয়াছে।

1. Coleman, L. V.—Museum Building. vol. I
2. Kenyon, F. G.—Libraries and Museums.
3. The Royal Society of Arts—London—Museum in Modern life.
4. Wittlin, A. S.—The Museum, Its history and tasks in educations.

গ্রন্থাগারে গ্রন্থপরিবেশনের প্রস্তুতি

অনন্ত কুমার চক্রবর্তী
গ্রন্থাগারিক, পশ্চিম বঙ্গ মহাকরণ গ্রন্থাগার

প্রত্যেক গ্রন্থাগারে কিভাবে গ্রন্থগুলিকে পাঠকের নিকট পরিবেশনের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার একটা ধারাবাহিক নিয়ম আছে। নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল ঃ

১। **পুস্তক নির্বাচন** (**Book Selection**) ঃ প্রত্যেক গ্রন্থাগারে কি ধরণের কি কি পুস্তক রাখা হইবে তাহার একটা সুপরিকল্পিত নীতি থাকা দরকার। যখনই পুস্তক কেনার সময় উপস্থিত হইবে কিম্বা দান স্বরূপ কোন গ্রন্থ গ্রন্থাগারে আসিবে, তখনই নির্বাচনের প্রয়োজন। বিশেষ বিবেচনা সহকারে পুস্তকের ভালমন্দ বিচার করিয়া, সমবিষয়ক অন্যান্য পুস্তকের সঙ্গে তুলনা করিয়া, চাহিদা অনুযায়ী পুস্তক নির্বাচন করিতে হইবে। দেখিতে হইবে যে পুস্তকটি গ্রন্থাগারের জন্য ক্রয় করা হইতেছে, তাহার অনুরূপ কোন পুস্তক ইতিমধ্যে গ্রন্থাগারে ক্রয় করা হইয়াছে কিনা, হইয়া থাকিলে, তুলনায় ইহাতে কোন নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে কিনা। ইহার ভাষা ও বিন্যাস উন্নততর কিনা। সর্বশেষ ইহার দ্বারা অধিক সংখ্যক পাঠকের চাহিদা মেটান সম্ভব কিনা—ইত্যাদি বিষয় বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে।

পুস্তক নির্বাচনে আরও কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করা প্রয়োজন। সেগুলি হইতেছে—(ক) আঞ্চলিক চাহিদা কি ?—উহা নির্ভর করিবে গ্রন্থাগারটি শিল্পাঞ্চল, সহরাঞ্চল ও পল্লী অঞ্চলের মধ্যে কোনটির অন্তর্ভুক্ত তাহার উপর। কারণ বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন রকম চাহিদা। পুস্তক নির্বাচনের পূর্বে সেই চাহিদার সম্যকরূপ জ্ঞান লাভ করিতে হইবে। স্থানীয় শিল্পপতি ও টেক্‌নিসিয়ান্‌, পণ্ডিতব্যক্তি ও সমাজসেবক প্রভৃতি গুণী ও জ্ঞানী লোকের সান্নিধ্যে আসিয়া এই জ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর হইবে। (খ) স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন, অর্থাৎ স্থানীয় স্কুল, কলেজ, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও জনকল্যাণ সমিতিগুলির সহিত যোগাযোগ রাখিয়া, তথাকার প্রয়োজন মত গ্রন্থনির্বাচন করিতে হইবে, যাহাতে অধিক মূল্যের একই গ্রন্থ

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে একই সংগে ক্রয় করা না হয় এবং প্রয়োজন মত পরস্পর পরস্পরের সহিত পুস্তক লেনদেন করিতে পারে। ইহাতে অর্থের অপচয় হইবে। উপরন্তু সংগৃহীত অর্থে নূতন গ্রন্থের সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হইবে। (গ)—সাধারণতঃ লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও নির্ভরযোগ্য প্রকাশকের গ্রন্থসূচী হইতে, সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকায় পুস্তক সমালোচনা হইতে, মূল্যবান গ্রন্থবিবরণী হইতে, অভিজ্ঞ সুপণ্ডিত ব্যক্তিদের ও পাঠকবর্গের সুপারিশ হইতে গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচিত হইয়া থাকে। স্থানীয় গ্রন্থাগার, জাতীয় গ্রন্থাগার ও অনুরূপ অন্যান্য গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচীও এই নির্বাচনের সহায়ক হইতে পারে। (ঘ)—তালিকা প্রস্তুতকালে লক্ষ্য করিতে হইবে প্রতিটি বিষয়ের (subject) দিকে দৃষ্টি রাখা হইতেছে কিনা। নচেৎ কোন একটি বিষয়ের অধিক সংখ্যক পুস্তক ক্রয় করা হইবে, ফলে অন্যান্য বিষয়গুলি দুর্বল হইয়া পড়িবে। এই জন্য শ্রেণী বিভাগ করিয়া তালিকা প্রস্তুত করা প্রয়োজন। (ঙ)—সুলভ সংস্করণের পুস্তক আপাতঃ দৃষ্টিতে লাভজনক হইলেও শেষ পর্য্যন্ত উহা ক্ষতির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। তবে যে সকল পুস্তক অল্পদিনের মধ্যে অচল হইয়া পড়িবে, সেগুলি যত কম মূল্যের পাওয়া যায় ততই ভাল। যে পুস্তকের চাহিদা ও প্রয়োজন দীর্ঘস্থায়ী সেগুলির সুলভ সংস্করণ ক্রয় করা মোটেই লাভজনক নহে।

এইভাবে মোটামুটি পুস্তকের তালিকা প্রস্তুত করিয়া, যদি কোন নির্বাচকমণ্ডলী থাকে, তবে তাহার সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে। নচেৎ গ্রন্থাগারিক নিজে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন হাতে যে পরিমাণ অর্থ আছে তাহাতে কোন্ কোন্ বিষয়ে কি কি পুস্তক ক্রয় করা যুক্তিসংগত হইবে। ইতিমধ্যে ঐ তালিকায় বর্ণিত কোন পুস্তক ঐ গ্রন্থাগারে কিম্বা পার্শ্ববর্তী কোন গ্রন্থাগারে আসিয়াছে কিনা, আসিয়া থাকিলে তালিকায় তাহা চিহ্নিত করিতে হইবে এবং নির্বাচনকালে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে ঐ পুস্তকের একাধিক সংখ্যক ক্রয় করার প্রয়োজন আছে কিনা। এই প্রয়োজন পুস্তকটির চাহিদার উপর নির্ভর করিবে। যে গ্রন্থাগারে পুস্তক ক্রয় করা বাবদ বাৎসরিক অর্থ বরাদ্দ করা থাকে সেখানে সম্বৎসর ধরিয়া যাহাতে পুস্তক ক্রয় করা যায় সেই ভাবে অর্থ বণ্টন করিয়া লইতে হইবে। নচেৎ বৎসরের প্রথম ভাগেই অর্থ নিঃশেষিত হইলে, প্রয়োজন মত সেই বৎসর আর পুস্তক কেনার উপায় থাকিবে না। পুরাতন পুস্তক ছিঁড়িয়া গেলে কিম্বা অন্যভাবে নষ্ট হইলে, সেগুলির

বদলে প্রয়োজন মত নূতন পুস্তক ক্রয় করবার মত অর্থের সংস্থান রাখিতে হইবে।

মনোনীত পুস্তকের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া বাকী পুস্তকের তালিকাও যত্নসহকারে রাখিতে হইবে। পরবর্তী নির্বাচনের সময় পুনরায় ঐগুলি ক্রয় করা সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই তালিকা কার্ডেও প্রস্তুত করা যাইতে পারে। তাহাতে সুবিধা এই, মনোনীত পুস্তকগুলি, যাহা ক্রয় করা হইল, তাহার কার্ডগুলিতে পুস্তকের নম্বর ও পঞ্জিভুক্তির নম্বর (Accn. No.) বসাইয়া মঞ্চসূচী (Shelf list) রূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। অমনোনীত পুস্তকের কার্ড অনায়াসে শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী সাজাইয়া রাখা চলে। পরবর্তী নির্বাচনের সময় ঐগুলি ব্যবহার করা চলিবে। এই কার্ডগুলিকে "Book Suggestion Card" বলা হয়। নিম্নে একটি নমুনা দেওয়া হইল ঃ

সম্মুখ ভাগ

Book Recommendation Card

Subject............................

Author (Surname first).........

Full Title of the book (with editor and vol)..................

....

Publisher ....

Date of Publication...Price...

For official use only :

Approved by the Committee on.................................

Book order No.......Date......

Accession No.........

উল্টোপিঠ

Suggested by....................

Address or Borrower's Ticket No....................................

Reviewed in....................

Short extract from review :

Govt. publication.

Replacement.

Addl. copy.

(Strike out whichever is not neccssary)

২। পুস্তক ক্রয় (Book Purchase)

পুস্তক ক্রয়কালীন কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার। যে সব গ্রন্থ-ব্যবসায়ীর নিকট হইতে পুস্তক ক্রয় করা হইবে, তাহারা নির্ভরযোগ্য ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ কি না, তাহাদের বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়-হার যুক্তিসংগত কি না প্রভৃতি বিষয় জানিতে হইবে। নির্বাচিত গ্রন্থ ব্যবসায়ীর নিকট হইতে বরাবর পুস্তক ক্রয় করিলে, তাহারাও গ্রন্থাগারের চাহিদা সম্বন্ধে সচেতন হইয়া পড়ে ও গ্রন্থ-নির্বাচনে গ্রন্থাগারিকের সহায়ক হইয়া দাঁড়ায়। নূতন পুস্তক আসিলে তাহারা প্রয়োজন অনুযায়ী বাছাই করিয়া গ্রন্থাগারিকের নিকট নির্বাচনের জন্য পাঠাইয়া দেয়। তাহারা জানে গ্রন্থাগারটি নিয়মিত তাহাদের নিকট হইতে পুস্তক ক্রয় করিয়া থাকে, কাজেই তাহারা যত্নবান হইবে যাহাতে গ্রন্থাগারে বাজে বই না পাঠান হয়। নূতন নূতন গ্রন্থ ব্যবসায়ীর নিকট হইতে পুস্তক ক্রয় করিলে এই সুবিধাগুলি পাওয়া যায় না। উপরন্তু যে সব পুস্তক বিক্রয় লাভজনক, এই সব ব্যবসায়ী সেই সব পুস্তক নানাভাবে গ্রন্থাগারে ক্রয় করানর চেষ্টা করিবে। কাজেই এই বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার।

নির্বাচিত পুস্তকের তিনটি অনুরূপ তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। প্রথম দুইটি পাঠাইতে হইবে পুস্তক বিক্রেতার নিকট, তৃতীয়টি থাকিবে গ্রন্থাগারের নথীতে। পুস্তক বিক্রেতা যখন গ্রন্থাগারে পুস্তক পাঠাইবে, তখন চালানের সংগে ঐ পুস্তক তালিকাটির একটি কপি পাঠাইবে। যদি তালিকাভুক্ত কোন পুস্তক পাঠান সম্ভবপর না হয় কিম্বা যদি কোন পুস্তক সংগ্রহ করিতে সময়ের প্রয়োজন হয়, তবে মন্তব্যের ঘরে তাহা উল্লেখ করিবে। দ্বিতীয়টি রাখিবে সে, যে সব পুস্তক বর্তমানে পাঠান সম্ভবপর হইল না, ভবিষ্যতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেই সব পুস্তক পাঠাইবার জন্য।

এদিকে গ্রন্থাগারিক পুস্তক সরবরাহের জন্য যখনই কোন তালিকা পুস্তক বিক্রেতার নিকট পাঠাইবেন, তখন সেই সেই পুস্তকের Suggestion Cardগুলি পৃথক করিয়া "Books on order" ট্রেতে রাখিয়া দিবেন। পুস্তক সরবরাহ হইলে প্রথমেই তিনি পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন তালিকাভুক্ত ঠিক্ ঠিক্ পুস্তক দেওয়া হইয়াছে কিনা। পুস্তকগুলির পৃষ্ঠা ও সূচীপত্রে উল্লেখিত বিষয়গুলি ঠিক ঠিক জায়গায় আছে কিনা, বাঁধাই ঠিক আছে কি না—ইত্যাদি দেখিতে হইবে। যদি কোন অসংগতি চোখে পড়ে, তবে তৎক্ষণাৎ পুস্তক বিক্রেতাকে সেই বিষয় জানাইতে হইবে ও উহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। এই সময়ে "Books

on order" ট্রে হইতে যে সব পুস্তক গ্রন্থাগারে আসিয়া পেঁৗছিল তাহাদের কার্ড তুলিয়া "Books supplied" ট্রেতে রাখিতে হইবে। "Books on order" ট্রেতে যে সব পুস্তকের কার্ড থাকিল সেগুলির জন্য নির্দিষ্ট সময়ে তাগিদ কিম্বা প্রয়োজন হইলে অন্য কোন পুস্তক বিক্রেতার নিকট সরবরাহের জন্য পুনরায় তালিকাভুক্ত করিয়া পাঠাইতে হইবে। এই সময়ে প্রথম তালিকা হইতে এইগুলি কাটিয়া বাদ দিতে হইবে।

এইভাবে গ্রন্থাগারে নূতন পুস্তক আসিয়া পেঁৗছিলে গ্রন্থাগারিকের নিকট দুইটি তালিকা থাকিবে। একটি (৩য় কপি) যাহা তিনি নিজের নথীতে রাখিয়া দিয়াছেন। অপরটি যাহা পুস্তক বিক্রেতা পুস্তকের সংগে পাঠাইয়াছে। এই দুইটি অনুরূপ তালিকার একটি যাইবে 'Cash Section'এ। অর্থাৎ যেখান হইতে পুস্তক বিক্রেতার 'Bill' পরিশোধ করা হইবে। ইহাতে নিয়ম মাফিক "pay order" দিয়া পাঠাইতে হইবে। আর অপরটি পুস্তকের সংগে যাইবে 'Accession Section'এ অর্থাৎ সেখানে পুস্তকগুলির নাম জমার খাতায় লিখিতে হইবে। এই সময়ে কোন কোন গ্রন্থাগারে প্রত্যেক পুস্তকের জন্য একটি করিয়া "Process Card" করার নিয়ম আছে। এই কার্ডটি কোন কোন গ্রন্থাগারে আলগা ভাবে প্রত্যেকটি পুস্তকের সংগে লাগান হয়। কোথাও বা 'Process Card'এর বদলে একটি রবার স্ট্যাম্প ব্যবহার করা হয়। এই কার্ড বা স্ট্যাম্পে একই ধরণের বিবরণ থাকে। অর্থাৎ পুস্তকটিতে কে কি কাজ করিল তাহার একটা বিবরণী এই কার্ড হইতে জানা যায়। নিম্নে একটি নমুনা দেওয়া গেল ঃ

PROCESS CARD

<table>
<tr><td>Billed</td><td rowspan="2">Cut
&
Stamped</td><td>Book-Carded</td></tr>
<tr><td>Labelled</td><td rowspan="2">Checked</td></tr>
<tr><td>Book-plated</td><td>Classified</td></tr>
<tr><td>Accessioned</td><td>Catalogued</td><td>Finally Checked
&
Issued</td></tr>
</table>

ইহার প্রধান উদ্দেশ্য বইটিতে করণীয় সব কাজ করা হইয়াছে কিনা, তাহা এক নজরে জানা যায়। ভবিষ্যতে যদি কোথায় ভুল ধরা পড়ে, তবে সে ভুলের জন্য যে দায়ী তাহাকে জবাবদিহি করা যায়। আলগা ভাবে লাগান এই শ্লিপগুলি পরে খুলিয়া "Call No." অনুযায়ী সাজাইয়া রাখা হয়। এই processingএর জন্য অতিরিক্ত কার্ড বা স্ট্যাম্প্ ব্যবহার না করিয়া যদি 'Book-recommendation Card'এ নীচের দিকে এই সব বিবরণ মোটামুটি ভাবে দেওয়া সম্ভবপর হয়, তবে এই অতিরিক্ত খরচ বাঁচান যাইতে পারে। "Book-recommendation" কার্ডটি পুস্তকে এমন ভাবে রাখিতে হইবে, যাহাতে সহজেই খুলিয়া না পড়ে। "Book Card"এর জন্য যে পকেট ব্যবহার করা হইবে, তাহা এই সময়ে লাগাইয়া অনায়াসে তাহার ভিতর এই "Book-recommendation" কার্ডটিকে রাখা যাইতে পারে। এই সময়ে প্রতিটি পুস্তকে গ্রন্থাগারের স্ট্যাম্প্, বুক লেবেল (Book lebel) ও ডেট্ লেবেল (date lebel) লাগাইতে হইবে।

৩। জমার উল্লেখ (Accessioning)

পুস্তক ক্রয় করা হইলে প্রতিটি পুস্তক জমায় উল্লেখ করিতে হইবে। কারণ পুস্তকই গ্রন্থাগারের মূল সম্পত্তি। কখন কি ভাবে, কোথা হইতে কি মূল্যে, কি আকারের, কি ধরণের পুস্তক গ্রন্থাগারে স্থান লাভ করিয়া, উহাদের শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী নম্বর কি,—প্রভৃতি সম্পূর্ণ বিবরণ ইহাতে পাওয়া যাইবে। ভবিষ্যতে কোন পুস্তক হারাইয়া গেলে অনুরূপ পুস্তক ক্রয় করিতে কিম্বা যে হারাইয়াছে তাহার নিকট হইতে মূল্য আদায় করিতে ইহার প্রয়োজন হইবে। আরও একটি মূল্যবান তথ্য ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। যে কোন সময়ে গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা কত তাহা অনায়াসেই ইহা হইতে জানা যাইবে। কারণ ইহাতে ক্রমিক সংখ্যার দ্বারা প্রতিটি পুস্তক উল্লেখিত হইয়া থাকে। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বিভিন্ন রকম নিয়ম অনুসরণ করা হয়। কোথাও বা বৃহৎ আকারের উত্তমরূপে বাঁধান খাতায় পরপর অধিকারভুক্ত করা হইয়া থাকে। আবার কোন কোন গ্রন্থাগারে এই উদ্দেশ্যে কার্ড ব্যবহার করা হয়। অথবা ক্রয়কালীন পুস্তক বিক্রেতার নিকট হইতে যে "Invoice" পাওয়া যায় সেইগুলিতে পর পর পুস্তকগুলির ক্রমিক নম্বর লিখিয়া শক্ত বন্ধনীর মধ্যে সাজাইয়া রাখা হয়। তবে নিম্নোক্ত পন্থা মুস্কিল এই, অনেক সময়

পুস্তকের পূর্ণ বিবরণ এই "Invoice" গুলিতে দেওয়া থাকে না। কাজেই পুস্তক ক্রয়কালীন গ্রন্থাগারের তরফ হইতে পূর্ণ বিবরণযুক্ত যে তালিকা পুস্তক বিক্রেতার নিকট পাঠান হয় এবং যাহা পুস্তকের সঙ্গে গ্রন্থাগারে ফিরিয়া আসে, সেই তালিকাগুলি পুস্তক অনুসারে পর পর নম্বর দিয়া সাজাইয়া রাখা যাইতে পারে। ইহাই সহজ উপায়। ইহাকে "Block Accessioning" বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাউক, কোন তালিকায় দশখানি পুস্তক ক্রয় করা হইয়াছে। পূর্ববর্তী তালিকা হইতে দেখা গেল তাহাতে ক্রমিক নম্বর পড়িয়াছে একশত পর্যন্ত। এক্ষণে বর্তমান তালিকায় একশত এক হইতে একশত দশ পর্যন্ত (১০০—১১০ এইভাবে) নম্বর দেওয়া হইল এবং তালিকায় উল্লিখিত পুস্তকগুলি পর পর যেভাবে লিখিত আছে সেইভাবে পর পর প্রতিটি পুস্তকে নম্বর দেওয়া হইল। ইহার পর তালিকাটি নথিবন্ধ করিয়া রাখা হইল। ইহাতে প্রধান সুবিধা এই যে অল্প ব্যয়ে, অল্প পরিশ্রমে এই মূল্যবান রেকর্ডটি প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এখানে উল্লেখ থাকে যে ক্রয়কালীন তালিকা প্রস্তুত করার সময় প্রতিটি পৃথক অংশ (volumes or parts) আলাদা করিয়া লিখিতে হইবে।

৪। শ্রেণী বিভাগ ও বর্গীকরণ (Classification)

প্রত্যেক পুস্তক শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী বর্গীকরণ করিতে হয়। এই শ্রেণী বিভাগ বিভিন্ন পরিকল্পনা অনুসারে হইয়া থাকে। একই বিষয়ের বিভিন্ন গ্রন্থ যাহাতে একই জায়গায় স্থান লাভ করে ও পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত বিভাগগুলি যাহাতে পরস্পর সন্নিবিষ্ট হয় শ্রেণী বিভাগের ইহাই মূল নীতি। শ্রেণী বিভাগে যে নীতি গ্রহণ করা হইবে, বরাবর সেই নীতিই অনুসরণ করিতে হইবে। আবার পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত করিতে যাইয়া যাহাতে নূতন নূতন বিষয় সমূহ, যাহা এখনও পর্যন্ত জানা যায় নাই অথবা যাহার প্রয়োজন গ্রন্থাগারে তখনও পর্যন্ত অনুভূত হয় নাই, সেই বিষয়গুলির স্থান সংকুলানের অবকাশ থাকে তাহার ব্যবস্থা রাখা দরকার। খুব যত্ন সহকারে প্রতিটি পুস্তক বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। যাহাতে ভুলক্রমে ইহার নির্দিষ্ট স্থান হইতে দূরে সরিয়া না যায়। আরও একটি বিষয় লক্ষ্য রাখা দরকার—স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলি যে নিয়মে এই বর্গীকরণ প্রথা অনুসরণ করে সেই রীতি মানিয়া লওয়া দরকার। ইহাতে সুবিধা এই—পরস্পরের সহিত পুস্তক লেনদেনের সুবিধা হইবে।

বিশেষ করিয়া ইহাতে পাঠকবর্গের সুবিধাই সব চাইতে বেশী। তাঁহারা একই রীতির অনুসরণ করিয়া এই বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন ও পুস্তক নির্বাচনকালে গ্রন্থাগারিকের সাহায্য ব্যতিরেকেই তাহার বিষয়বস্তুর পুস্তকসমূহ নির্বাচন করিতে পারিবে। শ্রেণীভুক্ত হওয়ার পর প্রতিটি পুস্তক নিজ নিজ নম্বর দ্বারা পৃথক করিতে হইবে। একই বিষয়ের সবগুলি পুস্তকের শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী নম্বর বা সিম্বল একই হইবে। তাহাদিগকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করিতে হইলে প্রতিটির জন্য স্বতন্ত্র নম্বর দরকার। এই দুইটি নম্বর একত্রে "Call No" বলিয়া পরিচিত। এই "Call No" শ্রেণী বিভাগ ও বর্গীকরণের পর জমার খাতায় উল্লেখ করিতে হইবে।

৫। সূচীকরণ (Cataloguing)

গ্রন্থসূচী প্রণয়নই সম্ভবতঃ গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ। সূচীকরনের দ্বারাই গ্রন্থাগারের গ্রন্থসম্ভার জানিতে পারা যায়। এই গ্রন্থসূচী (Catalogue) প্রস্তুত করিতে বিশেষ যত্নের প্রয়োজন। যাহাতে গ্রন্থ সম্বন্ধে মোটামুটি সবরকম বিবরণ ইহাতে প্রকাশ পায় তাহার ব্যবস্থা থাকা দরকার। যেমন কেহবা শুধু গ্রন্থকারের নাম জানে, কেহবা জানে শুধু গ্রন্থের নাম, অনুবাদকের নাম কিম্বা সংকলকের নাম, কেহ বা শুধু কোন বিষয়ের গ্রন্থ এইরূপ একটা আন্দাজ করিতে পারে। আবার কেহবা শুধু পুস্তকটি কোন একটি বিশিষ্ট সিরিজের অন্তর্গত অথবা কোন বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রকাশিত এইটুকুই জানে। সবাই যাহাতে এই গ্রন্থসূচী মারফত পুস্তকটির সন্ধান করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা রাখিতে হইবে। সাধারণতঃ গ্রন্থকারের নামে গ্রন্থসূচী প্রস্তুত করা হয়। অথবা বিষয় অনুযায়ী তালিকা প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু আদর্শ গ্রন্থসূচী হইবে সেইটাই যাহাতে সকলপ্রকার পুস্তকের সন্ধান করা সম্ভব হইবে। কোন কোন গ্রন্থাগারে এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম নির্ঘণ্টের (Index) ব্যবহার হইয়া থাকে।

এই গ্রন্থসূচী আবার বিভিন্ন ধরণের হইতে পারে। প্রধানতঃ তিন প্রকারের গ্রন্থসূচী দেখা যায়—(ক) পুস্তকের আকারে (Book Catalogue), (খ) ছোট ছোট কাগজের টুকরায় (Sheaf Catalogue), ও (গ) কার্ডে। প্রথমতঃ কিছু বেশি খরচ লাগিলেও কার্ডে গ্রন্থসূচী প্রণয়ন করাই শ্রেয়। কারণ ইহাতে প্রতিটি পুস্তকের জন্য এক বা একাধিক কার্ড প্রস্তুত করিয়া অনায়াসেই

প্রয়োজন মত সাজাইয়া লওয়া যায়। নির্দিষ্ট মাপের কাগজের টুকরা (Sheaf) ব্যবহারেও এই সুবিধা আছে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই এই টুকরাগুলি নষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। আর কাগজের টুকরাগুলি আলাদাভাবে এক একটি করিয়া ব্যবহার করা অসুবিধাজনক। কিছু সংখ্যক একত্রে গ্রথিত করিতে হয়। ইহাতে ঐ বাণ্ডিলটি যখন একজন পাঠক দেখিতে থাকিবে তখন অপর কেহ উহা ব্যবহার করিতে পারিবে না। আবার ইহার প্রধান সুবিধা এই, প্রয়োজন মত নির্দিষ্ট বাণ্ডিলটি বাছিয়া লইয়া পাঠক একান্তে উহা পর্যালোচনা করিতে পারে। কার্ডে এই সুবিধা নাই। ছোট ছোট গ্রন্থাগারের পক্ষে অবশ্য এই কাগজের টুকরায় গ্রন্থসূচী রচনা করা সুবিধাজনক। কারণ ইহাতে খরচ অনেক কম ও কার্ডে রচিত গ্রন্থসূচী প্রায় অধিকাংশ সুবিধাই ইহাতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ৭½" × ৪" সাইজের কাগজের টুকরা ব্যবহার করা হয়।

৬। গ্রন্থ প্রদর্শন (Book display)

পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে সদ্যক্রীত গ্রন্থগুলিকে কিছুকাল একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে সাজাইয়া রাখা হয়। এই উদ্দেশ্যে পুস্তকের উপরের মলাট-গুলিকে (jacket) আলাদাভাবে একটা বোর্ডে আটকাইয়া প্রকাশ্য স্থানে রাখার বিধি আছে। কিছুদিন এইভাবে রাখিয়া পুস্তকগুলিকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে স্থানান্তরিত করা হয় ও তথা হইতে প্রয়োজন মত পরিবেশন করা হয়। কোন কোন গ্রন্থাগার স্থানীয় সংবাদপত্রে এই নূতন গ্রন্থের তালিকা প্রকাশ করিয়া থাকে। কেহ কেহ তালিকা প্রস্তুত করিয়া উহার কপি পাঠকবর্গকে ও স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পাঠাইয়া থাকেন।

পরিষদ কার্যালয়ে টেলিফোন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের ৩৩, হুজরিমল লেনের সান্ধ্য কার্যালয়ে সম্প্রতি টেলিফোন আসিয়াছে। টেলিফোন নম্বর হইল : ৩৪-৭৩৫৫। সান্ধ্য কার্যালয় সন্ধ্যা ৬॥•টা হইতে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত খোলা থাকে।

গ্রন্থাগারের জনসংযোগ ও প্রচারের মাধ্যম

উৎসবানুষ্ঠান

বনবিহারী মোদক

গ্রন্থাগারের আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসপূর্ণ উক্তি আমরা যথেষ্টই করি। কাজের কাজ যাই-ই হোক না কেন, এদিক দিয়ে কিন্তু আমরা খুবই প্রগতিশীল। 'গল্পের বই পড়া যাদের নেশা, লাইব্রেরী তাদের বই যোগায়'—গ্রন্থাগার সম্বন্ধে পাড়াগাঁয়ের সাধারণ মানুষের ধারণা কিন্তু ঠিক এইটুকুই। সহরেও কি নেই এ-রকম মনোভাব? ভূরি ভূরি আছে।

গ্রন্থাগার সম্বন্ধে এ-রকম সংকীর্ণ ধারণা যত শীগ্‌গীর দূর হয়, ততই মঙ্গল। কিন্তু দূর করতে হবে কাজ দেখিয়ে, বক্তৃতা দিয়ে নয়। জনজীবনের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের সেবাকে প্রসারিত করতে হলে যা-কিছু করা দরকার, তার কতটুকু আজ পর্যন্ত করতে পেরেছি আমরা?

করা সম্ভব হয় নি; তার কারণ, সামগ্রিক ও সর্বতোমুখী পরিকল্পনা নিয়ে যৌথ প্রচেষ্টা হয় নি। বিক্ষিপ্ত প্রচেষ্টা এখানে-ওখানে যেটুকু হয়েছে, সেটুকুও সীমাবদ্ধ থেকেছে মুষ্টিমেয় বিদ্যোৎসাহী ও তরুণদের মধ্যে। পাড়াগাঁয়ের গরীব-দুঃখী মানুষের সংগে সে-সব প্রচেষ্টার একাত্ম যোগাযোগ গ'ড়ে তোলা হয় নি। ফলে উদ্যমও হয়েছে ব্যর্থ। অনিবার্যভাবে এসেছে হতাশা ও অবসাদ। শুধু গল্পের বই আর সিনেমা-পত্রের যোগানদার হয়েই, কোন গতিকে নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলো।

গ্রন্থাগারের সংগে যোগাযোগ রাখার দরকার এবং উপকারিতাটুকু আপনার গরীব-দুঃখী গ্রামবাসীরা যেদিন নিজেরা মনে অনুভব করতে সুরু করবেন, একমাত্র সেই-দিনই উন্নয়ন প্রচেষ্টাগুলো সাফল্যের রাস্তা খুঁজে পাবে। দরকার এবং উপকারিতা তাঁরা নিজেরা মনে অনুভব করতে সুরু করবেন তখনই, যখন: (১) দারিদ্র্য গ্রন্থাগারের সংগে তাঁদের যোগ রাখার বাধা হয়ে দাঁড়াবে না;

(২) অজ্ঞতা ও অমার্জিত পোষাকাদির জন্যে তাঁদের কুণ্ঠিত ও সন্ত্রস্তভাবে একপাশে সরে থাকতে হবে না;

(৩) তাঁদের সক্রিয় সহযোগিতার মূল্য শিক্ষিতরাও যখন সপ্রশংস কৃতজ্ঞতার সংগে স্বীকার ও গ্রহণ করবেন।

এতগুলো পরিবর্তন সম্ভব করতে পারলে তবে গ্রন্থাগারের সংগে আত্মিক যোগ স্থাপিত হবে। তখন সহজবোধ্য জ্ঞানপূর্ণ বই সম্বন্ধে তাঁদের উৎসুক করে তোলা সম্ভব হবে। সেই প্রথম-জাগা ঔৎসুক্যকে এমন সব বই পড়িয়ে মেটাতে হবে যাতে তাদের আনন্দ ও ব্যবহারিক লাভ—দুই-ই হয়। কিছুদিন নিয়মিত এ ভাবে চালাতে পারলে তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ এবং ভাল-মন্দ ক্রমে তাঁরা নিজেরাই বেছে নিতে পারবেন। ক্রমে গ্রন্থাগার তাঁদের কাছে হয়ে উঠবে একান্ত অপরিহার্য, একেবারে আপন জিনিষ।

কাজটা সহজ নয়। সতর্কতার সংগে ধাপে ধাপে এগুতে পারলে তবেই আকাঙ্খিত পরিবর্তনের উৎসাহজনক লক্ষণগুলো দেখা দিতে থাকবে। কোন একটি পর্যায়ে ভুল হলে, সমস্ত পরিকল্পনাটাই কিন্তু বানচাল হয়ে পড়বে।

উৎসব বা আনন্দানুষ্ঠানকে আমরা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যের প্রথম ধাপ হিসেবে অবলম্বন করতে পারি। হরেক রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান খুবই চালু হয়েছে আজকাল। জীবন-যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত আজকের সাধারণ মানুষ; এগুলো তাঁদের মনে সঞ্জীবনীর কাজ করে। কাজেই, উৎসবগুলোর সামাজিক তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া গ্রন্থাগারের জনসংযোগ ও প্রচারের উপায় হিসেবেও উৎসবের বিশেষ একটি মূল্য সব সময়েই মনে রাখতে হবে আমাদের।

যখন-তখন যে কোন উৎসব করলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। সুপরিকল্পিতভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে হবে উৎসবগুলো; যাতে দর্শক হিসেবে, শ্রোতা হিসেবে, সহায়ক হিসেবে এমন সব মানুষ এসে সে উৎসবে হাত মেলান, যাঁরা এর আগে গ্রন্থাগারে আসতেন না।

কী কী ধরণের অনুষ্ঠান পালনে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলো, বিশেষ করে মফঃস্বলের ছোট গ্রন্থাগারগুলো উদ্যোগী হবেন—সে সম্বন্ধেও আমাদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। সাধারণ গ্রন্থাগার মাত্রেই নিম্নোক্ত সাত রকমের সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হতে পারে:

১। তিথি উদ্‌যাপন—বর্ষবরণ, বিজয়া সম্মেলনী ইত্যাদি…

২। মনীষী স্মরণ—রবীন্দ্র-জয়ন্তী, সর্বোদয় দিবস ইত্যাদি…

৩। বিশেষ উপলক্ষ—কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিদর্শন, বিদায়-সভা, কোন মনীষীর প্রয়াণ, অভিনন্দন-সভা ইত্যাদি…

৪। ঋতু উৎসব—বর্ষামঙ্গল, বসন্তোৎসব ইত্যাদি…

৫। মাঙ্গলিক—দ্বারোদ্ঘাটন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, প্রতিষ্ঠা-বার্ষিকী, পত্র-পত্রিকার নববর্ষারম্ভ, জয়ন্তী ইত্যাদি…

৬। জাতীয় উৎসব—গণতন্ত্র দিবস, স্বাধীনতা দিবস ইত্যাদি…

৭। বিবিধ—প্রদর্শনী, আলোচনা-চক্র, কবি-সম্মেলন, বিতর্ক সভা ইত্যাদি…

সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্যোগে অনেক জায়গায় নাট্যাভিনয়ও হয়। এটিও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ; কিন্তু একাধিক কারণ ও অসুবিধের জন্যে, শুধু বিশেষ কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড়া, পাড়াগাঁয়ের ছোট গ্রন্থাগারগুলোকে ব্যয়বহুল পূর্ণাংগ নাটকে হাত দিতে বলাটা ঠিক হবে না। এ বিষয়ে মনে রাখা দরকার যে ঃ (১) একাঙ্কীকা বা কৌতুক-নাটিকার অভিনয় প্রায় সব ক্ষেত্রেই সমর্থনযোগ্য। (২) সাহায্য-রজনী হিসেবে, সু-প্রযোজিত পূর্ণাংগ নাটকও অভিনীত হতে পারে। (৩) গ্রন্থাগার যেখানে কোন ক্লাব বা সংস্থার একটি বিভাগ মাত্র, সেক্ষেত্রে সংস্থাটি ইচ্ছে করলে যে-কোন নাটক হাতে নিতে পারেন। তাতে গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব থাকে না। (৪) অন্য কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা সংস্থা পুরো ব্যয়ভার বহন করলে, সতর্ক বিবেচনা সাপেক্ষে, গ্রন্থাগার নাটকাভিনয়ে ব্যাপৃত হতে পারে।

অন্য লোকের চোখে নিজেকে কৃতি ও খ্যাতি দেখলে সুখী হয় না, এমন মানুষ নেই। গ্রন্থাগারে উৎসব পালনের সময় মানব চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্যটাকে কাজে লাগাতে হবে। অনুষ্ঠানের রসভঙ্গ না করে, সাধারণ মানুষদের এতে সর্বাংগীন অংশ গ্রহণের যথাসম্ভব সুযোগ দিতে হবে। নানা ধরণের উৎসব পালন করলে এক এক বিষয়ের গুণী লোকেরা এক একটিতে হাত মেলাতে পারবেন। প্রতিশ্রুতি আছে অথচ সংকোচ ও কুণ্ঠার জন্যে যাঁরা এগিয়ে আসতে পারেন না, সহৃদয়তার সংগে যথোপযুক্ত সাহায্য করলে তাঁদের জড়তা শীগ্‌গীরই কেটে যাবে। আমরা যেন ভুলে না যাই যে. নতুন একজন গুণীকে পাদপ্রদীপের আলোয় আনতে পারলে আরও দশজন উৎসাহিত হবেন। তাঁদের আরও বিশজন বন্ধু তাঁদের সাফল্য দেখে গ্রন্থাগারে আসবেন নতুন নতুন কর্মোদ্যোগের শরিক হতে।

এইভাবে কাজে এগুতে হলে গ্রন্থাগারকর্মী ও উদ্যোক্তাদের একটু কৌশলী হতে হবে। পাঠানুরাগীর সংখ্যা বাড়িয়ে গ্রন্থাগারের সভ্য করার উদ্দেশ্যেই

সাংস্কৃতিক উৎসবাদি থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া সম্ভব হবে না। একটু মন্ত্রগুপ্তি এক্ষেত্রে খুবই দরকার। একেবারে প্রথম অবস্থায় meansটা endএর চেয়ে একটু বেশী প্রাধান্য পাক্, ক্ষতি নেই।

উৎসবের সর্বাংগীন সাফল্যের দ্বারা গ্রন্থাগারের জনপ্রিয়তা বাড়াতে হলে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয়ে প্রথম থেকেই সতর্ক হতে হবে ঃ

(১) কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর প্রতি নিন্দা বা অপপ্রচারের স্থান হিসেবে গ্রন্থাগারের উৎসবকে কেউ-ই যেন কোন রকমে ব্যবহার করতে না পারে। দলাদলির ফলে কল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠানের অপমৃত্যু মোটেই বিরল নয় আমাদের দেশে।

(২) অহেতুক ব্যয়বাহুল্য ও জাঁক-জমক কোন মতেই যেন প্রশ্রয় না পায়।

(৩) অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের মনে আঘাত হানতে পারে—এমন যে-কোন সাম্প্রদায়িকতা বর্জন করতে হবে। উৎসবের শ্রেণী বিভাগে ধর্মীয় অনুষ্ঠান সেই জন্যেই বাদ দেওয়া হয়েছে।

(৪) কোন একটি বিষয়ে মনকে অভিনিবিষ্ট রাখার ক্ষমতা মানুষ মাত্রেরই সীমাবদ্ধ। বেশী দীর্ঘ হলে অত্যন্ত মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানও বিরক্তিকর হয়ে দাঁড়ায়। ভাল করে জমে উঠবার আগেই শেষ হয়ে যায়, উৎসব এত ছোটও যেন না হয়। সাধারণভাবে পাঁচ থেকে সাত কোয়ার্টারের (১ ঘণ্টা ১৫ মিঃ থেকে ১ ঘণ্টা ৪৫ মিঃ) মধ্যেই অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।

(৫) তিন সপ্তাহের কম ব্যবধানে দুটি উৎসব না করাই ভাল। যে সব গ্রন্থাগারের আর্থিক সঙ্গতি কম, সেখানে মাসে একটি অনুষ্ঠান করাই যথেষ্ট।

(৬) উৎসবের প্রস্তুতির দিনগুলোতে যেন গ্রন্থাগারের নিত্যকর্ম বন্ধ না থাকে। অনুষ্ঠানের দিন সন্ধ্যা বা সকাল, অথবা বিশেষ ক্ষেত্রে সারাটা দিন, গ্রন্থাগার বন্ধ রাখা যেতে পারে।

আমাদের দেশের সাধারণ গ্রন্থাগারগুলোর অর্থকৃচ্ছ্রতা সর্বজনবিদিত। গ্রন্থাগার সেবীরা অনেকেই হয়ত প্রশ্ন তুলবেন—"অর্থাভাবে পাঠকদের চাহিদামত বই-পত্রই কেনা হয় না; উৎসব করব কী দিয়ে?" তাঁদের কাছে সবিনয় নিবেদন ঃ

(১) উৎসব মানেই ব্যয়বহুল ব্যাপার—এ ধারণা ভুল। দু-চার টাকাতেও ছোটখাট অনুষ্ঠান দিব্যি হয়ে যায়।

(২) সহর, গ্রাম—সবজায়গাতেই কিছু খ্যাতি-পাগল মানুষ আছেন। ছাপানো অনুষ্ঠান-সূচীতে নামটি স্থান পেলে, কিছু চাঁদা দিতে তাঁরা হাসি-মুখেই রাজী হবেন।

(৩) নিজের প্রতিভা সম্বন্ধে আত্ম-বিশ্বাস প্রচুর, কিন্তু সুযোগ পান না—এমন হবু-শিল্পীদেরই বা বাদ দেবেন কেন? সুযোগ পাওয়ার বিনিময়ে ব্যয়ের কিছুটা অংশ দিতে মোটেই আপত্তি করবেন না তাঁরা।

(৪) গ্রন্থাগারটিকে যাঁরা সত্যিই ভালবাসেন, তাঁরা প্রত্যেকে দৈনিক ১ নয়া পয়সা (কমপক্ষে) হিসেবে দিয়ে একটা উৎসব-তহবিল করুন না?

(৫) শুধু গাড়ীভাড়াটা দিয়ে যাঁদের আনা যায়, সাহিত্যিক ও মনীষীদের মধ্যে এমন কিছুসংখ্যক ব্যক্তি আজও আছেন। বাইরে থেকে তাঁদের আনুন। ভাষণ দানের সময় আপনাদের লাইব্রেরীর প্রশংসা করে তিনি স্থানীয় ব্যবসায়ী ও ধনীদের কাছে আবেগপূর্ণ আবেদন জানাবেন, গ্রন্থাগারে অর্থ সাহায্যের জন্যে। দেখবেন, রাতারাতি সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক হবার জন্যে অনেক ব্যবসায়ী বা ধনীই মুক্ত-হস্ত হবেন।

(৬) প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট অতিথি, পুরস্কার বিতরক, দ্বারোদ্ঘাটক—হরেক রকম পদের রেওয়াজ আজকাল; সভাপতি ত' আছেনই। প্রথমে অর্থসাহায্যের কথা কিছু না বলে, স্থানীয় কোন ধনীকে বা কৃপণ ধনীর গৃহিণীকে এনে উপরোক্ত যে-কোন পদে তোয়াজ করে বসিয়ে দিন। ফলাফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রত্যাশাকেও ছড়িয়ে যাবে।

(৭) পৌরসভা, বিধানসভা প্রভৃতিতে নির্বাচন প্রার্থীরা কাজ গুছোবার জন্যে দাতাকর্ণ হয়ে থাকেন—অবশ্য সাময়িকভাবে। সে সুযোগটাইবা নেবেন না কেন? এক্ষেত্রে কিন্তু একটু বেশী সাবধান হতে হবে; কারণ তাঁরা টাকা দিয়ে মাথা কিনতে চান।

(৮) যত পারেন বিজ্ঞাপন নিয়ে স্মরণী-পুস্তিকা, বিবরণ-পুস্তক ইত্যাদি প্রকাশ করুন। কিছু অন্তত বাঁচবে।

(৯) স্থানীয় সিনেমার মালিককে ধরে একদিন চ্যারিটি শো দেওয়ান। নাটক বা বিচিত্রানুষ্ঠানের চেয়ে ফিল্ম-শো নির্ঝঞ্ঝাট; টাকাও ওঠে বেশী। নিজেরা ঘুরে, অনুরোধ করে টিকিট বিক্রী অনেক বাড়ানো যায়। পরের বছর ঠিক ঐ দিনটি নাগাদ আবার চ্যারিটি করতে সর্বশক্তি নিয়োগ করুন। পর পর কয়েকটি বছর করতে পারলেই বুঝবেন—স্থায়ী একটি বার্ষিক আয় বাঁধা হয়ে গেল।

(১০) যথাবিহিত পদ্ধতিতে ধরলে সরকারী সাহায্যও কিঞ্চিৎ মিলবে। সরকারী লাল-ফিতের জট ছাড়িয়ে পৃষ্ঠপোষক করতে পারলে ত' কথাই নেই।

(১১) যে সব গ্রন্থাগারের পৃথক ও সুপ্রশস্ত পাঠকক্ষ আছে, সভা ইত্যাদি করার জন্যে হলটি তাঁরা অন্যদের ভাড়াও দিতে পারেন।

(১২) সত্যিকারের মহৎ কাজ একমাত্র টাকার অভাবেই নষ্ট হয়েছে—এমন দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে খুব বেশী নেই। আদর্শব্রতী নিঃসম্বল গ্রন্থাগার সেবীদের শুধু ঐকান্তিক নিষ্ঠার জোরে গড়ে ওঠা আমাদের পল্লী গ্রন্থাগারগুলো কি আশা ও প্রেরণা দেয় না আমাদের ?

শেষ কথা—আনন্দোৎসবের মধ্যে দিয়ে গ্রন্থাগার যেন স্থানীয় জনমানসে আলোড়ন আনতে পারে; সুষ্ঠু সংগঠন ও নিখুঁত কাজ দেখিয়ে উদাসীন স্থানীয় লোকদের যেন চঞ্চল করে তুলতে পারে। আমাদের উৎসবের বাঁশী যেন সক্ষম হয় 'to tease people out of indifference.

অন্ধ্রনিধি হরিসর্বোত্তম রাও স্মরণে

তিনকড়ি দত্ত

প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে যখন আমি বিজয়বাদা (তদানীন্তন বেজওয়াদা) সহরে যাই তখন অন্ধ্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তের গ্রন্থাগার কর্মীরা সেখানে সমবেত হন। সেই সময় অন্ধ্রদেশ গ্রন্থালয় সঙ্ঘের সভাপতি গাদিচেরলা হরি-সর্বোত্তম রাওয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে। সেই সময় হইতেই গ্রন্থাগার আন্দোলন ও বয়স্ক শিক্ষা আন্দোলনের প্রসারকল্পে তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টার কথা জানিতে পারি।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে হরিসর্বোত্তম রাও-য়ের মৃত্যুতে আমাদের দেশের একজন নিষ্ঠাবান দেশসেবককে হারাইলাম। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স সাতাত্তর বৎসর হইয়াছিল।

গত ১৯০৫ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নির্ভীক সাপ্তাহিক স্বরাজের সম্পাদকরূপে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে রাজদ্রোহ অপরাধে

তিনি তিন বৎসরের জন্য কারাবরণ করেন। তেলেগু ভাষায় সংবাদপত্র, কোষগ্রন্থ ও পুস্তকাদি প্রকাশে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব ছিল। তিনি কিছুকাল ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের সহকারী সভাপতি ছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার সহকর্মী শ্রীআয়াঙ্কি ভেঙ্কটরামান্যার চেষ্টায় অন্ধ্রদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলন আরম্ভ হয় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে, তখন অন্ধ্রদেশ লাইব্রেরী এসোসিয়েসন স্থাপিত হয়। স্থাপনার পর হইতেই তদানীন্তন মান্দ্রাজ প্রদেশের অন্ধ্র এলাকায় এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বিশেষভাবে ব্যাপকতা লাভ করে। অনেক গ্রন্থাগার কর্মী ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের স্বদেশী আন্দোলনের পর রাজনৈতিক জীবন হইতে সরিয়া আসিয়া গ্রন্থাগার সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহাদের চেষ্টায় সুদূর পল্লী অঞ্চলেও জনসাধারণের গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিয়াছে। স্বর্গীয় রাওয়ের ষষ্ঠিতম জন্মদিনে বিজয়বাদার সন্নিকটবর্তী পাটামাটায় অন্ধ্রদেশ লাইব্রেরী এসোসিয়সনের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও প্রকাশন বিভাগের জন্য জনসাধারণের অর্থসাহায্যে নির্মিত বিরাট ভবন
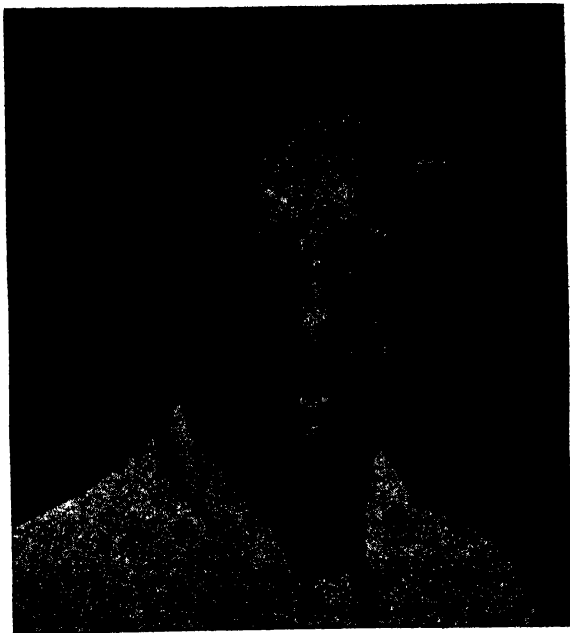
"সর্বোত্তম ভবনমু" তাঁহার হস্তে উৎসর্গীকৃত হয়। তিনি "পঞ্চায়েত রাজ্যম" নামক একখানি তেলেগু পাক্ষিক পত্রের এবং "গ্রন্থালয় সর্বস্বমু" নামক তেলেগু মাসিকপত্রের সম্পাদক ছিলেন।

বাঙলাদেশে যেমন কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয় নিরলসভাবে গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিপুষ্টির জন্য আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, অন্ধ্রনিধি হরিসর্বোত্তম রাও-ও তেমনি ভাবে অন্ধ্রদেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। ভগবানের কাছে তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

আনন্দের স্মৃতি

রবীন্দ্রনাথ

সুশীল কুমার ঘোষ

[বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম সভাপতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্ম শতবার্ষিক বর্ষের প্রারম্ভে পরিষদের প্রথম সম্পাদক শ্রীসুশীল কুমার ঘোষ লিখিত এই স্মৃতি কথাটি মুদ্রিত হইল]

সে এক সুখের দিন,—আনন্দের স্মৃতি। সিউড়ী (বীরভূম) সাহিত্য সম্মিলনের প্রাণময় অধিবেশনের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া যাইবার পর আমরা বীরভূম জেলার কতিপয় দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শনে বাহির হইলাম। সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী (বিদ্যাসাগর কলেজ), পণ্ডিত কালীশ্বর চট্টোপাধ্যায় (বহরমপুর-মুর্শিদাবাদ), সরলা দেবী চৌধুরাণী, দৌলতপুর হিন্দু একাডেমী, খুলনার বিশিষ্ট অধ্যাপক ও গ্রন্থাগারিক সতীশ চন্দ্র মিত্র, পাবনার তরুণ কবি রাধাচরণ দাস প্রভৃতি। উক্ত সাহিত্য সম্মিলনের অভ্যর্থনা সমিতির সুযোগ্য সভাপতি সাহিত্যিক—জমিদার নির্ম্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র স্বনামধন্য বন্ধুবর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (তৎকালে তরুণ কবি ও উদীয়মান সাহিত্যিক) আমাদের পথি প্রদর্শক ও মন্ত্রণাদাতা বা সারথি হইয়া চলিলেন। চণ্ডীদাসের নান্নুর, কীর্ণাহার, লাবপুর, কেন্দুবিল্ব, বক্রেশ্বর তীর্থ (অষ্টাবক্র), রাজনগর, বোলপুর-শান্তিনিকেতন প্রভৃতি আমাদের দ্রষ্টব্যের তালিকাবদ্ধ হইল।

এই স্থলে উল্লেখযোগ্য, সিউড়ীর উজ্জ্বল অধিবেশন ভঙ্গ হইবার অনতিপূর্ব্বে প্রতিনিধি আবাসে (বেণীমাধব ইন্‌স্টিটিউশন হল) বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষদের সম্পাদকরূপে একটি সাধারণ সভা মৎকর্ত্তৃক আহ্বান করা হয়। সাহিত্য শাখার সভাপতি শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, সহসম্পাদক নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, ঐতিহাসিক রমাপ্রসাদ চন্দ অধ্যাপক শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, কুমার মুণীন্দ্রকুমার

দেবরায় মহাশয়, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, পণ্ডিত কাশীশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সতীশ চন্দ্র মিত্র, অধ্যক্ষ যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী, অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যিক রাধাচরণ দাস প্রভৃতি উক্ত সভায় যোগদান করিয়াছিলেন।

উক্ত সপ্তদশ (১৩৩২ বঙ্গাব্দ) সাহিত্য সম্মিলনের মূল সভাপতি নাট্যাচার্য্য রসরাজ অমৃতলাল বসু মহাশয় গ্রন্থাগার পরিষদের আহুত সেই সম্মিলন বা কনফারেন্সে সর্ব্বসম্মতিক্রমে পৌরোহিত্য করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলনের উপকারিতা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ আলোচনার পর—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য্যে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে জেলা গ্রন্থাগার সমিতি প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প গ্রহণ করা হয়। স্থানীয় কতিপয় কৃতবিদ্য মনীষী লইয়া একটি অস্থায়ী কর্ম্মী সংঘ গঠন করা হইল,—পণ্ডিত কুলদা প্রসাদ মল্লিক ভাগবতরত্ন, শিবরতন মিত্র ও কয়েকজন শিক্ষক অধ্যাপক, গ্রন্থাগারিক ও নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তি ও কর্ম্মীবৃন্দ ইহাতে সহযোগিতা করিবেন স্থির হইল। নির্ম্মল শিব বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর ইহার পরিচালনার ভার অর্পণ করা হয়।

রবীন্দ্রনাথ

প্রথমে বোলপুরে রবীন্দ্রতীর্থের কাহিনী প্রকাশ করি। প্রাথমিক আলাপ আপ্যায়নের পর রবীন্দ্রনাথ সানন্দে জিজ্ঞাসা করিলেন গ্রন্থাগার পরিষৎ কি করিতে চাহে? আমি সাগ্রহে উত্তর দিলাম দেশের মধ্যে গ্রন্থাগারগুলির উন্নতি সাধন। এই উদ্দেশ্যে লাইব্রেরীগুলিকে একতাবদ্ধ করিতে হইবে। তিনি চিন্তা না করিয়াই বলিলেন, এ কার্য্যে উহাদের উদ্দেশ্য কেন্দ্রানুগ হওয়া প্রয়োজন। সকলের আদর্শ কিছু সমান নয়, সকলকে ঐক্যসূত্রে গাঁথিবার সার্থকতা আছে, একমুখী হইতে সাহায্য করে।

কিঞ্চিৎ ধ্যানমগ্ন হইয়া পুনরায় বলিলেন উন্নতি সাধন অতি বড় কথা,—ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। নানাবিধ পুস্তক সংগ্রহ কার্য্যে ইহারা ব্যাপৃত। আমি তখন বলিলাম, পুস্তকের সংখ্যা ত ইহাদের আদর্শ হইতে পারে না। আমরা চাই কত সংখ্যক বই লোকে পাঠ করে তাহার তত্ত্ব অনুসন্ধান, কি প্রকৃতির পুস্তক অধিকতর লোকের প্রিয়,—কীদৃশ গ্রন্থ অধিক পরিমাণে লাইব্রেরিকন্দর হইতে নির্গত হইতে পায়, তাহার সংখ্যা নির্ণয় প্রভৃতি কার্য্যে

হস্তক্ষেপ করা আমাদের উদ্দেশ্য। আর একটি বিশেষ প্রয়োজন, প্রতি জেলায় লাইব্রেরী সমিতি গঠন দ্বারা ক্ষুদ্র বৃহৎ নানা জাতীয় গ্রন্থালয়ের তথ্য অনুসন্ধান। প্রত্যেকের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। রবীন্দ্রনাথ সুচিন্তিত ভাষণে ব্যক্ত করিলেন, প্রত্যেকের নব নব অসুবিধার কথা শুনিবেন, ইহাতে যেমন বৈচিত্র্য আছে জটিলতাও আছে, স্মিতহাস্যে বুঝাইলেন গুরু সংকটকালে প্রকৃত সাহায্য অভাবে এই তরুণ প্রতিষ্ঠানগুলি নির্জীব হইয়া পড়িবে। গ্রামের নবীন যুবক বা অপেক্ষাকৃত তরুণ বালক লাইব্রেরী চালাইয়া থাকে,—তাহাদের সাধ্য সীমাবদ্ধ, সংকট ত্রাণের উপায় সঙ্কুচিত। যথোপযুক্ত উপদেশ প্রদানে আমরা সাহায্য করিতে পারি, বলিলাম। আরও জানাইলাম গভর্ণমেন্ট, মিউনিসিপ্যালিটি, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতি সাধারণ তহবিল হইতে অর্থ সাহায্য করিবার অনুরোধ আমরা বিধিমতে করিয়া থাকি। রবীন্দ্রনাথ ইহা শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল লোচনে কহিলেন, অর্থানুকূল্যে যেরূপ সংকট মোচন হইতে পারে,—এরূপ অন্য কিছুতে হয় না। আমার লাইব্রেরী সম্পর্কে আদর্শ ত পূর্ব্বে বলিয়াছি। পুনরায় কিছু অভিমত ব্যক্ত করুন—এইরূপে অনুরুদ্ধ হইলে মৃদুহাস্যে আমাদের শুনাইলেন, আমি বলিয়াছি লাইব্রেরী ভাঁড়ার ঘরের মত। ইহা খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহের স্থান। নানাজাতীয় খাদ্য, সৌখীন, সুস্বাদু, পুষ্টিকর, লঘু, গুরুপাক—সকলপ্রকার আহার্য্য ভাণ্ডার এই লাইব্রেরী। ইহা সকলকে তুষ্টি দিবে, সকলের প্রয়োজন মিটাইবে। পুষ্টি সাধনে সমদর্শী হইবে, ইহা সকলের পক্ষে সমধর্ম্মী থাকিবে, সকলের গতিবিধি এই স্থানের জন্য অনিয়ন্ত্রিত থাকিবে।

তবে ধর্ম্ম ক্ষেত্রে যেমন, এ বিষয়েও সেইরূপ প্রচারকের প্রয়োজন আছে। উন্নতির আদর্শ হৃদয়ঙ্গম করাইতে লোকবলের আবশ্যক হইবে। আর একতাসূত্রে সকলকে গ্রথিত করার ভিন্ন তাৎপর্য্য লক্ষিত হইতে পারে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা ঃ

ইউনাইটেড রিডিং রুম (নিমতলা) গ্রন্থাগারে সাহিত্য সভা

২৪শে এপ্রিল সন্ধ্যায় গ্রন্থাগার ভবনে আধুনিক বাংলা নাটক সম্বন্ধে এক কথিকা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা ছিলেন সংগীত, নৃত্য ও নাটক একাডেমীর ডিন শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী।

নাটকের উপাদান ও তার সামাজিক মূল্যায়ন প্রসঙ্গে শ্রীচৌধুরী বলেন যে নাটকে নিছক দুঃখ, দুর্দশা, বিভিন্ন সমস্যা বা আদর্শবাদকে প্রকট করে দেখালেই তা রসোত্তীর্ণ হয় না; সংবাদপত্রের সামিল হয়ে যায়। সমাধানের অন্তর্নিহিত কারণ ও তার সমাধানের ইঙ্গিত দেবার চেষ্টা নাট্যকারকে করতে হবে। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রকে বাস্তবানুগ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অংকিত করা উচিত। ঘটনার চমক লাগানোর জন্যে কোন চরিত্রকে অস্বাভাবিক রূপে ভাল অথবা মন্দ হিসাবে দেখানো অনুচিত। যে সামাজিক পরিবেষ্টনের ভিতর চরিত্রগুলির অবস্থিতি তা দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরতে হবে। বিদেশী নাটকের অনুকরণ সম্পর্কে তিনি বলেন, যে অনুকরণে আপত্তির কিছু নেই—যদি তাতে দেশ, কাল ও পাত্র সম্পর্কিত কোনও অসংগতি বা অস্বাভাবিকতা না থাকে।

গোপালনগর কে এম এ ক্লাব ও লাইব্রেরীর বার্ষিক সভা

গত ২৪শে এপ্রিল ক্লাবের উনচত্বারিংত্তম বার্ষিক সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পৌর প্রতিনিধি শ্রীকানাইলাল সরকার ও শ্রীঅনিল কুমার সেনগুপ্ত যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন। পাঠাগারটীকে স্থানীয় জনসাধারণের নিকট অধিকতর জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে একটি কার্যক্রম সভায় স্থিরীকৃত হয়। পাঠাগারের শিশু ও কিশোর বিভাগটির উন্নতি সম্পর্কেও সবিস্তারে আলোচনা হয়।

মহাজাতি পাঠাগারে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন স্মরণানুষ্ঠান

১৮ই এপ্রিল কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটের উপরে পাঠাগারের উদ্যোগে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন দিবস উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভানেত্রীর আসন

গ্রহণ করেন শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী। উক্ত দিবসের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বর্ণনা ও তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ করে ভাষণ দেন ডাঃ ভূপাল বসু, বিধান সভা সদস্য শ্রীসুনীল দাস, শ্রীবিনোদ দত্ত ও শ্রীমতী অনিমা বিশ্বাস। লুণ্ঠন অভিযানে অংশ গ্রহণকারী স্বর্গত বিপ্লবীদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে চারুশীলা দেবী সমকালীন যুব সম্প্রদায়কে সেই সব বিপ্লবীদের নিষ্ঠা, আদর্শ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দেশোন্নয়ন কার্যে প্রবৃত্ত হতে উপদেশ দান করেন।

চব্বিশ পরগণা :

ভাটপাড়া সাহিত্য মন্দিরে রবীন্দ্র জন্মোৎসব

২৫শে বৈশাখ সাহিত্য মন্দিরে সাড়ম্বরে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে তিনটি বিভাগে এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন পণ্ডিত শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ। সভাপতিত্ব করেন শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য। স্থানীয় শিল্পীগণ ঐ দিন সংগীত পরিবেশন করেন। রবীন্দ্র সাহিত্য গ্রন্থের এক মনোজ্ঞ প্রদর্শনী উৎসবের আকর্ষণ বৃদ্ধি করে।

মুলাজোড় ভারতচন্দ্র গ্রন্থাগারে পরশুরাম স্মৃতি-সভা

গত ১লা মে গ্রন্থাগারে রস-সাহিত্যিক রাজশেখর বসুর জীবনাবসানে এক সভায় তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক শোক-প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে তাঁর অনন্যসাধারণ সাহিত্য প্রতিভা ও বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদানের কথা উল্লেখ করা হয়।

বর্ধমান :

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারের কর্মতৎপরতা

মাখনলাল পাঠাগার সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গ সরকার কর্তৃক পল্লী গ্রন্থাগার পরিকল্পনাধীনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। পাঠাগার গৃহে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় গৃহটির সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। গ্রন্থ ক্রয়, বেতনভুক কর্মী ও গৃহ নির্মাণের জন্যে সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করেছেন। গত নববর্ষ দিবসে স্থানীয় হাটতলায় পাঠাগারের উদ্যোগে জনশিক্ষামূলক এক প্রাচীর পত্রের প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। পাঠাগারে নিয়মিত নানা ধরণের সেবাকার্য করা হয়ে থাকে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সভাপতি শ্রীসুবোধ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান' বইটির জন্যে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নরসিংহ দাস পুরস্কার

প্রাপ্ত হওয়ায় জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার তাঁকে অভিনন্দন জানায়। ২৫শে বৈশাখ পাঠাগারে সাড়ম্বরে রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। আবৃত্তি, সংগীত ও বক্তৃতা অনুষ্ঠানের অংগ ছিল। এতদুপলক্ষে আয়োজিত রবীন্দ্র সাহিত্যের এক প্রদর্শনী স্থানীয় জনসাধারণের প্রশংসা লাভ করে।

মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীতে রবীন্দ্র জয়ন্তী

গত ২৫শে বৈশাখ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মতিথি উপলক্ষে প্রধান শিক্ষক শ্রীসাতকড়ি সরকার মহাশয়ের পৌরোহিত্যে লাইব্রেরী ভবনে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠানে ছাত্রদের আবৃত্তি, শ্রীশিবশংকর মুখার্জির রবীন্দ্র সংগীত এবং শ্রীবৈদ্যনাথ গোস্বামী ও শ্রীসুধীরকুমার চক্রবর্তীর স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উপলক্ষে লাইব্রেরীতে সংগৃহীত রবীন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় পুস্তকের এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

বাঁকুড়া ঃ

হদলনারায়ণপুর বাণী মন্দির গ্রন্থাগারে রবীন্দ্র জয়ন্তী

২৫শে বৈশাখ প্রাতে স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকগণ সহ এক প্রভাত ফেরী নির্গত হয়। গ্রাম প্রদক্ষিণ করে প্রত্যাগমনের পর সম্পাদক শ্রীমুক্তিপদ মণ্ডল রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন। শ্রীশশিন্দ্রনাথ দত্ত রবীন্দ্র জীবন আলোচনা প্রসংগে গ্রামবাসীদের যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী পালনের আহ্বান জানান।

বালসী ধ্রুব সংহতির দশম প্রতিষ্ঠা দিবসোৎসব

১৮ই বৈশাখ ধ্রুব সংহতির দশম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে দিবসব্যাপী এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতে বন্দেমাতরম ধ্বনির মধ্যে পতাকা উত্তোলন করেন সংহতির সম্পাদক শ্রীপ্রেমানন্দ কোঙার। উৎসবে পৌরোহিত্য করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ মনোমোহন দাশ। ডঃ দাশ উৎসব মণ্ডপে আয়োজিত এক শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। দশটি প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান সূচীত হয়। উপস্থিত বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় ভাষণ দান করেন। সভার শেষে আবৃত্তি ও গানের আসর বসে। সর্বশেষে সরকারের প্রচার বিভাগ কর্তৃক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। সুত্রবস্ত্র ও স্থানীয় দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন কার্যসূচীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বীরভূম ঃ

বৈদ্যনাথপুর সাধারণ পাঠাগার। সিয়ান

গ্রামবাসীদের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহে মাস ছয়েক আগে এই পাঠাগারটির প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথম দিকে স্বভাবতই সকলের কাছ থেকে বিশেষ সাড়া পাওয়া না গেলেও পরে পাঠাগারটি ক্রমে গ্রামবাসীদের কাছে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। বর্তমানে পাঠাগারের সদস্য সংখ্যা চল্লিশের উপর এবং পুস্তক সংখ্যাও তিন শ' অতিক্রম করেছে। গত ছয় মাসে পাঠাগারের আয় হয়েছিল প্রায় চার শ' টাকা। আশা করা যাচ্ছে, জনসাধারণের সাহায্য ও অর্থানুকূল্যে পাঠাগারের আর্থিক উন্নতি ঘটবে। সরকারের কাছ থেকে এখনও কোনও সাহায্য পাওয়া যায় নি। এটিকে পল্লী গ্রন্থাগারে রূপায়িত করার জন্যে সরকারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

কীর্ণাহার রবীন্দ্র স্মৃতি সমিতি পাঠাগার

পাঠাগারের সভাপতি শ্রীরামচন্দ্র সরকারের সভাপতিত্বে গত ২৫শে বৈশাখ পাঠাগারের সাধারণ বিভাগ, কিশোর বিভাগ ও সমাজ শিক্ষা বিভাগের সদস্যদের যুক্ত উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হয়। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা ছিল। স্থানীয় শিল্পীরা সাংগীতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। শ্রীচিত্তরঞ্জন মিত্রের পরিচালনায় রবীন্দ্রনাথের সম্পত্তি সমর্পণ অভিনীত হয়।

মেদিনীপুর ঃ

রসিকগঞ্জ রবীন্দ্র পাঠাগার। নিমতলা

২৫শে বৈশাখ সন্ধ্যায় পাঠাগারের উদ্যোগে কবিগুরুর আবির্ভাব দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ কবিতা আবৃত্তি করে। ঘাটালের সংগীত গোষ্ঠী রবীন্দ্র সংগীত পরিবেশন করিয়া অনুষ্ঠানটি মনোজ্ঞ করিয়া তোলেন। এইদিন পাঠাগার কর্তৃক "সম্ভাবনা" নামে একটি হস্তলিখিত ত্রৈমাসিক পত্রিকার রবীন্দ্র সংখ্যা হিসাবে প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

শিলদা তরুণ সংঘে সপ্তাহব্যাপী রবীন্দ্র জন্মোৎসব

রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শিলদা তরুণ সংঘ পাঠচক্রে সপ্তাহব্যাপী এক কার্যসূচী গৃহীত হয়। প্রথম দিনের কথিকায় বক্তৃতা করেন

শ্রীদিলীপ ঘোষাল। ২৯শে বৈশাখের অনুষ্ঠানের অঙ্গ ছিল কবিতা পাঠ, সংগীত ও 'অভিসার' নৃত্যনাট্য। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সর্বশ্রী অনন্তকুমার সৎপতি, হরিসাধন মজুমদার ও ক্ষুদিরাম নাদ। ৩০শে বৈশাখের অনুষ্ঠানে বৈকুণ্ঠের খাতা অভিনীত হয়। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে নৃত্য, নাটক ও সংগীতে যারা অংশ গ্রহণ করে তাদের মধ্যে অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, ভূপতি মিত্র, ময়না চক্রবর্তী, আগমনী মজুমদার, শিপ্রা রায় ও শিপ্রা পালচৌধুরী অন্যতম।

হাওড়া

ভারত পাঠাগারের ত্রয়োদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

বিশে মার্চ পাঠাগারের ত্রয়োদশ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রারম্ভে বিগত বছরের কার্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাবনিকাশ উপস্থাপিত করেন পাঠাগার সম্পাদক শ্রীউদয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায়। পরবর্তী বছরের কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্যগণ এই সভায় নির্বাচিত হন। সর্বশ্রী কৃষ্ণপদ মুখোপাধ্যায়, উদয় নারায়ণ মুখোপাধ্যায় ও ইন্দ্রনাথ সেন যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক পদে নির্বাচিত হন।

২৭শে মার্চ পাঠাগারের ত্রয়োদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা উৎসব বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে উদ্‌যাপিত হয়। পৌরোহিত্য করেন কলিকাতা পৌরপতি শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন সুসাহিত্যিক শ্রীমতী প্রতিভা বসু। এই উপলক্ষে প্রদর্শনী বিতর্ক, নাটক এবং বিবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

মহীয়াড়ি পাবলিক লাইব্রেরী

বাংলা দেশের প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে মহীয়াড়ি পাবলিক লাইব্রেরী অন্যতম। দুষ্প্রাপ্য পুঁথি ও পুস্তকাদির জন্যে লাইব্রেরীটির খ্যাতি আছে। বাংলা দেশের বহু মনীষী এই গ্রন্থাগার নিয়মিত ব্যবহার করতেন এবং বর্তমানেও অনেকে এই গ্রন্থাগারে পড়াশোনা ও গবেষণার উপকরণ সংগ্রহ করতে যান। সম্প্রতি সরকার গ্রন্থাগারটিকে 'পল্লী গ্রন্থাগারে' রূপায়িত করেছেন। গ্রন্থাগারটির শীঘ্রই নূতন গৃহ নির্মাণ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। স্থানীয় উৎসাহী লোকেদের নিরবচ্ছিন্ন সেবায় গ্রন্থাগারটির সমৃদ্ধি ও জনপ্রিয়তা ঘটেছে।

হুগলী :

কামারপুকুরে নূতন গ্রন্থাগার স্থাপন

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের অর্থানুকুল্যে এবং রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্যোগ ও পরিচালনায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুরে সম্প্রতি একটি বিরাট লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মোট খরচ হবে ৬৬০০০ টাকা। তার মধ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার যথাক্রমে শতকরা ৬০ ও ৩৫ ভাগ ব্যয়ভার বহন করেছেন। আট হাজার টাকার বই কেনা হয়েছে। এখান থেকে গ্রন্থ-যানের সাহায্যে আরামবাগ জেলার আরও পাঁচটি কেন্দ্রে বই সরবরাহ করা হবে। গত ২রা মার্চ ডক্টর ডি, এম, সেন গ্রন্থাগারটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন। গৃহ নির্মাণের জন্যে পঁচিশ হাজার টাকা ও গ্রামবাসীদের শিক্ষাদান ও চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সরঞ্জাম ক্রয়ের জন্যে পঁচিশ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের নামে প্রতিষ্ঠিত এই গ্রন্থাগারটির পৌনঃপুনিক খরচের মধ্যে সাত হাজার টাকা রাজ্য সরকার দেবেন বলে জানা গেছে।

রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির ॥ বেলুড় মঠ

'পর্বত যদি মহম্মদের নিকট না আসে, মহম্মদ পর্বতের নিকট যাইবেন'— জনশিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামিজী এই কথাটির উল্লেখ করতেন। স্বামিজীর সেই উপদেশ অনুযায়ী জনশিক্ষা মন্দির গ্রন্থাগার থেকে একটি সুন্দর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। শিশু ও মহিলাদের জন্যে বিভিন্ন পল্লীতে গ্রন্থযানের সাহায্যে গ্রন্থ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। ভ্রাম্যমাণ বিভাগ থেকে বেলুড়ের শিবতলা ও লিলুয়ার ভট্টনগর এবং বেলুড়ের লালাবাবু সায়ার রোড, রামধন ঘোষ লেন ও হেম পাল লেন অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবকের দল সাইকেলে করে বই দিয়ে আসে। এছাড়া দমদম, বরাহনগর, জনাই, ভদ্রেশ্বর, ডোমজুড় ও উলুবেড়িয়ার মোট ২৬টি ক্ষুদ্র গ্রন্থাগারে গ্রন্থ-ঋণ দেওয়া হয়। গ্রন্থাগারের কেন্দ্রীয় ও ভ্রাম্যমাণ দুটি শাখা থেকে যথাক্রমে ২২০ ও ১১১০ জন সদস্যকে নিয়মিত গ্রন্থ সরবরাহ করা হয়। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত ১৯৫৪ সালে স্থাপিত এই গ্রন্থাগার কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়ে থাকেন। গ্রন্থাগারটির বর্তমান গ্রন্থ সংখ্যা ১৪,৬০৭। মিশনের এই জনশিক্ষা মন্দিরের উদ্যোগে গ্রন্থাগার, বয়স্কশিক্ষা কেন্দ্র, শ্রুতিচাক্ষুষী বিভাগ, শিশু বিভাগ প্রভৃতি কয়েকটি বিভাগ সাফল্যের সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে। গ্রন্থাগারটি সম্পূর্ণরূপে বিনা চাঁদায় চলে।

রামকৃষ্ণ মিশন জনশিক্ষা মন্দির ॥ বেলুড়
গ্রন্থাগার বিভাগ
কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার
ভ্রাম্যমাণ বিভাগ
পাঠকক্ষ
লেনদেন বিভাগ
সংবাদপত্র
পত্রপত্রিকা
বয়স্ক বিভাগ
শিশু বিভাগ
সাধারণ পুস্তক
স্লাইড, ফিল্ম, চার্ট ও রেকর্ড
পাঠ্য পুস্তক
গ্রন্থযান
সাইকেল
ব্যাগ
১। শিবতলা কেন্দ্র, বেলুড়
২। ভট্টনগর, লিলুয়া
১। লালাবাবু সায়ার রোড—৩২টি পরিবার
২। রামধন ঘোষ লেন —৩১টি ,,
৩। হেমপাল লেন —২০টি ,,
১। হাওড়া জেলা—১৬টি কেন্দ্র
২। হুগলী জেলা—৭টি কেন্দ্র
৩। ২৪ পরগণা জেলা—৩টি কেন্দ্র

হুগলী ঃ
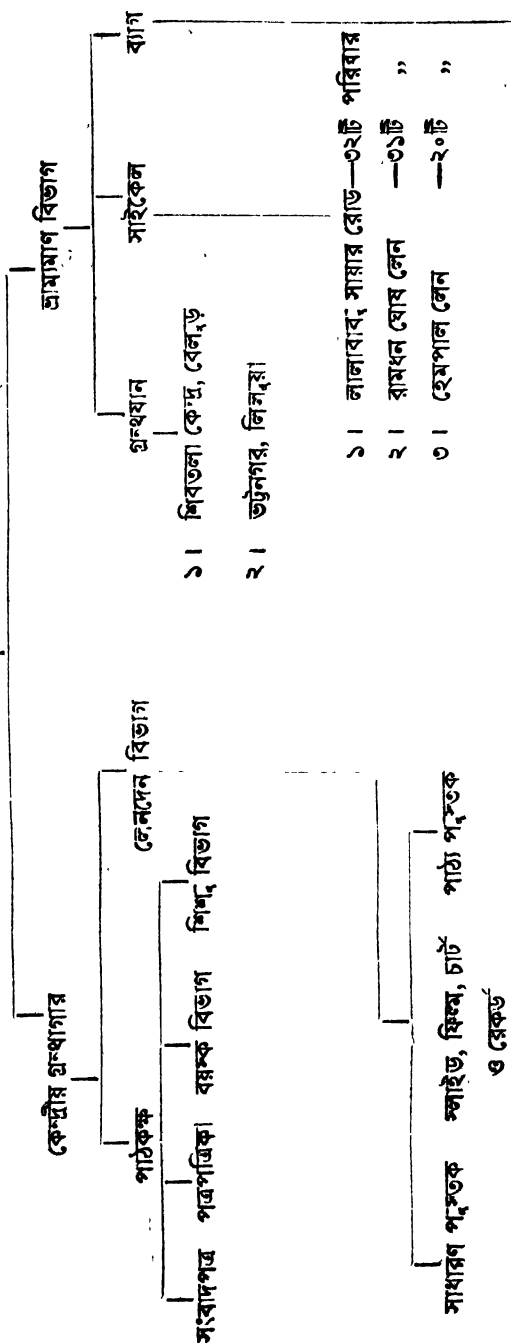
সালেপুর নগেন্দ্র সাধারণ পাঠাগার

২৭শে বৈশাখ পাঠাগারে রবীন্দ্র জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবে 'কবি-জীবন ও কর্মধারা' পর্যায়ে একটি গীতিআলেখ্য পরিবেশিত হয়। পরে 'কারাগার' বইটি অভিনীত হয়। স্থানীয় জনসাধারণ উৎসাহের সহিত যোগদান করেন। আবৃত্তি, গান ও রচনা পাঠ অনুষ্ঠানটিকে উপভোগ্য করে তোলে।

গরলগাছা সাধারণ পাঠাগারের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব

গত ১০ই এপ্রিল পাঠাগারের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীবি এস কেশবন। শ্রীতরুণকান্তি ঘোষ পাঠাগারের আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন কার্য সম্পন্ন করেন। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। পাঠাগার সম্পাদকের কার্যবিবরণীতে জানা যায় যে পাঠাগারটিকে সরকারের 'আঞ্চলিক গ্রন্থাগার' পরিকল্পনাধীনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। পাঠাগারের বর্তমান মোট পুস্তক সংখ্যা ৪২০২টি ও সদস্য সংখ্যা ২৭৮ জন। পাঠাগারের একটি কিশোর বিভাগ আছে। ঐদিনের অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

হলদিবাড়ী পি, ডি, এন, এন, ক্লাব লাইব্রেরী। সম্প্রতি অগ্নিকাণ্ডে গ্রন্থাগারটির সমুদয় গ্রন্থ ও আসবাবপত্র বিনষ্ট হইয়াছে।

চিঠিপত্র

বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ প্রসঙ্গে

প্রিয়বরেষু সৌরেন,

গ্রন্থাগারে বর্গীকরণের সমালোচনা পড়ে খুব ভালো লাগলো ; সমালোচনা নিশ্চয়ই চাই। তবে তোমরা ত্রুটির দিকটাই বড়ো করে দেখিয়েছ ; পড়লে মনে হয় সবটাই বাজে হয়েছে। তাই কি ? যে কয়টা কথা লিখেছ তার মধ্যে একটা কথা মনে রেখো—যেসব form-গুলি expand করা সম্ভব হয় নি বা* করি নি ; যেমন বাংলা সাহিত্যই আমি বাদ দিয়েছি। বরাত দিয়েছি কোনো expert-এর উপর।

দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার স্থান হয়নি বলেছ—কেন ৩৪.৮৪ হিন্দু আইনে যাবে। আর্থিক ভূগোল তো ৯১.১৩ আছে। স্থানিক কথাটা বাংলা ছাড়া—আরও একটু স্পষ্ট করে বললে ভালো হতো আমার। বাংলা দেশের স্থানিক বাংলা দেশের মধ্যেই থাকবে। অন্যান্য প্রদেশ বা রাষ্ট্রের স্থান হবে স্থানিকের মধ্যে—কথাটা অস্পষ্ট। ৯১.১৯-এ সাধারণ ভূগোলের বই প্রায় text book জাতীয়। ৯১.৪ ভ্রমণ বর্ণনা। ৯১.০২ ভ্রমণ সহায়, তারপর geographical number দেবে—যদি সূক্ষ্ম করতে চাও। তবে বাংলা দেশের ভ্রমণ সহায় বাংলা ভ্রমণের মধ্যে রাখা যুক্তিসংগত। দূরে ফেলে লাভ নেই।

০৩.১৫ ও ৯২.০৫ বাঙালীর জীবনী। লাইব্রেরী যদি ইচ্ছা করে যাবতীয় কোষগ্রন্থ একস্থানে রাখতে পারে ; আবার জীবনীর মধ্যে জীবনীকোষ রাখতে পারেন—choice থাকা ভালো সুবিধের জন্যে।

৭৮ সংগীত, expand করবার অনেক জায়গা আছে। .১৬—.১৮ ফাঁক আছে। যথেষ্ট expansion হতে পারে। আর্থিক ইতিহাস ও আর্থিক অবস্থা কি এক জিনিষ ? আর্থিক অবস্থায় যেমন ধর Poverty and Plenty নিয়ে আলোচনা কোনো দেশের। সেটা কি ঠিক আর্থিক ইতিহাস।

আমিতো Arabic Numerals-এর পক্ষপাতী। কিন্তু হিন্দীওয়ালারা হিন্দী সংখ্যা ছাপছে—আমরা বাংলা ছাপবো না কেন ? Arabic হতে কোনো আপত্তি নেই। হ্যাঁ ইংরেজি ও সংস্কৃতটা ছাপছি, যদি কিছু বলার থাকে

এখনই বলো। মোট কথা তোমরা সমালোচনা করেছ দেখে খুসি হয়েছি। তবে আমার দিকের কথাটাও শুনো। খুব ভালো হয় যদি একদিন তোমাদের আড্ডায় কোনো সময়ে এবিষয়ে আলোচনার সুযোগ দাও আমাকে। বেশ ঘরোয়া বৈঠকে আলোচনা হবে। আমিতো আর সবজান্তা নয়। তোমাদের কাছে এখনো কত শিখতে পারি সত্যি বলছি একথাটা। বিজয়, ফণী, প্রমোদ, তুমি এবং যারা থাকতে চান—সকলে মিলে আলোচনা করা যাবে।

যদি সম্ভব হয় আমার দিকের কথাগুলি গুছিয়ে লিখে দিতে পারো—আর positive কি কিছুই পাওনি—সেটাও বলো। ইতি—

বোলপুর, ২৯।৪।৬০ প্রভাতদা

[পত্রিকায় গ্রন্থাগার বিষয়ক সমস্ত বই বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সমালোচনা করানো হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রতিকূল সমালোচনার জন্য অনেকে ক্ষুব্ধ হইয়া থাকেন। কিন্তু নির্দিষ্ট বিষয়ের প্রতি দ্বিধাহীন নিষ্ঠা রাখিতে হয় বলিয়া আমরা এ ধরণের সমালোচনা হইতেও বিরত থাকিতে পারি না। সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ যে এ ধরণের ক্ষেত্রে তাঁহারা যেন ভুল না বুঝেন। লেখকদের প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধাকে কিছুমাত্র কম করিলেও চলে না। —সম্পাদক]

সমালোচকের উত্তর

কোনো বর্গতালিকা পরীক্ষা করতে গেলে দেখতে হয়

1) Whether terms are proceeding from greater extension to smaller extension.

2) Whether each term is modulating into the next term, i e. whether the process of division is gradual.

3) Whether the enumeration of parts is exhaustive.

আরও কিছু দিক আছে, তবে এই তিনটি দিক মুখ্য দিক। প্রভাতবাবু যে যে বিভাগে 'ভারতীয়তা' আনতে চেয়েছেন, সেই বিভাগগুলি এই দিকত্রয় দিয়ে বিচার করা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে বর্গীকরণ যথেষ্ট অসম্পূর্ণ, উদাহরণ দিতে গেলে অনেক পৃষ্ঠা লাগবে। সামান্য দু'চারটে দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। যখন schedule expand করাই উদ্দেশ্য, তখন এমন কথা বলা চলে না যে expand করার জায়গা আছে। জায়গা পূরণ করার কাজটা যদি ভবিষ্যতের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে প্রভাতবাবুর কৃতিত্ব কী রইল ?

যে ত্রুটি দেখানো হয়েছে তাতে নিশ্চয়ই এমন ধারণা হয় না যে বইটির সবটাই বাজে হয়েছে। বইয়ের গুণের কথা—যা প্রাপ্য তা ঠিক বলা হয়েছে। Detailed সমালোচনা এবং তাও আবার গ্রন্থাগারিকের দিক থেকে করা হয়েছে বলেই ত্রুটিগুলি দেখানো হয়েছে যাতে পরবর্তী সংস্করণে পরিমার্জন করা চলে।

পরিষদ সভাপতি শ্রীসুবোধ কুমার মুখোপাধ্যায়। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীমুখোপাধ্যায়ের 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান' বইটির জন্য তাঁহাকে নরসিংদাস পুরস্কারে সম্মানিত করিয়াছেন।

গ্রন্থ সমালোচনা

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান। হরিদাস দাস কর্তৃক সঙ্কলিত। প্রকাশক: হরিবোল কুটীর, নবদ্বীপ। মূল্য ৪ ভাগ দুই খণ্ডে—৪০্ টাকা। কলিকাতায় প্রাপ্তিস্থান: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬॥

বৈষ্ণব ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য বাঙ্গালীর একান্ত গৌরবের বস্তু। বাঙ্গালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বৈষ্ণব ধর্মকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। ভারতীয় সংস্কৃতির ভাণ্ডারে বাঙ্গালীর সবচেয়ে বড় দান বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্য। একদা আমাদের সমাজে বৈষ্ণব ধর্মের যে প্রভাব জীবন্ত ও সর্বব্যাপী ছিল এখন আর তা নেই। সুতরাং এখন সাধারণ পাঠক বৈষ্ণব দর্শন ও সাহিত্য পড়তে গিয়ে পদে পদে বাধা পায়। ব্যক্তি ও জায়গার নাম; অপরিচিত শব্দের অর্থ, পূর্বসূত্র ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা না থাকলে বৈষ্ণব সাহিত্য ও সংস্কৃতির যথার্থ উপলব্ধি সম্ভব নয়। এতদিন এমন একটি রেফারেন্স বই ছিল না যা থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে।

এতদিনে শ্রীহরিদাস দাস কর্তৃক সংকলিত শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান প্রকাশিত হয়ে সেই অভাব দূর করেছে। দুই সহস্রাধিক পৃষ্ঠার এই বিরাট কোষগ্রন্থ বাংলা ভাষার সম্পদ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করবে। এই গ্রন্থ সংকলনের গভীর পাণ্ডিত্য ও জীবনব্যাপী নিরলস সাধনার এক বিস্ময়কর কীর্তি। বাংলা ভাষায় রেফারেন্স বইয়ের একান্ত অভাব। এই কোষগ্রন্থ যে শুধু বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠকের অভাব পূর্ণ করবে তাই নয়; সাধারণভাবে বাঙালীর সাহিত্য ও সংস্কৃতির আলোচনা ও অধ্যয়নের পক্ষেও এই কোষগ্রন্থ অপরিহার্য।

শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান চার খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে আছে সংস্কৃত-প্রায় শব্দাবলির অভিধান; দ্বিতীয় খণ্ডে পদাবলী সাহিত্যে ব্যবহৃত প্রাচীন বাংলা, হিন্দী, মৈথিলী, ব্রজভাষা ও উড়িয়া ভাষার দুরূহ, অপ্রচলিত, অপভ্রষ্ট ও তদ্ভব শব্দাবলীর অর্থ ও প্রয়োগ; পদাবলীর ভাষা, ছন্দ, ব্যাকরণ, রস, অলঙ্কার ইত্যাদি; কীর্তনের উপাঙ্গ ভেদ, চৌষট্টি রসের কীর্তন, বাদ্য, নৃত্য গৌরচন্দ্র ইত্যাদির ব্যাখ্যা, তৃতীয় খণ্ডে চৈতন্যদেব এবং অন্যান্য বৈষ্ণব

সাধকদের চরিতাবলী এবং বৈষ্ণব-সাহিত্য গ্রন্থের সার সঙ্কলন। চতুর্থ খণ্ডে আছে বৈষ্ণব তীর্থ সমূহের বিবরণ, সংস্কৃত ও বাংলা ছন্দ ইত্যাদি। এই সংক্ষিপ্ত সূচীপত্র থেকে দেখা যাবে আলোচ্য গ্রন্থটির পরিধি কত বৃহৎ। কয়েকটি মানচিত্র সন্নিবেশিত করায় কোষগ্রন্থটির উপযোগিতা বেড়েছে। নিঃসম্বল অবস্থায় একক প্রচেষ্টায় এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর কোষগ্রন্থ রচনা পাঠকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ না করে পারে না। গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় সঙ্কলক দৃষ্টান্ত স্বরূপ বৈষ্ণব সাহিত্য থেকে যে-সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা থেকে তাঁর গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রন্থের আকার ও প্রয়োজনীয়তা বিচার করলে দাম সস্তা বলেই মনে হয়। সরকারী সাহায্য পাওয়ায় অপেক্ষাকৃত অল্প দাম ধার্য করা সম্ভব হয়েছে। শ্রীশ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধান প্রত্যেক গ্রন্থাগারে স্থান লাভের যোগ্য।

রবিতীর্থে ॥ অসিতকুমার হালদার ॥ পাইওনিয়ার বুক কোং, কলিকাতা-১২
॥ মূল্য পাঁচ টাকা ॥

বিখ্যাত শিল্পী শ্রীঅসিতকুমার হালদার পারিবারিক সূত্রে ঠাকুর বাড়ির সহিত সম্পর্কান্বিত। দীর্ঘ বারো বৎসর যাবৎ তিনি শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর সান্নিধ্য লাভ করেছেন। সুতরাং শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য বিবৃতি পরিবেশনের অধিকার তাঁর আছে। শ্রীযুক্ত হালদার তাঁর নিজের জীবনের পটভূমিকায় ঘরোয়াভাবে শান্তিনিকেতনের স্মৃতি লিপিবদ্ধ করেছেন। শান্তি-নিকেতন সম্বন্ধে গুরুগম্ভীর বই থেকে যে পরিচয় পাওয়া যায় না এ বই থেকে তা পাওয়া যায়। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে লেখকের অন্তরঙ্গতা রচনার মধ্যে ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ এবং শান্তিনিকেতন ছাড়া লেখক নিজের কথাও পাঠককে জানিয়েছেন। নিজেকে আর একটু পশ্চাতে রাখলে রচনার উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেত। এ বইয়ের সবচেয়ে বড় সম্পদ লেখকের আঁকা কতকগুলি সুন্দর রেখাচিত্র। এই রেখাচিত্রগুলির সহায়তায় শান্তিনিকেতনের ছাত্র, শিক্ষক ও পরিবেশ জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

—চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

বার্তা বিচিত্রা

পরিষদ কার্যালয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর

গত ২৪শে এপ্রিল প্রাতে ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সান্ধ্য কার্যালয়ে এক চা-চক্রে আপ্যায়িত করা হয়। পরিষদের সংসদ সদস্যগণ উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক কবীর পরিষদের বিভিন্ন কার্যাবলী সম্পর্কে সদস্যগণের সহিত আলোচনা করেন। এবং পরিষদের মাসিক পত্রিকা ও অন্যান্য কার্যাদিতে বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন। রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি অর্থ সংগ্রহের জন্যে আবেদন জানান।

গ্রন্থাগারিকদের লৌহ যবনিকার মনোভাব বলিয়া অভিযোগ

সম্প্রতি লন্ডনে অনুষ্ঠিত ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যলয়গুলির এক সম্মেলনে অধ্যাপক জে, এম, আর, করম্যাক গ্রন্থাগারিকদের বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিকদের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগে বলেন যে তাঁরা পাঠক ও গ্রন্থের মধ্যে একটা লৌহ যবনিকার সৃষ্টি করেছেন। তাঁর মতে গ্রন্থাগার বিদ্যাকে বিজ্ঞান বলা ভুল, তিনি বলেন যে যত বেশী সম্ভব সংখ্যক পাঠক ন্যূনতম আয়াসে যত বেশী সম্ভব গ্রন্থ ব্যবহারে সক্ষম হবে ততই ভাল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচী কক্ষকে দানবের সমতুল্য হিসেবে এক ভীতিপ্রদ চিত্রের বর্ণনা দেন। তিনি ষ্ট্যান্ডিং কনফারেন্স অব ন্যাশান্যাল এন্ড ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীজকে বর্গীকরণের জটিলতা দূরীকরণের অনুরোধ জানান। তাঁর মতে পেশাদার কর্মীরাই এই জটিলতা সৃষ্টি করায় বর্গীকরণই লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে মাধ্যমের পরিবর্তে। [Liason : Jan : 1960)

আন্তর্জাতিক গ্রন্থসূচী সম্মেলন

চলতি বছরের শেষে ইউনেস্কোর প্যারিসে অবস্থিত কেন্দ্রীয় দপ্তরে আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে। গ্রন্থসূচী ও গ্রন্থপঞ্জী সংকলনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে একাধিক রীতিনীতি প্রয়োগ করা হয়। সেজন্য বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতিতে একটিমাত্র রীতি নির্ধারণে মতৈক্য সৃষ্টিই সম্মেলনের উদ্দেশ্য।

সম্পাদকীয়

পত্রিকার বর্ষারম্ভ

মাসিকে রূপান্তরিত হবার পর 'গ্রন্থাগার' পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করল। পত্রিকা প্রকাশনে স্বাভাবিক বহু অসুবিধাই আছে; কিন্তু নব পর্যায়ের প্রারম্ভে পত্রিকার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে অনিশ্চয়তা ও সংশয়ে অনেকের মন দোলায়িত হয়েছিল এখন আত্মপ্রত্যয়ে তা কিছুটা দৃঢ়তা লাভ করেছে। এই দৃঢ়তার বনিয়াদ পরিষদের সাংগঠনিক শক্তি এবং গ্রন্থাগার কর্মী ও অনুরাগীদের সাহায্য ও সহানুভূতি। ইদানিং পত্রিকার যা কিছু প্রচার ও প্রতিষ্ঠা ঘটেছে, তা পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার তৎপরতার পরোক্ষ প্রতিফলন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সংগঠন। আন্দোলনের সাফল্য-অসাফল্য ও কর্মচাঞ্চল্যের প্রভাব পত্রিকায় প্রতিফলিত হয়। গ্রন্থাগার সম্পর্কিত চিন্তা ও লেখাজোকা, সংবাদ ও প্রচেষ্টার নিদর্শন পাওয়া যায় এতে। কর্মতৎপরতার গতি ও মান এর মাধ্যমেই নিরূপণ করা চলে। তেমনি পত্রিকার গুণাগুণ নির্ভর করে উৎকৃষ্ট ও পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রবন্ধাদির উপর; বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সংবাদেও থাকা চাই অনুষ্ঠানাদির ঔজ্জ্বল্য ও বৈচিত্র্য।

বিগত বর্ষে সুপরিচিত লেখকদের প্রবন্ধ ছাড়াও অন্যান্য বছরের তুলনায় অধিকতর নতুন লেখক-লেখিকাদের প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এবং তাঁদের প্রতিভার স্বাক্ষর সেগুলিতে পাওয়া গেছে। প্রবন্ধ দিয়ে যাঁরা পত্রিকা প্রকাশনে সহায়তা করেছেন, তাঁদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। সংবাদ প্রেরণ ও অন্যান্য টুকিটাকি কাজে যাঁরা নিয়মিত সহযোগিতা করে থাকেন, তাঁদের প্রতিও আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

গ্রন্থাগার-এর লেখক, পাঠক ও সকল শুভানুধ্যায়ীর সক্রিয় সহযোগিতা ও পরামর্শে পত্রিকার ক্রমোন্নতি ও সমৃদ্ধি ঘটুক, এই কামনা করি।

তিন মনীষীর মহাপ্রয়াণ

বাংলা দেশের মনীষার ক্ষেত্র ক্রমেই যেন সংকীর্ণ হয়ে আসছে। পর পর তিনজন মনীষী চলে গেলেন; বাংলার শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র দীনতর হোল। উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী ও রাজশেখর বসু বাংলা সাহিত্যের তিনটি দিকের দিকপাল ছিলেন। তাঁদের জীবনাবসানে বাংলা সাহিত্যে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হোল। আমরা তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

এই কিছুদিন আগে উপেন্দ্রনাথের ৭৯তম জন্মদিবসে সকলে তাঁর শতায়ু কামনা করেন। কিন্তু তা না ফললেও তিনি আমাদের মধ্যে অন্যভাবে রয়েছেন। ঔপন্যাসিক উপেন্দ্রনাথের রচনা সম্পদ ছাড়াও বিচিত্রা সম্পাদক সাংবাদিক উপেন্দ্রনাথের অবদান অপরিমেয়। ইদানিং দেখা যেত তাঁর গভীর সাহিত্যানু-রাগের ফলে শত অসুবিধা সত্ত্বেও কোনও অনুষ্ঠানে তিনি যোগদানে বিরত হতেন না। কিছুদিন আগেও একটি গ্রন্থাগারের জয়ন্তী উৎসবে গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে তিনি বিশেষ উৎসাহ প্রদর্শন করেন। তাঁর অভাব সকলে দীর্ঘকাল অনুভব করবে।

রবীন্দ্রনাথের সহকর্মী আচার্য ক্ষিতিমোহনের কাছে বাঙালী সমাজ বিশেষ ভাবে ঋণী। ভারতীয় সংস্কৃতির কয়েকটি দিকের দ্বার খুলে দিয়ে গেছেন তিনি। মধ্যযুগের সন্ত জীবন-দর্শন নিয়ে তিনি করেছিলেন চর্চা ও গবেষণা। লোক সাহিত্য ও লোক ধর্মের প্রতি আমাদের আগ্রহের সূচনা ঘটে বলতে গেলে তাঁরই প্রভাবে। জ্ঞানবৃদ্ধ আচার্যদেবের স্মৃতি সংস্কৃতিবান বাঙালীর কাছে প্রোজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

একটি মানুষের পক্ষে কতবেশী গুণের অধিকারী হওয়া যায়, তার প্রকৃষ্ট নিদর্শন ছিলেন, রস-সাহিত্যিক, আভিধানিক, শাস্ত্রবিদ, ভাষাবিজ্ঞানী, বাণিজ্য-বিশারদ, যন্ত্রবিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক রাজশেখর বসু। তাঁর অজস্র অবদানের মধ্যে পরশুরামের লেখনী দিয়ে তিনি যে রসসম্ভার রেখে গেলেন, সাধারণ বাঙালীর কাছে তার মূল্য অসীম ও অনন্যসাধারণ। পরশুরামের লেখা আর দেখা যাবে না এ চিন্তা সাধারণ মানুষের কাছে দুঃসহ। বাঙালীর চিত্তজগতে তিনি চির-স্থায়ী আনন্দপ্রস্রবণ সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর গড়া চরিত্রগুলি সব সময়ই যেন আমাদের মানসচক্ষে দেখা দেয়। যুগ যুগ ধরে তিনি আমাদের মধ্যে বিরাজ করবেন।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

গ্রন্থসূচি ও সূচিকরণের গোড়ার কথা

বিমলেন্দু মজুমদার

গ্রন্থাগারিক, রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচার, গোলপার্ক

বিখ্যাত ঐতিহাসিক কারলাইল সূচিবিহীন গ্রন্থাগারকে চক্ষুবিহীন দানবের সহিত তুলনা করিয়াছেন। দানবের যত শক্তিই থাকুক না কেন চক্ষুবিহীন হইলে সে শিশুর মত দুর্ব্বল হইয়া যায়, তাহার দ্বারা কোন কাজই আর সম্ভব হয় না, সেইরূপ সূচিবিহীন গ্রন্থাগারে যত গ্রন্থসমৃদ্ধিই থাকুক না কেন সেইগ্রন্থ ঠিক সময়ে ঠিক প্রয়োজনমত ঠিকঠিক পাঠকের পক্ষে পাওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না।

গ্রন্থাগারের কার্য্য পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মীরা এখনও মান্ধাতার আমলের চিন্তায় আচ্ছন্ন। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় "আচ্ছা, গ্রন্থাগারিককে ঠিক কি কাজ করিতে হয়? জবাব পাওয়া যাবে, "কেন উত্তর তো খুব সোজা! গ্রন্থাগারে যেমন যেমন পুস্তকগুলি আসে গ্রন্থাগারিক তাহাদের একটি তালিকা প্রস্তুত করিয়া সেল্ফে সাজাইয়া রাখেন এবং লোকে চাহিবামাত্র সেই সেই বইগুলি বাহির করিয়া তাঁহাদের হাতে দেন।" তাঁহারা তালিকা বলিতে বুঝেন একটি ক্রমিক তালিকা—অর্থাৎ প্রথম যে বইটি গ্রন্থাগারে আসিল সেটির নাম প্রথমে লেখা হইল, দ্বিতীয়টি দ্বিতীয় স্থান পাইল; এইরূপে যত বই আসুক প্রত্যেকটিই সেই ক্রমিক তালিকায় স্থান পাইল। কিন্তু যদি আপনি তাঁহাদের পুনরায় প্রশ্ন করেন "আচ্ছা তালিকা তো হ'ল এবং ধরুণ এই তালিকাতে প্রায় ৫০০০ বইএর

নাম লেখা হ'ল। এখন কেউ যদি এসে বলেন 'আচ্ছা জওহরলাল নেহেরুর ভারত আবিষ্কার বইটির নম্বর কত একটু বলে দেবেন কি? তখন তাকে কি জবাব দেবেন?" তার উত্তরে তাঁরা জবাব দেবেন, "কেন, তালিকাটির উপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলেই খুঁজে পাওয়া যাবে।" প্রত্যুত্তরে পাঠক বলিবেন "হ্যাঁ, পাওয়া যাবে সত্য, কিন্তু সেটা খুবই সময় সাপেক্ষ হবে। অথবা ঠিক সেই Itemটি চোখে নাও পড়তে পারে।" যাহাতে গ্রন্থাগারে কোন পাঠক আসিয়া কোন বিশেষ লেখকের লেখা বই বা কোনও বিশেষ শিরোনাম (Title) ওলা বই চাহিবামাত্র সহজেই গ্রন্থাগারিক বাহির করিয়া দিতে সক্ষম হন এমন ভাবে তালিকাটি বিজ্ঞান সম্মত ভাবে প্রস্তুত করা উচিত; তখন এই তালিকাকে আর "তালিকা" বলা হয় না। বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে রচিত সেই তালিকাকে সূচি বলা হয়।

ইংরাজী Oxford Dictionaryতে অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে "Catalogue" কথাটির এইরূপ অর্থ দেওয়া আছে ঃ

"কোন জিনিষের সাধারণত বর্ণানুক্রমিক বা অন্য কোন রীতিসংগত বা প্রণালীবদ্ধ বা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাজান সম্পূর্ণ তালিকা, যে তালিকাতে বিশেষ ভাবে ঐ বিষয়ের খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ করা থাকে।"

পূর্বে "সূচি" কথাটির অর্থ ছিল কোন জিনিসের বা বস্তুসমূহের তালিকা বা ফর্দ। কিন্তু Oxford Dictionary পাঠে দেখা যায় যে অধুনাকালে Catalogue বা সূচিকে শুধু তালিকা, ফিরিস্তি বা ফর্দ হইতে পৃথক করিয়া দেখা হয়। অর্থাৎ আধুনিককালে Catalogue বা সূচি বলিতে কোন জিনিস বা বস্তু সমূহের বর্ণানুক্রমিক বা রীতিসংগত বা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সাজান তালিকা বুঝি এবং সেই তালিকাতে তালিকাটি যাঁহাদের ব্যবহারের জন্য রচিত তাঁহাদের প্রয়োজনানুযায়ী এই বস্তুগুলির খুঁটিনাটি জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ অবশ্য থাকা চাই। যেমন ধরুণ কোন গহনার দোকানের "সূচি", এটিকে তখনই "সূচি" বলা চলিবে যখন সেই সূচিতে যাঁরা সেই সূচি ব্যবহার করিবেন অর্থাৎ দোকানের খরিদ্দাররা যাহা যাহা জানিতে চান সেই সেই বিষয়ের বিবরণ খুঁটিনাটি ভাবে লিপিবদ্ধ থাকিবে। অর্থাৎ গহনাটি কি সোনার তৈয়ারী বা রূপার বা অন্য কোন বস্তুর তৈয়ারী? প্রত্যেকটি জিনিসের ওজন কত? কেননা গহনার খরিদ্দারদের পক্ষে ওজন জানা খুবই প্রয়োজনীয়।

তাছাড়া গহনাগুলি শুধু সোনা বা রূপা দিয়া তৈয়ারী বা জড়োয়া বা রত্ন খচিত কি না? জিনিসগুলির ঠিক মাপ কি? শরীরের কোন অংশে ব্যবহৃত হয়, মূল্য কত ইত্যাদি। তেমন আসবাব পত্রের দোকানের দ্রব্যাদির সূচিতেও ঐরূপ ব্যবহারকারীর বা খরিদ্দারের প্রয়োজনানুরূপ জ্ঞাতব্য বিষয় লিপিবদ্ধ থাকা চাই। যেমন, সেগুলি ঠিক কি দিয়া তৈয়ারী, কি মাপের, কি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, রং কি, মূল্য কত এই সব জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে সাহায্য করে এবং এই জ্ঞাতব্য বিষয়ের খুঁটিনাটি যদি সেই সূচিতে লিপিবদ্ধ না থাকিত—তাহা হইলে তাহাকে আমরা "সূচি" বলিতে পারিতাম না শুধু ফর্দ বা ফিরিস্তি বলিতে পারিতাম।

যাহা হউক তাহা হইলে মোটের উপর আমরা দেখিতেছি সূচি বলিতে সেই তালিকা বা ফিরিস্তি যাহাতে সেই সূচি ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ থাকে এবং এই খুঁটিনাটি বিষয় লিপিবদ্ধ না থাকিলে ইহাকে সূচি বলিলে ভুল হইবে।

অধুনাকালে গ্রন্থাগারের "সূচি" বলিতে বিজ্ঞানসম্মতভাবে সাজান এবং খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ করা নিম্নলিখিত জিনিসগুলির তালিকা বা ফর্দ বুঝায়—যথা :—পুস্তক, হস্তলিখিত পুঁথি, ক্ষুদ্র পুস্তিকা বা চটি বই, গানের স্বরলিপি, চিত্র বা ছবি, নক্সা, মানচিত্র, ভূচিত্র, ম্যাজিকলণ্ঠন প্রভৃতির চিত্রিত কাঁচখন্ড, ফিল্ম, অনুচিত্র, গ্রামোফোন রেকর্ড, টেপরেকর্ড ইত্যাদি।

অর্থাৎ অধুনাকালে গ্রন্থাগারিক শুধু পুঁথি বা পুস্তকের রক্ষক নহেন তাঁহাকে উপরে উল্লিখিত সব জিনিসেরই সংগ্রহ করিয়া তাহাদের বিজ্ঞান সম্মতভাবে সূচি প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। ইংলন্ডের বিখ্যাত গ্রন্থাগারিক জেমস্ ডাফ্ ব্রাউন গ্রন্থসূচির নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা বা সংজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন :

"সূচির ঠিকমত সংজ্ঞা নির্দ্দেশ করিতে গেলে বলিতে হয় যে ইহা একটি অর্থবোধক, রীতিসঙ্গত বা শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সজ্জিত তালিকা বা ফর্দ্দ যাহাতে গ্রন্থ এবং তৎমধ্যস্থ সমস্ত বিষয়ের খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ থাকে এবং গ্রন্থপঞ্জীর (Bibliography) সহিত ইহার তফাৎ এই যে গ্রন্থসূচি (Catalogue) একটি মাত্র গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকাদির তালিকা বা সূচিমাত্র, কিন্তু গ্রন্থপঞ্জী বলিতে বিশেষ বিষয়ের এক বা একাধিক গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তকাদির তালিকা বুঝায়।

সূচিকরণ কাহাকে বলে ?

সাধারণভাবে বলিতে গেলে "সূচিকরণ" (Cataloguing) বলিতে কোন বিষয়ের তালিকা বা ফিরিস্তির লিপিবদ্ধকরণ বুঝায়, কিন্তু এই ফিরিস্তি এমন হওয়া চাই যে এই ফিরিস্তি হইতে সেই সেই বস্তুগুলিকে চেনার ও সেগুলির অবস্থিতির সঠিক স্থান নির্দ্দেশ করা যায় এবং সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা করা যায়। বিস্তৃতভাবে বলিতে গেলে সূচিকরণ বলিতে বুঝায় বস্তুসমূহের সুবিন্যস্ত তালিকা লিপিবদ্ধ করার কার্য্য, যদ্বারা এই সূচি ব্যবহারকারীকে সেই বস্তুগুলি ঠিক কি, তাহারা ঠিক কোথায় আছে এবং বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনের পক্ষে কতটা উপযোগী তাহা জানিতে সাহায্য করে। এই সূচি ঠিক নির্ভরযোগ্য, সুবিন্যস্ত এবং উপযোগী তখনই হয় যখন এই লিপিবদ্ধকরণ কতকগুলি বাঁধাধরা নিয়মে এবং রীতিসংগতভাবে করা হয়।

সূচিকরণ সংহিতা বা আইনকানুনের প্রয়োজনীয়তা কি ?

সাধারণ লোকে ভাবিতে পারেন যে সামান্য সূচিকরণের জন্য বাঁধাধরা আইনকানুন বা সংহিতার (কোডের) কীই বা প্রয়োজন? এবং বড় কোড ইত্যাদির প্রয়োজন নগণ্য। কিন্তু কেহ যদি হাতে কলমে সূচিকরণ কার্য্য করিতে যান তাহা হইলে প্রথমেই তিনি দেখিবেন যে কোন বাঁধাধরা নিয়মকানুন ছাড়া কাজের কী ভীষণ অসুবিধা হয় এবং এই অসুবিধা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য তিনি নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ কার্য্যের জন্য কতকগুলো নিয়ম লিপিবদ্ধ করিয়া লইবেন। যেমন ধরুন কোন লেখক "ছদ্মনামে" বই লেখেন এখন তিনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করিবেন যে সেই লেখকের "ছদ্মনামে" সূচি লিখিব না তাঁর "আসল নামে" লিখিব। নিজেই নিজের প্রশ্নের জবাব দিয়া তিনি হয়ত ঠিক করিলেন—লেখকের "ছদ্মনামে" না লিখিয়া লেখকের "আসল নামে" সূচিতে entry করাই সকলের পক্ষে সুবিধা হইবে। এইরূপ যেমন যেমন এক একটি সমস্যার উদ্ভব হইবে সংগে সংগে তিনি নিজে এক একটি উপায় নির্দ্ধারণ করিয়া তাহার সমাধান করিবেন এবং নিজেই দেখিবেন নিজের ভবিষ্যতে কাজের সুবিধার জন্য সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিলে সুবিধা হইবে, সেজন্য নিজের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নির্দ্দেশের জন্য সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন। এইরূপে একের পর এক সমস্যার উদ্ভব এবং তার সমাধানের উপায় বাহির করিতে করিতে তিনি নিজেই একটি কোড বা সংহিতার সৃষ্টি না করিয়া যদি তিনি অভিজ্ঞ

ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতার ফল হইতে উদ্ভূত সংহিতা নিজের গ্রন্থাগারে আনাইয়া ইহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী সূচিকরণ কার্য্য করেন তাহা হইলে তাঁহার নিজের ও পাঠকদের সকলেরই সুবিধা হইবে। কারণ পাঠকেরা এক গ্রন্থাগার হইতে অন্য গ্রন্থাগারে যাতায়াত করেন এবং যখন সব জায়গায় একই নিয়ম অনুযায়ী লিপি-বন্ধ করা সূচি পাইবেন তাঁহাদের কার্যের তাহাতে সুবিধাই হইবে। তাহা ছাড়া এইরূপ বাঁধাধরা নিয়ম অনুযায়ী কাজ করিলে গ্রন্থাগারিক বা সূচিকারক বদলাইলেও তাঁহাদের কৃত কার্য্য ঠিক একই ধারামতে চিরকাল চলিবে। ইহাতে নিয়মানুবর্ত্তিতা বজায় থাকে এবং যাঁহারা গ্রন্থাগার ব্যবহার করেন তাঁহাদের সকলেরই সুবিধা হয়।

ইহা ছাড়া অধুনাকালে অনেক দেশে দেখা যায় কো-অপারেটিভ বা সমবায় পদ্ধতি কৃত সূচিকরণ পদ্ধতির প্রচলন হওয়ার একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা হইতে সেই সেই দেশের যাবতীয় প্রকাশিত পুস্তকের পত্রক বা কার্ড-সূচির প্রধান বা লেখক সংলেখ (author entry) গুলি পাইবার সুবিধা হইয়াছে ; এই কার্ডগুলি সেই কেন্দ্রীয় সংস্থা হইতে অতি অল্প মূল্যে যে কোন গ্রন্থাগার-পরিচালক কিনিতে পারেন। ইহার সুবিধা এই যে এই কার্ডগুলি কিনিয়া শুধু শিরোনাম বা হেডিংটি প্রয়োজনানুযায়ী (গৌণ সূচি লেখ) added enty বা গৌণ সংলেখ-এর জন্য লিখিয়া সেগুলি ঠিক ঠিক জায়গায় সারিবদ্ধ ভাবে সাজাইলেই সকল গ্রন্থাগারে বেশ সুন্দর, রীতিসংগত প্রথানুযায়ী লিখিত, পরিস্কার গ্রন্থসূচি পাওয়া সম্ভব হয়। কিন্তু এই কার্ডগুলি সব গ্রন্থাগারে ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে প্রথমেই সেই সব গ্রন্থাগারকে একই "সংহিতা" বা "কোড" মানিয়া লইতে হইবে। সেই জন্য একটি কোডের বা সংহিতার প্রয়োজন।

অবশ্য আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে যদিও সূচিকারকের পক্ষে একটি সংহিতা মানিয়া চলা খুবই প্রয়োজনীয় তথাপি পাঠকের সুবিধা অসুবিধাকেই আমাদের লক্ষ্য হিসাবে সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিতে হইবে। সেই লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করিতে গিয়া অর্থাৎ পাঠকের সুবিধা অনুযায়ী কাজ করিতে গিয়া যদি সংহিতার নিয়ম কানুনের কিছুটা ব্যতিক্রম করিলে সেই বিশেষ গ্রন্থাগারের সুবিধা হয় তাহা হইলে তাহাই করা বাঞ্ছনীয়। প্রতীচ্য দেশীয় বিখ্যাত গ্রন্থাগারিক Cranshaw বলেন—"আপনার সূচি আপনার নিকটস্থ বা প্রত্যক্ষ পাঠকদের উপযোগী করিয়া লিখিবেন"—অর্থাৎ সূচিকরণ পদ্ধতি এমন হওয়া চাই—ইহা সেই গ্রন্থাগারকে সাধারণত যেসব পাঠক আসেন তাঁহাদের

বিদ্যাবুদ্ধির দ্বারা যাহাতে অতি সহজেই সূচিগুলির পদ্ধতি তাঁহাদের বোধগম্য হয় এবং তাঁহাদের স্ব স্ব রুচি ও প্রয়োজনানুযায়ী পুস্তক পুস্তিকা ইত্যাদি অতি অল্প সময়ের মধ্যে নির্ব্বাচন করিতে ও পাইতে পারেন এইরূপভাবে যেন সূচি প্রস্তুত হয় এবং সূচিগুলি যেন জটিল প্রথায় লিখিত না হয় অর্থাৎ সূচি বুঝিবার জন্য নানা রকমের সংকেত পত্রক (Guide card) বা জ্ঞাতব্য বিবরণ পুস্তক ইত্যাদির প্রয়োজন যত কম হয় ততই সাধারণ পাঠকদের সুবিধা। সূচি-গুলিতে লিপিবদ্ধ বিবরণে পুস্তকগুলির যথোপযুক্ত বিবরণ (যাহা সাধারণত পাঠকেরা চাহিয়া থাকেন) তাহা থাকা চাই ; অথচ দেখিতে হইবে অবান্তর বিবরণ দ্বারা সূচি যেন ভারাক্রান্ত না হয়। ইহাছাড়া এইরূপ প্রথানুযায়ী এবং পাঠকের প্রয়োজনারূপ সূচি প্রণয়ন একমাত্র শিক্ষা এবং প্রধানতঃ অভ্যাসের দ্বারাই সম্ভব আর কিছুর দ্বারাই নহে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে সূচিকারক যেন প্রত্যেকটি সংলেখ লিখিবার সময় অত্যন্ত মনোযোগের সহিত এবং সম্পূর্ণ নির্ভুল ভাবে প্রতিটি কথা লেখেন। ইহা না করিলে ইহাতে পত্রকগুলি সাজাইবার সময়—বানানের ভুলের জন্য ঠিক জায়গায় না সজ্জিত হইয়া ভুল জায়গায় চলিয়া যাইতে পারে এবং পাঠকের বিরক্তি উৎপাদনের কারণ হইতে পারে, যাহা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয়।

এখন গ্রন্থসূচির বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক ঃ—

১। গ্রন্থাগারের পক্ষে গ্রন্থসূচি অপরিহার্য্য কেন ?

২। ইহা হইতে আমরা কি কি প্রশ্নের জবাব পাইবার আশা করিতে পারি ?

৩। এই কার্য্যে গ্রন্থসূচি কি ভাবে এবং ঠিক কোন কোন সংলেখ (entry) ও লেখ্যের (recording) দ্বারা সম্পাদিত করে ?

৪। গ্রন্থসূচির (ক) বাহ্যিক আকৃতি এবং (খ) ভিতরের লিখন পদ্ধতি কোন ছাঁদে লেখা ও কার্ডগুলি কি পদ্ধতিতে সাজান থাকা বাঞ্জনীয়।

প্রথম প্রশ্নের জবাব হিসাবে বলা যায় যে কোন একটি গ্রন্থাগারের পক্ষে সুষ্ঠু কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে গ্রন্থসূচি অপরিহার্য্য। গ্রন্থসূচিকে গ্রন্থাগারের "চাবি" বলা হয়। অর্থাৎ কোন গৃহের মধ্যে যদি ধনভাণ্ডার সঞ্চিত থাকে এবং সেই ধনভাণ্ডারের ব্যবহার করিতে হইলে সেই গৃহের "চাবি" না পাইলে যেমন ধনভাণ্ডারের ব্যবহার করিবার সুযোগ পাওয়া যায় না সেইরূপ গ্রন্থাগারে যতই পুস্তকরূপ ধনভাণ্ডার সঞ্চিত থাকুক না কেন রীতি সঙ্গত ভাবে

গঠিত ও লিখিত সূচি না থাকিলে সেই পুস্তকগুলি ঠিক সময়ে ঠিক লোকের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব। কেননা সূচি না থাকিলে গ্রন্থাগার একটি পুস্তকের গুদাম মাত্র হইয়া যায়; ইহার ঠিক মত ব্যবহার সূচি ছাড়া অসম্ভব।

এখন দেখা যাইতেছে যে গ্রন্থাগারের পক্ষে গ্রন্থসূচি একেবারে অপরিহার্য্য অতএব গ্রন্থসূচি একটি লক্ষ্যে পোঁছাইবার উপায় বিশেষ। সেই লক্ষ্যটি হইল যে যাহাতে পুস্তকগুলি হইতে যথা সম্ভব কম সময়ে যত বেশী সম্ভব খবরাখবর বা জ্ঞান প্রাপ্তির সুবিধা করা যায়।

দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হিসাবে বলা যায় যে একটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রীতি সঙ্গত ভাবে গঠিত সূচির পক্ষে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলি উত্তর দেওয়ার যোগ্যতা থাকা চাই ঃ—

(ক) গ্রন্থাগারে অমুক লেখকের লেখা অমুক বইটি আছে কি ?
(খ) গ্রন্থাগারে অমুক লেখকের লেখা কি কি বই আছে ?
(গ) গ্রন্থাগারে অমুক বিষয়ের উপরে লেখা অমুক বইটি আছে কি ?
(ঘ) গ্রন্থাগারে অমুক বিষয়ের উপরে লেখা কি কি বই আছে ?
(ঙ) গ্রন্থাগারে এই শিরোনাম ওলা (Title) কি কি বই আছে ?
(চ) গ্রন্থাগারে অমুক গ্রন্থ-মালার (Series) কি কি বই আছে ?
(ছ) এই গ্রন্থাগারে অমুক সম্পাদকের সম্পাদিত কি কি বই আছে ?
(ঝ) এই গ্রন্থাগারে অমুক অনুবাদকের কি কি বই আছে ?

এই সমস্ত সাধারণ ও সোজা প্রশ্ন ছাড়াও গ্রন্থসূচির আরও কতকগুলি পুস্তক সম্বন্ধীয় প্রশ্নের জবাব দিবার যোগ্যতা থাকা বাঞ্ছনীয়—যেমন পুস্তকটি কোন সহর বা জায়গা হইতে প্রকাশিত ? প্রকাশন প্রতিষ্ঠানের নাম কি ? বইটি কত খণ্ডে বা পৃষ্ঠায় লিখিত, চিত্রিত কিনা এবং চিত্রিত হইলে ঠিক কি ধরণের চিত্র আছে, বইটির মাপ কি ইত্যাদি।

তৃতীয় প্রশ্নের জবাব হিসাবে বলা যায়ঃ—গ্রন্থসূচিটি উপরে বর্ণিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিবার উপযোগী করিতে হইলে সূচি নিম্নলিখিত উপায়ে লিখিত হওয়া চাই ঃ—

(ক) যেমন প্রত্যেকটি গ্রন্থের লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক, সঙ্কলনকারী, চিত্রকর, ক্রমিক প্রকাশনমালার নাম অথবা প্রয়োজন হইলে অন্য কোন লোক বা প্রতিষ্ঠান যাহার নামে লেখক পুস্তকটি অনুসন্ধান করিতে পারেন এরূপ সম্ভাবনা আছে সেই সেই নামে এক একটি সংলেখ (entry) লিখিত হওয়া চাই।

(খ) লেখকের নামের সংলেখগুলি এমনভাবে সাজান চাই যেন একই লেখকের লেখা গ্রন্থগুলির সংলেখগুলি ঠিক একত্রে পাওয়া সম্ভব হয়।

(গ) গ্রন্থাগারে রক্ষিত প্রত্যেক পুস্তকের এবং এমনকি পুস্তকের অংশ বিশেষে বর্ণিত প্রত্যেক বিশেষ বিষয়ের জন্য এক একটি পৃথক সংলেখ প্রয়োজন মত থাকা বাঞ্ছনীয় যাহাতে যদি কোন পাঠক গ্রন্থাগারে কোন বিশেষ বিষয়ের উপরে লিখিত কি কি বই আছে এই প্রশ্ন করিলে সেই প্রশ্নের জবাব অতি সহজেই দেওয়া সম্ভব হয়।

অবশ্য সকল গ্রন্থসূচিতেই উপরে উল্লিখত সব রকমের সংলেখ নাও লিখিত হইতে পারে বা খুঁটিনাটি বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ নাও থাকিতে পারে। কারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য, তথাকার পাঠকদের প্রয়োজন, কর্মীর সংখ্যা এবং অর্থের সংস্থান ইত্যাদি বিবেচনা করিয়া তবেই কি কি লিখিতে হইবে না হইবে তাহা স্থির করিতে হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীদের ও পরীক্ষার্থীদের পক্ষে উপরে উল্লিখিত সব রকম সংলেখ এবং পুস্তকের খুঁটিনাটি বিবরণ লিপিবদ্ধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার আইন

গণেশ ভট্টাচার্য

গ্রন্থাগারিক, স্কটিশ চার্চ কলেজ

সার্বজনীন সাধারণ গ্রন্থাগার

সর্বপ্রথমে বলা দরকার সার্বজনীন সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে আমরা কি বুঝি। মাত্র কয়েক বছর আগেও সাধারণ গ্রন্থাগারের যে সংজ্ঞা ছিল আজ তার বহুল পরিবর্তন হয়েছে। তবে এ পরিবর্তন মূলনীতিতে নয় পরিচালন ব্যবস্থায় ও অর্থনৈতিক দিকে। সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে আমরা বুঝি এমন এক গ্রন্থাগার যা কোন সুসংবদ্ধ ব্যবস্থার অধীন, চাঁদা মুক্ত এবং যেখানে স্থানীয় সর্বসাধারণের অবাধ অধিগম্য স্বীকৃত। মূল নীতিটি হচ্ছে এই, কিন্তু স্থান, কাল, পাত্র ভেদে পরিচালন ব্যবস্থার সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক দিকের

পরিবর্তন ঘটে। আমাদের দেশে এই দুইটি দিক মূল নীতির সহিত কি ভাবে যুক্ত হলে উপযুক্ত হবে তা আমরা পরে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

এইবার আসে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্যের কথা। প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে আজকের দিনে গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য কত গভীর ও ব্যাপক। মোটামুটিভাবে প্রয়োজনীয়তাকে ৫টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তার মধ্যে একটি ব্যক্তিগত অপর ৪টি সমষ্টিগত।

ব্যক্তিগত দিক

ব্যক্তিগত প্রয়োজনের দিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গ্রন্থাগারই একমাত্র সংস্থা যা ব্যক্তিকে নির্দোষ অথচ নীতি ও বুদ্ধির দিক থেকে অনেক উন্নত ধরণের অবসর বিনোদনের সুযোগ দিতে পারে। কর্মহীন অবসর পরিণামে ব্যক্তিত্বের ভিত্তিকে শিথিল করে। স্কুল কলেজের শিক্ষার পর আত্মোন্নতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারে এক গ্রন্থাগারই। ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাশ সাধন এবং উন্নততর জীবনে উন্নত হতে হলে এই ধরণে আত্মশিক্ষাই তার পথ। পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলতে গেলে এ শিক্ষা অপরিহার্য।

সমষ্টিগত দিক

অপর ৪টি উদ্দেশ্য যে প্রয়োজনীয়তাতে ভিত্তি করে তার সব কটিই সমষ্টি সম্পর্কিত সমগ্রভাবে দেশ সম্বন্ধীয়।

সামাজিক প্রয়োজন

প্রথমতঃ সুস্থ সুন্দর সমাজ গড়ে তোলার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন। সুস্থ, সুন্দর ও সংস্কার মুক্ত মানুষ, যারা ধীরে অথচ ধারাবাহিক ভাবে ক্রমোন্নত সমাজ গড়ে তুলবে গ্রন্থাগারের সাহায্য তাদের অপরিহার্য। এই ধরণের সমাজের প্রাণকেন্দ্র হবে গ্রন্থাগার যেখান থেকে সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে বিকীর্ণ হবে জ্ঞানের আলো। গ্রন্থাগার হবে স্থানীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র। প্রকৃত সমাজ শিক্ষা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল।

অর্থনৈতিক প্রয়োজন

দ্বিতীয়তঃ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আজ এক পরোক্ষ অর্থনৈতিক প্রয়োজন। দিনের পর দিন জনসংখ্যার চাপে সমস্যার অন্ত নেই। প্রাকৃতিক বা প্রায় প্রাকৃতিক সম্পদ এই বৃহৎ জনসংখ্যার চাহিদা পূরণে অসমর্থ। নূতন সম্পদ—যা হয়তো গ্রহণযোগ্য বা ব্যবহার যোগ্য নয় এমনকি হয়তো ক্ষতিকারকও—এমন সম্পদকে আজ মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহার যোগ্য করে তোলা হচ্ছে। বাড়ী ঘর তৈরীর মাল মশলায়, পোষাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে এমনকি বহুপ্রকার খাদ্যদ্রব্যের মধ্যেও আমরা এই ঘটনা ঘটতে দেখছি। পরিবহন ব্যবস্থা জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে পরিব্যাপ্ত। আজকের দিনের মূল কথা—উৎপাদন বাড়াও। এই নীতি থেকেই এসে পড়ে মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন গবেষণা শক্তির কথা। আবার এই গবেষণা যদি সমান্তরাল পথ ধরে অর্থাৎ একই বিষয়ের একই ধরণের গবেষণা দেশের মধ্যে বহুস্থানে একই সঙ্গে চলতে থাকে তা হলে বিরাট সম্ভাবনাময় এই শক্তির অপচয় ঘটে। এ সমস্যার সমাধান গবেষণার ধারা বাহ্যিকতায়। সদ্যজাত কোন চিন্তার ধারাবাহিক গবেষণা কখনই সম্ভব নয় যদি ঐ বিষয় সম্বন্ধে সর্বাধুনিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান গবেষণা না থাকে। এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের সংবাদ দিতে পারে গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের এই বিশেষ ধরণের কাজকেই বলা হয় documentation service ; দেশের শিল্পোন্নতির জন্য মানুষের এই প্রচ্ছন্ন গবেষণা শক্তির সংরক্ষণ ও চর্চায় সাহায্য অবশ্য প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক প্রয়োজন

তৃতীয়তঃ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অবশ্য প্রয়োজনীয়। দেশে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার চেষ্টা চলেছে। দেশের প্রতিটি নাগরিকের যদি সঠিক তথ্য জানবার সুযোগ না থাকে গণতন্ত্র সেখানে সার্থক হতে পারে না। গণতন্ত্রের সার্থকতার জন্য দরকার সব রকম দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে দেশের প্রতিটি নাগরিকের পরিচয়। সেই সঙ্গে প্রয়োজন প্রতিটি নাগরিকের ধীশক্তির ক্রম বিকাশ। সর্বোপরি দরকার দেশনেতা ও তাদের অনুগামীদের সকল প্রকার নীচতার উর্দ্ধে উঠতে হবে। নিরাপদ রাজনৈতিক জীবনের এই হচ্ছে ভিত্তি, ব্যক্তির রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে এই হচ্ছে শুভ পন্থা। যদিও কিছুদিন আগে গ্রন্থাগারগুলিকে কোন কোন রাজনৈতিক দলীয় মত প্রচারের কেন্দ্র

হিসেবে ব্যবহার করবার অপচেষ্টা চলেছে, আজকের দিনে কিন্তু গ্রন্থাগারই সুস্থ, ও উন্নত রাজনৈতিক জীবন গঠনের একমাত্র পক্ষপাতহীন সংস্থারূপে স্বীকৃত হয়েছে।

শিক্ষার ধারা বজায় রাখা

চতুর্থতঃ দেশব্যাপী সাক্ষরতা বজায় রাখার জন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন। আমাদের সংবিধান দেশব্যাপী সকল মানুষের সাক্ষরতার সমর্থক। সার্বজনীন সাক্ষরতা সফল করতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই উদ্দেশ্যে আমরা কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে চলেছি। আগামী দিনে প্রত্যেকটি লোককে অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন করে তুলতে আমরা আরও অনেক ব্যয় করবো। কিন্তু ধারাবাহিক চর্চা না থাকলে অক্ষরজ্ঞান বজায় থাকা সম্ভব নয়। এই অক্ষর জ্ঞানের চর্চার জন্যই দরকার চাঁদা মুক্ত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা। দেশব্যাপী সার্বজনীন বিদ্যালয় ব্যবস্থা গড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে যদি সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তোলা না হয় তা হলে ব্যাপারটা দাঁড়াবে ছাদ ছাড়া মাটীর দেয়াল দিয়ে বাড়ী তোলার মত।

ব্যবস্থা প্রবর্তনের দায়িত্ব

এবার দেখা যাক এই সব উদ্দেশ্য সাধনের দায়িত্ব কার। ব্যক্তিগত দিকটি বাদ দিলে বাকী আর ৪টি ব্যাপার রাষ্ট্রের পালনীয় দায়িত্ব ও কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। দেশের স্বার্থে এই উদ্দেশ্যগুলি সার্থক করে তুলতে রাষ্ট্র স্বভাবতঃই সচেষ্ট হবে—এটাই আশা করা যায়। সুতরাং রাষ্ট্রও চাইবে যে প্রতিটি নাগরিক আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে গ্রহণ করুক। কিন্তু যে ক্ষুধার তৃপ্তিসাধন করে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সার্থকতা, মানুষের মাঝে মানসিক সেই ক্ষুধার উন্মেষ বাহ্যিক ক্ষুধার ন্যায় বাধ্যতামূলক নয়। বেশীর ভাগ লোকই এ ক্ষুধার তাড়না বোধ করে না। সুতরাং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য প্রত্যক্ষভাবে অর্থ ব্যয় করতে বেশীর ভাগ লোকই রাজি হবে না। কেবলমাত্র এই কারণেই সার্বজনীন মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্র দেশের প্রতিটি নাগরিককে চাঁদা মুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে বাধ্য।

সর্বদলীয় সমর্থন

সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপায়ণে একটি বিশেষ সুযোগ আছে—সেটি হচ্ছে সর্বদলীয় সমর্থন। দেশের কোন প্রকার অপচয়হীন দ্রুত অথচ

ধারাবাহিক উন্নতির জন্য দরকার হচ্ছে জনগণের ধী শক্তির বিকাশ সাধন। চাঁদা মুক্ত গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জনগণের এই ধী শক্তির বিকাশ সাধনে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই—থাকতে পারে না।

চাঁদানুকুল্যে ব্যবস্থার সম্ভাব্যতা

এখন বিচার করে দেখা যাক যে সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত চাঁদার আনুকূল্যে সম্ভব ও সার্থক করে তোলা যায় কিনা। হয়তো সম্ভব হতে পারতো যদি এই পাঠ-স্পৃহা বা তথ্য ও জ্ঞান লাভ স্পৃহার উন্মেষ মানুষের মধ্যে বাধ্যতামূলক হতো। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তা নয়। শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা দশ জনেরও কম এই ক্ষুধা বোধ করেন। বাকী শতকরা ৯০ জনের সম্বন্ধে একথা বলা চলে যে তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত চাঁদার আনুকূল্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু রাখবে এটা আশা করা নিতান্তই অযৌক্তিক। সারা পৃথিবীতে হয়তো হল্যান্ডই একমাত্র দেশ যারা চাঁদার আনুকূল্যে সংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকেই যথেষ্ট বলে মনে করে।

আংশিক চাঁদা ও আংশিক সরকারী সাহায্য

আংশিক চাঁদা এবং আংশিক সরকারী সাহায্য এই দুইয়ের আনুকুল্যে সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্ভব কিনা এ বিচার করতে গেলে বোম্বাই রাজ্যের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। স্বাধীনতা লাভের পর বোম্বাই রাজ্যে 'খের' মন্ত্রীসভা ঘোষণা করলো যে সার্বজনীন গ্রন্থাগ্যার ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য সরকার স্থানীয় সংগৃহীত অর্থের সমান অর্থ সাহায্য করবে। ১ম বছরে উৎসাহ মন্দ ছিল না সুতরাং সরকারী অর্থের আনুকুল্যে যে রূপ দেখা গেল পরবর্তী বছর গুলিতে তার ক্রমাবনতি দেখা গেল। শেষ পর্যন্ত কোন কোন অঞ্চলে কোন চাঁদা সংগৃহীত না হওয়া সত্ত্বেও সরকার নামমাত্র অর্থ সাহায্য করলেন। এই অবস্থার জন্য জনসাধারণকে দোষারোপ করা যায় না। এ থেকে শুধু এই শিক্ষাই লাভ করা যায় যে অর্থের যোগান এভাবে হলে সংগঠিত ব্যবস্থাও ভেঙে পড়তে বেশী সময় লাগে না।

আর্থিক সমস্যার সমাধান

তা হলে প্রশ্ন হচ্ছে যে সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তন ও পরিচালনের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান আমরা কোথায় খুঁজবো? এর সমাধান খুঁজতে

হবে রাষ্ট্রীয় অর্থে, বেসরকারী অর্থে নয়। পাঠক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে যে সুযোগ ভোগ করবে তার জন্য প্রত্যক্ষভাবে তার কাছ থেকে অর্থ নেওয়া চলবে না। পরোক্ষভাবে সে এই সুযোগ ভোগের জন্য অর্থ দেবে।

এর দুটি বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে

(১) এই উদ্দেশ্যে বা এই নামে কোন করের প্রবর্তন না করে সরকারী সাহায্যের দ্বারা।

(২) এই উদ্দেশ্যে ও এই নামে কর প্রবর্তনের দ্বারা।

কর ছাড়া সরকারী সাহায্য

অসুবিধা ঃ (১) সম্পূর্ণ সরকারী কর্তৃত্ব।
(২) ব্যবস্থার পঙ্গুত্ব।
(৩) সরকার পরিবর্তনে সরকারী মনোভাবের পরিবর্তন।
(৪) সরকারী অর্থ আসবে কোথা থেকে ?

অন্য নামে নতুন কর অবশ্যই বসবে বা পুরনো কোন করের হার বাড়বে। এই ব্যবস্থার জন্য নির্দিষ্টকৃত থাকবে না কোন অর্থ। অন্য খাতে সংগৃহীত অর্থের অংশ ব্যয় হবে এর জন্য। সুতরাং নিশ্চয়তা থাকবে না অর্থের পরিমাণের। কোন অধিকার থাকবে না জনগণের প্রয়োজনীয় অর্থ দাবী করার। সুতরাং আর্থিক নিশ্চয়তা যা এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন তা আসবে না এ ব্যবস্থায়। সুতরাং করের কথা যদি আমরা না বলি তা হলে এই ধরণের অবস্থা কাটিয়ে ওঠা ভবিষ্যতে কখনই সম্ভব হবে না।

করের যৌক্তিকতা

(১) করভারে জর্জরিত দেশে নতুন কোন করের প্রশ্ন উঠলেই স্বাভাবিক ভাবেই তার বিরুদ্ধে জনমত প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু এমন ব্যবস্থাও আছে যা সম্পূর্ণরূপে অবাঞ্ছিত নয়। খসড়া বিলে এই করের কথা কি ভাবে বলা হয়েছে তা একটু আলোচনা করে দেখা যাক। আমাদের দেশে কর আদায়ের ব্যবস্থাটা কিরূপ ? স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সংস্থাগুলির কর বসাবার ক্ষমতা নিতান্তই দুর্বল। রাজ্যগুলিরও আবর্তমান (recurring) খরচ চালাইতে যতটুকু প্রয়োজন তার বেশী কর বসাবার ক্ষমতা নেই। কর বসাবার সর্বাধিক

ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের। এর প্রয়োজন আছে। কারণ যুদ্ধ বা অন্য কোন বিপর্যয়ের সময় আকস্মিক অভাব মেটাবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল পুষ্ট থাকাই বাঞ্ছিত। কিন্তু শান্তির সময় কেন্দ্রীয় সরকারের এই সঞ্চিত অর্থই আবার ফিরে আসে রাজ্য সরকারের হাতে এবং সেখান থেকে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সংস্থার হাতে।

খসড়া বিলে বলা হয়েছে যে সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনের আবর্তমান (recurring) সমস্ত খরচের দায়িত্ব বহন করবে রাজ্য সরকার ও স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন সংস্থা এবং এ দায়িত্ব পালনে উভয়ের অংশের অনুপাত হবে ৩ঃ১ অর্থাৎ রাজ্য সরকারের দায়িত্ব ৩ ভাগ স্থানীয় সংস্থার দায়িত্ব ১ ভাগ। আর কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া অর্থ ব্যয় হবে কেবলমাত্র গ্রন্থাগারের জন্য বাড়ী তৈরীর কাজে, আসবাবপত্রের ব্যাবস্থায়, সাময়িক পরিবর্ধনে বা নবীকরণে বা প্রারম্ভিক সংগ্রহ কেনার কাজে।

(২) যে অনুপাতের কথা বলা হলো তাতে করে করের পরিমাণ দাঁড়াবে এই যে যে-ব্যক্তি বছরে ১৲ টাকা সম্পত্তির উপর কর দেয় তাকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য ৩ নয়া পয়সা কর দিতে হবে। বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখা যাক—যদি কোন ব্যক্তি বছরে ৫০৲ সম্পত্তি কর দেন—যা আমাদের দেশের খুব কম লোকই দেয়—তাঁকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য বছরে ১৫০ নয়া পয়সা অর্থাৎ দেড়টাকা কর দিতে হবে। কিন্তু তার জন্য তিনি কি পাচ্ছেন? তার পরিবারের শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সকলেই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ ও সুবিধা ভোগের অধিকার পাবে। এইবার চাঁদার কথা ভাবা যাক। মাসে যদি কমপক্ষে ২৫ নয়া পয়সাও চাঁদা দিতে হয় তা হলে একটি লোককে বছরে ৩৲ টাকা চাঁদা দিতে হয়। আর তার পরিবর্তে তিনি ভিন্ন অপর কেউ গ্রন্থাগারের সভ্য বলে বিবেচিত হবেন না বা কোন সুযোগ ভোগের অধিকার পাবেন না।

(৩) দুই কারণে আইনের প্রয়োজন—এক অবাঞ্ছিত অবস্থাকে দূর করবার জন্য—আর দুই হচ্ছে বাঞ্ছিত অবস্থাকে স্বাগত করবার জন্য। কর চাইনা—একথা বলে কি আমরা কোন করের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি না পাচ্ছি? একের পর এক অবাঞ্ছিত করের ভার আমাদের উপর চাপছে। কিন্তু যে কর সত্যই আমাদের জন্য এক বাঞ্ছিত অবস্থার আয়োজন করবে তা যদি দরিদ্রকে কোনরূপে পীড়িত না করে এবং কেবলমাত্র যারা অর্থবান ও ক্ষমতাবান করের ভার বহনের দায়িত্ব যদি তাদের উপর থাকে তা' হলে এ করের বিরোধীদের সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য হবে।

(৪) এইভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য নির্দিষ্টকৃত অর্থ অর্থের-যোগান সম্বন্ধে নিশ্চয়তা আনবে। যে নিশ্চয়তার অভাব এই ব্যবস্থা প্রবর্তন ও উন্নীত করণের সবচেয়ে বড় পরিপন্থী।

উদ্দেশ্য প্রণোদিত বিরোধিতা

করের সপক্ষে যত যুক্তিই দেখান হোক না কেন তবুও বাধা আসবে। সকল দেশেই এসেছে। কেন সে বাধা আসে তা সহজেই বোধগম্য হয় বাধার চরিত্র একটু বিশ্লেষণ করলে। এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডের উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে। সর্বপ্রথম এই ধরণের আইন প্রবর্তিত হয়েছিল সেখানে। আইন প্রবর্তনে প্রথম বাধা এল সমাজের তথাকথিত উপর মহল থেকে। তারা জনসাধারণের দুঃখে কাঁদলেন—বললেন দরিদ্রের উপর আর চাপ দেওয়া চলে না একেই তারা নানা করভারে জর্জরিত। তখন তাদের বুঝিয়ে দেওয়া হল যে, কর দরিদ্রের উপর কোন চাপ আনবে না একথা অবশ্য বলা যায় না—কারণ এক জনকে যদি সারা বছরে মাত্র ১ পেনিও দিতে হয় দরিদ্রের উপর সেটাও চাপ—সুতরাং যে চাপের গুরুত্ব দিয়ে জনমত ভেঙ্গে দেবার চেষ্টা চলছে তার আসল চেহারা কিন্তু অন্যরকম। কারণ কর বসবে চাহিদার উপর নয় আর্থিক সংগতির উপর। যার দেবার ক্ষমতা আছে তাকেই দিতে হবে কর। পরিমাণ নির্দিষ্ট হবে ব্যক্তির আর্থিক সংগতির উপর।

আইন পাস হলো—কিন্তু দেখা গেল তাকে কার্যকরী না করতে পারার অনেক ব্যবস্থাই করে দেওয়া হয়েছে—যেমন ঃ

(১) আইন কেবলমাত্র সেখানেই ধার্য হবে যেখানকার লোক এই আইন চাইবে।

(২) জনমত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে যে মিটিং হবে যদি কোন কারণে তা একবার ভেঙ্গে যায় তা হলে তা' আর তিন বছরের মধ্যে সেখানে ডাকা চলবে না।

(৩) এই আইনের বলে সংগৃহীত অর্থ গ্রন্থাগারের জন্য বাড়ী তৈরীর কাজে, গ্রন্থাগারিকের মাইনে দেবার কাজে ইত্যাদিতে ব্যয় হতে পারবে কিন্তু বই কেনা চলবে না।

(৪) প্রতি পাউণ্ডে ১ পেনির বেশী কর দেওয়া চলবে না।

কি অস্বাভাবিক অবস্থা! আইনের এই সব অদ্ভুত ধারা জনসাধারণকে সচকিত করে তুলল। তাঁরা বুঝলেন যে তাঁদের দুঃখে যারা কেঁদেছিলেন আসলে তার কারণ তাদের প্রতি সহানুভূতি নয়—অন্য কিছু। কি তা? তা

হচ্ছে এই—তথাকথিত উপরিমহলের ভয় হলো যে এই রকম গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় জনসাধারণকে অধিকার সচেতন করে তুলবে। আর জনসাধারণ যে মুহূর্তে অধিকার সচেতন হয়ে উঠবে সেই মুহূর্ত থেকে সুরু হবে তাদের স্বেচ্ছাচার, ক্ষমতা ও অধিকার ত্যাগের পালা। তথাকথিত উপর তলার লোকদের সেইতো পতনের সূত্রপাত। গোষ্ঠী স্বার্থকে এভাবে এত সহজে কে ক্ষুন্ন হতে দেবে? তখন চললো আইন সংশোধণের জন্য জনমত গঠনের পালা। জাগ্রত জনচেতনার প্রবল শক্তির কাছে গোষ্ঠী স্বার্থ হার মানতে বাধ্য হলো। ১ম মহাযুদ্ধের পর ১৯১৯ খৃঃ আইনের সংশোধন সম্ভব হলো। গণচেতনা এত অসুবিধা সত্ত্বেও তখন এমন এক অবস্থায় এসে পেঁীছেছে, গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এত বেশী উপলব্ধ হয়েছে যে জনসাধারণ স্বেচ্ছায় করের হার বাড়িয়ে দেবার আবেদন জানাল। এই হচ্ছে ইংলণ্ডে আইন প্রণয়নের ইতিহাস; এ থেকে আমরা এ শিক্ষা লাভ করতে পারি যে আমাদের দেশেও এই ধরণের শ্রেণী স্বার্থ বিরাট অধিকার ভোগ করছে। মুখে তাঁরা যাই বলুন—যে যুক্তিই দেখান—ইংলণ্ডের তথাকথিত উপরিওয়ালাদের মত তাঁরাও স্বীয় গোষ্ঠী স্বার্থে জনমত সংগঠনে বাধার সৃষ্টি করবেনই। নিজেদের উদ্দেশ্য প্রচ্ছন্ন রেখে আইনের প্রয়োজনীয়তার সহজ সরল ব্যাখ্যাকে তারা সব সময়ই জটিল করে তুলবার চেষ্টা করবেন। এই বাধাকে জয় করতে হলে বিদেশের অভিজ্ঞতাকে আমাদের কাজে লাগাতে হবে।

সরকার পরিকল্পিত ব্যবস্থা

এখন দেখা যাক সরকার ইদানীংকালে এ সম্বন্ধে কি করেছেন? এ সম্বন্ধে বিশদ জানার সুযোগ বড় নেই—কারণ পত্র পত্রিকায় সরকারের পরিকল্পনার এদিকটা সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য বেরোয় নি। মোটামুটি যা জানা যায় তা হচ্ছে এই যে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের জন্য নির্দিষ্টকৃত অর্থের একটা অংশ ব্যয় হয় সমাজ শিক্ষা খাতে। এই সমাজ শিক্ষার একটি অংগ হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা।

এ পরিকল্পনায় যে সব গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; বা সরকারী সাহায্যে পরিচালিত হচ্ছে ঃ—

ষ্টেট সেণ্ট্রাল লাইব্রেরী	১টি
জোনাল ,, ,,	২টি
ডিষ্ট্রিক্ট ল্যাইব্রেরী	১৮টি
এরিয়া লাইব্রেরী	২১টি
রুরাল লাইব্রেরী	২০৯টি
অন্যান্য লাইব্রেরী	৭টি

তা ছাড়া লাইব্রেচিন বা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আছে ; এ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা কিন্তু চাঁদা মুক্ত নয়। নির্দিষ্ট চাঁদা এবং ডিপজিট দিতে পারলে ব্যক্তি বিশেষই গ্রন্থাগারের সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে পারে।

খসড়া বিলে পরিকল্পিত ব্যবস্থা

এবার আমরা দেখতে পারি যে খসড়া বিলে এ ব্যবস্থার রূপ কেমন বলা হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। মোটামুটি কিছু বলার চেষ্টা আমি করবো। সর্বপ্রথমে বলা দরকার বিলে অনুমোদিত ব্যবস্থায় প্রতিটি গ্রন্থাগার চাঁদা মুক্ত, সর্বসাধারণের অবাধ অধিগম্য স্বীকৃত।

ষ্টেট অথরিটি

বিলে এই ব্যবস্থার সর্বোচ্চে স্থান দেওয়া হয়েছে ষ্টেট লাইব্রেরী অথরিটিকে। সমগ্র রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুসংগঠন ও উন্নতির দায়িত্ব এই অথরিটির ; এবং রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রীই হবেন এই অথরিটি।

ষ্টেট লাইব্রেরীয়ান

গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্বন্ধীয় কাজে ষ্টেট অথরিটিকে সাহায্য করার জন্য অথরিটি নিজেই নিয়োগ করবেন ষ্টেট লাইব্রেরীয়ানকে। তিনি অবশ্যই উপযুক্ত শিক্ষা প্রাপ্ত ও এবিষয়ে অভিজ্ঞ হবেন।

ষ্টেট লাইব্রেরী কমিটি

ষ্টেট লাইব্রেরী অথরিটিকে এই আইনের আওতায় পড়ে এমন যে কোন বিষয়ের উপর উপদেশ দেবার জন্য থাকবে ষ্টেট লাইব্রেরী কমিটি। তাতে উপযুক্ত বেসরকারী সদস্য থাকবে প্রয়োজন অনুপাতে।

লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি

ষ্টেট অথরিটির অধীনে থাকবে লোকাল লইব্রেরী অথরিটি। লোক সংখ্যা ৫০,০০০ বা তদূর্ধ্ব এমন মিউনিসিপাল এলাকা এবং এই ধরণের এলাকা বাদে

প্রতি জেলা বোর্ডের অধীনস্থ এলাকা গুলিতে সার্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সংগঠন ও পরিচালনের দায়িত্ব নেবে এই লোকাল অথরিটি।

সিটি লাইব্রেরী অথরিটি

স্থানীয় মিউনিসিপাল কাউন্সিল বা সিটি করপোরেশনই মিউনিসিপাল এলাকাভুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার লোকাল অথরিটি হবে এবং তাদেরকে বলা হবে সিটি লাইব্রেরী অথরিটি।

রুরাল লাইব্রেরী অথরিটি

আবার মিউনিসিপ্যাল এলাকা বাদে প্রতিটি জেলা বোর্ডের অধীনস্থ এলাকা গুলির গ্রন্থাগার ব্যবস্থার লোকাল অথরিটিকে বলা হবে রুরাল লাইব্রেরী অথরিটি। রুরাল লাইব্রেরী অথরিটি সংগঠিত হবে নির্বাচিত, মনোনীত এবং একস্-অফিসিও সদস্যদের নিয়ে।

লোকাল লাইব্রেরী কমিটি ও ভিলেজ লাইব্রেরী কমিটি

কাজ পরিচালনার সুবিধার জন্য লোকাল লাইব্রেরী অথরিটি ষ্টেট লাইব্রেরী অথরিটির অনুমোদন নিয়ে প্রয়োজন মত লোকাল লাইব্রেরী কমিটি এবং ভিলেজ লাইব্রেরী কমিটি নিয়োগ করতে পারবেন।

আর্থিকপ্রসঙ্গ

লাইব্রেরীর জন্য যে কর ধার্য হবে তা স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন সংস্থা যে ভাবে অন্যান্য কর আদায় করে সেই ভাবেই করা হবে। সমগ্র ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য আবর্তমান সমস্ত খরচ বহনের জন্য রাজ্য সরকার আইন সংগত ভাবে আদায়ীকৃত অর্থের কম পক্ষে তিনগুণ দিতে বাধ্য থাকবেন। তাছাড়া অনাবর্তমান বৃহৎ খরচের জন্য বিশেষ গ্রান্ট দিবেন যেমন বাড়ী তৈরী, আসবাবপত্র ক্রয়, পরিবর্ধন, নবীকরণ, প্রারম্ভিক পুস্তক সংগ্রহ ইত্যাদি। বলাবাহুল্য এগুলির জন্য যে অর্থ ব্যয় হবে তার সবটাই রাজ্য সরকার দেবেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে পাওয়া তহবিল থেকে।

খসড়া বিলের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থার পরিণত রূপ

এই পরিচালক গোষ্ঠীর হাতে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থাকবে পরিণত অবস্থায় তার রূপ হবে এই রকম ঃ

ষ্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরী		১টি
সিটি সেন্ট্রাল লাইব্রেরী		২৪টি
রুরাল সেন্ট্রাল লাইব্রেরী		১৫টি
ব্রাঞ্চ লাইব্রেরী		২৬৫টি
সহরে	১৮৮	
গ্রামে	৭৭	
	২৬৫	
লাইব্রেচিন বা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার		৫০০টি

উপসংহার

যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা এতক্ষণ বলা হলো তার রূপায়ণের পথ কি ; আর সেই পথের ঠিকানা পেতে কাকেই বা সর্বাগ্রে উদ্যোগী হতে হবে ? প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা চলে যে আইন প্রণয়নই এর একমাত্র পথ। দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে যাদের নাম করা চলে তাদের মধ্যে গ্রন্থাগার কর্মীদের দায়িত্ব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এ দায়িত্ব পালনের প্রথম পর্যায় হচ্ছে বিলের সপক্ষে জনমত সংগঠন। দেশে আজ যে ব্যবস্থা চালু রয়েছে তারই মাধ্যমে স্বীয় দায়িত্ব নিষ্ঠার সংগে পালন করে জনসাধারণকে সংখ্যায় ও মাত্রায় আরো বেশী গ্রন্থাগারমনা করে তুলতে হবে। দেশের জনসাধারণ গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে যত বেশী সচেতন হয়ে উঠবে, উদ্দেশ্য সাধনের পথে আমরা তত বেশী অগ্রসর হব। প্রত্যক্ষ কোন স্বার্থ আজ এ কাজের মধ্যে যদি নাও দেখতে পাই, ভবিষ্যতের সম্ভাবনা সম্বন্ধে উদাসীন থাকাও উচিত হবে না ; কারণ একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা যদি অন্ধকারে থাকে গ্রন্থাগার কর্মী তার জীবনের আলো কোনদিনই দেখতে পাবে না।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লাইব্রেরী সার্ভিসেস এ্যাক্ট

পরিপূর্ণ মানুষ রূপে গড়ে উঠতে হলে, সমাজের একজন হিতকারী ব্যক্তি হয়ে উঠতে হলে জনগণকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে যে সাধারণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে তা সরবরাহ করা একমাত্র সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষেই সম্ভব। জনশিক্ষার ও সাধারণ মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের যতগুলি জনপ্রিয় মাধ্যম মানুষ আবিষ্কার করেছে সাধারণ গ্রন্থাগার তাদের অন্যতম। সাধারণ গ্রন্থাগারের সহায়তায় মানুষ আজীবন শিক্ষালাভ করে যেতে পারে। এককথায় সাধারণ গ্রন্থাগার হল জ্ঞানরাজ্যের প্রবেশ পথ।

সাধারণ গ্রন্থাগার বিলাসবস্তু নয়, জনগণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং এজন্য গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতি জনসমর্থন একান্ত কাম্য। আজ মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় সরকার এবং সেখানকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সরকারসমূহ ও জনসাধারণ এই পরম সত্যটি হৃদয় দিয়ে অনুভব করেছেন। তাই যুক্তরাষ্ট্রের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সুষ্ঠু পরিকল্পনায় সুগঠিত, এবং সেদেশের সরকার আজ গ্রন্থাগার পরিচালনার পিছনে সক্রিয় সহযোগিতা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন।

গ্রন্থাগারের মূল উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রন্থাগার পরিচালনা করতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রবাসীরা লক্ষ্য করল যে, গ্রন্থাগার থেকে পরিপূর্ণ সুফল লাভ করতে হলে সুসংহত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে। কোন একটিমাত্র গ্রন্থাগার মানুষের জ্ঞানের স্পৃহা মিটাতে পারে না, তার জীবন জিজ্ঞাসার সদুত্তর সকল সময় দিতে পারে না। এজন্য প্রয়োজন একটি নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে যোগাযোগ। গ্রন্থাগারগুলি সমবেতভাবে কাজ করলে জনগণের চাহিদা মিটাতে পারে।

এইভাবে একত্র সংঘবদ্ধ একটি গ্রন্থাগারগোষ্ঠিকে আমেরিকায় "লাইব্রেরী সিস্টেম" বা গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নামে অভিহিত করা হয়েছে। আমেরিকার বড় সহরগুলিতে এবং জনবহুল কাউন্টিগুলিতে এই ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সাফল্যের সঙ্গে চলেছে। এই ব্যবস্থা অনুসারে এই সকল সহরের ছোটবড়

[কলিকাতা ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিসের সৌজন্যে প্রকাশিত]

গ্রন্থাগারগুলি একযোগে কাজ করে তাদের অধিবাসীদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় গ্রন্থাদি ব্যাপকভাবে তাদের হাতে তুলে দেয় এবং উপদেশাদি দিয়ে তাদের সহায়তা করে। সুসংগঠিত গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় পাঠক যত ক্ষুদ্র অঞ্চলেই বাস করুক না কেন, অথবা যতদূরেই থাকুক না কেন, সে তার অঞ্চলের এমন কি তার রাজ্যের ও সমগ্র দেশের যাবতীয় গ্রন্থ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণের সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

প্রত্যেকটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অধীনে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থাকে। এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে রয়েছে উপদেষ্টাবৃন্দ ও গ্রন্থবাহী 'বুকমোবিল' বা বা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার। ঐ ব্যবস্থার অধীন সকল গ্রন্থাগারের সহায়তায় এরা সর্বদাই প্রস্তুত। সর্ববৃহৎ গ্রন্থ সংগ্রহ থাকে এই কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের। স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলির পাঠকদের গবেষণা সহায়ক তথ্যাদি, রেফারেন্স গ্রন্থ প্রভৃতির চাহিদা মিটাবার জন্য এই গ্রন্থাগারগুলি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সাহায্য নিতে পারে।

এই গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় মার্কিন জনগণের কাছে দুর্লভ জ্ঞানভাণ্ডারের প্রবেশ দ্বার ক্রমেই উন্মোচিত হয়ে যাচ্ছে এবং সেই উন্মুক্ত জ্ঞানভাণ্ডারের রত্নরাজি নিয়ে জনগণের মানসলোক ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠছে। কিন্তু এসত্ত্বেও যখন দেখা গেল যে, আমেরিকায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক এমনসব অঞ্চলে বাস করে যেখানে কোন সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নেই, এবং আরও ৫ কোটি ৩০ লক্ষ্য নাগরিক এমন সমস্ত অঞ্চলে থাকে যেখানে তারা গ্রন্থাগার থেকে যে সাহায্য পায় তা আদৌ সন্তোষজনক নয়, তখনই লাইব্রেরী সার্ভিসেস অ্যাক্ট প্রণয়নের প্রয়োজনীতা অনুভূত হল।

যে সকল মার্কিন নাগরিক সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাদের শতকরা ৯০ জনই বাস করে ছোট ছোট সহরে বা গ্রামাঞ্চলে। এই জন্য লাইব্রেরী সার্ভিস অ্যাক্ট প্রণয়ন করা হয়েছে পল্লী অঞ্চল সমূহে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে। এই আইন অনুসারে এখন যুক্তরাষ্ট্রে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কাজ চলছে এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে পল্লী অঞ্চলে সম্প্রসারিত করার কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যের মিলিত প্রচেষ্টা ক্রমেই সার্থক প্রমাণিত হচ্ছে।

ভারতের পল্লীঅঞ্চল সমূহেও যাতে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণ হয়, সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক আলোচনা চক্রে তার ওপর জোর দেওয়া

হয়। আলোচনাচক্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কথায় জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাদপ্তরের সহযোগিতায় গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্প্রসারণের কাজ ভালভাবেই চলছে।

যাই হোক, এই পরিপ্রেক্ষিতে এখানে আমেরিকার লাইব্রেরী সার্ভিসেস অ্যাক্টের কথা কিছু আলোচনা করলে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৯৫৬ সালের ১৯শে জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৮৪তম কংগ্রেসে লাইব্রেরী সার্ভিসেস বিলটি পাশ হয়েছিল। বিলটিকে স্বাক্ষরদান করতে গিয়ে প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ার বলেছিলেন:

> "আমেরিকার পল্লীঅঞ্চলের অধিবাসীরা যাতে গ্রন্থাগারের সুযোগ-সুবিধা আরও বেশি করে লাভ করতে পারে সেই দিকে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য ও পল্লীগুলিকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে যে প্রচেষ্টা চলছে তারই পরিচয় রয়েছে এই লাইব্রেরী সার্ভিসেস বিলে। এই বিলে স্বাক্ষর দান করে আজ আমি বিলটিকে আইনে পরিণত করছি। লক্ষ লক্ষ আমেরিকানের জীবন সমৃদ্ধ করে তোলার প্রতিশ্রুতি রয়েছে এই বিলে।"

রচিত আইনের প্রারম্ভেই এই নীতি ঘোষণা করা হয়েছে যে, গ্রামাঞ্চলে যেখানে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আদৌ নেই, অথবা ব্যবস্থা যেখানে পর্যাপ্ত নয়, সেই সকল অঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অধিক সম্প্রসারণে উৎসাহ দেওয়াই এই আইনের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে ১৯৫৭ সালের ৩০শে জুন যে আর্থিক বৎসর শেষ হয় সেই বৎসরের জন্য ৭৫ লক্ষ ডলার বরাদ্দ অনুমোদন করা হয় এই আইনটিতে। আইনের পরবর্তী চারটি আর্থিক বৎসরের প্রত্যেকটির জন্যও সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। যে সকল অঙ্গরাজ্য পল্লী অঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে তাঁদের পরিকল্পনা শিক্ষা কমিশনারের নিকট পেশ করবেন এ থেকে অর্থসাহায্য দেওয়া হবে সেই অঙ্গরাজ্যগুলিকে।

১০ হাজার বা তার চেয়ে কম সংখ্যক লোক অধ্যুষিত অঞ্চলকে এই আইনে পল্লীঅঞ্চল বলে অভিহিত করা হয়েছে। প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যে 'স্টেট লাইব্রেরী অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এজেন্সী" বা রাজ্য গ্রন্থাগার পরিচালন সংস্থা রয়েছে। রাজ্যের সর্বত্র সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ভার রয়েছে এদের ওপর। এই সংস্থাগুলি স্ব স্ব রাজ্যের পরিকল্পনা প্রস্তুত করে ও মার্কিন

শিক্ষা কমিশনারের নিকট তা পেশ করে। প্রাপ্ত অর্থসাহায্য কতখানি সুষ্ঠুভাবে সদ্ব্যবহার করা যেতে পারে তার একটা খসড়া দেওয়া হয় এই পরিকল্পনার মধ্যে। রাজ্য পরিকল্পনা অনুসারে প্রাপ্ত অর্থ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, গ্রন্থাদি, গ্রন্থাগারের সাজসরঞ্জাম ও উপকরণাদি ক্রয় এবং গ্রন্থাগার পরিচালন বাবদ ব্যয় করা যাবে, কিন্তু গ্রন্থাগারের জন্য জমি ক্রয় অথবা বাড়ী নির্মান করা চলবে না।

আইনে বলা হয়েছে শিক্ষা কমিশনার ভার্জিন আইল্যাণ্ডসের জন্য ১০,০০০ ডলার এবং অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগুলির প্রত্যেকটির জন্য ৪০,০০০ ডলার বরাদ্দ করবেন এবং অবশিষ্ট অর্থ অঙ্গরাজ্যগুলির গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী অধিবাসীদের আনুপাতিক হার অনুসারে ঐ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টন করা হবে। এর সঙ্গে অঙ্গরাজ্যগুলিও মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে অর্থ প্রদান করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জনকল্যাণ সচিবের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা কমিশনার আইনটি কার্যকরী করবেন। আইন অনুসারে অর্থ বণ্টন ও বণ্টিত অর্থের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে তদন্ত ও পর্যালোচনার যাবতীয় ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে শিক্ষা কমিশনারকে।

সাধারণ গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের এই পরিকল্পনায় যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্য ও অঞ্চল যোগ দিয়েছে। লাইব্রেরী সার্ভিসেস অ্যাক্ট অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র সরকার এ পর্যন্ত নিম্নলিখিতরূপ অর্থ বরাদ্দ করেছেন ঃ

আর্থিক বৎসর ১৯৫৭ সালে—	২০,৫০,০০০ ডলার
ঐ ঐ ১৯৫৮ সালে—	৫০,০০,০০০ ডলার
ঐ ঐ ১৯৫৯ সালে—	৬০,০০,০০০ ডলার

আইনে অনুমোদিত সম্পূর্ণ অর্থ এখনও পর্যন্ত দেওয়া হয়নি। তবে পল্লী অঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণকল্পে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে প্রদত্ত অর্থ সাহায্যের পরিমাণ ১৯৫৬ সাল অপেক্ষা শতকরা ৪৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ থেকেই পরিকল্পনার কার্যকারিতা প্রমাণিত হচ্ছে।

সারা যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ৮ শতাধিক কাউন্টি নতুন ও উন্নততর গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ লাভ করছে। লাইব্রেরী সার্ভিসেস অ্যাক্ট পাশ হওয়ার পূর্বে এর মধ্যে প্রায় ৩০টি কাউন্টিতে কোনরূপ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাই ছিল না। স্টেট লাইব্রেরী এজেন্সিগুলি পল্লী অঞ্চল সমূহে ১২০টিরও অধিক ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার চালু করেছে। পল্লী অঞ্চলে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে পুস্তকাদি ও

নানাবিধ তথ্য জ্ঞাপক উপকরণাদি ক্রয় করতে প্রথম দুবছরে লক্ষাধিক ডলার ব্যয়িত হয়েছে। স্টেট লাইব্রেরী এজেন্সিগুলি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি সাধনকল্পে আরও ৭০ জন উপদেষ্টা, ১০০ জন গ্রন্থাগারিক এবং ৩০০ জন কেরাণী, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ড্রাইভার ও অন্যান্য কর্মী নিয়োগ করেছে। রাজ্য পরিকল্পনাগুলি থেকে জানা যায় যে, ১৩০টি কাউন্টি ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের কার্যসূচী ইতোমধ্যেই প্রস্তুত করা হয়েছে। যে সকল অঞ্চলে গ্রন্থাগার নেই সে অঞ্চলগুলির সঙ্গে গ্রন্থাগার সমূহের সহযোগিতা গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয়।

১৯৫৮ সালের আর্থিক বৎসরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট ৫০টি অঙ্গরাজ্য ও অঞ্চল তাদের পল্লী অঞ্চলে গ্রন্থাগার উন্নয়নের উদ্দেশ্যে লাইব্রেরী সার্ভিসেস অ্যাক্ট অনুসারে সাকুল্যে ১,৫৪,৬৩,১৭৫ ডলার নিয়ে কাজ আরম্ভ করে। এর মধ্যে ফেডারেল তহবিল ৪৯,২২,৩৪৪ ডলার, অঙ্গরাজ্য সরকার প্রদত্ত তহবিল ৭৬,০৬,৯৯৬ ডলার এবং স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত তহবিল ২৯,৩৩,৮৩৫ ডলার। এই হল আয়ের সূত্র। এই অর্থ ব্যয় হয় নিম্ন লিখিত খাতে ঃ

বেতন ও মজুরি—	৭২,১০,৯৬১ ডলার
পুস্তক ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয়—	৫২, ০২ ৬১২ ডলার
সাজ সরঞ্জাম ক্রয়—	১১,৬৬,৩৩৭ ডলার
গ্রন্থাগার পরিচালনার অন্যান্য যাবতীয় ব্যয়—	১৮,৮৩,২৬৫ ডলার

আমেরিকায় গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের মূল শক্তি নিহিত রয়েছে বুকমোবিল বা ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের মধ্যে। বাল্টিমোরের ঝকঝকে রাজপথ থেকে অ্যারিজোনার বালুকাবেলা পর্য্যন্ত সর্বত্রই এই ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের অবাধ গতি। লাইব্রেরী সার্ভিসেস অ্যাক্ট অনুসারে কাজ করার প্রথম এক বৎসরের মধ্যে এ কাজে ব্যবহারের জন্য ১২৫টি গাড়ী ক্রয় করা হয়েছে।

সম্প্রসারিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সবচেয়ে জনপ্রিয় ইউনিট হল আঞ্চলিক গ্রন্থাগার। এ দুপ্রকার হতে পারে। প্রথমটি হল স্টেট লাইব্রেরী এজেন্সির একটি শাখা। এটি স্বীয় নির্দিষ্ট অঞ্চলসীমার মধ্যে কতকগুলি সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজকর্ম তদারক করে ও ঐ গুলিকে সাহায্য করে। দ্বিতীয়টি খুব বেশী প্রচলিত। এগুলিকে মাল্টি-কাউন্টি অথবা আঞ্চলিক লাইব্রেরী বলা হয়। দুই বা ততোধিক কাউন্টি লাইব্রেরী নিয়ে এগুলি গঠিত। সুপ্রতিষ্ঠিত

কাউন্টি ব্যবস্থা সমন্বিত এরূপ ছয়টি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আরকানজাসে গড়ে উঠেছে। ফ্লোরিডায় দুটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ব্যবস্থা এবং ইডাহোতে ছয়টি জেলা গ্রন্থাগার রয়েছে। কেনটাকীতে চারটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার রয়েছে, এগুলির একটিতে আছে ২৩টি কাউন্টি, ও আরেকটিতে ২৫ টি। নিউ মেক্সিকোর ৩০টি কাউন্টির মধ্যে ২১ টি কাউন্টি নিয়ে ৪টি আঞ্চলিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। নিউ ইয়র্কে এই আঞ্চলিক ব্যবস্থা অত্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।

লাইব্রেরী সার্ভিসেস অ্যাক্ট অনুসারে প্রদত্ত অর্থ থেকে স্টেট এজেন্সী গুলি একটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত সুপ্রতিষ্ঠিত সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে সাহায্যদান করতে পারে। ক্যালিফোর্ণিয়া গ্রন্থাগারের রেফারেন্স ব্যবস্থার উন্নতিসাধনকল্পে সান্টা বারবারা কাউন্টিকে সাহায্য করছে। ফ্লোরিডা তার সুপ্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার সমূহ থেকে অরল্যাণ্ডো ও অরেঞ্জ কাউন্টি, গেনসভিল ও আলাচুয়া কাউন্টিকে সাহায্য করছে।

আমেরিকান লাইব্রেরী অ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত "এ ন্যাশনাল প্ল্যান ফর পাবলিক লাইব্রেরী সার্ভিস" গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলিকে ভালভাবে চালাতে হলে বার্ষিক অন্ততঃ ২০ কোটি ডলার প্রয়োজন। এর শতকরা ১৫ ভাগ কেন্দ্রীয় সাহায্যরূপে ও শতকরা ২৫ ভাগ স্টেট সাহায্যরূপে লাভ করা যাবে এবং অবশিষ্ট শতকরা ৬০ ভাগ স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ বরাদ্দ করবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নে। এই গেল আয়ের দিক। ব্যয়ের দিক থেকে বলা যেতে পারে যে, আয়ের শতকরা ৬০ ভাগ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন, শতকরা ২০ ভাগ পুস্তক, সাময়িক পত্র ক্রয় ও পুস্তক বাঁধাই এবং শতকরা ২০ ভাগ গ্রন্থাগার পরিচালনার অন্যান্য কার্যবাবদ ব্যয় করা যেতে পারে।

স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ গ্রন্থাগারকে সাহায্যের জন্য কি ভাবে রাজস্ব সংগ্রহ করে তার কয়েকটি সুনির্দ্দিষ্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। আরকানজাস রাজ্যে এ পর্যন্ত মোট ৫৩টি কাউন্টিতে কর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে। প্রত্যেক কাউন্টির সমস্ত সম্পত্তির মূল্যের ওপর নির্ধারিত মোট কর থেকে ডলার পিছু ১ মিল (এক সেন্টের এক-দশমাংশ) হিসাবে কর আদায় করা হয়।

এইভাবে আদায়ীকৃত করের সাহায্যে ঐ কাউন্টির গ্রন্থাগার-তহবিল গড়ে ওঠে। কলোরাডোর ৮টি কাউন্টি পূর্বে কখনও গ্রন্থাগারের সাহায্যার্থ অর্থ বরাদ্দ করেনি, কিন্তু এবার তারা তা করেছে।

লাইব্রেরী সার্ভিসেস অ্যাক্ট অনুসারে প্রদত্ত অর্থ দ্বারা কানেটিকাটে ৯টি গ্রন্থাগার নতুন কর্মচারী নিয়োগ করেছে, ২টি গ্রন্থাগার বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করেছে, অন্ততঃ ৯টি গ্রন্থাগার তার কর্মচারীদের বেতনের হার বৃদ্ধি করেছে এবং ২টি গ্রন্থাগার কর্মচারীদের জন্য অবসরকালীন ভাতার ব্যবস্থা করেছে।

এই প্রবন্ধে পূর্বেই পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখা গেছে যে, অঙ্গরাজ্য, স্থানীয় ও ফেডারেলের মিলিত তহবিলের শতকরা ৩৪ ভাগ পুস্তক ও অন্যান্য দ্রব্যাদি ক্রয় করতে ব্যয়িত হয়। আলাবামা গত জুন মাস পর্যন্ত ১৬,০০০ ডলার মূল্যের পুস্তক, আরকানজাস ১৯৫৭-৫৮ সালে ১৬,৩৫৮টি পুস্তক, অ্যারিজোনা ১৯৫৭ সালের এপ্রিল থেকে ২৫,০০০ এবং কানেটিকাট ১৯৫৭ সালের জুন মাস থেকে ১৮,০০০ পুস্তক ক্রয় করেছে। ইডাহোতে পূর্বে যে গ্রন্থসংখ্যা ছিল এখন গ্রন্থসংখ্যা দাঁড়িয়েছে তার ৮ গুণ। কেনটাকীর চারিটি অঞ্চলে আছে, ৩৭,০০০ গ্রন্থ, ১০০০ রেফারেন্স পুস্তক এবং ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য আরও ৮৫০০ পুস্তক। ওহায়ো ক্রয় করেছে ৫০,০০০ ডলার মূল্যের পুস্তক। বলা বাহুল্য, সমস্তই লাইব্রেরী সার্ভিসেস অ্যাক্ট অনুসারে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যে ক্রয় করা হয়েছে।

এই নতুন আইনের অন্যতম সুফল এই যে, এর সাহায্যে রেফারেন্স বই মজুত রাখার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। এই রেফারেন্স বই ছোট ছোট সাধারণ গ্রন্থাগারে প্রদান করা হয়, অথবা তা একান্ত সম্ভব না হলে এমন ব্যবস্থা করা হয় যাতে এই বইগুলি তাদের পক্ষে সহজলভ্য হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ, আইওয়া রাজ্য তার ৪১২টি গ্রন্থাগারের জন্য রেফারেন্স পুস্তক মজুত পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। রোড আইল্যান্ড ৩৮টি গ্রন্থাগারে বিতরণের জন্য ৫০ সেট এনসাইক্লোপিডিয়া ক্রয় করেছে। সাউথ ক্যারোলিনা আন্তঃগ্রন্থাগার পুস্তক ঋণ ব্যবস্থার জন্য ৭,৯০৭ রেফারেন্স বই ও ৭৬টি সাময়িক পত্রিকার ৫ বছরের ফাইল ক্রয় করেছে। পুস্তক ব্যতীত অন্যান্য দ্রব্যাদি বলতে ফনোগ্রাফ রেকর্ড ও ফিল্মের কথা বলা হয়েছে।

আইন অনুসারে প্রদত্ত অর্থের শতকরা ৩৪ ভাগ কিভাবে ব্যয়িত হচ্ছে তার একটা মোটামুটি চিত্র এখানে দেওয়া হল। ঐ অর্থের শতকরা ৪৬ ভাগ ব্যয় করা হয় কর্মচারীদের বেতন ও মজুরী বাবদ, সাজ-সরঞ্জাম বাবদ শতকরা ৭ ভাগ এবং অন্যান্য কার্য পরিচালন বাবদ শতকরা ১৩ ভাগ।

আইনে প্রদত্ত অর্থ দ্বারা যেমন গ্রন্থাগারে নতুন কর্মী নিয়োগ করা হয়, তেমনি বৃত্তি দান করে কর্মীদের বিশেষ শিক্ষা দেওয়া হয়। নিউ ইয়র্ক স্টেট ১৯৫৭ সালে এই বৃত্তিদান পরিকল্পনা সুরু হল। ১৯৫৯ সালের জুন মাসের মধ্যে ২২ জন এই রাজ্যের লাইব্রেরী স্কুলগুলি থেকে স্নাতক হয়েছেন।

লাইব্রেরী সার্ভিসেস অ্যাক্ট চালু হওয়ার পর থেকে নিয়মিত সাধারণ সভা আরম্ভ করা হয়েছে। কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। লাইব্রেরী অব কংগ্রেসে ১৯৫৮ সালের ১২ই থেকে ১৪ই নভেম্বর রাজ্য গ্রন্থাগারিকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। একই রকম সমস্যা রয়েছে এরূপ কতকগুলি রাজ্যের আঞ্চলিক সম্মেলন বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। গ্রন্থাগারে কার্যপদ্ধতি সরল করার জন্য ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে উইসকনসিনে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা এর নিদর্শন। রাজ্য পর্যায়ে ইডাহোর বার্ষিক সম্মেলনের পরিকল্পনা উল্লেখ করা যেতে পারে।

লাইব্রেরী সার্ভিসেস অ্যাক্টের বৈশিষ্ট্যগুলি এবং এই আইন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে ও অঞ্চলে কিভাবে কাজ চলছে তার মোটামুটি একটা বিবরণ এই প্রবন্ধে দেওয়া হল। যেকোন ব্যবস্থার সাহায্যে যদি অধিক সংখ্যক লোকের হাতে অধিক সংখ্যক পুস্তক তুলে দেওয়া যায় তাহলেই সে ব্যবস্থার চরম সার্থকতা। বস্তুতঃ এই গ্রন্থাগার আইনের সাহায্যে ঠিক এইটিই সম্ভব করার চেষ্টা চলছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা কমিশনার লরেন্স জি ডারথিকের উক্তি দিয়ে প্রবন্ধের উপসংহার টানা যাক। তিনি বলেছেন ঃ

"১৯৫৬ সালের জুন মাসে লাইব্রেরী সার্ভিসেস আইন গৃহীত হওয়ায় গ্রন্থাগার উন্নয়নের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা হল। এই আইনটি বিশেষ করে সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির উদ্দেশ্যে রচিত হলেও স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার এবং গবেষণা সহায়ক গ্রন্থাগার ও রাজ্য গ্রন্থাগার প্রভৃতি সকল প্রকার গ্রন্থাগারই এর দ্বারা উপকৃত হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু উন্নয়ন সম্ভব করে তুলতে এই আইন সহায়তা করবে।"

একটি ছোট্ট গ্রামের এক ছোট্ট লাইব্রেরীর কথা

কালিগতি বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি যে গাঁয়ের কথা বলছি, তা' বীরভূমে। বড় লাইনের ষ্টেশন থেকে বারো মাইল ও ছোট ষ্টেশন থেকে ন' মাইল। বর্ষার সময় গরু, মোষ, মানুষও এক কোমর কাদায় আটকে যায়। এবারকার বর্ষা ও বানে একমাস পরেও জীপ্‌গাড়ী তো দূরের কথা গো-মহিষের গাড়ীও গাঁয়ে ঢুকতে পারে না এমন কি ছোট লাইনের ট্রেনে নেমে ৭ মাইল কষ্ট করে ধূলোর রাস্তায় গরু-মহিষের গাড়ীতে বা জীপে পার হলেও (একমাস পরের কথা বলছি) একটা নদী পার হতে হবে নৌকোয়, তার পরে কাদার রাস্তা—একহাঁটু কাদা আর উঁচুনীচু পাহাড়ী রাস্তা পার হয়ে বীরভূমের আশী-নব্বই ঘরের বসতিপূর্ণ এই ছোট্ট গাঁটি। থানা থেকে দশ মাইল। মহকুমা সহর থেকে ২৮ মাইল।

আমি রাস্তার কথা ও গাঁয়ের পরিবেশ ও ভৌগোলিক বর্ণনা দিলাম এই-জন্য যে বার বছরের স্বাধীনতার সুখ-সমৃদ্ধির অংশ এ খুব বেশী কিছু পায়নি। এই পাড়াগাঁয়ে বীরভূমের সামাজিক শিক্ষা বিভাগের কল্যাণে একটি লাইব্রেরীর জন্ম হ'ল বছর কতক আগে। প্রাইমারী স্কুলের নৈশ-বিদ্যালয়ে পড়ত পূর্ণবয়স্ক লোক, তারা শিখত বর্ণমালা। পরে পড়তে পারলো ছোট ছোট বই। উদ্যোগী শিক্ষক প্রকৃত গ্রামসেবকরূপে তাদের কাছে পড়ে শোনাতেন সমাজ-শিক্ষা কেন্দ্রের সম্পাদকের দেওয়া বই। ছোটদের রামায়ণ, ছোটদের মহাভারত, পুরাণের গল্প। শুনতো তারা সন্ধ্যাবেলায় অর্দ্ধসাপ্তাহিক আনন্দ-বাজারের খবর। সে বছর কলকাতায় খুব ধুমধাম—রুশ নেতারা এসেছেন। বুলগানিনকে তারা বলতো মুলগায়েন, বুলগানিনকে বলতো রাশিয়ার বাদশা, জহরলালকে বলতো ভারতের বাদশা। তারা একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করে; মুলগায়েনের সঙ্গে জহরলালের এত ভাব, তবে কম্যুনিষ্টের দল আমাদেরকে রুশকে ভোট দিতে বলে কেন? ছোট্ট ছোট্ট সহজ গণনীতি ও রাজনীতির প্রশ্ন এইভাবে তাদের মনকে আকুল করতো। এদের এই প্রশ্নের প্রকৃতি দেখে বুঝতাম —এদের শিক্ষার, এদের জানবার কি আকুতি।

তারপর সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্রের সাহায্যে তিনশো টাকার কিছু আসবাব ও বই কিনে সাধারণ পাঠাগারের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। আমার অনেক শহুরে বন্ধুরা পাড়াগাঁয়ের বর্ষীয়ান ঐ নগণ্য পল্লীগ্রামের খুদে সাহিত্য লক্ষ্মীর মালাকার হওয়ার জন্য আমাকে তাঁরা উপহাস করতে লাগলেন। আমি নিজেও বই নির্ব্বাচন করতে সুরু করলাম। প্রথমে এল বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, তারাশংকর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও গিরীশ ঘোষের গ্রন্থাবলী। আর এলো রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ প্রভৃতি। এইসব লাইব্রেরীর বই কলকাতার কোন প্রকাশককে দিলে তারা নিজের প্রকাশিত বই চালাবার চেষ্টা করেন, বলেন বাকীগুলি পাওয়া গেল না; আর এখানকার কোন পুস্তক বিক্রেতাকে দিলে, সকলে সব প্রকাশকের দোকান খুঁজে বই আনবার শ্রম স্বীকার করেন না। আমি একটি বৃদ্ধ প্রাচীন শিক্ষক পেয়েছিলাম—যাঁর এখানে আগে একটি ভাল বইয়ের দোকান ছিল—তিনি সযত্নে সব বইগুলি সংগ্রহ করে এনেছিলেন। তাঁর অকপট সেবা আমার ও পল্লীবাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। প্রথমতঃ পাড়াগাঁয়ের নগণ্য লাইব্রেরীকে প্রতি বছর বা এক বছর অন্তর দুশো টাকা বা তার কাছাকাছি দামের বই সরবরাহ করতে স্থানীয় পুস্তক ব্যবসায়ীর বা কলিকাতার পুস্তক-ব্যবসায়ীর উৎসাহ বা আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু এঁরা কি সকলেই স্বীকার করেন না যে ভারতের প্রাণ গ্রামে, এঁরা কি জানেন না যে ছোট্ট গ্রাম থেকে ঈশ্বরচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, মধুসূদনের সৃষ্টি।

যাক্, একবছর পরে হঠাৎ একদিন সেই গাঁয়েই কাজে গিয়েছিলাম। অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাঁয়ে একটি মেয়ে রোগীকে দেখতে যেতে হ'ল। অবগুণ্ঠনবতী মেয়েটির বিছানার কাছে পড়েছিল শরৎচন্দ্রের 'মেজদিদি'। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ মা, তুমি কতদূর পড়েছ? সে জানাল ঃ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ আর রামায়ণ। আর কি বই পড়েছ? বলল, ছোটদের আনন্দমঠ, বিষবৃক্ষ, কপালকুণ্ডলা এবং আরো বই। আমি ধন্যবাদ দিলাম সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্রের পরিদর্শক বড়ুয়া মহাশয়কে, যিনি আমায় জোর করে নামিয়েছিলেন গাঁয়ে এই সামাজিক শিক্ষাকেন্দ্র বিস্তারের কাজে। এতদিনে গাঁয়ের কুল-লক্ষ্মীদের সংগে শহুরে সাহিত্য-লক্ষ্মী জটিলা কুটিলার ন্যায় ব্যবহার করে এসেছে। আজ সাহিত্য লক্ষ্মীর বাগানে ছোট্ট গেঁয়ো সাজিটি নিয়ে গাঁয়ের কুল-লক্ষ্মীও দাঁড়াচ্ছেন—এ দেখে সত্যি আমার মনে আনন্দ হচ্ছে। আমাদের যিনি লাইব্রেরীয়ান তিনি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক ও চল্লিশ বছরের অকৃতদার। তিনি বই ঘাড়ে নিয়ে

গাঁয়ে গাঁয়ে আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে বিলি করে পাঠের পিপাসার সৃষ্টি করেছেন। আজ গাঁয়ের লোকেরা ফরমাস করে "তারাশংকর, শৈলজানন্দ, ফাল্গুনীবাবুর বই সব আনান;" বলে শ্রীমদ্ভাগবতের বাংলা অনুবাদ আনাতে। উপরের তিনটি সাহিত্যিকের নামের দিকে এদের পক্ষপাতিত্ব কেন ?—বেশীক্ষণ ভাবতে হ'ল না। তিনজনেরই বীরভূমের পলিমাটিতে জন্ম। তিনজনেই বীরভূমের 'মা'টিকে ধরে অনেক কিছু লিখেছেন।

গেঁয়ো লাইব্রেরীর সবচেয়ে বড় অবদান দেখলাম যখন তার গাব গুবা-গুব নিজের হাতে তৈরী ক'রে ঐক্যতানে গেয়েছিল ঃ

ওহে ও কুব্জার বন্ধু।
প্যাসরেছ রাইমুখ ইন্দু ।।
ওহে ও পাগাধারী।
প্যাসরেছ নবীন কিশোরী ।।

গানে তাদের তাল-লয় ছিল কিনা জানি না, কিন্তু ছিল তাদের মধ্যে প্রাণের সরলতা ও অক্লান্ত আবেগ। গেয়েছিল তারা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (যিনি এখন সরকারী দপ্তরে বুনিয়াদী শিক্ষার অবরপতি) তাঁর সামনে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, চণ্ডীদাসের এই গান তারা কোথায় পেল ? তারা বল্লে ঃ গাঁয়ের লাইব্রেরী থেকে। এদের ভাদু গানও আমি শুনেছি। গেঁয়ো কবির আধুনিকতাও দেশের তাজা সংবাদ এই গ্রাম্য লোকগীতির মধ্যে কিরূপে ফুটেছে তার নিদর্শনস্বরূপ এদেরই বাঁধা গান ঃ

"ভাদুর ডরে মোশানজোরে
পাষাণ হ'তে বান ঝরে,
ভাদুর নাচ কে দেখবি আয়রে, কে দেখবি আয়।"

এই গানের মধ্যে মোশানজোরের বাঁধের কথা, আরও অনেক কথা লাইব্রেরীর মাধ্যমে পেয়েছে।

অবশেষে বলবার কথা এই সরকারের এই গ্রাম্য লাইব্রেরী সংগঠনের পরিকল্পনা কার্যকরী হ'তে পারে যদি কর্মকর্তা ও লাইব্রেরীয়ান সহজভাবে কাজ করে গেঁয়ো সরল মনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে চলেন। কৃষি ও গ্রামজ শিল্প, গরু, হাঁস, ছাগ, পশুপালন, ছোট ছোট লোকগীতি, স্বাস্থ্য ও শিশু-পরিচর্যার বই সরকার থেকে প্রকাশ করে গ্রাম্য লাইব্রেরীতে রাখা এবং গ্রাম্য শিক্ষকদের দ্বারা বহুল প্রচার ও আলোচনা করা আবশ্যক। আর একটি কথা আমাদের রাষ্ট্রের মনীষীগণের জন্মদিবস, ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ ঘটনার দিবস

এই লাইব্রেরীর মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রচার বিভাগ চেষ্টা করলে অল্পায়াসে অবনত, দুর্গত, ম্লান ও অর্দ্ধমূক গ্রামবাসীদের অন্তরে আশা, মুখে ভাষা, হৃদয়ে বল, ও আত্ম-গৌরব জাগাইতে পারেন।

[বীরভুম জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'পাঠাগার' পত্রিকার সৌজন্যে প্রকাশিত]

বিদ্যানগর ও তমলুকে পক্ষকালীন গ্রন্থাগারিক শিবির শিক্ষণ

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের দুটি জেলা গ্রন্থাগারে পক্ষকালীন দুটি গ্রন্থাগারিক শিবির শিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। একটি চব্বিশ পরগণার বিদ্যানগরে, অপরটি মেদিনীপুরের তমলুকে।

৫ই জুন থেকে বিদ্যানগরে যে শিবির শিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় সেটি জেলা গ্রন্থাগারের আমন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। সর্বসমেত ৩৫ জন শিক্ষার্থী শিবিরে যোগদান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই রুরাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক ছিলেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে অনেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সুদূর ও দুর্গম অঞ্চল থেকে উপস্থিত হন। শিবিরে প্রতিদিন শিক্ষার্থীদের গ্রন্থের বর্গীকরণ, সূচীকরণ প্রভৃতি প্রস্তুতিকার্য হাতেকলমে শেখানো হোত। অপরাহ্ণে ব্যবস্থা থাকত সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর বক্তৃতার। শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীমতী তপতী রায় প্রভৃতি বিভিন্ন দিনের কথিকায় অংশ গ্রহণ করেন। শিবির পরিচালনায় জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীসরোজ হাজরা, শ্রীঅরুণ দাশগুপ্ত, শ্রীমতী অশোকা ধর, শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য ও শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী অংশ গ্রহণ করেন। সমাপ্তি দিনে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিজ্ঞান-পত্র বিতরণ করেন শ্রীফণিভূষণ রায়। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সুসাহিত্যিক শ্রীশিবরাম চক্রবর্তী।

তমলুকে অনুষ্ঠিত শিবিরে সর্বসমেত ২৫ জন শিক্ষার্থী যোগদান করেছিলেন। তার মধ্যে ২২ জন ছিলেন মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন রুরাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক। তমলুকের জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য মূলতঃ শিবির কার্য পরিচালনা করেন। শিবিরে হাতেকলমে শিক্ষণদান অপেক্ষা বক্তৃতা ও আলোচনার মাধ্যমে অধিককাল শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী, শ্রীফণিভূষণ রায় ও শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় অংশ গ্রহণ করেন। সমাপ্তি দিনে শ্রীতিনকড়ি দত্ত ও শ্রীনিখিল রঞ্জন রায় ভাষণ দান করেন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

ইসলামিয়া লাইব্রেরীর পঞ্চত্রিংশৎতম বার্ষিক সভা

১৪ই মে ইসলামিয়া লাইব্রেরীর (খিদিরপুর) ৩৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক জনাব মহম্মদ সিদ্দিক বিগত বর্ষের কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপিত করেন। তাতে জানা যায় যে গ্রন্থাগারে দৈনিক গড়ে ৭১ খানি বই ইসু হয় এবং গড়ে ৭৫ জন পাঠক গ্রন্থারের পাঠকক্ষটি ব্যবহার করে থাকেন। বিগত বর্ষে গ্রন্থাগারের সাংস্কৃতিক বিভাগের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় কবিদের একটি কবি সম্মেলন, প্রবন্ধ ও আবৃত্তি প্রতিযোগিতা এবং গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা বর্ষশেষে ছিল ৩৯০ এবং মোট গ্রন্থ সংখ্যা ৫০২৪। এই সভায় পরবর্তী বছরের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীব্রজেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জনাব মহম্মদ সিদ্দিক ও জনাব খলিল আহমদ যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন গ্রন্থাগারে ছোটদের বিভাগ

গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচার গ্রন্থাগারে ছোটদের একটি বিভাগ খোলা হয়েছে। এ ধরণের সুসজ্জিত ও সুপরিকল্পিত শিশু গ্রন্থাগার শহর কলিকাতায় এই প্রথম। শিশু গ্রন্থাগারের উপযোগী আসবাবপত্র ও পরিবেশ এবং প্রয়োজনীয় যাবতীয় সরঞ্জামের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে গ্রন্থাগারের জন্যে কোনও চাঁদা লাগে না। কেবল পাঁচ টাকা জমা নেওয়া হয়। ইংরিজি, বাংলা ও হিন্দীতে লিখিত বইপত্র রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। বর্তমানে সদস্য সংখ্যা তিন শ'য় সীমাবদ্ধ থাকবে। তবে প্রতিদিন অপরাহ্ণে এই বিভাগটিতে যে ভীড় লক্ষিত হয় তজ্জন্যে বিভাগটীর অনতিবিলম্বে সম্প্রসারণের প্রয়োজন হবে। মিশনের এই বিভাগটি কর্তৃপক্ষের সুরুচি এবং আধুনিক ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়।

প্রগ্রেসিভ ষ্টাডি ক্লাবের বার্ষিক সভা ও বিচিত্রানুষ্ঠান

গত ৭ই ও ৮ই মে রাণী রাসমণি গার্ডেন লেনে প্রগ্রেসিভ ষ্টাডি ক্লাবের বার্ষিক সভা ও বিচিত্রানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। দুইদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতার মেয়র শ্রীবিজয় ব্যানার্জ্জি, অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা শ্রীমতী অলকা চট্টোপাধ্যায়। বিচিত্রানুষ্ঠানে খ্যাতনামা শিল্পীগণ আধুনিক সংগীত, লোকসংগীত ও যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন। ক্লাবের সভ্য ও স্থানীয় শিল্পীগণ অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে শ্রীবীরু মুখোপাধ্যায় রচিত 'সংক্রান্তি' নাটিকাটি সাফল্যের সহিত মঞ্চস্থ করেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে অন্যান্য বছরের মত এবারও একটি স্মরণী-পত্র প্রকাশ করা হয়।

বিজয়গড় মিলন চক্রে রবীন্দ্র উৎসব

গত ২১শে মে শনিবার মিলন-চক্র লাইব্রেরী গৃহে রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। এই উপলক্ষে পাঠাগারকে সুসজ্জিত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি অধ্যাপক দেবদাস জোয়ারদার রবীন্দ্র জয়ন্তীর তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনী ও আদর্শ এবং বহুমুখী প্রতিভার উল্লেখ করে সভাপতি শ্রীসুখেন্দু বিকাশ চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমান দুর্যোগপূর্ণ পৃথিবীতে তাঁর জীবনাদর্শকে একমাত্র পাথেয় রূপে গ্রহণ করার জন্য সকলের নিকট আবেদন করেন। পরিশেষে আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়।

শৈলেশ্বর লাইব্রেরীর ষটত্রিংশৎতম বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৩০শে এপ্রিল শৈলেশ্বর লাইব্রেরীর (টেংরা) বার্ষিক সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশ্রী জিতেন্দ্র নাথ সেন, নরসিংহ পাল ও মনোরঞ্জন সেন যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক পদে নির্বাচিত হয়েছেন। গ্রন্থাগারের তথ্যপূর্ণ কার্যবিবরণীতে প্রকাশ যে বিগত বর্ষে যেসব বই লেনদেন হয়েছে শ্রেণী অনুয়ায়ী তা' এইরূপ : উপন্যাস ৪৬৩২, গল্প ১০৯, প্রবন্ধ ২৭, ডিটেকটিভ ১২১৮, জীবনী ৯৪, ধর্ম ৭৭, ইতিহাস ২৮, কাব্য ১৬, নাটক ১৩০, বিজ্ঞান ৯৮, ভ্রমণ ৯৭, ইংরাজি ৬৫, সাময়িকী ১৮৭। সদস্য সংখ্যা ৩০০ অতিক্রম করেছে। বিগত বর্ষের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে মনীষীদের জন্মতিথি উৎসব, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

চব্বিশ পরগণা

বজবজ ব্রতী সংঘ পাঠাগারের চতুর্দশ বার্ষিক সভা

গত ২রা এপ্রিল '৬০ সন্ধ্যায় শ্রীতপনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ব্রতী সংঘের পাঠ্যগার ভবনে উহার ১৪শ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রারম্ভে সংঘের প্রাক্তন সভ্য শ্রীঅজিত কুমার ধরের অকাল মৃত্যুর জন্য এক শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কর্মসচিব শ্রীনিশানাথ সেন আলোচ্য বৎসরে সংঘের ক্রমোন্নতি ও প্রগতির বিষয় পর্যালোচনা করেন। হিসাবরক্ষক শ্রীচিত্ত মণ্ডল কর্তৃক পঠিত বিগত বৎসরের পরীক্ষিত হিসাব হইতে জানা যায় যে, প্রারম্ভিক তহবিল সহ উক্ত বৎসরে সংঘের সর্বসমেত মোট আয় হইয়াছে ১,৮০৪'০৯ নঃ পঃ ও ব্যয় হইয়াছে ১,০৫৪'২৪ নঃ পঃ। সর্বশেষে বজবজ পৌর সভার সহ-সভাপতি শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র পাত্র (পদাধিকার যোগ্যতা সম্পন্ন সদস্য) সহ নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া ১৯৬০-৬১ সালের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়ঃ সর্বশ্রী যতীন্দ্র মোহন চক্রবর্তী, সুশীল ধর, নিশানাথ সেন, মৃণাল সেন, নিমাই দত্ত, দেবদাস দত্ত, চিত্ত মণ্ডল, বিশ্বনাথ হালদার, দুলাল মিত্র, মিলন পাল, কমলাক্ষ লাট্টু, বিশ্বনাথ জানা ও শেখ রওশন আলি।

শিউলী মিলন পাঠাগার বারাকপুর

প্রায় দশ হাজার অধিবাসী অধ্যুষিত শিউলী ইউনিয়নে বছর নয়েক আগে এই পাঠাগারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এখন এর সদস্য সংখ্যা ৫০ ও পুস্তক সংখ্যা এক হাজার অতিক্রম করেছে। কিন্তু পাঠাগারটি নানা প্রতিকূলতার জন্যে আশানুরূপ উন্নতি লাভ করেনি। বর্তমানে স্থানীয় রুরাল লাইব্রেরী চানক পাঠাগারের কাছ থেকে মিলন পাঠাগার নানাভাবে সহযোগিতা লাভ করছে।

বনগ্রাম সাধুজন পাঠাগারে গ্রন্থ পার্বণ

রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে সাধুজন পাঠাগারে ২৫শে বৈশাখ হতে পাঁচদিন ব্যাপী এক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইতঃপূর্বে ১লা বৈশাখ থেকে তন সপ্তাহ-ব্যাপী পাঠাগারের আড়াই শতাধিক সদস্যকে রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠে প্রবৃত্ত করার এক বিশেষ কার্যসূচী সাফল্য লাভ করে। এতদুপলক্ষে দেশের মনীষীদের স্থায়ী এক চিত্রশালার উদ্বোধন করেন প্রভাবতী দেবী সরস্বতী। উৎসব অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রায় সমুদয় গ্রন্থ এবং অন্যান্য ভাষায় অনূদিত গ্রন্থাদির

একটি সুন্দর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীমতী কমল সেনগুপ্তার সভানেতৃত্বে অনুষ্ঠিত গ্রন্থ পার্বনে ডাঃ ইন্দ্রনারায়ণ সেনগুপ্ত তাঁর ব্যক্তিগত সংগৃহীত দু' আলমারি বই পাঠাগারে দান করেন। তাতে বহু দুষ্প্রাপ্য বই ও পুঁথি আছে। কার্যসূচীর বিভিন্ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত বক্তৃতা, কবিতা-পাঠ ও সংগীতে স্থানীয় বহু সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ ও শিল্পী যোগদান করেন। পাঠাগারের সদস্যগণ রবীন্দ্রনাথের রক্তকরবী নাটিকাটি অভিনয় করেন। বিভিন্ন দিনের অনুষ্ঠানে ও প্রদর্শনীতে স্থানীয় জনসাধারণ বিপুল উৎসাহের সহিত যোগদান করেন।

বর্ধমান

মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর ত্রয়োদশ প্রতিষ্ঠা উৎসব

গত ৬ই জুন মানকর পল্লীমঙ্গল লাইব্রেরীর ত্রয়োদশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে সকালে সংগীত ও লাইব্রেরীর বিভিন্ন প্রচারপত্র সহ গ্রাম পরিক্রম করা হয় এবং বিকালে গলসী সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীনিমাই চন্দ্র ঘোষের সভাপতিত্বে একটি জনসভা হয়। এই সভায় লাইব্রেরী সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণকে পুরস্কার দান করা হয়। প্রধান শিক্ষক শ্রীসাতকড়ি সরকার ও ডাঃ শ্রীকৃষ্ণপদ দাস লাইব্রেরী ও বালিকা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ভাষণ দেন। গ্রাম পরিক্রমা কালে নগদ ২৫৲ টাকা এবং ১ মণ ২৫ সের চাল ভিক্ষা স্বরূপ পওয়া যায়।

স্বামিজী মিলন মন্দির পাঠাগার। রসুলপুর

রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ২৭শে বৈশাখ রসুলপুর স্বামীজী মিলনমন্দির প্রাঙ্গনে এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় সভাপতিত্ব করেন ডাঃ জগৎপতি বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসাবে ভাষণ দেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীসমরেশ বসু। আবৃত্তি প্রতিযোগিদের পুরস্কার দেন বৈদ্যডাঙ্গা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী মীরা দেওয়ানজী। বিভিন্ন বক্তা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের আলোচনা করিয়া আগামী বর্ষে শততম জন্মবার্ষিকী যথাযথ গাম্ভীর্যের সহিত পালনে সকলকে আহ্বান জানান। রবীন্দ্রনাথের শততম জন্মবার্ষিকী পালনের জন্য পাঠাগার এক শক্তিশালী কমিটি গঠন করিয়াছেন।

বাণীমন্দির পাঠাগার। হাটগোবিন্দপুর

গত ২৬শে এপ্রিল বর্ধমান জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীযুত গৌরাঙ্গ কান্তি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে দ্বাবিংশ জন্মবার্ষিক উৎসব পালিত হয়। গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই উৎসবে যোগদান করেন। পাঠাগারের কার্য বিবরণে প্রকাশ যে পাঠাগারটী সরকারের নিকট হইতে আজ পর্যন্ত কোন সাহায্য পায় নাই। পাঠাগারের বর্ত্তমান সভ্য সংখ্যা ১১১জন, পুস্তক সংখ্যা ১০৮৫। বিগত বৎসরের হিসাবপত্রে পাঠাগারের আয়ব্যয়ের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই পাঠাগার জেলাবোর্ডের নিকট হইতে সামান্য কিছু সাহায্য পায়। N. E. S. Block হইতে যৎসামান্য সাহায্য পায়। সভ্যদের মাসিক চাঁদার উপর নির্ভর করিতে হয়।

বাঁকুড়া

রবীন্দ্র পাঠচক্র। সিমলাপাল

স্থানীয় সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীরবীন্দ্র চন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে গত ২৬শে বৈশাখ পাঠচক্রের এক সভায় রবীন্দ্র জন্মোৎসব উদ্‌যাপিত হয়। ঐদিন পাঠাগারের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকও ছিল। সংগীত, আবৃত্তি ও বক্তৃতাদির পর পাঠাগারের সদস্যগণ কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' নাটকটি অভিনীত হয়।

হুগলী

কুলতেঘরী সাধারণ পাঠাগার। তারকেশ্বর

গত ১৫ই মে রবিবার কুলতেঘরী সাধারণ পাঠাগারের উদ্‌যোগে নবনবতিতম রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত হাজরা মহাশয়। গ্রামের বালকগণ রবীন্দ্র কবিতা, আবৃত্তি এবং হাস্যকৌতুক নাটক অভিনয় করে। রসুলপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত অচিন্ত কুমার হাজরা এবং নছিপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত ধ্রুবপদ পাল মহাশয় সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। পাঠাগারের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত দিবাকর দত্ত মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত বাসুদেব চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্র জীবনী আলোচনা করেন। সভায় স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

জাতীয় সেবা সমিতি । জগমোহনপুর

গত ২৫শে বৈশাখ রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস জাতীয় সেবা সমিতি ভবনে সাড়ম্বরে পালন করা হয়। গুরুদেবের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানান্তে সভায় কার্য সুরু হয়। সভায় কবিতা, আবৃত্তি ও আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন সমিতির সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ। মহিলা সদস্যগণ দ্বারা সন্ধ্যায় 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' নাটক অভিনীত হয়। আগামী রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীর কার্যক্রম অদ্যকার সভায় খসড়া রূপে গৃহীত হয়।

জ্যোতিঃ সঙ্ঘ । কোদালপুর

বিগত ২৫শে বৈশাখ গ্রন্থাগার ভবনে রবীন্দ্রনাথের নবনবতিতম জন্মবার্ষিকী প্রতিপালিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুদর্শন নন্দী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীগোপাল চন্দ্র ভট্টাচার্য। প্রধান অতিথি তাঁহার ভাষণে রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে সকলকে অবহিত করেন। সভাপতি মহাশয় বলেন আগামী রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব যাহাতে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয়, সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে সাড়া জাগে এবং সেই সম্বন্ধে সঙ্ঘের সমস্ত সদস্য ও উপস্থিত গ্রামবাসীগণকে আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট হইতে হইবে। উপস্থিত সকলেই সভাপতির প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন।

বৈঁচি কাশীপতি স্মৃতি সাধারণ পাঠাগার । বৈঁচিগ্রাম

বিগত ২৮শে মে পাঠাগার ভবনে রবীন্দ্রনাথের নবনবতিতম জন্মোৎসব পালন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তৃতা করেন শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। শ্রী মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। সভায় একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য।

বাণী মন্দির পাঠাগার । রামনগর

বিগত ২৫শে বৈশাখ পাঠাগারে রবীন্দ্রনাথের নবনবতিতম জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রীহৃষিকেশ শীল। পাঠাগারের সম্পাদক সমাজ-জীবনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কবিগুরুর কবি প্রতিভা প্রসূত রচনাবলীর আদর্শ বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। প্রধান অতিথি ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের আদর্শ রবীন্দ্রনাথের জীবনী প্রাঞ্জল ভাষায় আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয়ও

রবীন্দ্র জীবনের বহুমুখী প্রতিভা সম্বন্ধে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তিনি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব উদ্‌যাপনের জন্য সমাগত জনগণের নিকট আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

সুহৃদ সঙ্ঘ। দুদকোমড়া

বিগত ৮ই জ্যৈষ্ঠ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী তীর্থানন্দ এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীনন্দলাল কুণ্ডু। প্রধান অতিথি ও সভাপতি মহাশয় রবীন্দ্রনাথের জীবনী, আদর্শ এবং ভারতে তাঁহার প্রভাব সভাস্থ সকলকে বুঝাইয়া দেন।

বার্তা বিচিত্রা

ইহা কি সত্য ?

কোনও এক নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেল যে সারা পশ্চিম বাংলার তিন শতাধিক 'রুরাল লাইব্রেরী'র গ্রন্থাগারিক মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত চার মাসের বেতন পাননি। 'রুরাল লাইব্রেরীগুলি' রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ও অর্থানুকুল্যে সৃষ্ট হয়েছে। পরিচালনভার সেগুলির বেসরকারী কর্মকর্তাদের উপর ন্যস্ত। তবে এ ধরণের সংবাদ নতুন নয়। কারণ পশ্চিম বঙ্গের কোনও একটি বিশিষ্ট 'এরিয়া লাইব্রেরীর' গ্রন্থাগারিককে মাসের পর মাস বেতনের জন্য শিক্ষা দপ্তরে ধর্ণা দিতে হোত। রুরাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকরা একেই অত্যন্ত কম বেতন (সর্বসাকুল্যে ৭৫৲) পেয়ে থাকেন। তদুপরি যথাসময়ে বেতন না পেলে তাঁদের মনোবল অটুট থাকা কি সম্ভব ?

রুশ-মার্কিণ গ্রন্থাগারিক বিনিময়

বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিদ্যা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যে মস্কোয় কিছুকাল পূর্বে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েতের মধ্যে একটি চুক্তি হয়। তদনুযায়ী ১৯৬০-৬১ সালে অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের মধ্যে উভয় দেশ থেকে

পাঁচ থেকে সাতজন গ্রন্থাগার কর্মী চার সপ্তাহের জন্যে অপর দেশের গ্রন্থপঞ্জী সংকলন ব্যবস্থা, ডকুমেণ্টেশন কার্যপ্রণালী, তথ্য সরবরাহ ব্যবস্থা, গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ও গ্রন্থাগারের সর্ববিধ কর্মপদ্ধতি পরিদর্শন করবেন। অ্যামেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েসন ও সোভিয়েতের অনুরূপ সংস্থা নিজ দেশের প্রতিনিধি মনোনয়নে সাহায্য করবেন বলে প্রকাশ। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে উভয় দেশ যখন শীর্ষ সম্মেলনের সমাধির উপর ঠাণ্ডা লড়াইয়ে মত্ত তখন এ ধরণের উদ্যোগ আয়োজন যথেষ্ট আশা ও আনন্দের সঞ্চার করবে।

পাকিস্তানে দ্বিতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে কিছুকাল পূর্বে পেশোয়ারে পাকিস্তান গ্রন্থাগার সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে আলোচ্য বিষয়াদির মধ্যে ছিলঃ (১) লাইব্রেরী কমিশন নিয়োগের প্রস্তাব, (২) কপিরাইট গ্রন্থ দাখিল ও জাতীয় গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন, (৩) গ্রন্থ আমদানি ব্যাপারে বিধিনিষেধ দূরীকরণ, (৪) গ্রন্থসূচী নিয়মকানুন ও সূচীকরণে পাকিস্তানি নামের ব্যাপারে নির্দিষ্ট নিয়ম প্রবর্তন, (৫) পুস্তক খোয়া যাওয়ায় গ্রন্থাগার কর্মিদের অভিযুক্ত করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ইত্যাদি। সম্মেলনের ব্যয় নির্বাহের জন্যে এবং প্রতিনিধিদের যাতায়াত খরচ বাবদ এশিয়া ফাউণ্ডেশন থেকে চার হাজার টাকা সাহায্য হিসাবে দেওয়া হয়েছে। পাকিস্তান লাইব্রেরী এসোসিয়েসনের সম্পাদক জনাব ফজল ইলাহী সম্মেলনে ঘোষণা করেন যে এসোসিয়েসন কর্তৃক শীঘ্রই একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হবে। সম্মেলনে বহু বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক যোগদান করেছিলেন।

পাঞ্জাবে কলেজ লাইব্রেরীয়ানদের সম্মেলন

জলন্ধরে গত মার্চ মাসে পাঞ্জাব রাজ্যের কলেজ গ্রন্থাগারিকরা এক সম্মেলনে মিলিত হন। কলেজ গ্রন্থাগারিকদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবীর মধ্যে গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদা ছিল সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়। সম্মেলনে গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাবে কলেজ গ্রন্থাগারের শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও মর্যাদা অধ্যাপকদের সমতুল করার জন্যে দাবী জানানো হয়। গ্রন্থাগারিকদের কাছ থেকে নগদ জামানত চাওয়ার বিরুদ্ধে এবং গ্রন্থাগার থেকে অপসৃত পুস্তকাদির জন্যে গ্রন্থাগারিককে অভিযুক্ত করার বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানানো হয়।

কলিকাতায় নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন

গত ১৭ই ও ১৮ই এপ্রিল গোলপার্ক রামকৃষ্ণ মিশন ভবনে সারা ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বহু বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক সম্মেলনে যোগদান করেন। সম্মেলনের মূল আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে লাইব্রেরী এডভাইসরি কমিটির রিপোর্ট, পে কমিশনের রিপোর্ট ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অন্যান্যদের মধ্যে শ্রীসোহন সিং, শ্রীশচীন্দ্রলাল দাশগুপ্ত, শ্রীপি, এন, কাউলা, বরোদা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারিক শ্রীশুক্লা, শ্রীবি, এস, কেশবন, শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় অংশ গ্রহণ করেন।

দ্বিতীয় দিনের সমাপ্তি অধিবেশনের পর ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিদায়ী সভাপতি শ্রীবি, এস, কেশবন বিগত তিন বর্ষের কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করেন। পরে নতুন কার্যনির্বাহক সমিতি ও সংসদের নির্বাচনে ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় ও শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন।

নীলামে প্রাচীন লণ্ডন গ্রন্থাগারের দুষ্প্রাপ্য বইপত্র বিক্রয়

সম্প্রতি সুবিখ্যাত ও প্রাচীন লণ্ডন লাইব্রেরীতে সংগৃহীত বহু মূল্যবান বই ও পাণ্ডুলিপি নীলামে বিক্রয়ের এক বিষাদময় সংবাদ পাওয়া গেল।

১৮৪১ সালে টমাস কার্লাইল এই গ্রন্থাগারটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। গ্রন্থাগারটির আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে পড়াশুনা ও গবেষণার জন্যে পাঠকেরা যে কোনও বই তা যতই দুষ্প্রাপ্য হোক না কেন যতগুলি সংখ্যক প্রয়োজন বাড়ী নিয়ে যেতে পারবে। বিলেতের বিশ্ববিখ্যাত বহু সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক এই গ্রন্থাগারটি নিয়মিত ব্যবহার করতেন এবং উপকারের বিনিময়ের তাঁরা অনেকেই তাঁদের নিজস্ব গ্রন্থ-সম্পদ এই গ্রন্থাগারে দান করে গেছেন।

কিছুদিন আগে ওয়েষ্টমিনিষ্টার নগর পৌর প্রতিষ্ঠান এই প্রথম গ্রন্থাগারের কাছ থেকে বছরে ৫০০০ পাউণ্ড করে কর দাবী করে বসেছেন। তার প্রতিবাদে নিযুক্ত একটি ট্রাইবুনালে সিদ্ধান্তটি অনুমোদন লাভ করে। তখন লণ্ডন লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ হাই কোর্টে আপিল করেন। আদালতের রায়ে বলা হয়েছে যে যদি গ্রন্থাগারটি প্রকৃতই নিঃস্বার্থ দান ও সাহিত্যের প্রয়োজনে পরিচালিত

হোত, তাহলে আইন অনুযায়ী গ্রন্থাগারটি কর থেকে রেহাই পেত। কিন্তু গ্রন্থাগারটি মোটেই নিঃস্বার্থ দানে পরিচালিত হয় না, এবং দানের পরিমাণ নিতান্তই নগণ্য। আদালত লর্ডস সভায় আপিলের অনুমতি দিলেও লন্ডন লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ আপিলের পথে যান নি। লাইব্রেরীর সভাপতি কবি টি, এস, ইলিয়ট সাধারণের কাছে অর্থ সাহায্যের জন্যে আবেদন জানিয়েছেন। রাজকবি জন মেসফিল্ড ও প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী চার্চিল সাহেবও অনুরূপ এক আবেদন করেছেন। বকেয়া দেনা ও মামলা চালানোর জন্যে প্রায় বিশ হাজার পাউন্ড দেনা বর্তমানে লাইব্রেরীর কাছে এক দুরূহ সমস্যার সৃষ্টি করেছে। বিলেতের বিভিন্ন সংবাদপত্র ও বি, বি, সি, এজন্যে সমবেদনা জানিয়ে আবেদন ও অর্থসাহায্য করছেন। বি, বি, সি, ইতিমধ্যে এক হাজার পাউন্ড দিয়েছেন।

দেনার অর্থ সম্পূর্ণ সংগ্রহ করতে না পারায় এবং ভবিষ্যতের জন্যে একটি তহবিল সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি গ্রন্থাগার থেকে কিছু পান্ডুলিপি ও কয়েকটি বিখ্যাত গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বিক্রয় করে দেওয়া হয়। অধিকাংশ বস্তুই আমেরিকার দু'টি প্রতিষ্ঠান কিনে নিয়েছে অত্যন্ত মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে।

নিলামে উপস্থিত দর্শকবৃন্দ রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দর হাঁকাহাঁকি শ্রবণ করেন। বায়রণের পত্রাবলী ও দিনলিপির পান্ডুলিপি যখন ৬০০ পাউন্ডে বিকিয়ে যায়, তখন তার দাতা সার হ্যারল্ড নিকলসন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, 'ঐ দামেই আমি ওগুলি কিনেছিলাম।' কবি টি, এস, ইলিয়ট ও ষ্টিফেন স্পেন্ডার তাঁদের বইয়ের প্রথম সংস্করণগুলির বিক্রয় প্রত্যক্ষ করছিলেন। ই, এস, ফরষ্টারের 'প্যাসেজ টু ইন্ডিয়া' এবং টি, ই, লরেন্সের 'সেভেন পিলার্স অব উইজডাম' ৬৫০০ ও ৩৮০০ পাউন্ডে বিক্রিত হয়। বক্সার যুদ্ধে পিপিঙে লুন্ঠিত ভেড়ার চামড়া দেওয়া বেগুনি রঙের একটি কোট গ্রাহাম গ্রীণকে কিনে ফেলতে দেখা গেল।

ঐ দিনের নিলামে প্রয়োজনীয় হাজার পঁচিশেক পাউন্ড উঠে এলেও যে অমূল্য সম্পদ ইংলন্ড থেকে চলে গেল তার জন্যে অনেকেই আফসোস করছিলেন। ইংলন্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে লন্ডন লাইব্রেরীর অবদান অপরিসীম। এ ধরণের সম্পদকে বাঁচাবার জন্যে পার্লামেন্টে একটি বেসরকারী বিল উত্থাপিত হয়েছে।

নিউ ওয়েষ্ট বেঙ্গল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সাতটি নূতন গ্রন্থাগার স্থাপন

বছর দুয়েক আগে কলিকাতার পাইকপাড়া অঞ্চলে বোর্ডের উদ্যোগে বিধানচন্দ্র রায় ছাত্র কল্যাণ আবাস ও একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত ছাত্রাবাসে ৩২ জন মেধাবী ছাত্রের নিখরচায় থাকা-খাওয়া ও পড়াশুনার ব্যবস্থা করা হয়। এ জন্যে আবাসে একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থাগার খোলা হয়েছে। আবাসের ছাত্ররা ছাড়াও স্থানীয় ছাত্রদের সকাল ও সন্ধ্যায় দীর্ঘ সময় ঐ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়ে থাকে। শেষোক্ত ছাত্রদের জন্যে নিখরচায় সান্ধ্য-কালীন জলযোগ ও ব্যায়ামের ব্যবস্থাও আছে। জানা গেল বোর্ড শীঘ্রই পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আরও ৭টি পাঠ্য-পুস্তক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করবেন। আরামবাগ, কান্দী, বসিরহাট, কৃষ্ণনগর, মেদিনীপুর, আমতা ও কালনা মহকুমায় উক্ত গ্রন্থাগারগুলি প্রতিষ্ঠিত হবে। গ্রন্থাগারগুলিতে ছাত্রীদের জন্যে কোনও ব্যবস্থা থাকবে কিনা জানা যায় নি। ইতিমধ্যে কলিকাতায় সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় যে কয়েকটি 'ডে হোম' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তার মধ্যে মাত্র দু'টিতে ছাত্রীরা পড়াশুনার সুযোগ পেয়ে থাকে। নিউ ওয়েষ্ট বেঙ্গল ওয়েলফেয়ার বোর্ড যে গ্রন্থাগারগুলি স্থাপন করছেন সেগুলিতে ছাত্রীদের জন্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রাখলে বিশেষ করে মফঃস্বলের ছাত্রীরা অত্যন্ত উপকার লাভ করবে।

পশ্চিম বঙ্গের জেলা গ্রন্থাগারিকদের উদ্যোগে নূতন সংস্থার পত্তন

সম্প্রতি পশ্চিম বঙ্গের জেলা গ্রন্থাগারিকরা পারস্পরিক সংযোগ ও কর্মসূচীর সমন্বয়ের জন্যে 'জেলা গ্রন্থাগারিক সঙ্ঘ' (Association of District Librarians) নাম দিয়ে একটি নূতন সংস্থা গঠন করেছেন। সংঘের সদস্য জেলা গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে কিনা, কার্যালয় কোথায় হবে ইত্যাদি কিছুই জানা যায় নি। সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত সংঘের কার্যক্রম নিম্নরূপ ঃ

১। প্রতি জেলায় বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সক্রিয় তথা শক্তিশালী করে তোলা ; ২। দেশের সর্বত্র সাহিত্য-রুচি সম্পন্ন জ্ঞানের বিস্তারের জন্য গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ কার্য পরিচালনা করা (আলোচনা চক্র, বক্তৃতা ও সভাসমিতির মাধ্যমে) ; ৩। গ্রন্থবিদ্যামূলক অধ্যয়নের bibliographical study) উন্নয়ন ও উৎসাহদান ; ৪। জেলা গ্রন্থাগার পরিষদগুলোকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যাপারে সাহায্য ও সহযোগিতা করা ও উৎসাহ দেওয়া ; ৫। গ্রন্থাগারিকের সত্যকার মর্যাদা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ; ৬। সমস্ত জেলায় একটি সুনির্দিষ্ট এবং সুপরিকল্পিত নীতি অনুযায়ী গ্রন্থাগার পরিচালনা করা ; ৭। জেলা গ্রন্থাগারগুলিকে গ্রন্থ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশনের অথবা তথ্য ও তত্ত্বের উৎস সম্বন্ধে সংবাদ পরিবেশনের কেন্দ্রে পরিণত করা।

সম্পাদকীয়

বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মিদের সংঘবদ্ধতা

পশ্চিম বঙ্গের জেলা গ্রন্থাগারিকগণ সম্প্রতি একটি নূতন সংস্থা গঠন করেছেন। উক্ত সংস্থার নিয়মকানুন ইত্যাদি বিশদভাবে জানা না গেলেও যে কর্মসূচী তাঁরা প্রচার করেছেন তা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মসূচীর অনুরূপ। নবগঠিত সংস্থাটি কি কেবল পনেরটি জেলা গ্রন্থাগারিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে ? যদি না থাকে তাহলে বলব গ্রন্থাগার কর্মিদের একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন থাকা সত্ত্বেও পুনরায় অনুরূপ সংস্থার সৃষ্টি বিভ্রান্তি ও বিভেদের কারণ হতে পারে। অবশ্য নবগঠিত সংস্থাটির বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের অধীনে থেকে তার কর্মতৎপরতার পরিপূরক হিসাবে কাজের কোনও উদ্দেশ্য থাকলে স্বতন্ত্র কথা। তবে জেলা গ্রন্থাগারিকদের বৃত্তিগত প্রয়োজনের দিক থেকে এরূপ সংস্থার প্রয়োজন নিশ্চয় আছে।

গত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী কর্তৃক গ্রন্থাগার কর্মিদের বেতন ও পদমর্যাদা সম্পর্কে উপস্থাপিত প্রবন্ধে পেশাদার কর্মিদের আর্থিক অবস্থার প্রতি আলোকসম্পাত ও নানাবিধ প্রয়োজন ও সমস্যার প্রতিকারের জন্যে কর্মিদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার গুরুত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগারিক বৃত্তি ইদানিং যথেষ্ট ব্যাপকতা লাভ করেছে। বিভিন্ন শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গ্রন্থাগারের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। সরকারের উদ্যোগে রাজ্যব্যাপী সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও সম্প্রসারিত হচ্ছে। তাই শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার কর্মীর সংখ্যা ও চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃত্তির সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মিদের বেতন ও পদমর্যাদার প্রশ্ন অনুভূত হচ্ছে। কিন্তু বেতনভুক গ্রন্থাগার কর্মিদের বৃত্তিগত স্বার্থের প্রতি নজর রাখা ও তার উন্নতি বিধানের জন্যে উপযুক্ত কোনও সংস্থা নেই। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি গ্রন্থাগার পরিষদগুলির আদর্শ কার্যক্রমকে যে পাঁচটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন তার একটিতে বলেছেনঃ "library association is a trade union fighting for better conditions of service of librarians…" বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ

গ্রন্থাগার কর্মিদের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে যতই সচেষ্ট হোন না কেন তাঁদের পক্ষে নিছক বৃত্তি সম্পর্কিত কার্যকলাপে সীমাবদ্ধ থাকা সম্ভব নয় বা বৃত্তির প্রশ্নে পুরোপুরি ট্রেড ইউনিয়নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়া যথেষ্ট অসুবিধাজনক। পেশাদার কর্মিদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সমস্যাও বেড়ে চলেছে। সেজন্যে তাঁদের নিজস্ব প্রয়োজনের তাগিদে একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

একদিকে সংখ্যায় অল্প অপরদিকে সংঘবদ্ধ না হওয়ায় সমাজের অন্যান্য বৃত্তিকুশলীদের ন্যায় গ্রন্থাগারিক বৃত্তি যথোচিত মর্যাদা ও স্বীকৃতি লাভ করেনি। অবশ্য বক্তৃতামঞ্চে গ্রন্থাগারিকদের সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে গালভরা আদর্শের কথা শোনানো হয়, পেট তাদের ভরছে কিনা তার খবর না রেখে। জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকরা নির্দিষ্ট বেতনে নিযুক্ত হন, তাঁদের বেতনবৃদ্ধি বা বেতন হারের কোনও প্রশ্নই কর্তৃপক্ষ বিবেচনা করছেন না, পল্লী গ্রন্থাগারিকরা বেতন পান অল্প এবং তার জন্যে অপেক্ষা করতে হয় মাসের পর মাস; যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মীরা কবে 'কনফার্মড' হবেন? জাতীয় গ্রন্থাগারের 'জে, আর, এ' শ্রেণীর কর্মীরা যে বেতন পান তা কি অসঙ্গত নয়? বই খোয়া যাওয়ার প্রতিকার হিসাবে গ্রন্থাগারিকের কাছ থেকে অনেক ক্ষেত্রে জামানত চাওয়া হয়; গ্রন্থাগারিককে দিয়ে গ্রন্থাগারের ছাড়াও অন্যান্য কাজও করানো হয়; গ্রন্থাগার কমিটিতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারিকের স্থান নেই কেন? উপরওয়ালারা গ্রন্থাগারিকের মান ও মর্যাদা অবনত করেন, গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদানের জন্যে ছুটি ও যাতায়াত খরচ বহু ক্ষেত্রে না দেওয়ার কারণ কি? এ সব প্রশ্ন ছাড়াও অন্যান্য সমস্যাও আছে। প্রয়োজনের অনুপাতকে অতিক্রম করে যে হারে শিক্ষণপ্রাপ্ত বৃত্তিকুশলী সৃষ্টি হচ্ছে তাতে demand ও supply-এর সরল নিয়মে নিয়োগ কর্তারা অবশ্যই তার সুযোগ নিয়ে সস্তায় মাথা কিনতে পারবেন। সেজন্য গ্রন্থাগারিক বৃত্তির একটা বিরাট সংকটের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। উপায় হিসাবে অনতিবিলম্বে গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। এবং বিধিসম্মত নানা প্রণালীতে বৃত্তি সম্পর্কিত সকল প্রয়োজন ও সমস্যার প্রতিকারের জন্যে সচেষ্ট হতে হবে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিম বঙ্গের 'লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী' পরিষদ কর্তৃক সংকলিত হইতেছে; কিন্তু পরিষদ হইতে রিপ্লাই পোষ্ট কার্ড পাঠানো সত্ত্বেও অদ্যাবধি বহু লাইব্রেরী স্বীয় তথ্যাদি প্রেরণ করেন নাই। এতৎসহ প্রদত্ত এই ফর্মটি ভর্তি করিয়া তাঁহাদের অবিলম্বে ফেরৎ দিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

প্রবীর রায়চৌধুরী
সহ-সম্পাদক

---

1. Name of the Library.
2. (a) District ; (b) Sub-division ; (c) Police Station ; (d) Village/Locality/Premises No. & Street/Lane etc ; (e) Post Office.
3. Year of foundation.
4. (a) Whether owned/rented house ; (b) No. of rooms ; (c)Total floor space.
5. Whether managed by Government/Parent body/Trust/Committee.
6. (a) Whether Free/Subscription ; (b) Whether readers are allowed to choose their books directly from the shelves.
7. Total No. of (a) Books ; (b) Bound periodicals (c) Periodicals received (i) By subscription (ii) From other sources.
8. Any special arrangement for (a) Ladies ; (b) Children ; (c) Any other special service.
9. (I) Whether catalogue is in (a) Book/Sheaf Card form ; (b) Printed/Manuscript form ; & (c) of Dictionary/Classified nature. (II) Whether books are classified ; (b) Classification scheme. (III) (a) No. of Staff ; (b) Whether the Librarian is (i) Trained, (ii) Paid.
10. (a) Working hours ; (b) Weekly holiday on ; (c) Rate of (i) Subscription, (ii) Deposit ; (d) No. of members ; (e) No. of borrowers (average annual) ; (f) No. of readers (average annual) ; (g) Total No. of issues (annual).
11. Accounts (April, 1959 to March, 1960) :
    (I) Income ; (a) Subscription ; (b) Endowment ; (c) Grant ; (i) Municipality/Corporation ; (ii) District Board ; (iii) Union Board ; (iv) Government ; (v) Other sources.
    (II) Expenditure ; (a) Books ; (b) Periodicals ; (c) Binding ; (d) Salaries ; (e) Other heads.
12. Name of (a) President ; (b) Secretary ; Librarian.

Last Annual Report to be sent separately.

(Please Write Clearly. 1 & 2 in Block Letters)

*Strike out the portion not required

1.- ______________________________

______________________________ *(Regd/Not Regd)

2. (a)- -(b)-

(c) - -(d)-

-(e)-

– 3.-

4. *(a) Owned/Rented (b)______________(c)–

*5. Government/Parent body/Trust Committee

*6. (a) Free/Subscription ; (b) Yes/No

7.(a)______________________(b) ________

(c) (i)__________ -(ii)-

8 *(a) Yes/No ; *(b) Yes/No ; (c)-

9. (I) *(a) Book/Sheaf/Card ; *(b) Printed/Manuscript ;

*(c) Dictionary/Classified

(II) *(a) Yes/No ; (b) ______________

(III) (a) ______________ ; (b) *(i) Yes/No *(ii) Yes/no

10. (a) __________ to ______________ ; (b)__________

day ; (c) (i) Rs- (ii) Rs-

(d) ________ – (e)-

(f)________ – (g)-

11. (I) (a) Rs___ , (b) Rs

(c) (i) Rs– ; (ii) Rs-

(iii) Rs___ (iv) Rs-

(v) Rs___ ,

(II) (a) Rs___ (b) Rs-

(c) Rs –- (d) Rs-

(e) Rs ___

12. (a) Sri______

(b) Sri ______

(c) Sri______

Signature.

Date Seal

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আষাঢ় ১৩৬৭

পাঠকের দায়িত্ব

দীপেন্দ্রকুমার সান্যাল

কথামালায় পড়া গেছে ব্যাং-এর যখন দুঃসময়, তখন ঢিল ছোঁড়ায় উন্মত্ত বালকদের ছিলো সুসময়! বাংলাদেশেরও আজ যখন দুঃসময় তখনই দেখছি বাঙলা-সাহিত্যের অ্যাং-ব্যাং লেখকদের চরম সুসময়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ই বাঙলাদেশের কৈশোর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে প্রথম দেখলো পথের উপর সেইসব কাণ্ড দিনের আলোয় ঘোটতে, যা বর্ণনারও অতীত লজ্জার। যুদ্ধ এক সময় থামলো, বিদায় নিলো খাকীরা। কিন্তু দাগ বোসে গেল কিশোরমনে। চিরকালের মতো ভেঙেচুরে গেলো যা কিছু শ্রদ্ধার—তার ভিত। এবং তার সুযোগ নিলো বোম্বাই সিনেমা। সিনেমার চটুল সুর—সুড়সুড়ি দেওয়ামাত্র, হুড়মুড় কোরে ভেঙে পড়লো প্রেক্ষাগৃহের সামনে তারাই, যাদের এই দুষ্কর্মের পীঠস্থান থেকে থাকা উচিত ছিলো শতহস্ত দূরে।

সিনেমা থেকে সাহিত্যের আঙিনায় এখন পা বাড়াচ্ছে এই পাপ। সাহিত্য আজ আর নেশা নয়, পেশা। পেশাদার লেখক চাইছে সস্তায় কিস্তিমাত কোরতে। চাইবারও কথা। পাঠককে পেষাই যে লেখকের একমাত্র পেশা হোয়ে দাঁড়িয়েছে আজ, তার প্রধান কারণ সস্তায় কিস্তিমাতের পেছনে প্রচণ্ড উস্কানি রোয়েছে প্রকাশকের। প্রকাশক বোলছে, যে বইএর সংস্করণ সাতদিনে হয় সে বই-ই শুধু বই। তার লেখকই শুধু লেখক। এইভাবে জাল লেখক এবং ভেজাল প্রকাশকে ছেয়ে গেছে কিতাবপট্টি। জাত লেখকদের দিন গেছে, এসেছে বজ্জাত লেখকদের সুদিন। একদিন পকেটকাটা ছিলো যার পেশা, তারও আজ 'যখন পকেটমার ছিলাম' বোলে বই লিখতে বাধা নেই। সে বই

এদেশের সাপ্তাহিকে, মাসিকে ধারাবাহিকভাবে আত্মপ্রকাশ কোরতে নেই অসুবিধে এবং ঝকমকে মলাটে বিক্রি হোতেও অনন্ত সুবিধা আজ-সকল সম্ভ্রান্ত দোকান থেকেই।

জাল লেখক এবং ভেজাল প্রকাশকের সোনায়-সোহাগা যোগাযোগ ঘোটেছে লাইব্রেরীর কৃপায়। পাড়ায়-বেপাড়ায়, অফিস-পাড়ায়, স্কুল-পাড়ায়, কলেজ-পাড়ায় গোড়ে ওঠা লাইব্রেরী—গৌরী সেনের টাকায় আজ ছিনিমিনি খেলতে বোসেছে। এতো টাকা তাদের হাতে এসেছে যে, যেকোন বই বেরুনো মাত্রই তারা এক অথবা একাধিক কপি বিনাবিচারে নিয়ে এসে ঘর সাজাচ্ছে। প্রকাশক তাই দেখছে যে, যে কোনো বই কেবলমাত্র লাইব্রেরীর কৃপায় প্রথম সংস্করণের গিরি লঙ্ঘন কোরছে অতি দ্রুত। ফলে যারা কোনোদিনো পুস্তক প্রকাশনা কি বস্তু জানতো না তারা আজ ঘর ভাড়া নিচ্ছে কিতাবপট্টিতে। যারা কোনোদিন নিজের কলমে একখানা পোস্টকার্ডও পুরো লেখেনি তারাও নাম লেখাচ্ছে 'রাইটার্স ক্লাবে'।

লাইব্রেরীর পরেই বিয়েবাড়ি। নতুন বই, নতুন বউএর হাতে তুলে দেওয়ার কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, উন্নতরুচি এবং অর্থ একসঙ্গে রক্ষা করা সম্ভব দেখে, লোকে বউভাতকে বইভাত জ্ঞান কোরে কৃতার্থ। বিয়ের বাজার কোরতে আজ তাই বইয়ের বাজারেও একবার যেতে হয়। আর যেতে হয় বোলেই প্রকাশক বিয়ের তারিখ বুঝে বই ছাড়ছে, নতুন বইকে নতুন বউএর মতই সাজিয়ে বার কোরছে এবং লেখককে বইএর বিষয় যাই হোক বইএর নাম প্রিয়াদের পছন্দসই দিতে বাধ্য করাচ্ছে। চকচকে মলাট, ঝকঝকে ছাপা, বিয়ের মাসে, বইএর বাজারে আর মাছের অথবা মিষ্টির বাজারে তফাত নেই আর। লগনশা সর্বত্র। এই বউভাত উপলক্ষ্যে একই বইএর ভাগ্যে কখনও কখনও বারবার ছিঁড়ছে বইভাতের শিকে। এমন কি কোনো কোনো বিয়েবাড়িতে ঢোকবার মুখেই নোটিশ ঃ অমুক বই এতোগুলি পাওয়া গেছে ; দয়া কোরে আর কেউ বই দেবেন না। নতুন বউএর বাক্সর মধ্যে নতুন বই প্যাক হোয়ে চোলে যায় শ্বশুরবাড়ি। সেখানে বহুদিন বাক্সবন্দী থাকে, কখনও কখনও পাড়াপড়শীর হাতে উধাও হয়। প্রায়ই পড়া হয় না। পড়া হোলেও, একই বই এতো বেশী বউভাতে পড়ে যে, ভালো বই পাতে পড়ার অযোগ্য বিবেচিত হয় প্রকাশকের দৃষ্টিভঙ্গীতে। অন্যদিকে লাইব্রেরীতেও কখনও কখনও টাকা পর্যাপ্ত এবং বাঙলা বই অপর্যাপ্ত হওয়ায় একই বই তিনচারখানা কোরে কিনে উদ্বৃত্ত অর্থ

অপচয় হয়। ফলে, বাঙলা বইয়ের বিক্রি বাড়ে কিন্তু পাঠক বাড়েনা সেই হারে। বিশ্বের বইয়ের জগতে এমন বিস্ময়কর দুর্ঘটনা বাঙলা বই-ই ঘটাবার কারণ হোলো।

কিন্তু এতে আমার আপত্তি খুব সোচ্চার নয়। নয় তার কারণ বাঙলা বইয়ের বিক্রি বাড়াই বাঙালী লেখকদের এখন সবচেয়ে জরুরী প্রয়োজন। 'কল্লোল' পত্রিকার অকালে লেখকমাত্রই গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যে নির্ভর কোরতে বাধ্য হোতেন লেখা ছাড়া অন্য যা কিছুর ওপরই। এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রেই আজ প্রমাণ হোয়ে গেছে যে, নেশার দিন চলে গেছে, তার বদলে এসেছে পেশার দিন। যে খেলায় বড় হোতে চায় তাকে খেলতে হবে সারাদিন; যে লেখায় বড় হোতে চায় তাকে লেখা নিয়েই থাকতে হবে কেবল। তাই লেখা যদি বাঙালী লেখকদের গ্রাসাচ্ছাদন জোগাতে পারে, তা সে লাইব্রেরীই হোক আর বিয়েবাড়ির কল্যাণেই হোক তাকে সানন্দে স্বাগত জানাতে আমার অকুণ্ঠ উৎসাহ।

নিরুৎসাহ বোধ কোরছি আমি সম্পূর্ণ অন্য কারণে। নিরতিশয় অবসাদ আচ্ছন্ন কোরেছে আমার মন সম্প্রতি। নিরুদ্বেগ না থাকবার কারণ ঘোটে গেছে অন্যত্র। তীর এসেছে অন্যদিক থেকে। লেখার জন্যে টাকা পাবে লেখক, যথেষ্ট টাকা পাবে এতে কার আপত্তি টিঁকবে? বরং তাই-তো হওয়া উচিত। সেটাই তো সংগত। সেই তো শোভন। সেই হচ্ছে সমীচীন। কিন্তু লেখার জন্য টাকা এবং কেবল টাকার জন্যই লেখা—এ দুই কোন কালেই এক নয়; পৃথিবী জুড়েই লেখকের উপন্যাস সিনেমা হোয়েছে এবং লেখক তার জন্যে পেয়েছে পারিশ্রমিক। এ দেশেও তার ব্যত্যয় হবে কেন? সে রকম উপন্যাস লেখা হোয়েছে বোলেই সিনেমা সম্ভব হোয়েছে এতকাল। কিন্তু উপন্যাসের জন্যে সিনেমা আর সিনেমার জন্যেই শুধু উপন্যাস রচনা কি এক? না। সিনেমার লেখক আর সাহিত্যের লেখক কোনোদিনও এক ছিলো না। এক হয়নি। আজ কিন্তু তারা এক নয় শুধু, একাকার হোতে বোসেছে! সিনেমার জন্যে নয়, সিনেমার কাগজের জন্যে।

সিনেমার কাগজই আজ বহুবিক্রীত বাঙলা কাগজ। সাহিত্যকেও সে আর অবিকৃত থাকতে দিতে রাজী নয়। সে জানে, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না। টাকা ছড়ালে লেখকেরও। বিশ পাতার যে কোনও রচনাকেই তাই উপন্যাস বোলে চালাতে দিতে আপত্তি আছে এমন লেখকের সংখ্যা খুব কম।

যে দু-একজনের মুখে ক্ষীণ প্রতিবাদ শোনা যায়, তৎক্ষণাৎ তাকেও মোটা টাকার মরীচিকায় নিয়ে গিয়ে মজাতে মুহূর্তমাত্র। এককালে শুধু লেখারই মুখ-বন্ধের প্রয়োজন হোতো; এখন লেখকেরও মুখবন্ধের প্রয়োজন হোচ্ছে। লেখার মুখবন্ধ রচনা করেন লেখক নিজেই; বইয়ের গোড়াতে লিখে দেওয়ার প্রয়োজন ঘোটতো আগাগোড়া বইয়ের দুরূহ বিষয় সম্বন্ধে পাঠককে প্রস্তুত করবার কারণেই। এখন লেখকের মুখ বন্ধ করে সিনেমা কাগজের মালিকরা টাকা দিয়ে। যে লেখকের বাজার আছে, বাজারে সে যাতে সিনেমার কাগজে লেখার বিরুদ্ধে একটি আওয়াজ না তুলতে পারে সেই কারণেই তার চোখের ওপর চলে এই কালোটাকার কুচকাওয়াজ। তারপর এক সময়ে তার আর টাঁ ফুঁ শোনেন না। বরং সে তখন বোলে বেড়ায়, সাহিত্যের কাগজ আমাকে কি দেয় এমন? তারচেয়ে সিনেমার কাগজ আমাকে ঢের বেশী দেয়। এই দেওয়ার-নেওয়ার রাস্তাতেই সিনেমার কাগজের প্রেমে সাহিত্যের ইন্দ্রপতন আজ আর বিরল নয়, হামেশাই ঘোটছে।

এর জন্যে সিনেমার কাগজের মালিককে দোষ দিয়ে লাভ নেই। সে চাইবেই তার কাগজের বিক্রি বাড়ুক এবং বাড়াবার জন্যে যদি শুধু হিরোইনের সায়া দেখিয়ে না হয় তাহোলে সাহিত্যের যাঁরা মেসায়া বর্তমানে তাঁদেরও ডাক পাড়ো। মনোহারিণীদের ছবির সঙ্গেই তিনখানা উপন্যাস ছাপো। যাতে লেখা যায় এ কথা যে, এই উপন্যাসগুলি বই হোয়ে বেরুলে তার প্রত্যেকটার দাম যা হবে তার চেয়ে অনেক কমে সবকটা উপন্যাস প্লাস হিরো-হিরোইনের চুলের বিন্যাস এই একখানা কাগজেই মাত্র পাবেন। অতএব......!

দোষ সেই লেখকের যিনি নিজেকে বিক্রি কোরছেন এই বিকৃতির পায়ে। শুধু টাকার জন্যে লিখলেও, বলার ছিলো না, যদি সেগুলি উপন্যাস হোতো বা উপন্যাস হবার এতোটুকু চেষ্টা থাকতো সেগুলির। তার চেয়ে বেশী টাকা নিয়ে সবচেয়ে নিকৃষ্ট রচনা দেবার কারণেই লেখকেরা ঘৃণার পাত্র, কেবল করুণার পাত্র নয় আর। শুধু তাও নয়, এতে শেষ পর্যন্ত কিন্তু ঠকছেন লেখকরা— কারণ, একখানা উপন্যাস যখন ধারাবাহিকভাবে মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয় তখন সে লেখা অনেকপ ঠিক পাঠিকাই বই হোয়ে বেরুলে একসঙ্গে পড়বার অপেক্ষায় থাকেন। তাতেই মাসিকে বেরুতে বেরুতে যদি কানাকানি হোতে থাকে যে লেখাটি ভালো হোচ্ছে তাহোলে বই হোয়ে বেরুলে তার বাজার আছেই। কিন্তু এক্ষেত্রে সিনেমার কাগজে একসঙ্গে একসংখ্যায় পুরো বইটি বেরুবার ফলে

সিনেমার কাগজের বিপুল পাঠিকা সেটি পড়ে ফেলেছে এবং বই হোয়ে বেরুবার পর লাইব্রেরীকে বাধা দিচ্ছে বই কেনায় উৎসাহিত হোতে। কিন্তু আজকের পেশাদার বাঙালী লেখক এতো দূর চিন্তা কোরতে পারলে ল্যাঙটপরা অবস্থায় আত্মপ্রকাশ কোরতে পারতো না এসব কাগজে। নগদ বিদায়ের ব্যাপারে বাঙালীতে আর কাঙালীতে আজ তফাৎ কোথায়? কাঙালী বিদায়ের অপর নামই তো আজ বাঙালী (লেখক থেকে সব) বিদায়।

আজকের পেশাদার বাঙালী লেখক আর সৎ থাকছে না। বাঙালী প্রকাশক আর সৎ নেই। এই অসৎ লেখক-প্রকাশকের দলকে সায়েস্তা করবার জন্যেই দেশে-দেশে কালে-কালে প্রয়োজন সৎ সমালোচকের। কিন্তু আজ রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে যেমন নেতা নেই একজনও; আছে অভিনেতা, তেমনই আজকে এদেশে সমালোচনা হোচ্ছে আসলে সেই বস্তু; শিবরাম চক্রবর্তীর উক্তিতে, 'যার মধ্যে আলোর ভাগ অল্প, চোনার ভাগ বেশী।' সমালোচনার নামে এখন দেশের এবং দলের হোলে তার জয়গান, না হোলে তার সম্বন্ধে হয় কটূক্তি—নয় সাহিত্য-সমালোচনা যা হয় তা আরও ভয়াবহ। কোনো কোনো লেখক নিজেই নিজের সমালোচনার নামে নির্লজ্জ আত্মপ্রশংসা লিখে নিয়ে গিয়ে ছাপিয়েছে—এর নজীর কিতাবপট্টিতে এমন কেউ নেই যার অজানা।

সৎ সমালোচক যদি বা কেউ থাকেন, তিনি সমালোচনার কালে সততা অবলম্বন কোরলে এদেশের কাগজে বেশীদিন আর থাকেন না। সৎ সমালোচক কাকে বলে, সেটা এখানে জনান্তিকে বোলে রাখা দরকার। সমালোচক নামে বাঙলাদেশে একদল আছেন যাঁরা গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। সাহিত্যের স্বাস্থ্যরক্ষার অনাবশ্যক দায় এঁরা নিজেরাই নিজেদের ওপর ন্যস্ত কোরেছেন! এঁরা সমালোচক নন, এঁরা আসলে সাহিত্যের শনি। এঁদের মাথায় সরস্বতীর অভিশাপের অশনিপাত আসন্ন হোয়ে এসেছে। সমালোচনার ধর্ম হোচ্ছে সাহিত্য থেকে মন্দটুকুকে ছেঁকে, ভালোকে আলোয়ে বেরুবার পথ কোরে দিয়ে সত্যিকারের সৎ লেখা দেশব্যাপী আলোচনার জন্যে প্রস্তুত করা। কোনো বই অশ্লীল হোয়েছে অতএব তা সাহিত্য হয়নি—এ যে বলে, সে সমালোচক নয়। যে সমালোচক, সে বলে, এর বদলে, অমুক বই সাহিত্য হয়নি অতএব অশ্লীল। যোগ্য অথচ অবহেলিত লেখাকে তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে অযোগ্য অথচ পুরস্কৃত লেখার মুখোস খুলে ধরাই সমালোচকের ধর্ম। সমালোচকের অপর কোনো ধর্ম নেই। সবই তার পক্ষে পরধর্ম এবং ভয়াবহ। স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়, এই হোচ্ছে সমালোচকের সবল ধর্মবিশ্বাস।

এই সমালোচকের সিংহাসন আজ শূন্য। তার দায় আজ পাঠককে তুলে নিতে হবে নিজের দায় বোলে। সততার শুল্ক সাহিত্যের কাছ থেকে আদায় কোরতে হবে আজ পাঠককে। জাতসাহিত্যের জয়ধ্বজা বহন কোরতে হবে তাকেই। স্যহিত্যে শুধু লেখকেরই দেয় নেই; পাঠকেরও আছে। উপাদেয় সাহিত্যের জন্ম-লালন এবং বাড় নির্ভর করে শুধু লেখকের উপর নয়, পাঠকেরও ওপর। 'পথের পাঁচালী'র মত ছবি দেখাবার জন্যে চাই উত্তম প্রদর্শক যেমন, তেমনই দেখবার জন্যে চাই যথেষ্ট দর্শক। ভালো বই লেখে যে—সেই লেখক। ভালো বই যে লেখায়—সেই হোচ্ছে পাঠক।

আমি জানি, আমি জানি যে, পাঠকমাত্রই প্রশ্ন তুলবেন যে, তাঁরা কি ভাবে এই দুরূহ গুরুভার বহন কোর্তে সক্ষম। যদি এই প্রশ্ন একজন পাঠকের মনেও জাগাতে পারি তা হোলেই এ রচনা তখন আর রম্যরচনা নয়; এ রচনার তখনই, তৎক্ষণাৎ জন্ম সার্থক। কারণ আমি জানি, প্রশ্নের অঙ্কুর থেকেই একদিন সমাধানের সজীবতার আবির্ভাব ঘটে উত্তরকালে। যদি কোনো পাঠক বলেন যে তাঁরা দুচারজন অবহিত হোলে বা আপত্তি জানালে শুনছে কে, তাহোলেও আমি বোলবো আমি জানি, আমি জানি এ উক্তি সত্য নয়; আমার বক্তব্যই প্রণিধানযোগ্য। দুচারজন লোক ঘরে বোসে একদিন যা ভাবে তাই তো একদিন ঘরে-বাইরে দেশসুদ্ধ লোককে ভাবায়। দুচারজন লোক একদিন ইংরেজের শিকল কাটার কথা ভেবেছিলো বোলেই আজ ইংরেজ রাজত্বের সূর্য শেষ পর্যন্ত পাটে বোসতে বাধ্য হোলো।

বাঙলা বইএর পাঠক এখনও মূলতঃ লাইব্রেরীর পাঠক। বাঙলা বইয়ের বৃহত্তম ক্রেতা আজও লাইব্রেরী। কিন্তু বই বেরুনো মাত্র বিনা বিচারে, নির্বিচারে সমস্ত বই-ই কিনতে যে পারে সেই শুধু লাইব্রেরী,—লাইব্রেরী সম্পর্কে এর চেয়ে বড় লাই আর কি হোতে পারে। লাইব্রেরীর কাজ কেবল বইএর লিস্ট তৈরী করা নয়; পাঠক তৈরী করাও বটে। এই লাইব্রেরী-সভ্যদের গড়তে হবে পাঠক-চক্র। কেবল মাত্র দর্শনধারী পুস্তককে কেটে কুচি কুচি কোরতে পারে পাঠ-চক্র নয়, সুদর্শন চক্র।

বাঙালী লেখক আজ ললাটনির্ভর। বাঙলা বই মলাটনির্ভর। বাঙলা বইয়ের মলাটে আজ মাদুর, বালি, রাঙতা, মখমল, ছাপাশাড়ির মত ফ্লুরেসেণ্ট প্রিণ্টিংএর ছাপ কিছুই বাদ নেই। বরবাদ হোয়ে গেছে শুধু ভেতরের বস্তু। কিন্তু যা চকচক করে তাই যেমন সোনা নয়, তেমনই যার মলাট ঝকঝক করে

তাই-ই কিছু বই নয়। অথচ এই মলাটটুকুর জন্যে বইয়ের দাম একটাকা বেশী দিতে হোচ্ছে লাইব্রেরীকে, ছ মাসের আগেই যে মলাট খোসে গিয়ে দপ্তরীর হাতে যার চিরন্তন লাইব্রেরী মোড়ক ফিরে আসছে আবার। এই অতিরিক্ত দাম কেন দেবে লাইব্রেরীর সভ্য, কোনো পাঠক কখনও কি এ প্রশ্ন তুলেছে? না। তোলেনি। তোলেনি, তার কারণ আজকে জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিবাদ জানাতে বিস্মৃত হোয়েই জীবিকার প্রতিযোগিতা থেকে বরবাদ হোয়ে যাচ্ছে যে সেই বাঙালী। সাধক-কবি রামপ্রসাদ গান বেঁধেছিলেনঃ 'আবাদ কোরলে ফলত সোনা'। আজ বাঙালীর দুর্দশা নিজের চোখে দেখে যেতে পারলে নূতন কোরে গান বাঁধতেন তিনি। 'আবাদ কোরলে ফলতো সোনা', নয়, তিনি এখন গাইতেন; প্রতিবাদ কোরলে ফলতো সোনা।

জীবনের আর আর ক্ষেত্রের সংগে কখনই এক নয় বই। বইএর জগৎ হোচ্ছে আসলে জীবনের কুরুক্ষেত্র। এবং জীবনের কুরুক্ষেত্রে যোগ্যের সংগে অযোগ্যের নয়, কর্ণের সংগে অর্জ্জুনের যুদ্ধ হয় কেবল। এখানে শিখণ্ডীকে খাড়া করা যায় কিন্তু তার দিকে তীর ছোঁড়া যায় না। জীবনের কুরুক্ষেত্রে অর্জুনের রথ চালাবার জন্যে শুধু সারথিতে চলে না, তাকেও পার্থসারথি হোতে হয়। তেমনই বই লিখলেই যেমন একজন লেখক নয়, তেমনই বই প্রকাশ করে—মাত্র এই কারণেই একজন প্রকাশক নয়। (ধনী দপ্তরী আর প্রকাশকে কিতাবপট্টিতে আজ তফাত কোথায়?)। ঠিক এমনই, সব বই রাখে বোলেই তা লাইব্রেরী নয়, বই পড়ে বোলেই একজন পাঠক নয় যেমন।

প্রকাশক হচ্ছে সেই, যে শুধু বই নয়, বইএর লেখককেও প্রকাশ করে। পুস্তক প্রকাশ করা তার একমাত্র করণীয় নয়। পুস্তক-রচয়িতার আত্মপ্রকাশের রাজপথ প্রশস্ত করা তার আরও বড় কাজ। নবীন লেখক সে নয় যে নতুন লিখতে আরম্ভ কোরেছে। নবীন লেখক সে-ই, যার লেখা নতুন জাতের। লাইব্রেরী নয় তা কিছুতেই, যে বই কিনে তবে পড়ে; লাইব্রেরী হোচ্ছে সেই—যে বই পড়ে তবে কেনে। পাঠক হচ্ছে সেই—যে ভালো বই পাঠ করে এবং মন্দ বই লোপাট কোরতে সাহায্য করে।

এখানে ভালো বই বোলতে অনেকে ধর্মপুস্তক মনে করে, মন্দ বই বোলতে বোঝে গোয়েন্দা-পুস্তক। আমি তা বুঝি না। কারণ এদেশে যত অধর্ম ধর্মপুস্তকের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করে, এত আর কোনো বইএর বেলায় করে না। বরং আমি যা বুঝি তা হোচ্ছে আধ্যাত্মিক বইও লেখার দোষে অত্যন্ত অপাঠ্য

হোতে পারে। আবার গোয়েন্দা-পুস্তকও লেখার গুণে সুন্দর হয়। তাই লাইব্রেরীতে ডিটেকটিভ বই না রাখা অত্যন্ত ডিফেকটিভ নির্বাচন-পদ্ধতি। লাইব্রেরীতে রহস্য-উপন্যাসের সঙ্গেই, একসঙ্গেই যে উপন্যাস জীবন-রহস্যের অতলে ডুব দিতে চায় তাও থাকবে, অর্থাৎ কেনার পর র‍্যাকেই পড়ে থাকবে না। প্রত্যেক সভ্যেরই রহস্য-উপন্যাসের মতই, জীবনরহস্যের অতলে ডুব দেওয়া উপন্যাসও পড়া থাকবে।

বাঙলাদেশের কোনো কাগজেই রিভিউ হয় না, তার কারণ রিভিউ করবার জন্যে সমালোচকের নিজস্ব ভিউ থাকা উচিত। বর্তমানে কারুর যদি সে ভিউ থাকেও ত তার সঙ্গে কাগজের মালিকের ভিউ পয়েন্ট মিলবে না। কাজেই লাইব্রেরীর পাঠক-চক্রকে নিজেদের মত গড়ে তুলতে হবে, অপরের অভিমত ভিক্ষে করার বদলে। এইখানেই একটা কথা পরিষ্কার কোরে বলা দরকার। বাঙলা ছবি যেমন সুচিত্রা-উত্তম ছাড়া অচল, বাঙালী লেখকদেরও দেখেছি একটি কি দুটি সাপ্তাহিক মাসিক ছাড়া গতি নেই। কারণ এখন এমন হোয়েছে যে, এই সাপ্তাহিক এবং মাসিকে লেখা ছাপালে তবেই আপনি লেখক। এখানে লেখা বেরুলে তবেই তার প্রকাশক পাওয়া যাচ্ছে এবং নামকরা প্রকাশক ছাপলে তবেই তা লাইব্রেরী মারফত পাঠকের কাছে পৌঁছুতে পারছে এবং এই সব কাগজে তবেই সমালোচনার নামে যা-তা সার্টিফিকেট ছাপা সম্ভব হোচ্ছে।

এরই বিরুদ্ধে, এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানাতে হবে পাঠক-চক্রকে। বোলতে হবে ওই একটি কি দুটি যা ছাপে তাই লেখা নয়; বোলতে হবে ঐ সব লেখা নামকরা প্রকাশক বার কোরেছে বোলেই তা বই নয় এবং যেহেতু লাইব্রেরীতে সরকারী সাহায্য যে পরিমাণ নতুন বইয়ের সংখ্যা সে পরিমাণ নয়, সেহেতু বাজারে যে বই বেরুক তা কিনতে হবে এমন কোনো কথা নেই। নামকরা লেখকের বদনাম করার মত বই বেরুলে তার প্রকাশককে জানাতে হবে; যে কাগজে প্রকাশিত সেখানে চিঠি দিতে হবে। অযোগ্য বইয়ের উচ্ছ্বসিত প্রশংসার প্রতি নির্মম পত্রাঘাত কোরতে হবে সমালোচনাকারী কাগজেই। তারই সঙ্গে হঠাৎ এমন কোনো বই যদি হাতে এসে পড়ে যা তথাকথিত খ্যাতনামা লেখকেরই নয়, যা অখ্যাত কাগজে এবং অবজ্ঞাত প্রকাশক কর্তৃক পরিবেশিত যদি তার মধ্যে কোনো বস্তু থাকে তবে তা সর্বসাধারণের গোচরে আনবার জন্যে সক্রিয় হোতে হবে পাঠক-চক্রকে। লাইব্রেরীতে কেনালেই

হবে না কেবল, পড়াতে হবে সকলকে। আজকের দিনে নকলের বিরুদ্ধে বাঁচতে হোলে আসলেরই বিজ্ঞাপন দরকার বেশী।

সরকারী পুরস্কার যেমন সাহিত্যিককে উৎসাহ দানের জন্যে, পাঠক-চক্রের প্রয়োজন সাহিত্য-তিরস্কারের জন্যে। সাধু সাহিত্যকে পুরস্কার যেমন কর্তব্য, তেমনই সাহিত্যে এবং সাহিত্যিকের মধ্যে যা অসাধু তাকে সাধুবাদ না দিয়ে তিরস্কার দেওয়াও অবশ্য কর্তব্য। একই বই, নাম পাল্টে নতুন বই বোলে চালাবার অপচেষ্টা; একই নামে বিভিন্ন বই প্রকাশ করার দারিদ্র্য, বড় গল্পকে উপন্যাস বলে চালাবার জন্যে পাতার চারপাশে অতিরিক্ত ফাঁক দেওয়ার ফাঁকি, ভেজাল সংস্করণের ধোঁকাবাজি—এসবেরই বিরুদ্ধে সজাগ হোতে হবে আজ সমালোচকের অভাবে পাঠককেই। সরকারী পুরস্কার দেশের চক্রান্তে, দলের চক্রান্তে, অযোগ্য পাত্রে অর্পিত হোলে তার বিরুদ্ধেও দ্বিধাহীন প্রতিবাদ সোচ্চার করে তুলতে হবে।

যদি বলেন যে প্রতিবাদ পত্রস্থ কোরবে কে, তাহোলে বলি, প্রতিবাদ যদি তেমন মোক্ষম হয় তাহোলে পত্রস্থ করবার মত পত্রিকা না থাকলে নতুন পত্রিকার জন্মলাভ হবে। সেদিন দূরে—কিন্তু অনেক দূরে নয়।

[সুন্দরম পত্রিকার সৌজন্যে মূল-প্রবন্ধের অংশ বিশেষ প্রকাশিত।]

সুপাঠক

সাধন চট্টোপাধ্যায়

সম্প্রতিকালে বাংলাদেশে সত্যিকারের পাঠকের সংখ্যা অতীব বিরল। যাকে একটি কথায় অভিহিভ করা যেতে পারে 'সুপাঠক' নামে। সুপাঠকের সংখ্যা অতীব নগণ্য না হলে সম্প্রতিকালে বাংলা ভাষায় (?) যে সব বদহজমি সাহিত্য (?) প্রকাশিত হচ্ছে সে-সব সাহিত্য প্রকাশে প্রতিরোধের ধ্বনি শ্রুতিগোচর হোতো। সুপাঠক তাদেরকেই বলব যারা প্রকৃত সাহিত্য প্রচারে সহায়ক এবং নিকৃষ্ট সাহিত্য প্রসারে প্রতিবন্ধক হবেন। সত্যিকারের পাঠক তাদেরকেই বলব যারা বাংলা ভাষায় অবশ্য প্রকাশিতব্য পুস্তক সম্পর্কে প্রকাশকদের সচেতন করবেন এবং যে সমস্ত প্রকাশক রদ্দি আর নোংরা সাহিত্য প্রকাশ করে

বুক ফুলিয়ে প্রকাশকের সম্মান দাবী করছেন তাদের বাক্ রোধের আশু ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন তাদেরকেই সুপাঠক বলব। সুলেখক, সুকবি, সুসাহিত্যিক, সুগায়ক প্রভৃতির সম্মানের আসনে অলঙ্কৃত করতে কুণ্ঠা বোধ করি না তখন এইরূপ বিশেষ রূপ বিশেষণ থেকে কেন পাঠকদের বঞ্চিত করব?

তাই আবেদন বাংলা দেশে সুপাঠকের দায়িত্ব গ্রহণ করতে তরুণ, যুবা, প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধ নির্বিশেষে অগ্রসর হতে তৎপর হোন।

বাংলা ভাষায় কিছু কিছু উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে, এটা আশার কথা। ঊনিশ শতকের শেষাংশে বা বিশ শতকের প্রথমাংশে সর্ব বিষয়ে যেরূপ মনোজ্ঞ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সে তুলনায় সম্প্রতিকালে প্রকাশিত পুস্তক ম্লান হয়ে যায়। পূর্বসুরীদের বক্তব্য অত্যন্ত ঋজু গতিতে পাঠকের মর্মস্থলে প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়নি পরন্তু রসানুভূতির পরিতৃপ্তি নিয়ে পাঠক পুলকিত হয়েছেন। বিষয়টা লেখকদের কাছে সুস্পষ্ট ছিল তাই তাঁরা সহজ ভাষায় সুচারুরূপে ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। আজকের দিনে অধিকাংশ লেখকের কাছে তাদের বক্তব্য 'বিষয়' অস্পষ্ট থাকাতে তাদের রচনা পাঠকদের সামনে ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু হয়ে দেখা দিচ্ছে না। এতদ্‌সম্পর্কে পাঠকদের তরফ থেকে কোনরূপ ক্ষীণতম আওয়াজও শোনা যাচ্ছে না।

শিশু-সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষ করে বলা যেতে পারে যে সামান্য দু'একজন লেখক লেখিকা বাদে অধিকাংশ লেখাই শিশুদের জন্যে রচিত হচ্ছে না বরঞ্চ বলা যেতে পারে সাবালক শিশু বা তাদের পিতৃস্থানীয়দের জন্যে রচিত হচ্ছে।

পূর্বে শিশুদের জন্যে যে সব বই বেরিয়েছে সে সব বই পড়ে শিশু ও শিশুর পিতামাতা একত্রে সমানভাবেই আনন্দ উপভোগ করতে পারতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ নামোল্লেখ করা যেতে পারে—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, যোগীন্দ্র সরকার, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (একটি সকুরা পুষ্পের কাহিনী), জগদানন্দ রায়, জ্ঞানদানন্দিনী দেবী, গিরীন্দ্রশেখর মিত্র (রবীন্দ্রনাথকে বাদই দেওয়া গেল) প্রভৃতি। এঁদের জুড়ি কোথায়? তবে আজকের দিনে শিশুদের জন্যে যারা লিখেছেন, তাদের নামোল্লেখ না করলে সুবিচার করা হবে না—দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে—সুখলতা রাও, লীলা মজুমদার, প্রেমেন্দ্র মিত্র (ঘনাদার গল্প, অদ্বিতীয় থনীদা) সুকুমার দে সরকার, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, শিবশঙ্কর মিত্র (সুন্দরবনে আর্জান সর্দার), সুনীল সরকার, গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি। এরা লিখেছেন বটে

তবে age grouping ক'রে কিছু রচিত হচ্ছে কি? উপহার দেবার বেলায় ফ্যাসাদে পড়তে হয়। এ বিষয়ে একটু চিন্তার প্রয়োজন। তাই পাঠক সমাজের কাছে পুনরায় নিবেদন—তাঁরা সাড়া দিন—নিজেরা সচেতন হয়ে প্রকাশকদের সচেতন করুন।

ভাল বই

শ্যামসুন্দর সাহা

যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয়—ভাল বইয়ের সংজ্ঞা কি? তাহলে আমি উত্তর দেব, যে বই আমাকে তৃপ্তি দিতে পারে সেখানাই হবে আমার মতে ভাল বই। এই প্রশ্ন একজন গ্রন্থাগারিককে করলেও একই উত্তর পাওয়া যাবে। যে বই গ্রন্থাগারের অধিকাংশ পাঠককে তৃপ্তি দানে সক্ষম সেখানিই হবে ভাল বই। আমার রুচির সাথে কোন গ্রন্থাগারের অধিকাংশ পাঠকের রুচির মিল না থাকতেও পারে, কাজেই আমার মতে যেখানা ভাল বই, ঐ গ্রন্থাগারে সেখানা ভাল বই না হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

পাত্রের কথা বাদ দিলে স্থান ও কালের উপরও ভাল বইয়ের সংজ্ঞা নির্ভর করে। যেমন কোলকাতার যে কোন গ্রন্থাগারের পাঠকদের কাছেই যাযাবরের দৃষ্টিপাত একখানা ভাল বই; কিন্তু সুদূর পল্লীবাঙলার কোন এক গ্রন্থাগারের স্বল্প শিক্ষিত পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সেখানা ভাল বইয়ের মর্যাদা হয়তো পাবে না, কারণ সেখানকার পাঠক-পাঠিকার স্বল্প-শিক্ষিত মন 'দৃষ্টিপাতে'র রস গ্রহণ করার উপযুক্ত হয়নি। এরকম বহু বইয়ের নাম করা যেতে পারে, আমি অবশ্য একখানা বইয়ের উদাহরণ দিয়েই দেখালাম।

কাল অনন্ত, পৃথিবী বিপুল, শিল্পের আবেদন চিরকালের; কিন্তু পাঠকের রুচি পরিবর্তনশীল। ক্রমাগতই তাঁদের পড়ার রুচি পাল্টাচ্ছে। আজ যেখানা বাজারের best seller-এর সম্মান পাচ্ছে, হয়তো পঞ্চাশ বছর কি একশ' বছর পরে অধিকাংশ লোকেই তার কথা ভুলে যাবে। এটাই নিয়ম। যেমন কাব্যের পাঠকদের কাছে উনবিংশ শতাব্দীতে হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার,' মাইকেলের 'মেঘনাথ বধ কাব্য,' রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান,' নবীনচন্দ্রের 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র

প্রভাস' প্রভৃতি কাব্য আদরণীয় ছিল, তাঁরা সাগ্রহে এই কাব্যগুলো পাঠ করে আনন্দ লাভ করতেন; কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আধুনিক যুগের পাঠক আমরা বাঙলার এই মহাকাব্যগুলোকে আজ আর পড়ার প্রয়োজন মনে করি না। এই ভাবে আমরা প্রাচীন লেখকদের সাথে, তৎকালীন পাঠক ও সাহিত্যের সাথে ক্রমেই যোগসূত্র হারিয়ে ফেলছি। অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণে আমাদের প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যের কিছু কিছু পড়ানো হয়; কিন্তু তা নেহাতই পরীক্ষা পাশের জন্য, এতে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি ঔৎসুক্য জাগলেও তা কখনো ব্যাপক ভাবে হয় না, কারণ আমাদের দেশের ক'জনই বা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়? কাজেই সেই সকল গ্রন্থ আমাদের সামগ্রী হতে পারে, গ্রন্থাগারের সম্পদ হতে পারে, কিন্তু তা কখনোই গ্রন্থাগারের অধিকাংশ পাঠককে তৃপ্তি দিতে পারে না।

পাঠক-পাঠিকাদের রুচি অনেকাংশে নির্ভর করে পরিবেশের ওপর। মহানগরী কোলকাতার ও সুদূর পল্লীবাঙলায় গ্রন্থাগারের পরিবেশ এক হতে পারে না; পাঠক আলাদা, শিক্ষাসংস্কৃতি-জীবন যাত্রার প্রণালী সবই আলাদা, কাজেই কোলকাতার কোন এক গ্রন্থাগারে আমরা যে-সব বই দেখতে পাই, তা গ্রামের কোন গ্রন্থাগারে আশা করা অন্যায়। কৃষি ও গ্রামীণ শিল্প সংক্রান্ত পুস্তক, গরু, ছাগল প্রভৃতি পশুপালন বিষয়ক পুস্তকের চাহিদা গ্রাম্য গ্রন্থাগারে বেশ দেখা যায়, কারণ এ সব বই এখানকার উপযোগী করেই লেখা। বর্তমানে সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছে এবং তাদের জন্য বইও অনেক লেখা হয়েছে, এসব বই সহরের অধিকাংশ গ্রন্থাগারে কল্পনাই অনেকে করতে পারেন না; কিন্তু এই বইই আবার গ্রামে নতুন বয়স্ক শিক্ষিতেরা আগ্রহে পাঠ করে।

ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি আজও ভারতের গ্রামে গ্রামে ক্ষীণ ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। প্রাচীন আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতির দ্বারা গ্রামই সেকালের ভারতের সহিত ক্ষীণ যোগসূত্র বজায় রেখেছে,সহরের কৃত্রিম আবহাওয়া এই গ্রাম্য পরিবেশকে আলোড়িত করলেও একেবারে লুপ্ত করতে পারেনি। তাই আজও দেখি গ্রামে গ্রামে মহাভারত পাঠ হয়, রামায়ণ গান হয়, শ্রাবণের বৃষ্টিঝরা বিকেলে গ্রাম্য ললনারা দূর্বা হাতে করে মনসার ভাসান শোনে। তাই আজও দেখি গ্রাম্য গ্রন্থাগারে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এসে বলে, কৈ বাল্মীকি রামায়ণ দিন, কিংবা দিন কাশীরাম দাসের মহাভারত। কে পড়বে? না ঠাকুমা কিংবা দিদিমা পড়বেন, আর গোল হয়ে বসে তারা তাই শুনবে। সহরে এসব দৃশ্য

দেখা যায় না, দেখা গেলেও ক্কচিৎ কদাচিৎ ; কিন্তু গ্রামে এ দৃশ্য দুর্লভ নয়, প্রায়ই এ দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি সেখানে হয়। এই ভাবে গ্রামের কিশোরকিশোরীদের মনের কাছে ভারতের প্রাচীন আদর্শকে তুলে ধরা হয়। তাছাড়া সাধারণ লোকেরাও রামায়ণ মহাভারত পাঠ করে শান্তি ও আনন্দ লাভ করে। কাজেই সেখানে রামায়ণ মহাভারত যে ভাল বই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অপর পক্ষে সহরের ছোট কিংবা মাঝারি গ্রন্থাগারে এই মহাকাব্য দু'খানা খুঁজে পাওয়া যাবে না, বড় গ্রন্থাগারে পাওয়া যাবে, কিন্তু তাদের উপযোগিতা পাঠকদের মনোরঞ্জনের জন্য নয়, তাদের অবস্থান গ্রন্থাগারে সম্পদরূপে।

পাড়ায় কোন নতুন গ্রন্থাগার স্থাপিত হলে খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে তার অধিকাংশ বইই ডিটেকটিভ শ্রেণীর এবং তারপরেই উপন্যাস, আবার উপন্যাসের বেশীর ভাগই বটতলার উপন্যাস। প্রবন্ধ, রম্যরচনা প্রভৃতি কদাচিৎ দেখা যায়। কিন্তু তারপরেই আস্তে আস্তে পাঠকদের রুচি বদলায়। ডিটেকটিভ ছেড়ে হালকা উপন্যাস ও গল্প এবং ক্রমে তাঁরা সাহিত্যের সকল বিভাগেই বিচরণ করেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, যাঁরা একদিন রুদ্ধশ্বাসে ডিটেকটিভ বইর পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টে যেতেন, হাতের কাছে যে বই পেতেন—নাওয়া খাওয়া ভুলে তাতেই ডুবে থাকতেন এবং তখন প্রায় প্রত্যেকেই একটি মহৎ প্রতিজ্ঞা করতেন যে ভবিষ্যতে তিনিও একজন গোয়েন্দা হবেন, সেই পাঠকদেরই পড়ার নেশা রুচিকে এমন ভাবে বদলে দেয় যে পরে তাঁরা আর ডিটেকটিভ বইর নামই শুনতে পারেন না !

যাঁরা সময় কাটানোর জন্য বই পড়েন কিংবা ঘুমুবার আগে ঘুমের ওষুধ হিসাবে একখানা বই হাতে নিয়ে শুয়ে পড়েন, তাঁরা উপনাসেরই খদ্দের ; তবে মনের মত উপন্যাস না পেলে ছোট গল্প ছেড়ে বড় জোর ভ্রমণ কাহিনী পর্য্যন্ত ওঠেন, তার ওদিকে আর যান না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে আমার কাছে যেখানা ভাল বই, অন্যের কাছে সেখানা ভাল বইয়ের সম্মান নাও পেতে পারে, কেননা প্রত্যেকের রুচি বিভিন্ন। আবার সময়ের ব্যবধানে এক কালের জনপ্রিয় বইও পরবর্তীকালে পাঠককে তৃপ্তি দানের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, কারণ রুচি পরিবর্তনশীল। সহরের গ্রন্থাগারে যে বই-খানার চাহিদা সবচেয়ে বেশী, গ্রামের কোন গ্রন্থাগারে সেখানকার তত চাহিদা নাও থাকতে পারে, কেননা গ্রামও সহরের পাঠকগোষ্ঠি আলাদা। সুতরাং ভাল বইয়ের সংজ্ঞা স্থান-কাল-পাত্র-পরিবেশ প্রভৃতির উপর নির্ভর করে।

গ্রন্থাগারের প্রতি প্রকাশকের দায়িত্ব

গোপাল পাল

বই ও পাঠকের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন তথা মানুষকে গ্রন্থমনা করে তোলাই গ্রন্থাগারের প্রধান কাজ। সে জন্যে উপযোগীবই চাই প্রচুর। কাজেই লেখার জন্মদাতা লেখক এবং বই এর জন্মদাতা প্রকাশককে চাই গ্রন্থাগারের সখা হিসাবে। তাঁদের সখা হতে আপত্তি থাকা উচিত নয়। কেননা তাঁদের 'মটো' জনসেবা। আর 'মটো'র কথা বাদ দিলেও সখা ভাবে পাবার দাবী রাখি কেননা বর্ত্তমানে গ্রন্থাগার প্রকাশকদের খুব বড় খরিদ্দার। এখন শুধু গ্রন্থাগার গুলিই যে কোন ভাল বইএর একটা দু'টো সংস্করণ শেষ করে দিতে পারে। বোধ হয় দিচ্ছেও। কিন্তু সকল ক্ষেত্রেই যে দেশী প্রকাশককে বন্ধু-ভাবে পাওয়া গেছে একথা বলা যায় না। গ্রন্থাগারের কাছে প্রকাশকের দায়িত্ব শুধু ভাল লেখাটা পেঁছে দেওয়া নয়—সেটাকে ভাল, শক্ত, মজবুত, (কোন কোনটা সুদৃশ্য) আধারে উপযুক্ত মূল্যে সরবরাহ করা চাই। কলকাতার কোন এক নামকরা প্রকাশন প্রতিষ্ঠানে গিয়ে যদি খারাপ কাগজে ছাপা, খারাপ সেলাই, খারাপ বাঁধাইএর বেশী দামী বইগুলি বেছে বেছে নিই তাহলে হয়তো দেখা যাবে ভাল ভাল লেখকের বইগুলিই বেছে ফেলেছি। অর্থাৎ বলতে পারি ভাল লেখকের বই বিক্রী হবেই জেনে কোন কোন প্রকাশক সেগুলির দাম করেন খুব বেশী এবং তাঁদের অঙ্গের দিকে নজর দেন না। এ রীতির পরিবর্ত্তন গ্রন্থাগারের স্বার্থে একান্ত প্রয়োজন। কেননা যে বইএর আত্মার অর্থাৎ লেখাটার এবং দেহের অর্থাৎ বইএর কাগজ ইত্যাদির পরমায়ু খুব বেশী সেগুলিই গ্রন্থাগারের খুব কাজে আসে এবং খরচ কমায়।

কী ভাবে গ্রন্থ প্রকাশ করে প্রকাশকরা গ্রন্থাগারের আরও উপকার করতে পারেন—এ হল একটি বহুল আলোচিত কথা। বিভিন্ন বিষয়ে ভাল লেখা চাই একথা আর নূতন করে বলবার দরকার নাই। কিন্তু প্রত্যেক বই-এরই একটা গ্রন্থাগার সংস্করণ থাকলে ভাল হয়। এ সংস্করণটি হবে মোটা শক্ত স্থায়ী কাগজে ছাপা; যথেষ্ট মার্জিন থাকবে। বই-এর প্রথম ও শেষে কয়েকটি সাদা পৃষ্ঠা থাকবে এবং হয় খুব ভালভাবে বাঁধাই হবে নয়তো নামমাত্র বাঁধাই থাকবে; গ্রন্থাগার গ্রন্থ কিনে নিজেরা বাঁধিয়ে নেবে। যেমন রবীন্দ্র রচনাবলীর এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কতকগুলি বইএ থাকে।

এইতো গেল মোটামুটি ভাবে বইএর অঙ্গের বিবরণ। এরপর বইএর বিষয় নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যাবে বাঙলা দেশের প্রকাশকরা যে বই ছাপছেন তা হয়তো সহরের চাহিদা মিটিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু পল্লীর পাঠকদের কথা বিবেচনা করলে তাঁরা যা পাচ্ছেন তার পরিমান বেশী নয়। বয়স্ক পাঠক হিসাবে পল্লীর পাঠককে তিনভাগে ভাগ করা যায়, এক—পল্লীর উচ্চ শিক্ষিত অর্থাৎ যাঁরা একটু জটিল বাংলা বই পড়ে বুঝতে পারেন। দুই—যাঁরা খুব সরল গল্প-উপন্যাস ছাড়া বুঝতে পারেন না। তিন—যাঁদের অক্ষর জ্ঞান আছে কিন্তু বই পড়তে বেশ কষ্ট হয় এবং পারতঃপক্ষে পড়েনও না। প্রত্যেকটি বই বা পুস্তিকা প্রকাশের সময় এদের সকলের কথা মনে রাখতে হবে। গ্রন্থাগারের এই হল দাবী।

পাঠ্য উপকরণ প্রসঙ্গে

বিজলী রায়

আধুনিক যুগের একটি মস্ত বড় সম্পদ এর ছাপানোর হরফ। পৃথিবীর অনেক স্থানেই অর্থনৈতিক অবনতির কারণ মুদ্রাযন্ত্রের বিলম্বিত ব্যবহার—এই মত সম্বন্ধে আজ আর সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। দক্ষিণ এশিয়া যদিও সমগ্র পৃথিবীর সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিকে বহু পরিমানে প্রভাবিত করেছে, তবুও আমরা একথা বলবো যে দক্ষিণ এশিয়া ঐ পূর্বোল্লিখিত অনগ্রসর দেশ গুলিরই একটি ছিল। এবং বর্ত্তমানে যখন এই সমস্ত দেশ তাদের অর্থনীতি ও সমাজ নীতিকে ক্রমশঃ উন্নত করে তুলতে সচেষ্ট হচ্ছে, তখন দেখা যাচ্ছে মুদ্রাযন্ত্র ও মুদ্রিত অক্ষরের প্রয়োজনীয়তা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাঠ্যবস্তু কেবলমাত্র মানব সমাজের ক্রমাগ্রসরতার একটি অঙ্গই নয়, পরন্তু এটাই হচ্ছে সেই দৃঢ় বুনিয়াদ, যার ওপর ভিত্তি করে সুদৃঢ় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।

১৯৫৫ সালে দক্ষিণ এশিয়ার নতুন শিক্ষাব্রতীদের জন্য পাঠ্যবস্তুর উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছে ইউনেস্কো, এই পরিকল্পনা দ্বারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতি সম্ভব হবে এবং গণশিক্ষার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাও এর দ্বারাই সার্থক হবে। অপর পক্ষে বলা যায় যাদের জন্য এই সকল ব্যবস্থা করা হচ্ছে,

তাদের দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবার মত অগ্রসরশীল সাহিত্য চাই প্রচুর পরিমানে। এর অপ্রতুলতা ঘটলে সদ্যশিক্ষিত এই জনসাধারণ আবার অশিক্ষার অতলগর্ভে তলিয়ে যাবে।

এই সকল উন্নতিমূলক পরিকল্পনা যখন ক্রমশঃ সাফল্যের পথে এগিয়ে যাবে, তখন দেখা যাবে উন্নতির একাধিক সিংহদ্বার এ উন্মোচন করে দিয়েছে। মানুষের যত উন্নতি তার সবের মূলে আছে শিক্ষা, আর এই শিক্ষার মাধ্যমেই বহু মানব একত্রিত হবে, মিলিত হবে। প্রথমেই পাণ্ডুলিপির কথা—পাণ্ডুলিপিগুলি পাঠকের অন্বেষণে বহুজনের হস্তান্তরিত হয়ে অবশেষে মুদ্রিত পুস্তকের রূপলাভ করে। এই রূপান্তরের পথে লেখক, প্রকাশক, মুদ্রক, বিক্রেতা ও গ্রন্থাগারিক—সবাই একসঙ্গে মিলিত হন। সর্বশেষে মানুষের হৃদয়ে এই পুস্তকের আবেদনকে পৌঁছিয়ে দেওয়াই গ্রন্থাগারিকের কাজ। প্রয়োজনোপযোগী বই খুব বেশী পাওয়া যায় না যদি না তাদের প্রভূত চাহিদা থাকে। কাজেই এই চাহিদা যদি স্বাভাবিকভাবে না থাকে, তবে তা সৃষ্টি করতে হবে। ইউনেস্কো আজ তাই সঙ্কল্প করেছে আপন অভীষ্ট সে সিদ্ধ করবেই, তাই তার মৌলিক চিন্তাধারাকে সে আরো সম্প্রসারিত করেছে। আর সেই কারণেই বহুমুখী পরিকল্পনা—যেমন পুস্তক ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দান, গবেষণা, নানা বিষয়ে সমীক্ষা, জ্ঞাতব্য বিষয় সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ, প্রকাশক ও লেখকদের উৎসাহ দান—ইত্যাদির দ্বারা সর্বপ্রকারে এবং সর্বদিক দিয়ে পুস্তক শিল্পকে সঞ্জীবিত করে তুলছে। এর ফলে যারা নব্য শিক্ষিত হবে, তারা কখনও অচল অবস্থার সম্মুখীন হবে না। এর ফলে তাদের পঠন স্পৃহা বৃদ্ধি পাবে, এবং কেবলমাত্র অক্ষর পরিচয়কেই উদ্দেশ্য বলে মনে না করে তারা এটাকে তাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির উপায়মাত্র মনে করতে শিখবে।

এই সঙ্কল্প সাধনের পথে ইউনেস্কো তার শিক্ষাসচিবের অকুণ্ঠ সহায়তা লাভ করেছে এবং National Commission-এর সভ্যদেরও সাহায্য পেয়েছে। এ ছাড়াও অনেক বে-সামরিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি বিশেষের সাহায্যও সে লাভ করেছে। তাঁদের অফুরন্ত সমর্থন এবং সাহায্যই ইউনেস্কোর সঙ্কল্প সাধনের সব চেয়ে বড় সম্পদ।

চব্বিশ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর

সরোজ হাজরা

গ্রন্থাগারিক, জেলা গ্রন্থাগার বিদ্যানগর।

আয়তন এবং লোক সংখ্যায় পশ্চিম বঙ্গের বৃহত্তম জেলা ২৪ পরগণা। এর একদিকে গঙ্গার ধার বেয়ে বজবজ, বরানগর, বারাকপুর, নৈহাটি ও কাঁচড়াপাড়ার ঘনবসতিবহুল শিল্পাঞ্চল এবং অপর দিকে মথুরাপুর, ডায়মনহারবার, কাকদ্বীপ, সাগরদ্বীপ, হাড়োয়া, সন্দেশখালি প্রভৃতি সুন্দরবন এলাকা ও কৃষি-প্রধান গ্রামাঞ্চল। শিল্প ও কৃষি, শহর ও গ্রাম জীবনের এই সহ অবস্থান বোধ হয় আর কোন জেলায় এমনি ভাবে নেই। আয়তনের এই দৈর্ঘ্য, যাতায়াত ব্যবস্থার দুরধিগম্যতা এবং জনজীবনের এই বৈচিত্রের কথা বিচার ক'রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার সঙ্গত কারণেই জেলার উত্তরাঞ্চলের জন্য খড়দহে এবং দক্ষিণাঞ্চলের জন্য আলিপুর মহকুমার বিদ্যানগরে দুটি জেলা গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন এবং বসিরহাট মহকুমার টাকীতে জেলা গ্রন্থাগার পর্য্যায়ের আর একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কাজ আরম্ভ করেছেন।

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার পরিচালনার ভার ন্যস্ত রয়েছে রহড়া রামকৃষ্ণ মিশনের উপর এবং বিদ্যানগরে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ।

॥ বিদ্যানগর ॥

৭৬-এ বাসরুটে মোমিনপুর থেকে ডায়মণ্ডহারবার রোড ধরে দক্ষিণে বারো মাইল পথ অতিক্রম করলে পথে পড়বে আমতলা হাট—দক্ষিণাঞ্চলের অন্যতম গঞ্জ যায়গা। এর পূবদিকে নূতন বাসরুটে আপনি বারুইপুর, চম্পাহাটি, জয়নগর, মথুরাপুর বা ক্যানিংএ যেতে পারেন। দক্ষিণে সরিষা, ডায়মণ্ডহারবা, কাকদ্বীপ আর পশ্চিমে বাসরুট গেছে চড়িয়াল-বজবজের দিকে। আমতলার তিন মাইল পশ্চিমে এই চড়িয়াল বজবজ রুটের উপরই পাবেন বিদ্যানগর।

বিদ্যানগর নগর নয়—গ্রাম। বাংলা দেশে স্থাপিত জেলা গ্রন্থাগুলির

অধিকাংশই জেলার সদরে বা মহকুমা-সহরে অবস্থিত। বিদ্যানগরের জেলা গ্রন্থাগার তার একমাত্র ব্যতিক্রম। পল্লী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য এর গঠন প্রচেষ্টায় যেমন অভিনবত্ব আছে তেমনি এর সমস্যাগুলিও ঠিক এক ধরণের নয়। অন্যত্র জেলা গ্রন্থাগারে উপস্থিত (existing) পাঠকের চাহিদা মেটানোই প্রধান কাজ এবং এখানে কাজ অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত মানুষকে পাঠক পর্য্যায়ে উন্নীত করা।

॥ জেলা গ্রন্থাগার, বিদ্যানগর ॥

বিদ্যানগরে জেলা গ্রন্থাগারের কাজের সূচনা ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু নব নির্মিত জেলা গ্রন্থাগার ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন এবং এর পর থেকে গ্রন্থাগারের সকল বিভাগের কাজের আরম্ভ।

॥ গ্রন্থপুঁজি ॥

কাজের সূচনায় গ্রন্থাগারের গ্রন্থপুঁজি ছিল মাত্র ১৫৪২। ১৯৫৯ খৃষ্টাব্দের মার্চে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৪৩০৮ এবং পরিগ্রহণ খাতায় সর্ব্বশেষ হিসাব অনুযায়ী (জুন, ১৯৬০) গ্রন্থাগারের বর্ত্তমান পুস্তক সংখ্যা ৬০০০। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'বর্গীকরণ' পদ্ধতি অনুসারে বাংলা পুস্তকগুলিকে এবং ডিউই অনুযায়ী ইংরাজী পুস্তকগুলি বর্গীকরণ করা হয়েছে। বিষয় অনুসারে ভাগ করলে এর মধ্যে গল্প উপন্যাসের অনুপাত শতকরা ৬৪ এবং অন্যান্য শতকরা ৩৬।

॥ পত্র-পত্রিকা ॥

বর্ত্তমানে নিয়মিত ভাবে দুইখানি দৈনিক এবং ১৫ খানি সাপ্তাহিক, মাসিক ও ত্রৈমাসিক পত্রিকা গ্রন্থাগারে নেওয়া হয়ে থাকে। বিষয় অনুসারে পত্রিকাগুলির সংখ্যা দাঁড়ায় এইরকম ঃ

সাধারণ—৩ ; গ্রন্থাগার বিদ্যা—১ ; অর্থনীতি—১ ; খেলাধুলা—২ ; বিজ্ঞান—২ ; সাহিত্য—২ ; শিশু—২।

॥ সভ্য সংখ্যা ॥

আলিপুর সদর এবং ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার সাধারণ পাঠাগারগুলির মধ্যে বার্ষিক ৫৲ টাকা চাঁদা দিয়ে যারা জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত হয়ে থাকেন তাঁদের জেলা গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠানগত সভ্য হিসাবে গণ্য করা হয়

এবং তাঁরা জেলা গ্রন্থাগারের পুস্তক ঋণ গ্রহণের অধিকারী বলে বিবেচিত হন। গত তিন বৎসরে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানগত সদস্য সংখ্যা ছিল এইরকম ঃ

১৯৫৭-৫৮ ঃ ১৪৪

১৯৫৮-৫৯ ঃ ১৫০

১৯৫৯-৬০ ঃ ২০০

জেলা গ্রন্থাগারের ব্যক্তিগত পাঠক সভ্যদের তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) এককালীন পাঁচটাকা জমা নিয়ে যাঁদের সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

(২) স্কুলের ছাত্র ছাত্রীবৃন্দ। এদের কাছে কোন জমা নেওয়া হয় না।

(৩) জমা বিহীন সাধারণ সভ্য। উপযুক্ত সুপারিশ থাকলে এঁদেরও বিনা জমায় সভ্য শ্রেণীভুক্ত করা হয়।

বলা প্রয়োজন, ব্যক্তিগত কোন সভ্যের নিকট হতেই জেলা গ্রন্থাগারের সভ্য হওয়ার জন্য চাঁদা নেওয়া হয়না।

গত দু'বৎসরে এই জাতীয় ব্যক্তিগত সভ্যের সংখ্যা ছিল এই রকম ঃ

বর্ষ	জমাসহসভ্য	ছাত্র-ছাত্রী (জমাবিহীন)	সাধারণ (জমাবিহীন)	মোট
১৯৫৮—৫৯	৭৪	৯০	×	১৬৪
১৯৫৯—৬০	১১৮	১২০	৩২	২৭০

স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের বাদ দিয়ে বাকী সভ্যদের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এর মধ্যে ঃ—

শিক্ষক	ছাত্র	চাকুরীজীবী	ব্যবসায়ী	কৃষিজীবী	ডাক্তারীবিদ্যা	বিবিধ
৫৩	৩৪	১৬	১৭	১২	৭	২১

এই বিবিধ শ্রেণীর পাঠকদের মধ্যে রয়েছেন পোষ্টাফিসের পিওন, বিড়ির কারিগর, দোকান কর্মচারী প্রভৃতি।

॥ "পুস্তক লেন দেন" ॥

জেলা গ্রন্থাগার হতে গত তিন বৎসরের পুস্তক ঋণ দেওয়ার সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ ঃ

বর্ষ	ভ্রাম্যমাণ বিভাগ	ব্যক্তিগত	মোট
১৯৫৭—৫৮	৫৭০০	১৩৭৪	৭০৭৪
১৯৫৮—৫৯	১০,১৪৬	২২৯১	১২,৪৩৭
১৯৫৯—৬০	১৩,২০৩	৪০৭৭	১৭২০

উল্লেখযোগ্য যে ব্যক্তিগত বয়স্ক সভ্যদের মধ্যে ব্যবহৃত পুস্তকে গল্প-উপন্যাস ও অন্যান্য বিষয়ে অনুপাতের হার যথাক্রমে শতকরা ৭৭ ও ২৩। শিশু সাহিত্য পদে ভ্রাম্যমাণ বিভাগে প্রতিষ্ঠান গত সভ্যদের মধ্যে বিতরিত পুস্তক এই অনুপাত ঃ

গল্প উপন্যাস	ঃ	শতকরা	৭৮
অন্যান্য	ঃ	,,	২২

বাড়ীতে পড়ার জন্য দেওয়া বই, ভ্রাম্যমাণ বিভাগ এবং ছাত্র, সমস্ত অংশের সভ্যদের চাহিদা বিচার করলে বলিতে হয় যে জেলা গ্রন্থাগারের বর্তমান গ্রন্থ পুঁজিতে পাঠকের চাহিদা প্রতিফলিত হয়নি। অর্থাৎ পাঠকের চাহিদা মেটানোর জন্য পুস্তক ভান্ডারে কল্পনামূলক সাহিত্যের আরো সংযোজন প্রয়োজন। সেই সংগে বলা প্রয়োজন, গল্প উপন্যাসের চাহিদা যে অনেক বেশী তা' সত্য হলেও অন্যান্য বিষয়ের চাহিদা যে যথাযথ এই পরিসংখ্যানে ধরা পড়েছে তাও নয়। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত অন্যান্য বিষয়ের বই যথেষ্ট সংখ্যায় না দিতে পারাও গল্প উপন্যাস পাঠ বৃদ্ধির কারণ হয়েছে। ইতিহাস, জীবনী ও সমালোচনামূলক সাহিত্যের ভালো বইগুলির প্রত্যেকটি আরো বেশি সংখ্যায় সংযোজন হলে এই বিতরণহার পরিবর্তন সম্ভব।

॥ ভ্রাম্যমাণ বিভাগ ॥

শুধু পুস্তক ব্যবহারের সংখ্যার দিক থেকেই নয়, গত দু' বৎসরে ভ্রাম্যমাণ বিভাগের কাজে যে সম্প্রসারণ ঘটেছে তার আরো প্রমাণ পাওয়া যায় পুস্তক ঋণ গ্রহণকারী সদস্য গ্রন্থাগারের সংখ্যা বৃদ্ধিতে। ১৯৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে জেলা গ্রন্থাগারের ১৪৪টি সভ্য গ্রন্থাগারের মধ্যে ৭০টিকে পুস্তক ঋণ দেওয়া হ'ত। ১৯৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে ১৫০টি সভ্য গ্রন্থাগারের মধ্যে পুস্তক ঋণ গ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন ১৬০টি সভ্য গ্রন্থাগার। ১৯৫৯-৬০ খৃষ্টাব্দে সদস্য গ্রন্থাগারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০০ এবং তার মধ্য পুস্তক ঋণ গ্রহণকারী সদস্য গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১৩০। সমস্ত সদস্য গ্রন্থাগারকে এখনো যে পুস্তক ঋণ সরবরাহ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি তার অন্যতম কারণ জেলা গ্রন্থাগারের যথেষ্ট পুস্তক পুজির অভাব। হিসাব করে দেখা গেছে অন্তত ১০,০০০ বইয়ের পুস্তক পুঁজি গড়ে তুলতে পারলে জেলা গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠানগত এবং ব্যক্তিগত সভ্যদের আশু প্রয়োজন মেটানো যায়। সরকারের নিকট এ সম্পর্কে আবেদন করা হয়েছে এবং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে সরকারী আনুকূল্যে পাঠকের এ চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে।

ভ্রাম্যমাণ বিভাগের কাজের সুবিধার জন্য আলিপুর এবং ডায়মণ্ডহারবার মহকুমার সমগ্র এলাকাটিকে ৭টি কর্ম অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। এই কর্ম অঞ্চলগুলির প্রত্যেকটি পূর্ব নির্দিষ্ট কর্মসূচী অনুযায়ী একমাস অন্তর জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থযান বই দেওয়া নেওয়ার জন্য উপস্থিত হয়। কর্ম অঞ্চলগুলি নিম্নরূপ ঃ

অঞ্চল ১ বেহালা বড়িষা। অঞ্চল ২ বাওয়ালী বজবজ। অঞ্চল ৩ জয়নগর মথুরাপুর। অঞ্চল ৪ বারুইপুর চম্পাহাটি। অঞ্চল ৫ রাজপুর গড়িয়া। অঞ্চল ৬ ডায়মণ্ডহারবার-ফলতা। অঞ্চল ৭ কাকদ্বীপ-নামখানা।

এই কর্ম অঞ্চলগুলির মধ্যে দূরতম অঞ্চল কাকদ্বীপ নামখানা—মোটর যান চলাচলের রাস্তায় বাংলাদেশের দক্ষিণপ্রান্তের শেষ ষ্টেশন। ফ্রেজারগঞ্জ বনশ্যামনগর, সাগরদ্বীপ প্রভৃতি দ্বীপগুলির পাঠাগার থেকে লঞ্চ বা নৌকা-যোগে এখানে থলে কাঁধে বই নিতে আসেন গ্রন্থাগারকর্মীরা। যেমন ভাঙড়, ক্যানিং প্রভৃতি অঞ্চলের সভ্য-গ্রন্থাগারগুলি বই নিয়ে মাত্র চম্পাহাটি ষ্টেশনে আসে। এই বই আবার সাইকেলে ক.র বা হাঁটাপথ দিয়ে পোঁছে দেন উৎসাহী কর্মীরা পাঠকের আস্তানায়। এই ভাবে বইয়ের জগতের সংগে দূরতম গ্রামের পাঠকের যোগাযোগ গড়ে উঠছে এবং জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থযান এবং সভ্য পাঠাগার সমূহের কর্মীরা সেই অখণ্ড গ্রন্থ ব্যবস্থার যোগসূত্র হিসাবে কাজ করছেন।

তথ্য নিয়ে জানা গিয়াছে জেলা গ্রন্থাগার থেকে হিসাবে গৃহীত এক একখানি পুস্তক দেড়মাস সময়ের মধ্যে ৭ থেকে ১০ বার পর্যন্ত ইস্যু হয়েছে। গড়ে একখানি বই অন্তত ৫ জন ক'রে পাঠক পড়েছে ধ'রে নিলেও গত বৎসরে ভ্রাম্যমাণ বিভাগে (১৩,২০৩ × ৫) ৬৬,০১৫ পাঠক জেলা গ্রন্থাগারের বই পড়েছেন বলা চলে।

॥ গ্রন্থাগার গৃহে পাঠ ॥

বৃহস্পতিবার বাদে সপ্তাহের প্রতিদিন ৭ ঘণ্টা এবং বুধবার ৪ ঘণ্টা জেলা গ্রন্থাগার খোলা থাকে। এতদিন কাজের সময় ছিল ১১টা থেকে ৬টা। জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাঠকবর্গের সুবিধার্থে চলতি বৎসরের ১লা জুলাই হতে গ্রন্থাগার দৈনিক ১টা থেকে সন্ধ্যা ৮টা পর্যন্ত খোলা রাখার ব্যবস্থা হয়েছে।

গ্রন্থাগার ভবনে সাধারণ পাঠকক্ষ ছাড়াও কিশোর, মহিলা প্রভৃতিদের জন্য পৃথক পাঠকদের ব্যবস্থা রয়েছে এবং আছে বিশেষ কোন বিষয়ে নিরিবিলি অধ্যয়নের জন্য "বিশেষ পাঠকক্ষ"। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে সহরাঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলির মত গ্রন্থাগার গৃহে অধ্যয়নকারী নিয়মিত পাঠক সংখ্যা এখনো আশানুরূপ গড়ে ওঠেনি। আর সে জন্যই জেলা গ্রন্থাগারের কার্যক্রমে প্রধান জোর দেওয়া হয়েছে গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ (একস্‌টেনশন) কর্মসূচীর উপর। জেলা গ্রন্থাগারে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এমনি কয়েকটি কর্মসূচীর পরিচয় এখানে দেওয়া হচ্ছে।

॥ সম্প্রসারণ কর্মসূচী—

স্বাধীনতা সপ্তাহ ॥

স্থানীয় এবং নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে জেলা গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করবার জন্য গত বৎসর ৭ই থেকে ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী একটি অনুষ্ঠান সূচী গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্কদের জন্য একটি গল্পের আসর, আন্তঃস্কুল একটি বিতর্ক ও একটি রচনার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়। প্রবন্ধ ও বিতর্ক উভয় বিষয়েই যে সমস্ত পুস্তক থেকে সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এই রকম একটি সংগ্রহ জেলা গ্রন্থাগারে বিশেষভাবে সাজিয়ে রাখা হয় এবং প্রতিযোগিতার অংশ গ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীরা তার সদ্ব্যবহার করে।

॥ প্রদর্শনী ॥

প্রতিবৎসর আমতলায় ২৪-পরগণা জেলা কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়ে থাকে এবং এই উপলক্ষে পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলের অধিবাসীদের সমাগম হয়। এ বৎসর ২৯শে ফেব্রুয়ারী থেকে ৭ই মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই প্রদর্শনীতে জেলা গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে একটি ষ্টল দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। ষ্টলটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং জেলা সমাজ শিক্ষা বিভাগের সৌজন্যে প্রাপ্ত গ্রন্থাগার সম্বন্ধীয় বিভিন্ন পোষ্টার দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। এই সংগে থাকে জেলা গ্রন্থাগার সম্পর্কিত নানা তথ্যের চার্ট, ভ্রাম্যমাণ বিভাগের ফটো, কর্ম অঞ্চলের ম্যাপ এবং বিশেষ বিশেষ বই এর সংগ্রহ প্রদর্শনী। জেলা গ্রন্থাগারের আদর্শ, অবস্থান এবং সভ্য হওয়ার নিয়মকানুন সহ একটি ইস্তাহারও এই প্রদর্শনীতে বিলি করা হয়।

।। রবীন্দ্র জয়ন্তী ।।

ছাত্র ছাত্রীদের গ্রন্থাগার মুখী করার জন্য যেমন স্বাধীনতা সপ্তাহের বিশেষ কর্মসূচীর আয়োজন করা হয়েছিল, এবং প্রদর্শনীর ষ্টল হয়েছিল সর্ব্বসাধারণকে আকৃষ্ট করার অন্যতম উপায় তেমনি জেলা গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে ৮ই থেকে ১০ই মে অনুষ্টিত এ বছরের রবীন্দ্র জয়ন্তী অনুষ্ঠান ছিল এতদঞ্চলের সাহিত্য ও সংস্কৃতি অনুরাগী মানুষের সমাবেশস্থল। ৮ই মে, প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানের প্রধান আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' অবলম্বনে স্থানীয় শিল্পীদের আঁকা চিত্র প্রদর্শনী। একটি বিশেষ কক্ষে রবীন্দ্রনাথ রচিত গ্রন্থরাজি এবং রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত অন্যান্য লেখকের লেখা গ্রন্থ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

রবীন্দ্রানুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিনে হয় সাহিত্যিক সমাবেশ। অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে অনুষ্টিত এই বিশেষ সমাবেশে রবীন্দ্রনাথ রচিত কবিতা আবৃত্তি এবং প্রবন্ধ পাঠে অংশ গ্রহণ করেন বিশিষ্ট কবি এবং সাহিত্যিক বৃন্দ।

জয়ন্তী অনুষ্ঠানের শেষ দিনটি নির্দ্দিষ্ট ছিল স্থানীয় শিশুদের জন্য। তিন দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের নিমিত্ত স্থানীয় যুবকবৃন্দ কর্ত্তৃক মঞ্চ এবং বিষ্ণুপুর বেসিক ট্রেনিং কলেজের ছাত্রদের দ্বারা নির্মিত খড়ের তোরণটি সর্ব্বসাধারণের কাছে একটি উন্নত রুচির পরিবেশনে সহায়তা করে।

।। বক্তৃতাবলী ।।

জনসাধারণকে গ্রন্থাগারমুখী ক'রে তোলার প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসাবে গ্রন্থাগার ভবনে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল—বিশিষ্ট মনীষী সাহিত্যিকবৃন্দ কর্ত্তৃক বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার আয়োজন। গত দু'বৎসরে এমনি দুটি আলোচনা সভায় বক্তৃতা করেন ডঃ মতিলাল দাস এবং ডঃ উমা রায়। ডঃ দাসের বক্তব্য বিষয় ছিল—"ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য" এবং ডঃ উমারায় বলেন "বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্য" এই বিষয়ের উপর।

॥ গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিক্ষা শিবির ॥

বিভিন্ন একসটেনসন কর্মসূচীর মাধ্যমে জনসাধারণকে গ্রন্থাগার মুখী করে তোলার প্রচেষ্টার যেমন প্রয়োজন আছে তেমনি সমগ্র জেলার গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে একটি বিজ্ঞান সম্মত ও সুসংহত ভিত্তির উপর স্থাপনা করার কাজে জেলা গ্রন্থাগারের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সরকারী

পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিচালিত গ্রামীন গ্রন্থাগার (রুরাল লাইব্রেরী) এবং বেসরকারী সাধারণ গ্রন্থাগারে কর্মরত গ্রন্থাগারিকদের দীর্ঘ দিনের এই প্রয়োজনের কথা মনে রেখে জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ গত ৪ঠা থেকে ১৩ই জুন বিদ্যানগর জেলা গ্রন্থাগার ভবনে একটি শিক্ষা শিবিরের ব্যবস্থা করেন।

৫ই জুন বৈকাল ৫টা পশ্চিম বঙ্গের সমাজ শিক্ষাধিকারের মুখ্য পরিদর্শক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় মহোদয় এই শিক্ষা শিবিরের অনুষ্ঠানে উদ্বোধন করেন— এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহযোগিতায় এই পরিচালনা করেন জেলা গ্রন্থাগারের কর্মিবৃন্দ।

জেল্যর ২৪টি গ্রামীন গ্রন্থাগার ৯টি সাধারণ পাঠাগার এবং একটি স্কুল লাইব্রেরীর প্রতিনিধি হিসাবে মোট ৩৫ জন শিক্ষার্থী এই শিক্ষাশিবিরে শিক্ষা গ্রহণ করেন। দশ দিনের এই শিক্ষা শিবিরে গ্রন্থাগার সংগঠনের কাজে হাতে-কলমে শিক্ষা দানের প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মীবৃন্দ। তাঁদের এ কাজে সহায়তা করেন জেলা গ্রন্থাগারিক।

গ্রন্থাগার সংগঠনের দৈনন্দিন ব্যবহারিক কাজ ব্যতীত এই গ্রামীন গ্রন্থাগারের আদর্শ, গ্রন্থাগার আন্দোলন, গ্রন্থার সম্পর্কে, সরকারী পরিকল্পনা, সমাজ শিক্ষা এবং জাতীয় উন্নয়ণ কাজের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা লাভ করেন সেজন্য প্রতিদিন সন্ধ্যায় ছিল বিভিন্ন বিষয়ের উপর পারদর্শী বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তৃতার আয়োজন। দশদিন ব্যপী শিবিরের এই বক্তৃতা-মালায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ রায়, সহ-মুখ্য পরিদর্শক, সমাজশিক্ষাধিকার, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ রায়, সম্পাদক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, শ্রীযুক্ত প্রমীলচন্দ্র বসু গ্রন্থাগারিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীযুক্ত দেবীপদ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীযুক্ত অজিত গুপ্ত, সহ অধিকর্ত্তা প্রচার বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রীমতী অনু মুখোপাধ্যায়, স্পেসাল অফিসার, উইমেনস প্রোগ্রাম, শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ ব্যানার্জী চৌধুরী, ন্যাসন্যাল লাইব্রেরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

১৩ই জুন শিক্ষাশিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে অতিরিক্ত জেলা সমাহর্ত্তা— শ্রীযুক্ত মিহির চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শিশু সাহিত্যিক শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী। সভায় শিক্ষার্থীগণকে জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে দু'টি করে

জেলা গ্রন্থাগার ভবন, বিদ্যানগর

সার্টিফিকেট প্রদান করেন শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ রায়। সভাশেষে শিবিরের শিক্ষার্থীগণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেন এবং অনুষ্ঠান শেষে শ্রীযুক্ত শিবরাম চক্রবর্ত্তী জেলা গ্রন্থাগারের ছাত্রবিভাগের উদ্বোধন করেন।

॥ উপসংহার ॥

উপরের বিবরণী থেকে প্রতীয়মান হবে যে গ্রামে অবস্থিত হলেও বিদ্যানগরের জেলা গ্রন্থাগার আধুনিক সংজ্ঞায় "পাব্লিক লাইব্রেরীর" করণীয় সর্ব্বমুখীন কাজগুলির সাহায্যে ধীরে ধীরে এতদঞ্চলের জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের কার্য্যকরী সমিতির সদস্যবৃন্দ, সম্পাদক ও জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারীর এবং অতিরিক্ত জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিণী এঁদের সকলের আগ্রহ এবং সক্রিয় সহযোগিতার জন্যই যতটুকু সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছে এবং আশা করা যায় তাঁদের অক্ষুণ্ণ আগ্রহে বিদ্যানগরের জেলা গ্রন্থাগার অদূর ভবিষ্যতে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়নের কাজে অন্যতম কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠবে।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ২৮শে আগষ্ট ১৯৬০ অপরাহ্ন ৫ টায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। ঐ দিন উক্ত স্থানে ৪-১৫ মিঃ পরিষদের সংবিধান সংশোধনের জন্য এক বিশেষ সাধারণ সভা হইবে।

চলতি বৎসরের চাঁদা যাহাদের বাকী আছে তাঁহারা নির্বাচনে আইনানুযায়ী অংশগ্রহণ করিতে পারিবেন না।

পরিষদ কার্যালয় হইতে ইতিমধ্যে বিগত বৎসরের কার্যবিবরণী ও পরীক্ষিত হিসাব সদস্যগণের নিকট প্রেরণ করা হইয়াছে। যাঁহাদের নাম চাঁদা বাকি থাকার জন্য ভোটার তালিকায় অদ্যাবধি অন্তর্ভুক্ত হয় নাই তাঁহাদের স্বতন্ত্র পত্রে চাঁদা প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ জানানো হইয়াছে।

সাধারণ গ্রন্থাগারে পাঠক সমাজ

বনবিহারী মোদক

রাজপ্রাসাদের মধ্যে চমৎকার গ্রন্থসংগ্রহ। প্রবলপ্রতাপান্বিত সম্রাটের পদপ্রান্তে এসে ক্রমে ক্রমে জমা হয়েছে অনেক জ্ঞানী-গুণীর চিন্তাপুষ্ট রচনা-সম্ভার। সম্রাটের কিন্তু তবু ভাল লাগে না। শুধু একা এই-সব গ্রন্থের রস আস্বাদন করেই কি মন ভরে? ভরে না। তাহলে……?

নীলনদের তীরে প্রসন্ন প্রভাত বোধহয় সোনার আলপনা এঁকেছিল সেদিন। ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি হেসে ইতিহাসের কালপুরুষ বোধহয় নতুন আঁচড় টেনেছিলেন তাঁর আকাশপটের খাতায়। মিশরের ফারাও দ্বিতীয় রামেসিস্ সেদিন উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন তাঁর গ্রন্থ-সংগ্রহশালার দরজা। না, প্রজাসাধারণের জন্যে নয়, শুধু তাঁর সভাসদদের জন্যে। সে-যুগে এর বেশী কল্পনাও করতে পারত না কেউ।

যে তাগিদের জন্যে নিজের আনন্দের ভাগ আর পাঁজজনকে দিতে উন্মুখ হয়েছিলেন সেই মহানুভব সম্রাট, সমস্ত দ্বেষ-দ্বন্দ্ব, বিরোধ-বিসংবাদের মধ্যেও মানব-মনের অন্তস্থলে অন্তঃসলিলা ফল্গু-ধারার মত আজও বয়ে চলেছে সেই সুমহান প্রেরণার অব্যাহত ধারা। যে বইটি পড়ে আপনি আনন্দ পেলেন, সহৃদয় প্রিয়জনকে সেই বইখানি পড়াতে পারলে আপনি কি আরও বেশী খুসী হন না? তাই আজকের মানুষ গড়েছে সাধারণ-গ্রন্থাগার। যে ঐতিহাসিক শুভ-সূচনা সেই মিশর সম্রাটের হাতে ঘটেছিল সেদিন, আজকের সৃষ্ট সর্বসাধারণের অবাধ-অধিগম্য গ্রন্থাগার সেই ধারারই গৌরবময় ফলশ্রুতি।

সত্যিকারের রসগ্রাহীদের হাতে যথাসময়ে যথাযথ গ্রন্থ তুলে দিতে পারার মধ্যেই রয়েছে গ্রন্থাগারের সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজনের সার্থকতা। প্রচুর ও মূল্যবান গ্রন্থ সম্ভারও সম্পূর্ণ বৃথা হয়ে দাঁড়ায়, যদি পাঠক না থাকে।

সাধারণ গ্রন্থাগারের সংগ্রহ ও বিন্যাসের লক্ষ্য যে পাঠক সমাজ, গ্রন্থাগার-কর্মীদের পক্ষে সেই পাঠক সাধারণের স্বরূপটা বুঝে দেখা ভাল। তার ফলে: (১) পাঠক-মনের রুচি ও চাহিদা বুঝে আমাদের সংগ্রহকেও তদনুযায়ী সুসমঞ্জস ও সমৃদ্ধতর করে তুলতে পারব। (২) গ্রন্থাদি লেন-দেনের বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক ব্যবস্থাগুলো যান্ত্রিকতা সর্বস্ব ও নিষ্প্রাণ। এর মধ্যে

আমরা আনতে পারব মানবিকতার স্পর্শ (human touch)। (৩) গ্রন্থাগারের নিয়মকানুন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে কোন সংশোধন বা পুণর্বিন্যাস প্রয়োজন হলে, তা-ও আমরা সহজেই বুঝতে ও করতে পারব।

মহামনীষী বেকনের গ্রন্থপাঠ সম্বন্ধীয় বহু-কথিত উক্তিটি*অনুসরণে 'খাওয়া' অর্থাৎ গ্রন্থ-আস্বাদনের বিশেষ ধরনটি বিচার করেই পাঠক সাধারণরকে আমরা মোটামুটি ৩টি ভাগে ভাগ করতে পারি: (১) যাঁরা চাখেন; (২) যাঁরা গিলে খান; এবং (৩) যাঁরা চিবোন এবং হজ্‌ম করেন।

এইবার এই ৩টি শ্রেণীকে আলাদা আলাদাভাবে চিনে নিই আসুন। কাল্পনিক দৃষ্টান্ত নিলে কতকটা সহজ হবে।

ওই যে সুবেশ ভদ্রলোকটি ব্যস্ত সমস্তভাবে এসে ঢুকেই সরাসরি আপনার কাছে চলে এলেন, উনি আপনার চেনা লোক হলেও আজ ওঁকে একটু মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করুন:

"না ভাই, এ খালি ধানাই-পানাই। বললাম আপনাকে, বেশ জমাটি দেখে একখানা দিন..."

মুষড়ে পড়বেন না। কাল সন্ধ্যায় এই ভদ্রলোকটিই যখন 'গাঁজাখুরি নয় অথচ পড়তে ভাল লাগে' এমন একখানা বই বেছে দেওয়ার জন্যে একান্ত নির্ভর-তার সংগে আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন, তখন পরম যত্নে ভাল একটি বই আপনি তুলে দিয়েছিলেন তাঁর হাতে। নিশ্চয়ই আশা করেছিলেন—বইটি উনি যত্ন করেই পড়বেন এবং খুব তারিফও করবেন আপনার রুচিসম্মত নির্বাচনের। অনেক বাঘা সমালোচকের বাহবা কেড়েছে বইটা, ওঁরও কি ভাল না লেগে পারে।

কিন্তু হায়! ভাল ত' ওঁর লাগেই-নি, পরন্তু সে-ভাবটা অত্যন্ত রূঢ়ভাবে প্রকাশ করে আপনার পছন্দের ওপর কিছুটা দোষারোপ করতেও দ্বিধা করলেন না উনি। দুঃখিত হয়ে কি করবেন? আপনারই ত' ভুল ভাই। এর ফলে যদি প্রতিজ্ঞা করেন—আর কাউকে কোনদিন বই নির্বাচন করে বা বেছে দেবেন না, আরও মর্ম্মান্তিক ভুল ঘটবে তাহলে। আপনার বিদগ্ধ মনের সুষ্ঠু নির্বাচন ও পরামর্শ দেবার প্রয়োজন আছে।

যে-সব গুণ-গ্রাহী পাঠক আছেন, তাঁদেরও কি বঞ্চিত করবেন আপনি?

*Some books are to be tasted, others to the swallowed and some few to be chewed and digested.

সাধারণ গ্রন্থাগারের অভিজ্ঞ ও বহুদর্শী কর্মী যাঁরা, এই অভিমানের ওপরে তাঁদের উঠতেই হবে।

আসল কথা—ভদ্রলোক বইটি পড়েনই-নি। মন লাগিয়ে পড়বার চেষ্টাও করেননি। উপরন্তু, লক্ষ্য করে দেখুন, প্রায়-নতুন বইটির শির-দাঁড়াটা (spine) সম্পূর্ণ খসিয়ে এবং হারিয়েও এনেছেন। ভিতরের অনেকগুলো পাতাও মুড়ে রেখেছেন বিশ্রীভাবে। ইনি সেই শ্রেণীর পাঠক যাঁরা এখান থেকে পাঁচ লাইন, ওখান থেকে দু' প্যারা, সেখান থেকে একপাতা—এইভাবে খুবলে খুবলে খান; অর্থাৎ খান না, শুধু চাখেন। আমাদের পূর্বোক্ত শ্রেণীবিন্যাসে প্রথমেই ধরা হয়েছে এঁদের কথা।

এঁদের বই নির্বাচন করে বা বেছে না দেওয়াই ভাল। হাজার ভাল বই হোক, এঁদের ভাল লাগবে না। যে-সব বই সকলেই ভাল বলেন, পাঠকদের কাছে বা বন্ধু মহলে উপহাসিত হওয়ার ভয়ে শুধু সেইগুলোকেই এঁরা প্রশংসা করবেন; তা-ও না পড়েই। এই রকম গোটা কয়েক বই ছাড়া আর সবই এঁদের কাছে "বোগাস্"। অথচ নিয়মিত, সম্ভব হলে দু'বেলাই, বই নেবার উৎসাহে কোন ঘাটতি নেই এঁদের। মোটা ও সুদৃশ্য বই বগলদাবা করে পরম প্রাজ্ঞতার হাসি মুখে ফুটিয়ে তুলে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানোটা এঁদের আরেকটি শখ।

কোন বই সম্বন্ধে এঁদের কেউ যদি আমার মতামত জিজ্ঞেস করেন, সব-কিছুকেই 'মোটামুটি ভাল' বলি। খুব স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণভাবে কোন বইয়েরই প্রশংসা করিনা; নিন্দে ত' নয়ই।

গ্রন্থাগারের কোন কিছু সম্বন্ধে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট কোন ত্রুটি, অন্ততঃ এঁরা যেন কখনও না ধরতে পারেন—এবিষয়ে সাধ্যমত সতর্ক হতে হবে। অভিযোগের সামান্যতম কোন কারণ পেলেই হৈ-হৈ বাধিয়ে দেন এঁরা। সত্যি-মিথ্যে সম্ভব-অসম্ভব নানারকম কথা নিয়ে ভিতরে-বাইরে যে দারুণ জট এঁরা পাকিয়ে তোলেন, সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠা গ্রন্থাগার-কর্মীর হাজার যৌক্তিকতাও দাঁড়াতে পারে না তার কাছে। দশচক্রে ভগবান বেচারা-ই শেষ পর্যন্ত ভূত হয়ে যায়।

মাঝে মাঝে হয়ত অসহনীয় মনে হতে পারে, কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে এঁদের একেবারে বাইরে রাখাটা সম্ভব কিনা সন্দেহ। এঁদের সহ্য করা ছাড়া উপায়ান্তর নেই। সময়োপযোগী বুদ্ধি ও অবস্থানুযায়ী কৌশল খাটিয়ে এঁদের tackle করাই বরং ভাল।

এইবার আলোচনা করা যাক ২নং পাঠকগোষ্ঠী সম্বন্ধে, অর্থাৎ 'যাঁরা গিলে খান'।

সংখ্যায় এঁরাই সর্বাধিক। এঁরাই বাঁচিয়ে রেখেছেন মফঃস্বলের মাঝারি ও ছোট পাবলিক লাইব্রেরীগুলো। গ্রন্থাগারের পক্ষে এঁদের গুরুত্ব সর্বাধিক বলে এঁদের সামাজিক পরিচয়টাও একটু জানা দরকার।

এই শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার প্রায় পুরো অংশটাই মধ্যবিত্ত পরিবারের বুদ্ধিজীবি ও বিদ্যোৎসাহী মানুষ। গ্রন্থাগার কি ও কেন—এটা তাঁরা সবাই বোঝেন। সমাজ-জীবনে গ্রন্থাগারের গুরুত্ব ও ইতিকর্তব্য সম্বন্ধেও এঁরা প্রায় সবাই কম-বেশী সচেতন। সারা ভারতে গ্রন্থাগার-ব্যবস্থার প্রসার ও উন্নতির জন্যে সবচেয়ে বড় শক্তি হতে পারতেন এঁরাই। কিন্তু তা হয়নি; কারণ, এঁদের অধিকাংশই আজও গ্রন্থাগারকে দেখেন অবসর-বিনোদনের উপকরণের যোগানদার হিসেবে।

আর একটি কথা। নিজেরা সভ্যশ্রেণীভুক্ত হয়ে বা না হয়েও যে-সব মহিলা সাধারণ গ্রন্থাগারের বই পড়েন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই এই শ্রেণীর পাঠক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

এই শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাদের নিয়ে গ্রন্থাগার-কর্মীর কোন ঝামেলা নেই। মোটামুটি সুখপাঠ্য যে-কোন একটা বই পেলেই এঁরা খুশী। ব্যক্তিগত রুচি ও প্রবণতা বুঝে মাঝে মাঝে দু-চারটে বাছা বই এঁদের পড়তে দিন; হাসিমুখে কৃতজ্ঞতার সানন্দ স্বীকৃতি জানাবেন এঁরা। বাইরেও এঁরাই হবেন আপনার সবচেয়ে বড় প্রশংসাকারী।

বই ফেরৎ দেওয়ার সময় হয়ত এঁদের একজন একটা বইয়ের খুব প্রশংসা করছেন। আপনিও তাঁর কথায় যোগ দিন এবং অনুরূপ আরও দু-একটি বইয়ের প্রশংসা করুন। দেখবেন, খুসীর আলোয় ভরে উঠল তাঁর মুখটি। আপনার উল্লিখিত বই-ক'টি পড়বার জন্যে খুবই আগ্রহান্বিত হলেন তিনি। এইবার তাঁকে সত্যিকারের ভাল একটি বই পড়তে দিন। পড়া হয়ে যাওয়ার পর যখন তিনি ফেরৎ দিতে আসবেন, তাঁর কৃতজ্ঞতা থেকে তখন নিশ্চয়ই প্রেরণা পাবেন আপনি। এইভাবে হাল্কা গল্প উপন্যাসের চক্রব্যূহ থেকে বের করে এনে ক্রমে প্রকৃত সদ্‌গ্রন্থের রসে মজিয়ে তুলুন। সত্যিকারের মহৎ কাজ সম্পাদনের গৌরব ও আনন্দ লাভ করবেন।

কী এঁদের হওয়া উচিত ছিল, কী এঁরা হতে পারতেন—সে-সব ভেবে

মন-খারাপ করে লাভ নেই। এঁরাই আমাদের সাধারণ গ্রন্থাগারের সবচেয়ে বড় asset। এঁদের মর্যাদা দিন; আপনিও প্রশংসা ও মর্যাদা পাবেন।

সবচেয়ে তাঁদের কথা, যাঁরা চিবোন এবং হজম করেন।

এঁদের সেবা করতে পাবার সুযোগ পেলে নিজেদের ধন্য মনে করে যে-কোন দেশের, যে-কোন সমাজের যে-কোন গ্রন্থাগার। সংখ্যায় এঁরা নেহাতই মুষ্টি-মেয়। গ্রন্থাগার- কর্মীমাত্রেরই নমস্য এঁরা; কিন্তু এঁদের অনেকেই একটু খুঁত-খুঁতে। দু-চারজন ঋষি-কল্প মানুষ এই শ্রেণীর পাঠকদের মধ্যে মাঝে মাঝে মেলে যাঁরা যথার্থই জ্ঞান-তপস্বী।

বই-পত্র, আসবাব, ঘর-দোর—সবকিছুরই অপ্রতুলতা ও ত্রুটি সম্বন্ধে এই শ্রেণীর বেশীর ভাগ পাঠকই বড় বেশী সচেতন। চাখ্‌নেওয়ালা পাঠকশ্রেণীর মত সে-সব নিয়ে হৈ-চৈ করেন না এঁরা—এইটকুই যা রক্ষে। মনে মনে দোষ-ত্রুটি-গুলো ক্ষমা করতে পারুন আর না-ই পারুন, সেগুলো সয়ে থাকার ঔদার্যটুকু অন্ততঃ এঁদের আছে। চাহিদাটাও বড় বেশী উঁচু পর্দায় বাঁধা এঁদের।

বই-পত্র যখন যেটি চাইবেন এঁরা, কোন কথা না বলে চট্‌পট্‌ দিয়ে দিন। ব্যস্‌, তাহলেই নিশ্চিন্ত। এঁদের দ্বারা শান্তি বিঘ্নিত হবার আশঙ্কা নেই।

পাঠকরাও মানুষ। আমরা গ্রন্থাগার কর্মীরা যেমন দোষ-ত্রুটি ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নই, তাঁরাও তেমনই। হাজার মানুষ নিয়ে আমাদের কাজ, তাঁদের সবাই আমাদের মনের মত আদর্শ পাঠক হবেন—এটা আশা করাই ত' ভুল। প্রায়ই আঘাত পেতে হয়, স্বপ্নভংগের দুঃখও মনে বেঁধে; এর মধ্যেও অন্ততঃ একটি সান্ত্বনা আমাদের আছে—মাঝে মাঝে এমন দু চারজন পাঠক আমরা পাই, যাঁরা খাঁটি সোনা। এইসব সুধী রসবেত্তার প্রজ্ঞার প্রদীপ্ত আলোয় পথ চিনেই এগিয়ে চলতে হবে গ্রন্থাগারসেবীদের।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা ঃ

কিশোর গ্রন্থালয়ে রবীন্দ্র উৎসব

৩রা জুলাই সন্ধ্যায় মুকুলবীথি শিশু বিদ্যালয়ে গ্রন্থালয়ের সভ্যরা রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালন করেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীমতী রেণুকা সেন। সংগীত পরিবেশন করেন কুমারী অর্চ্চনা পাল, শ্রীসুভাষ রায়, শ্রীদেবব্রত গুপ্ত ও শ্রী অংকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন শ্রীঅমিয় সেন, শ্রীগণেন্দ্রকৃষ্ণ দে। কবিতা আবৃত্তি করেন শ্রীরণজিৎশেখর চন্দ্র ও কুমারী অর্চ্চনা পাল। শ্রীমতী রেণুকা সেন তাঁহার ভাষণে গ্রন্থালয়ের সভ্যদের নিয়মিত রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনা ও সাহিত্য চক্র অনুষ্ঠানের পরামর্শ দেন।

তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগারের দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা

বিগত ১২ই জুন ৪নং ঘোষ লেনস্থ ভবনে পাঠাগারের দ্বাদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক তাঁহার বার্ষিক বিবরণীতে বলেন যে গত বৎসরে পাঠাগারের উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলির মধ্যে পুস্তক তালিকা মুদ্রণ অন্যতম।

সভায় পরবর্তী বৎসরের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভাশেষে ১৫ই মে রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সভাপতির ভাষণে আগামী রবীন্দ্র শত বার্ষিকী পালন উপলক্ষে কবির জীবনের বিভিন্ন সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর একটি চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, কবির উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর উপর বক্তৃতার আয়োজন ইত্যাদি করার জন্য তাঁহার মতামত প্রকাশ করেন।

চব্বিশ পরগণা ঃ

গাববেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগারের রজত জয়ন্তী উৎসব

গত ৯ই এবং ১০ই এপ্রিল গাববেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগারের ২৫ বর্ষ পূর্ত্তি উপলক্ষে রজত জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। উভয় দিনের সভায় শ্রীহংসধ্বজ

ধাড়া সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন উপমন্ত্রী শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র। গ্রন্থাগার কর্তৃক এক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয় এবং কবি শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় উহার দ্বারোদ্ঘাটন করেন। রজত জয়ন্তী উপলক্ষে গ্রন্থাগার কর্তৃক একটি স্মরণী পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। সাধারণ সম্পাদক শ্রীরেবতীরমণ হালদার গ্রন্থাগারের ২৫ বৎসরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও কার্যবিবরণী পাঠ করেন। প্রধান অতিথি শিক্ষা প্রসারে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে গ্রন্থাগারের কর্মীদের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং ইহার উন্নতির দিকে আরও সজাগ দৃষ্টি দিতে বলেন। দ্বিতীয় দিনে পুস্তক বিতরণী সভায় শ্রী টি, এ, মেনন আই, সি, এস, (আর) বিভিন্ন প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীদিগকে পুরস্কার বিতরণ করেন। রাজ্য সরকারের প্রচার দপ্তর কর্তৃক চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় এবং ১২ই এপ্রিল রাজ্য সরকারের নৃত্য-নাট্য-সংগীত বিভাগ কর্তৃক তরজা গান গীত হয়।

কুলপী-থানা গ্রন্থাগার সম্মেলন

গত ১০ই এপ্রিল গাববেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগারের রজত জয়ন্তী উৎসব মণ্ডপে স্থানীয় গ্রন্থাগারের উদ্যোগে কুলপী থানার গ্রন্থাগারসমূহের এক আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা হয়। সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীফণিভূষণ রায়। কুলপী থানার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিরা সভায় যোগদান করেন। শ্রীরেবতীরমণ হালদার গ্রামীণ গ্রন্থাগার-সমূহের বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁহার সুচিন্তিত অভিভাষণে উক্ত সমস্যা সমূহের যথাযথ সমাধানের উপায় নির্দ্দেশ করেন। সবশেষে তিনি গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সহ-সম্পাদক শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরীও উক্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

মুলাজোড় তারকচন্দ্র গ্রন্থাগারে বঙ্কিম জয়ন্তী

গত ২৫শে আষাঢ় গ্রন্থাগারের কার্যকরী সমিতি কর্তৃক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ১২২ তম জন্মজয়ন্তী পালিত হয়। সভায় সভানেত্রীত্ব করেন স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী শ্রীমাধুরী রায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের বাংলা ভাষার অধ্যাপক সত্যজিৎ চৌধুরী। সভায় বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা ও প্রবন্ধের অংশ পাঠ এবং জীবনী ও সাহিত্যধর্ম্মের

পর্য্যালোচনা করেন অধ্যাপক সীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বশ্রী চিন্তামনি মুখোপাধ্যায়, বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং শিপ্রা রায়।

অধ্যাপক চৌধুরী বিশেষ জোরের সহিত কাঁঠালপাড়া (নৈহাটী) স্থিত 'বঙ্কিম-সংগ্রহশালার' প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন এবং সরকার যাহাতে এই বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টিপাত করেন তাহার জন্য আবেদন জানান।

কুচবিহার ঃ

পি, ডি, এন, এন, গ্রন্থাগারের রবীন্দ্র ভবনের ভিত্তি স্থাপন

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর গত ২৭শে বৈশাখ এক অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারের রবীন্দ্র ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। উত্তর বাংলার সুদূর সীমান্তের পল্লী অঞ্চলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হিসাবে 'রবীন্দ্র ভবন' নির্মাণ প্রচেষ্টার প্রশংসা করে অধ্যাপক কবীর ভবন নির্মাণ তহবিলে এক হাজার টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন এবং আজীবন সদস্যপদ গ্রহণে সম্মত হন।

অনুষ্ঠানটি গ্রন্থাগারের নয়দিনব্যাপী রবীন্দ্র জন্মোৎসবের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উৎসবে গ্রন্থ ও চিত্র প্রদর্শনী, নৃত্য, নাটক ও সঙ্গীতের অনুষ্ঠানগুলিতে দৈনিক তিন হাজার লোক যোগদান করেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে শ্রীনিকেতনের অধ্যক্ষ শ্রীকালিপদ বিশ্বাস, শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর; অধ্যাপক নির্মল বসু প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেন।

মেদিনীপুর ঃ

শহীদ পাঠাগার ॥ বড়বাসুদেবপুর

গত ২৭শে জুন পাঠাগারের ত্রয়োদশ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীকেদারনাথ বেরা। শ্রীবিল্বপদ জানা বিগত বর্ষের কার্য-বিবরণী পাঠ করেন। সুতাহাটা থানার শিক্ষক সমিতি পাঠাগারকে একশত টাকা মূল্যের গ্রন্থ দান করেছেন বলে জানা যায়। ঐ দিনের সভায় জেলা সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক শ্রীগদাধর নিয়োগী, শ্রীতিনকড়ি দত্ত ও শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন।

হুগলী ঃ

বিবেকানন্দ পাঠাগার ॥ চাতরা

১১ই জুন বিবেকানন্দ পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীফণিন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করেন। বিধান সভা সদস্য শ্রীব্যোমকেশ মজুমদার ও ইউ, এস, আই, এস লাইব্রেরীর ডাইরেক্টর শ্রীমতী রুথ ক্রুগার প্রধান ও বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠাগারের ক্রমোন্নতির এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দান করেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভাষণের পর শ্রীমতী ক্রুগার পাঠাগারের হস্তলিখিত 'উদীচি' পত্রিকার চতুর্থ সংখ্যা আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেন। পরবর্তী দিনে সন্ধ্যায় পাঠাগারের সদস্যরা 'বিদ্রোহী' ও 'দুই মহল' নামে দুটি নাটক অভিনয় করেন।

বার্তা বিচিত্রা

গ্রন্থ বর্গীকরণে সুগন্ধি দ্রব্য ও রঙের ব্যবহার

নিউ ইয়র্কের এক প্রকাশক (ইষ্টবোর্ণ) স্থির করেছেন যে, তাঁর কোম্পানীর বইগুলি ছাপার সময় কতকগুলি সুগন্ধি দ্রব্য ও রঙের ব্যবহার করা হবে যার সাহায্যে বইগুলিকে অনায়াসে গন্ধ ও বর্ণের সাহায্যে চট করে বের করে ফেলা যায়। মুস্কিল হচ্ছে যে, বর্ণের মেয়াদ বইয়ের আয়ুস্কালীন হবে বটে, তবে প্রস্তাবিত গন্ধ মাস চারেকের বেশী থাকবে না। ফুলের চাষের উপর বইগুলিতে ফুলের গন্ধ; রান্নার বইয়ে সেঁকা রুটির অনুরূপ গন্ধ এবং গল্পের বইয়ের গন্ধ থাকবে কাঁচা চামড়ার গন্ধ। এ ছাড়া বইয়ের পিছনে নির্দিষ্ট চার ধরণের রঙের চিহ্ন থাকবে—রহস্যোপন্যাসের জন্য লাল, সাধারণ উপন্যাসের জন্যে নীল, এ্যাডভেঞ্চারের জন্যে হলদে আর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি সবুজ রঙে রঞ্জিত হবে।

[Liaison]

লেনিনের গ্রন্থাবলী বিশ্বে সর্বাধিক অনূদিত

বর্তমানে বিশ্বে কোন্ লেখকের বই বিভিন্ন ভাষায় সর্বাপেক্ষা বেশী অনূদিত হয়েছে, এ কৌতুহল অনেকের জাগে। শেকস্‌পীয়র, রবীন্দ্রনাথ, তলস্তয়

প্রভৃতির বই শীর্ষস্থানীয়। সম্প্রতি ইউনেস্কোর এক হিসাবে প্রকাশ যে, সোভিয়েত দেশ অনুবাদে সকলকে ছাপিয়ে গেছে। বিগত বর্ষে সোভিয়েতে সাড়ে চার হাজার বই অনুবাদ হয়েছে এবং হিসাবে আরও দেখা গেছে যে লেনিনের গ্রন্থাবলীই সারা বিশ্বে এবার সকল ভাষায় সর্বাপেক্ষা অধিক অনূদিত হয়েছে। [Index Translationum]

গ্রন্থাগারিক বৃত্তিতে মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি

ইউরোপ ও আমেরিকার অধিকাংশ দেশে গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই অধিক। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সুবিখ্যাত বহু দিকপালই হলেন মহিলা। এদেশেও বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গে মহিলা কর্মীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বহু দায়িত্বপূর্ণ পদে মহিলা কর্মীরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সম্প্রতি বিলাতের নরউইচ অঞ্চলের গ্রন্থাগার অধিকারের এক হিসাবে প্রকাশ যে সেখানকার বত্রিশ জন কর্মীর মধ্যে মাত্র পাঁচ জন হলেন পুরুষ। তাও তাঁরা জুনিয়র পদে কাজ করছেন। (L.A.R.) অনেকে সেজন্য মনে করছেন যে গ্রন্থাগারিকতা অদূর ভবিষ্যতে মহিলাদের একচেটিয়া বৃত্তিতে পরিণত হবে।

গৃহ নির্মাণের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্য

দেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন ও শিক্ষা সম্প্রসারণের কার্যে তিন বছরের অধিক-কাল রত রেজিষ্ট্রিকৃত প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য দানের জন্য ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের দপ্তর থেকে গৃহ নির্মাণ বাবদ অর্থ সাহায্য দানের এক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। নৃত্য, নাটক, সংগীত, সাহিত্য, চারুকলা প্রভৃতি বিষয়ের সংস্থাগুলি এই সাহায্য পাবেন বলে প্রকাশ।

পরিষদের সপ্তাহান্তিক শিক্ষণের ছাত্রছাত্রীদের প্রীতিসম্মেলন

গত ১০ই জুলাই বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের সপ্তাহান্তিক বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় গ্রন্থাগারে অনুষ্ঠিত এক প্রীতি সম্মেলনে মিলিত হন। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষণের অধ্যক্ষ শ্রী বি, এস, কেশবন। উপস্থিত শিক্ষকগণের মধ্যে অনেকে ঐ সভায় ভাষণ দান করেন। সংগীত, আবৃত্তি ও স্বরচিত কবিতা পাঠ অনুষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত ছিল।

গ্রন্থ সমালোচনা

মৌমাছিতন্ত্র ॥ শিবনারায়ণ রায় ।। রেণেসাঁস পাব্লিশার্স ।। সাড়ে তিন টাকা ।

মৌমাছিতন্ত্র, গণতন্ত্র ও সমাজ, চার্চ, রেণেসাঁস ও গণতন্ত্র তিনটি প্রবন্ধ নিয়ে বইটি। প্রত্যেকটি প্রবন্ধ বিশেষ ভাবে আলোচিত। প্রথম প্রবন্ধটিতে আলোচিত হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ এবং সমাজ ও মানুষ মনের ওপর তার প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে। গণতন্ত্র ও সংস্কৃতি প্রবন্ধে তিনি একালের সমাজের সামগ্রিক চেহারাটা ফুটিয়ে তুলিয়েছেন বহু তথ্যপূর্ণ ঘটনা এবং বিভিন্ন দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের সুচিন্তিত মতামতের সাহায্যে। সাহিত্য, রেডিও, সিনেমা, বিজ্ঞাপন, খবরের কাগজ এবং টেলিভিসন একযোগে কি ভাবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ব্যক্তি মানুষের বিরুদ্ধে কাজ করে চলেছে এবং ধীরে ধীরে কেমন করে আর এক নতুন ধরণের দাসত্বের মধ্যে টেনে নিয়ে চলেছে সমগ্র মানব সমাজকে তার বিস্তৃত আলোচনা আছে এই অংশটিতে। এ সম্বন্ধে লেখক খুব সুস্পষ্ট ভাষায় একস্থানে নিজের মত উল্লেখ করে বলেছেন; "আমার ধারণা আধুনিক সভ্যতার সব চাইতে বড় গলদ তার প্রবল কেন্দ্রাভিগ গতি এবং এই গতিকে অপ্রতিরোধ্য বলে স্বীকার করে নেবার মনোভাব। রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবণতার পরিণতি সর্বগ্রাসী স্বৈরতন্ত্রে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে দানবীয় কর্পোরেশনে এবং পরিশেষে উৎপাদন ও বন্টণ ব্যবস্থায় পরিপূর্ণ রাষ্ট্রীয় মনোপলির প্রতিষ্ঠায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মনের সর্ববিধ প্রকাশকে একই ছাঁচে ঢালায় এবং মানসিক স্বাধীনতার সম্পূর্ণ বিলোপ।"

শিবনারায়ণ নিজে একজন মানবতন্ত্রী (humanist) এবং সেই কারণে সমাজ, রাষ্ট্র এবং রাজনীতি সব কিছুই বিচার করেছেন ব্যক্তি মানুষের মাপকাঠিতে। তাঁর সমস্ত প্রবন্ধতেই সেই মানবতন্ত্রী দর্শনের কথাই উচ্চারিত হয়েছে। শেষাংশে মানবতন্ত্রের ঐতিহাসিক বিবর্ত্তনের আলোচনা খুবই মনোজ্ঞ, ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেরই পক্ষে উপযোগী। তাছাড়া মানবতন্ত্রী দর্শনের পরিচয় লাভের পক্ষে বইখানি একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়। অনেক বিষয়ে তাঁর সংগে হয়ত মতের মিল না হতে পারে কারোর। প্রত্যেক বিষয়েই

দ্বিতীয় মত প্রকাশের উপযুক্ততা সম্বন্ধে যদি কারো দ্বিধা না থাকে (সুস্থ সামাজিক পরিবেশের জন্যে সব সময়ই প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মত প্রকাশের প্রচেষ্টা অত্যন্ত সাধু বিবেচিত) তবে নিশ্চয়ই একথা বলা চলে যে বহু রাজনৈতিক আদর্শ এবং সমাজ দর্শনের ভীড়ের মধ্যে ঐতিহাসিক মানবতন্ত্রী দর্শন নতুন রূপে আত্মপ্রকাশ করে এদেশের রেনেসাঁস আন্দোলনেরই আর এক নতুন অধ্যায় রচনা করবার প্রতিশ্রুতি বহন করছে। চিন্তা জগতে আর একবার বিপ্লব না এলে সমাজ জীবনে প্রবাহিত পুরোণ এবং নতুন ময়লা পরিস্কার হবে না।

শিবনারায়ণের সুতীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ, অপূর্ব যুক্তি প্রয়োগ এবং পান্ডিত্যের গভীরতা পাঠক মাত্রকেই নিশ্চয়ই মুগ্ধ করবে। **—প্রবোধ ভট্টাচার্য**

সুতোর জন্মকথা। স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ। বিবেকানন্দ শিল্পী সংঘ। পৃষ্ঠা ৪৬। মূল্য ১৲।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকটির বিষয়বস্তু হল পশম সুতো। পশমকে মানুষ কেমন করে প্রথম কাজে লাগিয়েছে এবং পশম থেকে সুতো কাটার বর্ত্তমান প্রণালী কি; লেখক অতি সহজ ভাষায় তা জানিয়েছেন। পশম সুতো আমাদের কাছে একটা বড় রকমের কুটীরশিল্প হতে পারে। এবং এই সুতো নিজে হাতে কেটে নিজেদের প্রয়োজনীয় গরম কাপড় তৈরি ক'রে নিতে পারি। লেখক সেই কথাই বলেছেন, এবং আমাদের জানিয়েছেন যে এ দেশে পশমশিল্পের একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যত রয়েছে। সারা ভারত কেবলমাত্র দার্জিলিং জেলা, কাশ্মীর আর পাঞ্জাব ছাড়া আর কোথাও পশমশিল্পের তেমন প্রসার নেই। পশম-সুতো কাটার দিকে মন দিলে এ শিল্পের প্রসার সকল স্থানেই হ'তে পারে এবং দেশের বেকার সমস্যারও কিঞ্চিৎ লাঘব হয়।

পুস্তকটি সচিত্র, এবং আর্ট কাগজে সুন্দর ভাবে ছাপা। শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসুর আঁকা প্রচ্ছদপটটি বইটির মূল্য বাড়িয়েছে।

বইটির নামকরম যথোপযুক্ত হয়েছে ব'লে মনে করি না বর্ত্তমান নাম বইয়ের প্রকৃত বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্য ব্যঞ্জিত করে নি।

—আদিত্য ওহদেদার

সম্পাদকীয়

লেখক-পাঠক-প্রকাশক-গ্রন্থাগারিক

গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশনে পাঠকের ভূমিকা এ সংখ্যার প্রবন্ধগুলিতে আলোচিত হয়েছে। বস্তুতঃ পাঠকের চাহিদা ও রুচিই পরোক্ষে গ্রন্থ-প্রকাশনকে প্রভাবিত করে থাকে। লোকে নেবে না জেনেও এমন লেখায় প্রবৃত্ত হবার মত লেখকের সংখ্যা কম, আর যে অর্থনৈতিক কাঠামোয় উৎপাদনের লক্ষ্য মুনাফা সেখানে লাভ না হোক লোকসানের সম্ভাবনা থাকলে অলাভের উৎপাদনে কোন ব্যবসায়ীই উদ্যোগী হবেন না। সিনেমাই হোক আর সাহিত্যই হোক তা লোকের রুচি ও মেজাজ বুঝেই সৃষ্ট হয়। অনুমিত অলাভের উৎপাদনের ঝুঁকি নিয়ে অপ্রত্যাশিত সাফল্য লাভ করতে যাঁদের দেখা যায় সেটা লটারী-খেলার মত মনে হয় বটে, তবে ভাল বই বা সিনেমার একটা প্রচ্ছন্ন চাহিদা আছে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উৎপাদক সেই চাহিদাকে উৎসাহিত এবং তার সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন। উন্নত ধরণের সেই চাহিদাকে সক্রিয় ও জাগ্রত করে তুলতে পারলে কুরুচিপূর্ণ সাহিত্য ও শিল্পের সৃষ্টি ক্রমে বন্ধ হয়ে যাবে।

সাহিত্য ও শিল্প সমাজের প্রতিফলন মাত্র। সমাজ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন তার কোনও অস্তিত্ব নেই। সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক সাধারণ মানুষ যদি অশিক্ষা, কুশিক্ষা ও অর্ধশিক্ষায় নিমজ্জিত থাকে তাহলে দেশের শিল্প-সাহিত্যের মান উন্নত না হওয়াই স্বাভাবিক।

মানুষের সুরুচি, শুভবুদ্ধি ও মানবিক সত্তাকে সাহিত্যিক অবশ্যই জাগিয়ে তুলতে পারেন। যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করে তাঁরা তা করেনও। কিন্তু আশু জীবনধারণের তাড়নায় তাঁদের প্রকাশকদের মুখপানে চেয়ে থাকতে হয়। প্রকাশক করতে বসেছেন ব্যবসা। আদর্শ নয়। তাই তাঁরা প্রথমে লাভ-লোকসানের কষ্টিপাথরে সাহিত্যের মূল্য খতিয়ে দেখেন। তবুও লোকসানের ঝুঁকি নিয়েও ভাল বই ছেপে থাকেন এমন প্রকাশক বিরল নয়। কিন্তু অধিকাংশ প্রকাশককে ব্যবসায়ের সাধারণের নিয়মানুযায়ী দেখতে হয় লগ্নীকৃত অর্থ জলে যাচ্ছে কিনা। কাজেই লেখা ও প্রকাশনার ব্যাপারটা একটা বিষাক্ত আবর্তেই ঘুরছে। এর একমাত্র উপায় শিক্ষার সম্প্রসারণ ও পাঠকের রুচির

পরিবর্তন। শিক্ষার সম্প্রসারণ সংকুচিত বইয়ের বাজারকে প্রসারিত করবে এবং পাঠকের সুরুচি সুসাহিত্য প্রকাশকে প্রভাবান্বিত করবে।

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যকে পেশা হিসেবে নিতে বারণ করতেন। কারণ উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন হলে রসোত্তীর্ণ শিল্প সৃষ্টি হয় না। কিন্তু সময় বদলে গেছে। এখন নেশা আর পেশার সমন্বয়ের দিন এসেছে। উপার্জনের জন্যে ভিন্নকাজে সময় ও কর্মশক্তি নিঃশেষিত করে এসে ক্লান্ত দেহমন নিয়ে শিল্পী বা সাহিত্যিক কি সৃষ্টি করবেন? কাজেই তাঁদের জীবন ধারণের নিরাপত্তা দরকার। প্রকাশকদের প্রলোভন ও নিজেদের আর্থিক দুরবস্থা লেখকদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও লিখতে বাধ্য করে। জীবিকার দায়িত্ব রাষ্ট্র গ্রহণ করলে অবাঞ্ছিত গ্রন্থ প্রকাশ বাধা পাবে।

প্রকাশকদের নিন্দা করা নিরর্থক। আগেই বলেছি তাঁরা ব্যবসা করতে বসেছেন। সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে নয়। কাপড় বা চিনির কারবারী যে সমাজে নির্বিঘ্নে চোরা কারবারে লিপ্ত সেখানে বইয়ের কারবারীর কারচুপিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখে কোন লাভ নেই। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে। প্রকাশনা শিল্প, সমাজ-দেহেরই একটা অঙ্গ। সমগ্র দেহ রোগাক্রান্ত হলে অংশবিশেষকে রোগমুক্ত করে রাখা যায় না।

নিজ নিজ গ্রন্থে প্রকাশকদের একচেটিয়া স্বত্ব থাকার দরুণ তাঁরা আর কাগজ, মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন বোধ করেন না। নিকৃষ্ট মালের বিনিময়ে যথাসম্ভব বেশী দাম উসুলের চেষ্টা এদেশের ব্যবসায়ীদের চরিত্রগত ব্যাপার। তাই বিলিতি মালের প্রতি সাধারণ লোকের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ দেখা যায়। বাংলা বই যদি বিলেত থেকে ছেপে আসত তাহলে এখানকার বই আর কেউ নিতে চাইত কিনা সন্দেহ! বইয়ের ব্যবসায়ীদের কাছে অনুরোধ যে তাঁরা নিজেদের ব্যবসায়ের উন্নতি ও প্রসারের জন্যে নীতিনিষ্ঠ ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন হোন। নইলে ফলটা একদিন হাঁস মেরে সোনার ডিম পাবার মত অবস্থা ঘটবে। আর একটা আশঙ্কাও আছে। সেটা, এই যে বড়বাজারের এলাকাটা চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে শেষ হয়েছে। কলেজ ষ্ট্রীট অবধি এগিয়ে আসাটা বিচিত্র নয়। প্রকাশকদের অজস্র অসুবিধা ও বাধা আছে জানি। বিশেষ করে পূর্ব বাংলা চলে যাবার পর বাংলা বইয়ের বাজার অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়েছে। কাজেই এখন পশ্চিম বাংলার বাজারই একমাত্র ভরসা। পশ্চিম বাংলার জনসংখ্যা আড়াই কোটীর উপর। কিন্তু বই ছাপা হয় বড় জোর বাইশ শ'। জনসাধারণের

শিক্ষার হার উন্নত হলে এবং মানুষকে গ্রন্থমুখী করে তুলতে পারলে প্রকাশনা ব্যবসায়ের উন্নতির সাথে সাথে সাহিত্য ও শিল্পের উন্নতির সুযোগ দেখা দেবে।

বইয়ের বাজারের সবচেয়ে বড় খদ্দের হোল গ্রন্থাগারগুলি। সেগুলি কিন্তু পূর্বোক্ত বিষাক্ত আবর্তের বাইরে নয়, অর্থাৎ সেগুলিকেও তাদের সদস্যদের মন যুগিয়ে হাল্কা ও বাজে বইপত্তরে আলমারি বোঝাই করতে হয়। তাহলে আবর্ত থেকে বোরোবার উপায় কি? উপায় হোল যাঁরা বই পড়েন তাঁদের ক্রমে ক্রমে রুচির পরিবর্তন ও যাঁরা বই না পড়েন তাঁদের বই পড়তে উৎসাহিত করা, ভালমন্দ বই সম্বন্ধে আলোচনা-সভার আয়োজনও একটা ভালো পন্থা। বিলেত ও আমেরিকার গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থাগারিকরা সদস্যদের সঙ্গে নিয়মিত 'বুক রিভিউ' সভায় মিলিত হন। এখানেও কি তা করা চলে না? তাছাড়া বই ও বইয়ের প্রচ্ছদপট সুন্দরভাবে প্রদর্শন করে পাঠকদের নজর ভালো বইয়ের প্রতি সহজে আকৃষ্ট করা যায়। সদস্যদের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনা ও সদস্যদের গ্রন্থ-নির্বাচনের সময় তাঁদের পরামর্শ ও সাহচর্য দানের ভেতর. দিয়ে পঠনপাঠনের মান উন্নত করা যায়। গ্রন্থ-ক্রয় বাবদ বরাদ্দ টাকা খরচ করতে হবে বলে বাজারে ভালো বই না পেলেও বাজে বই-ই কিনতে হবে একথা যুক্তিহীন। এবং ভালো বই যার চাহিদা বেশী তার একাধিক কপি কেনা কিংবা ভালো ইংরাজি বই কেনা উচিত। গ্রন্থাগার কর্মীরা যত্নবান হলে প্রবন্ধের বই ও ইংরাজি বই পড়ার অভ্যাস বৃদ্ধি করা যায়, ভালো বইয়ের চাহিদা কম হলেও সাধ্যমত কেনা দরকার এবং সদস্যদের চাহিদা আছে বলেই বাজে বই ও পত্রিকা ঢালোয়া কিনে যেতে হবে এ নীতি গ্রহণ করলে অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে না।

মোটের উপর মানুষের চাহিদা ও রুচির মোড় ফেরাতে না পারলে অবাঞ্ছিত অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়। এ দায়টা শুধু গ্রন্থাগারিকের একার নয়। গ্রন্থ-শিল্পের সঙ্গে যাঁরা জীবিকাসূত্রে জড়িত তাঁদের বিশেষভাবে সক্রিয় হতে হবে : আদর্শ ও উন্নত মানের গ্রন্থ প্রকাশনে পাঠকের রুচি ও চেতনা সৃষ্টির জন্যে লেখক ও পাঠক, প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে ঘনিষ্ট সংযোগ ও সহযোগিতা আবশ্যক। সে জন্য সম্মিলিত উদ্যোগে সভা, সম্মেলন, প্রদর্শনীর আয়োজন করা দরকার। তাড়ির নেশায় বিভোর মানুষকে শুধু নিন্দা বর্ষণ করলেই চলে না, অমৃতের সন্ধানও দেওয়া চাই।

শতীস চন্দ্র গুহ

প্রবীন গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ ও 'প্রাচ্য বর্গীকরণ' পদ্ধতির উদ্ভাবক এলাহাবাদ প্রবাসী শ্রীসতীশচন্দ্র গুহের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া গেল। খবরটি গ্রন্থাগার কর্মিদের নিকট খুবই আকস্মিক ও বেদনাদায়ক। গ্রন্থাগার বিদ্যায় যেসব ভারতীয়দের মৌলিক দান আছে সতীশচন্দ্র তাঁদের মধ্যে ছিলেন অন্যতম। প্রথম জীবনে স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। পরে তিনি কাশীতে গ্রন্থাগারিক বৃত্তি গ্রহণ করেন। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মৌলিক চিন্তা ও গবেষণা-কার্য ছাড়াও অধুনালুপ্ত 'ইন্ডিয়ানা' পত্রিকার তিনি কিছুকাল সম্পাদনা করেন। তাঁর বহু কাজ অসমাপ্ত ও বহু পাণ্ডুলিপি অপ্রকাশিত রয়ে গেছে। অবসর গ্রহণের পর তিনি আমরণ কাল গ্রন্থাগার বিদ্যার অনুশীলন ও লেখায় জীবন অতিবাহিত করেন। ইদানিং 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ অনেকের মনে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল। তাঁর মৃত্যু ভারতের গ্রন্থাগার বিদ্যার ক্ষেত্রকে ক্ষতিগ্রস্ত করল। তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধা জানাই।

সুধীন্দ্র নাথ দত্ত

রবীন্দ্রোত্তর যুগের একজন জ্যেষ্ঠ কবি ও শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক সুধীন্দ্র নাথ দত্ত হঠাৎ চলে গেলেন। আধুনিক কবিদের অগ্রগণ্য সুধীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুক্তি ও আবেগ, বুদ্ধি ও অনুভূতির সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। সুধীন্দ্রনাথকে তাঁর অনুরাগীরা শুধু কবি বা দার্শনিক, সাংবাদিক বা সম্পাদক, কিংবা চিন্তানায়ক ও অধ্যাপক হিসেবেই দেখেন নি। তাঁর সুমধুর আলাপন ও ব্যক্তিত্বের মাধুর্যেও সকলে অভিভূত ছিল। তাঁর অভাব বহুকাল অনুভূত হবে। আমরা তাঁর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।

শ্রাবণ ১৩৬৭

পশ্চাৎপট

এস. আর. রঙ্গনাথন

[যে মানসিক প্রস্তুতির মধ্য দিয়া ডক্টর রঙ্গনাথনের গ্রন্থাগার আইনের প্রতি আকর্ষণ ও অনুরাগ দেখা দিয়াছিল, তাহা তিনি তাঁহার 'লাইব্রেরী লেজিসলেশন' নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। উক্ত অংশটি পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে। অনুবাদ করিয়াছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত।]

এই বিবরণটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার আইন ও মাদ্রাজ গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচায়ক। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে সে কথাই ব্যক্ত করতে চেয়েছি।

0১ সঞ্চালক

১৯২৪-এর নভেম্বর। লণ্ডনে আমি এক গ্রামীণ গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদান করেছিলাম। সম্মেলন আহ্বান করেছিলেন যুক্তরাজ্যের কার্ণেগী ট্রাষ্ট। লর্ড হ্যালডেন বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "রাজনৈতিক দলগুলি সহজে কোন বিষয় নিয়ে আন্দোলন করে না। যখন করে তখন জনসাধারণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকে। তারা বলে, 'এটা এমন একটি ব্যাপার যা নিয়ে ভোট পাওয়া যেতে পারে।' এখন সাধারণ গ্রন্থাগার এ অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে—এমন কি গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থাও এ পর্য্যায়ে পৌঁচেছে। এ্যান্ড্রু কার্ণেগী চারটি অঞ্চলে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রচলন করেন। এরপর সরকার বা কাউন্টি কাউন্সিল এই সব অঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা অস্বীকার করতে পারেননি। অপর অঞ্চলগুলিও এ ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনে আগ্রহশীল ছিল। এই নিয়ে আন্দোলন সুরু হল—তাকে আর প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না।" অপর একজন বলেছিলেন "গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় অর্থব্যয়

অপচয় নয়, বরঞ্চ তা বহুগুণে ফিরে আসে। একটি শিক্ষিত সম্প্রদায় গড়ে তোলার জন্য ও অবসর বিনোদনের এই আনন্দ ও জ্ঞানদায়ক ব্যবস্থার জন্য ব্যয় বিধেয়। এই নতুন অভিজ্ঞতা আমার জীবনে সঞ্চালকের কাজ করলো।

০১১ সহরে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

আমার কাছে এ ধারণাগুলো নতুন ছিল। আমার কখনো মনে হয় নি যে জনসাধারণ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে এতটা আগ্রহান্বিত। আমার ধারণা ছিল যে কেবলমাত্র ছেলেরাই গ্রন্থাগার ব্যবহার করে। কদাচিৎ বয়স্কদের গ্রন্থাগার ব্যবহার করতে দেখেছি। আমার অনুসন্ধিৎসা জেগে উঠল। আমি প্রায় এক মাসের জন্যে ক্রয়ডন গিয়েছিলাম। এখানকার সাধারণ গ্রন্থাগারে আমি দিনের পর দিন কাজ করেছি। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত গ্রন্থাগারে উপস্থিত পাঠকের সংখ্যা দেখে অভিভূত হয়েছিলাম। আবালবৃদ্ধ-বণিতা, বিত্তবজ্জন, শ্রমিক নির্বিশেষে শহরের সমস্ত অধিবাসীদের নিরবচ্ছিন্ন সমাগম হোত। কোন কোন অপরাহ্ণে মহিলা সমাবেশ হোত। গ্রন্থাগারিক ঘণ্টাখানেক ধরে চিত্তাকর্ষক ভাষণে ও প্রদর্শনে তাঁদের নতুন বইগুলির সঙ্গে পরিচিত করে তুলতেন। কোন সন্ধ্যায় শিশুরা আসত গল্প শোনার জন্য। মাঝে মাঝে সান্ধ্য সঙ্গীতানুষ্ঠান ও নাট্যানুষ্ঠান হোত। আবার কোন দিন বিতর্ক সভা বসত। অন্যান্য দিন সর্বসাধারণের জন্য বক্তৃতা হোত ও এই বক্তৃতার শেষে গ্রন্থাগারের তাকের কাছে ভীড় জমে যেত ; লোকেরা বই নিয়ে যেত।

০১২ বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ

আমি কয়েক দিনের জন্য পাঠকক্ষের কাজ করেছিলাম—যাকে বলা হয় Reference Library। পাঠকদের অবহিত করার জন্য ডেস্কের উপর প্রস্তুত রাখা বিভিন্ন ধরণের ডাইরেক্টরী, বর্ষপঞ্জী, জীবনীকোষ, অভিধান, মানচিত্র ও বিশ্বকোষের বিচিত্র সমাবেশ আমাকে অভিভূত করেছিল। দশ মিনিটের জন্যেও সেগুলি পাঠকের হস্তক্ষেপ থেকে অব্যাহতি পেতো না। কোন মহিলা সেগুলি টেনে দেখার পরই হয়তো কোন শিক্ষক সেগুলি নিলেন, আর তারপরেই কোন রুটিওয়ালা তা' দেখতে লাগলো বা একজন নাপিত এলো এবং তার পরেও তার বিরাম নেই। এই অবিরাম উদ্দেশ্য প্রণোদিত দর্শক ছাড়াও পাঠকক্ষের আসনগুলি সব সময়েই ভর্ত্তি থাকতো। সকলেই পাঠে নিমগ্ন থাকতেন। কেউ কেউ

সারাদিনও কাটাতেন। মাঝে মাঝে এবং দিনের শেষে আমি বইগুলো পরীক্ষা করে দেখতাম। সমস্ত বিষয়ের ওপর বিভিন্ন মানের এবং বেশ কয়েকটি ভাষায় সব রকমের বই ছিল। আমার মনে হত, "এটা কি ক্রয়ডনেরই বিশেষত্ব?"

০১৩ দেশব্যাপী অভিমত

তারপর আমি নানা সহরে গেলাম। প্রত্যেকটি সহরে একটি গ্রন্থাগার আছে। প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারও পাঠক পরিকীর্ণ। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের সাথে সে প্রদেশগুলির গ্রাম-গ্রামান্তরে গেলাম; কৃষক, রাখাল, মেথর সকলেই বই পড়ে। শীতের দীর্ঘ সন্ধ্যায় বই সকলের কাছেই সমাদৃত। উদ্দীপনামূলক বইয়ের মধ্যে একটা নূতন আনন্দের উৎসানুসন্ধান তারা করেছিল। স্থানীয় চারু ও কারু শিল্পের উপর বইও তারা পড়ছিল। সেখানে চারু ও কারু শিল্পের প্রতিটি বিভাগের উপর সহজপাঠ্য বই ছিল। তাদের নিজস্ব চারু ও কারু শিল্পের উপর পঠনীয় বইয়ের একটি 'তালিকা' আমাকে দেখালো। ফরাসী ও ইংরাজী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ বইগুলির একটি মিশ্র তালিকাও তারা আমাকে দেখালো, "এগুলির যে কোনটি আমরা পেতে পারি এবং তা চাওয়া মাত্রই আমরা পাই। ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারটি প্রতিমাসে প্রায় ২০০০ বইয়ের একটি ছোটখাট গ্রন্থাগারকে আমাদের কাছে নিয়ে আসে।

আঞ্চলিক গ্রন্থাগারিক এরসঙ্গে আসেন। তিনি আলোচনা করেন ও বইগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। প্রত্যাশিত নতুন বই সম্বন্ধেও তিনি বলে থাকেন। আমাদের প্রয়োজন সম্পর্কে লিখে নিয়ে যান। পরের মাসে আসার সময় প্রাসঙ্গিক বইগুলি আনেন।" আমি বিস্মিত হলাম—প্রত্যেকটি গ্রামের জন্য একি করা সম্ভব? একি সত্যি? হতে পারে? অপর একটি গ্রাম পরিদর্শন কালে আঞ্চলিক গ্রন্থযান উপস্থিত হল। গ্রামবাসীটির সবকটি কথাই সত্য ছিল।

০১৪ শিশু গ্রন্থাগার

শিশু গ্রন্থাগারে প্রবেশ করলাম। ৫ থেকে ১৭ বছরের শিশু ও কিশোর কিশোরীরা সেখানে রয়েছে। তাদের চোখ অনুসন্ধিৎসায় উজ্জ্বল। মনে হোল, তারা সকলেই বই পড়তে অভ্যস্ত। বই-এর তাক থেকে তাকে তারা চঞ্চল ও

অনুসন্ধিৎসু চোখ বুলিয়ে গেল। তাদের দেখে আমার মনে হোল, এই উদ্দেশ্য-পূর্ণ ভাবে বই দেখাতে তারাও বেশ অভ্যস্ত। কয়েক মিনিট এ বইটা ও বইটা দেখার পর কয়েকটা বই-এর উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নেবার পর, একটা বা দুটো বই তারা ঝোলার মধ্যে রাখে। তারা বই 'ইস্যু' করে দেয়। কর্ম্মপরিবেষ্টনীতে নিয়ে আমি সেই ছেলেটিকে বললাম, "কাজ করার পক্ষে তুমি খুবই ছেলেমানুষ।" উত্তরে সে বলল, "না, না, আমি স্কুলে পড়ি। আমরা এখানে পালা করে কাজ করি। আমাদের করতে ভাল লাগে।" শিশু বিভাগের গ্রন্থাগারিক আমায় বললেন, অধিকাংশ কর্মসূচী ছেলেরা নিজেরাই করে। তাই শিশু গ্রন্থাগার পরিচালনা করা অপেক্ষাকৃত কম ব্যয়বহুল।

০১৫ দৃষ্টিহীণদের জন্য গ্রন্থাগার

দৃষ্টিহীণদের জাতীয় গ্রন্থাগারে গেলাম! একটি রয়্যাল মেল ভ্যানকে প্রচুর বই দিয়ে যেতে দেখলাম। গ্রন্থাগারে প্রবেশ করলাম। বইগুলোতে কোন অক্ষর নেই। মোটা কাগজে কন্টকিত নমুনা। শুনলাম, দৃষ্টিহীণেরা এ ধরণের বই আঙুলের সাহায্যে পড়ে। সেই গ্রন্থাগারের বই, যেখানেই থাকুক না, যে কোনও দৃষ্টিহীণের কাছেই পোঁছতে পারে। যে কোন বই, প্রয়োজনবোধে 'ব্রেইলে' পর্যবসিত করা হয়।

০১৬ প্রশ্নের বন্যা

এমন ভাবেই চলতে লাগলো; কয়েক সপ্তাহ হতবাক হয়ে রইলাম, বিস্মিত কৌতুহল বোধ করলাম। আমার মন ভারতবর্ষে ফিরে এল। আমরা নিজের দেশে এমন করিনা কেন? মানসচক্ষে রাস্তার মোড়ে, নিভৃত কোনে, মন্দিরে, স্নানেরঘাটে আড্ডার দৃশ্য ভেসে উঠ্লো। সম্ভাবনাপূর্ণ, প্রচ্ছন্ন মানসিক শক্তির কি বিপুল অপচয়! আর, এই মানসিক শক্তি বৃদ্ধি ও সদ্ব্যবহারের কী পন্থাই না পশ্চিমের অধিবাসীরা আবিস্কার করেছেন—শুধুমাত্র যাঁরা শ্রেষ্ঠ ও অগ্রগামী তারাই নন, পরন্তু সব রকম মানুষের জন্য! কখন তাঁরা এটা অনুমান করলেন? আমার মনে প্রশ্ন জাগলো—কেমন করে কার্যকরী করলেন?

০১৭ আইনগত ভিত্তি

আমার বন্ধুরা, যাঁরা এ বৃত্তিতে আছেন, প্রশ্নগুলি তাঁদের করেছিলাম! এ সম্বন্ধে তখন বেশী বই প্রকাশিত হয়নি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকায়

এ বিষয়ে খুব বেশী প্রবন্ধ থাকত না। ইংরাজ গ্রন্থাগারিকদের থেকে বেশ কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি, লন্ডনে ভ্রমণরত কিছু বিদেশী গ্রন্থাগারিকের কাছেও সাহায্য পেয়েছি। তাঁরা সকলেই বললেন যে গ্রন্থাগার আইনই তাঁদের দেশের গ্রন্থাগার বিস্তারের দৃঢ় ভিত্তি—এটা যথেষ্ট না হলেও ভিত্তি হিসাবে এর আবশ্যকতা আছে।

০২ প্রদর্শনের প্রয়োজনীয়তা

০২১ প্রস্তুতি

১৯২৫এর জুন মাসে দেশে ফিরে এলাম। তখন আমার একমাত্র চিন্তা ছিল, ভারতবর্ষের মানসিক ঐশ্বর্য্যের সদ্ব্যবহারের জন্য সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন কেমন করে করা যায়? গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজনীয় ভিত্তি কেমন করে করা সম্ভব হবে? লন্ডন ছাড়ার আগে কর্মরত গ্রন্থাগারের ওপর কতকগুলো ম্যাজিক লন্ঠন তৈরী করেছিলাম। এগুলি কি যথেষ্ট? মনে হোল, এগুলি প্রয়োজনীয় কিন্তু যথেষ্ট নয়। এ ছাড়া আর কি করা যায়? ভ্রমণের তৃতীয় দিনে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম। প্রথমতঃ একটি বাস্তব নিদর্শন দরকার। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার দ্রুত পুনর্গঠন করা উচিত। এই গ্রন্থাগারটিকে কর্মব্যস্ত কার্যালয়ে পরিণত করতে হবে। বইয়ের সম্পদ কাজে লাগাতে হবে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পুনরুজ্জীবিত হবে এবং বাস্তব নিদর্শনের কাজেও একে লাগানো যাবে। স্থির করলাম, যাত্রার বাকী সময়টুকু গ্রন্থাগারের বই বর্গীকরণ করবো। সৌভাগ্যবশতঃ আমার সাথে ৩২,০০০ বই-এর একটি বর্ণানুক্রমিক লেখক তালিকা ছিল। ইংল্যান্ড যাত্রার আগে কোলন বর্গীকরণের মূল বৈশিষ্ট্যের একটি খসড়া তৈরী করেছিলাম। বইগুলির শিরোনামা দেখে মোটামুটি কোলন বর্গীকরণ সংখ্যা দিলাম। আপাত দুরূহ শিরোনামার পাশে একটি বিশেষ চিহ্ন ব্যবহার করা হোল।

০২২ সৌভাগ্যবান কর্মী

আমলাতন্ত্র সম্বন্ধে আমার তখনও কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। বিধাতা আমাকে ঠিকপথে চালিত করলেন। কোন বস্তুগত বা আর্থিক সাহায্যের জন্য আমি আমলাতন্ত্রের দ্বারস্থ হইনি। বইগুলির বর্গীকরণ ও পুনর্বিন্যাস করলাম। গ্রন্থাগারের কর্মীরা আশ্চর্যভাবে আমার সাথে যোগ দিলেন।

খুব সামান্য থেকে সুরু—গ্রন্থাগার রক্ষণাবেক্ষণে অভ্যস্ত চারজন পুরাণো কর্মী তাঁদের গোঁড়ামী পরিত্যাগ করে আমার সাহায্যে এগিয়ে এলেন। তাঁর পুরাণো বিধিব্যবস্থা ভেঙেগ দিয়ে নতুন বিধিব্যবস্থা প্রবর্তন করতে আমার সঙেগ পরিপূর্ণভাবে যোগ দিলেন। আমাদের উপর গ্রন্থাগার কমিটির আস্থা ছিল। এমন কি তারা এই নতুন কাজে আমার সাহায্যার্থে দুজন স্নাতককে নিযুক্ত করলো। সি, সুন্দরম ও কে, এস, শিবরামন এই উদ্দীপক কাজে নিজেদের সর্বতোভাবে ঢেলে দিলেন।

০২৩ পাঠক সমাজে সাড়া

ছাত্রমহল থেকে অভূতপূর্ব্ব সাড়া পাওয়া গেল। ক্রমবর্দ্ধিত সংখ্যায় তাদের গ্রন্থাগারে আগমন সুরু হল। নতুন স্নাতকেরা পাঠক সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিলো। কার্যালয়ে কর্মব্যস্ততা জেগে উঠল। ধূর্ত্ত রাজনীতিকরা গ্রন্থাগারের উপর তখনও চক্রান্তশীল প্রভাব বিস্তার করেন নি। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ! এমন কি ক্রমবর্দ্ধমান স্বৈরাচারীরা—যারা বিশ বছর পরে এর বিনষ্ট সাধন করেছিল—তারাও তখন এর সাহায্য গ্রহণ করেছিল। সত্যই সৌভাগ্যের কথা। গ্রন্থাগার কমিটি এই বিষয়ে খুবই সহায়ক হয়েছিল। কমিটি, অগ্রগতির প্রতি পদক্ষেপেই সহায়তা করেছিল। জনসাধারণের মনে গ্রন্থাগার একটা বিশেষ ছাপ ফেলেছিল। সমুদ্রতীরবর্তী এক স্থানে গ্রন্থাগারকে স্থানান্তরিত করা হল। এতে করে জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে গেল। চার বছরের মধ্যে বাৎসরিক 'ইসু' ১০,০০০ থেকে ১০০,০০০তে পেঁছালো।

০২৪ সরকারী মহলে সাড়া

নানাভাবে বিধাতা সাহায্য করলেন—এই সহায়তা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাধ্যমে পাওয়া গেল। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী পি, সুব্বারয়ন এক শিক্ষা সম্মেলনের উদ্বোধন করতে আসেন। ঐ সম্মেলনে জনৈক বয়োজ্যেষ্ঠ অধ্যাপকের উদ্বোধনী ভাষণ দেবার কথা ছিল, কিন্তু তিনি আসতে পারেন নি। দর্শকদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ আমাকেই মঞ্চের উপর দাঁড় করানো হল। ইউরোপের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করলাম, ভারতীয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমার কল্পনা ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মপদ্ধতির সাফল্যের উপর আমার উচ্চাশা ব্যক্ত করলাম। জনসাধারণের জ্ঞান পিপাসা

ও অব্যবহৃত বই সম্পর্কেও আমার মতামত জানালাম। মন্ত্রী মহোদয় তরুণ বয়স্ক ছিলেন। তার কোনরকম রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ মনোভাব ছিল না। তাঁর কাছ থেকে আশ্চর্যজনকভাবে অপ্রত্যাশিত সাড়া পাওয়া গেল। Meston Award সম্বন্ধে তিনি আমাকে ওয়াকিবহাল করলেন। তহবিলের জন্য সরকারের কাছে আবেদন করতে তিনি আমায় উৎসাহিত করলেন। আর ভেংকটরত্নম তখন উপাচার্য্য ছিলেন। মারাত্মকরকম সাম্প্রদায়িকতা তাঁর ছিল না। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে তখন তিনি এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন নি, পরবর্তী কয়েক বছরে আমার অনেক প্রস্তাবকে যা করেছিলেন। তহবিলের জন্য তিনি সরকারের কাছে আবেদন পেশ করলেন। সাহায্য পাওয়া গেল—পৌনঃপুনিক ও মূলধনী। এতে করে বই ও পত্রপত্রিকা কেনা সম্ভব হোল। গ্রন্থাগার কমিটি যথারীতি সাহায্য করলো। কর্মীসংখ্যা বেড়ে গেল। পাঠক সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেল। এই বাস্তব নিদর্শন জনসাধারণকে অভিভূত করেছিল। (ক্রমশঃ)

বাংলায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান-গ্রন্থ

বাণী বসু

গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিপূরক হিসেবে বাংলায় যে সকল গ্রন্থ গ্রন্থাগার বিজ্ঞান তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে সেগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনাই এ-প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। ১৯২৮ সালে সর্ব্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে গিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করেছিলেন, পরবর্তীকালে বিশ্বভারতীর সৌজন্যে তাহাই "লাইব্রেরীর মুখ্য কর্ত্তব্য" নামে পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় আন্দোলনের সূচনা কোন্ পথে হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে রবীন্দ্র চিন্তাধারার ছাপ রয়েছে। দেশের জনমনের উপর গ্রন্থাগারের প্রভাব বিস্তার করতে গেলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

কি ভাবে গড়ে তোলা দরকার এবং সেদিক থেকে গ্রন্থাগারিকের প্রস্তুতি কতটুকু থাকা প্রয়োজন এই পুস্তিকায় তিনি তারই ইংগীত রেখে গেছেন।

তাঁর মতে বড় বড় গ্রন্থাগার হোল সংগ্রহশালা, ছোট ছোট গ্রন্থাগার ভোজনশালা, বড় গ্রন্থাগার গঠন করার ভার নেবে, ছোট গ্রন্থাগারগুলি সেখান থেকে খাদ্য বাছাই করে বিতরণ করার দায়িত্ব নেবে। চল্লিশ বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে যে চিন্তা করেছিলেন আমরা আজ সেকথা ভাবতে শুরু করেছি। সারা পশ্চিমবঙ্গে সরকারী প্রচেষ্টায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে তা রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যকে কার্যকরী করার প্রচেষ্টা নয় কি? অন্যত্র তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে প্রাঞ্জল ভাষায় বলেছেন গ্রন্থাগারিককে কেবল মাত্র ভাণ্ডারী হোলে চলবেনা, হোতে হবে কাণ্ডারী। পাঠক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে গ্রন্থাগারে আসবে বই পড়তে এ মনোভাব দূর ক'রে গ্রন্থাগারিককে এগিয়ে যেতে হবে পাঠকের সন্ধানে, অর্থাৎ তাকে পাঠক সৃষ্টি করতে হবে পাঠস্পৃহা জাগিয়ে তুলে।

বিচিত্র প্রবন্ধে 'লাইব্রেরি' নামে একটি প্রবন্ধে গ্রন্থাগার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। "শঙ্খের মধ্যে যেমন সমুদ্রের শব্দ শুনা যায় তেমনি এই লাইব্রেরির মধ্যে কি হৃদয়ের উত্থান-পতনের শব্দ শুনিতেছ? এখানে জীবিত ও মৃত ব্যক্তির হৃদয় পাশাপাশি এক পাড়ায় বাস করিতেছে।"

সমসাময়িক যুগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের প্রথম সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ মহাশয়ের লেখা "লাইব্রেরী আন্দোলন ও শিক্ষাবিস্তার" গ্রন্থখানি মাতৃভাষায় রচিত হয়। এই পুস্তক আধুনিক যুগের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞদের কাছেও যথেষ্ট মূল্যের দাবী রাখে। যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলেও এর প্রয়োজনীয়তা অনেকখানি। যে সময় দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিভিন্ন দিক থেকে পরীক্ষা নিরিক্ষা সুরু হয়েছে সেই সময় সুশীলবাবু একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক হিসেবে শিক্ষা বিস্তারে গ্রন্থাগারের অপরিহার্য্যতা সম্বন্ধে নানা দেশের উদাহরণ দেখিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন এই পুস্তকের সহায়তায়। পাঠ্যপুস্তকের তালিকা মারফৎ অধিত জ্ঞান চিরস্থায়ী করতে হোলে স্কুল কলেজের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রাখা অগনিত অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত মানুষের অক্ষর জ্ঞান লাভের সহায়ক হিসেবে

গ্রন্থাগারের ভূমিকা সুশীলবাবুর গ্রন্থেই সর্ব্বপ্রথম আলোচিত হয়। তাই এই গ্রন্থের মূল্য যুগের সীমা অতিক্রম করে চলে এসেছে সন্দেহ নেই।

১৯৩৩ সালে পরিষদ 'বঙ্গীয় গ্রন্থালয় পরিষৎ' নাম ত্যাগ করে 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' নাম গ্রহণ করে। পরিষদের কার্য্যবিবরণীতে পাওয়া যায় দেশের মধ্যে পরিপূর্ণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হোলে এই বিষয়ের উপর মাতৃভাষার মাধ্যমে পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা প্রণয়নে পরিষদ প্রথম থেকেই যথেষ্ট সচেতন ছিল। যার ফলে পরিষদ ১৯৩৭ সাল হতে ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষায় একত্রে বুলেটিন (Bengal Library Association Bulletin) প্রকাশ আরম্ভ করেন। বুলেটিনের সহায়তায় পরিষদ তার কার্য্যবিবরণী, গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উপর প্রবন্ধ ও বাংলা ভাষায় রচিত পুস্তকের তালিকা বাংলা দেশের গ্রন্থাগারগুলির জন্য প্রকাশ করে। পরিষদের এই বুলেটিন ১৯৩৭-১৯৫২ সাল পর্য্যন্ত নয়টি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। পরিষদের দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ সুরু হয় ১৯৫১ সাল হতে। পরবর্তী কালে অর্থাৎ ১৯৫৬ থেকে এই পত্রিকা মাসিক পত্রিকা রূপে প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রন্থাগার বিষয়ক পত্রপত্রিকার বিষয়ে পরে আসছি।

বাংলাদেশে শিক্ষাবিস্তারের সূচনা হয়েছিল দেশী-বিদেশী শিক্ষিত ব্যক্তি, সাহিত্যিক ও শিক্ষক মন্ডলীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়; এর পেছনে যে আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার যোগান এসেছিল ধনী জমিদার ও রাজা মহারাজাদের ভান্ডার থেকে। আজকের দিনের মত সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকলে আজ যতটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি ততটুকুও পেতুম কিনা সন্দেহ হয়। গ্রন্থাগার বিস্তারের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। বাঁশবেড়িয়ার কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় এই সময় পরিষদের সচিব হিসেবে গ্রন্থাগার আন্দোলন গড়ে তোলার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। মুনীন্দ্রবাবুকে সমস্ত ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনের অন্যতম হোতা বল্লে বেশী বলা হয়না। ধনী রাজ পরিবারের বিলাসের নেশা ত্যাগ করে আন্দোলনের এই নতুন নেশায় তিনি মেতে উঠেছিলেন, যার ফলে সমস্ত ভারতবর্ষ এবং বিদেশের প্রধান প্রধান গ্রন্থাগারগুলি তিনি পরিদর্শন করে বেড়িয়েছিলেন। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলির গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিজের দেশে সম্ভব করে তুলতে তিনি আজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। আজ আমরা যে গ্রন্থাগার আইনের সহায়তায় দেশের মধ্যে পরিপূর্ণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করেছি

মুনীন্দ্রবাবু আন্দোলনের সূচনাতেই সে কথা চিন্তা করে একটি খসড়া বিল প্রস্তুত করেছিলেন। কিন্তু সরকারী অনুমোদন না থাকায় সেই বিল আইনে পরিণত হোতে বাধা পায়। আন্দোলনকে রূপ দিতে হোলে যেমন দরকার রয়েছে প্রচারের তেমনি সমানভাবে উন্নত দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার চিত্র ফুটিয়ে তোলারও প্রয়োজন রয়েছে একথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলেই রচনা করেছিলেন "দেশ-বিদেশের গ্রন্থাগার"। এছাড়া ১৯৩৭ সালে "গ্রন্থাগার" নামে অপর একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন শিক্ষা বিস্তারের পটভূমিকায়।

এ পর্যন্ত যে কটি গ্রন্থ আলোচনায় স্থান পেয়েছে, লক্ষ্য করার বিষয়, এগুলি মুখ্যতঃ রচিত হয়েছিল গ্রন্থাগার আন্দোলনকে রূপ দিতে ও এগিয়ে নেবার সহায়ক হিসেবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরবর্তী ইতিহাস এরপর থেকে নতুন পথে চলতে সুরু করে; আন্দোলনের প্রথম দিকে এদেশের সাহিত্যিক, শিক্ষক ও ধনী জমিদারের বুদ্ধি প্রাধান্য পেলেও পরবর্তী কালে এই আন্দোলন ধীরে ধীরে পেশাদার গ্রন্থাগারিকদের হাতে গিয়ে পেঁছয়। এর দ্বারা বলা যায়, আন্দোলন প্রাথমিক অবস্থা অতিক্রম করে অনেকটা এগিয়ে গেছে। গ্রন্থাগারিকদের নেতৃত্বে আন্দোলন আসায় তাঁরা অনুধাবন করেছিলেন কেবল মাত্র গ্রন্থাগার গড়ে তুল্লেই চলবেনা। দেশের মধ্যে ইতস্ততঃ যে সব গ্রন্থাগার ছড়িয়ে রয়েছে তাদের পদ্ধতিকে ব্যবহারোপযোগী না করতে পারলে সমস্ত আন্দোলনই ব্যর্থ হবে। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ শান্তি নিকেতনের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের হাতে সৃষ্টি হোল "দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি"। বাংলাভাষায় রচিত গ্রন্থগুলি এদেশের সমাজ, তথা ব্যক্তি-জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এদেশের গ্রন্থ বিদেশী কাঠামোতে সাজাতে গেলে চিন্তাধারার ক্রমবিকাশের রূপটি ফুটিয়ে তুলতে যে বাধার সৃষ্টি হয় প্রভাতবাবু সেই বাধা অতিক্রম করে চলার পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন এই গ্রন্থে। পরবর্তী কালে অর্থাৎ ১৯৫৯ সালে এই গ্রন্থকে ভিত্তি করে তিনি নতুন পরিবর্দ্ধিত আকারে রচনা করেছেন "বাংলা গ্রন্থ বর্গীকরণ"।

প্রভাতবাবুর বর্গীকরণ গ্রন্থ প্রকাশের অল্পকালের মধ্যেই কলিকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের তদানীন্তন গ্রন্থাগার পরিদর্শক শ্রীসুখেন চট্টোপাধ্যায় রচনা করেছিলেন "গ্রন্থাগার পরিচালনা" গ্রন্থটি ১৯৩৮ সালে। এই গ্রন্থখানি মোটামুটি ভাবে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার চালাতে হোলে যে সমস্ত পন্থা

নিত্য প্রয়োজনীয় সে সম্বন্ধে আলোচনা রয়েছে। সুখেন বাবুর পরই বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থ যাঁর কাছ থেকে পেয়েছি তিনি শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। প্রভাতবাবু যেদিন "দশমিক বর্গীকরণ" রচনা করেছিলেন, তখন থেকেই "গ্রন্থকার নামা" গ্রন্থটির আবশ্যকতা ঘটেছিল। স্বাভাবিকভাবেই আজ এ প্রশ্ন মনে জাগে, এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকদ্বয় কি সম্বন্ধযুক্ত হয়ে গ্রন্থ দুটি রচনা করেছিলেন? কারণ এর একটি অপরের পরিপূরক, গ্রন্থ সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখার সহায়ক হিসেবে।

'প্রমীলনামা'র পরেই গ্রন্থ রচিত হয় তা বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার সাজিয়ে রাখার দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্ঞানবাহক "লাইব্রেরী সংরক্ষণ"। বৈজ্ঞানিক প্রথায় সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখলেই যে গ্রন্থাগারিকের নিষ্কৃতি নেই সে কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মীনেন্দ্র নাথ বসু ও শ্রীকান্তিভূষণ পাকড়াশী। বইয়ের শত্রু কি, কি করে এরা বইকে আক্রমণ করে এবং কিভাবে এই আক্রমণ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় ও আক্রান্ত হোলেই বা মুক্তির উপায় কি, এই গ্রন্থ সে কথা বলেছে। ১৯৪১ সালে এই বইটি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশ করেছে। এই গ্রন্থে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বনের নির্দেশ রয়েছে তা সহজসাধ্য হলেও ব্যয়সাপেক্ষ। ছোট ছোট গ্রন্থাগারের পক্ষে এই পদ্ধতিগুলি কাজে পরিণত করা অসম্ভব নয়।

এর পরবর্তী সংযোজন প্রচেষ্টা গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রায় সকল দিক থেকেই দেখা দেয়। ১৯৫৩ সালে বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত বিশ্বভারতী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীবিমল দত্তের 'গ্রন্থাগার' নামক নাতিদীর্ঘ বইটি সাধারণ গ্রন্থাগার কর্মীদের আধুনিক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সঙ্গে মোটামুটি একটা পরিচয় ঘটিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী। ১৯৫৩-৫৯ সালের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের ভারপ্রাপ্ত পুস্তক নির্বাচক ও গ্রন্থসূচি প্রণয়নকারী শ্রীযুক্ত রাজকুমার মুখোপাধ্যায় পর্যায়ক্রমে (১) 'গ্রন্থাগার পরিচালনা ও বইয়ের যত্ন' (১৯৫৪ ও ১৯৫৮, ২য় সং), (২) 'গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগারিক' (১৯৫৫), (৩) জনসাধারণের গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচন (১৯৫৬), (৪) গ্রন্থাগার ঃ কর্মী ও পাঠক, (৫) স্কুল ও কলেজের গ্রন্থাগার এবং (৬) গ্রন্থাগার প্রচার (১৯৫৯) নামে গ্রন্থ-রচনা করেন। এদের মধ্যে প্রথম গ্রন্থখানির পরিবর্দ্ধিত নতুন

সংস্করণ হয়েছে ১৯৫৮ সালে। এই বইগুলির নামকরণেই বুঝা যায় সেগুলির বিষয়বস্তু। গ্রন্থাগার পরিচালনা করতে গিয়ে বিভিন্ন স্তরে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হোতে হয় নবীন গ্রন্থাগারিককে এই বইগুলি সেদিক থেকে সহায়তা করতে সক্ষম। ১৯৫৪ সালে কুমুদরঞ্জন সিংহ "গ্রন্থাগার বিজ্ঞান" রচনা করেছিলেন সেই একই দৃষ্টিভংগী থেকে। পরিষদের কর্মী হিসেবে বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে তিনি গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে কিছুদিন ঘুরে বেড়িয়েছিলেন এবং অসামঞ্জস্যতার জন্য ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলি তাদের ঐকান্তিক ইচ্ছে সত্ত্বেও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অবলম্বন না করার ফল হিসেবে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারেনা সে কথা উপলব্ধি করেছিলেন, গ্রন্থের প্রারম্ভে সেই ইংগীত রেখে গেছেন লেখক। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের প্রায় সকল দিক থেকেই আলোচনা করেছেন। সম্ভবতঃ এটা না করলে তাঁর চেষ্টা সাফল্যলাভ করতে পারতো। কারণ বিজ্ঞানের একাধিক বিষয় বস্তু একই গ্রন্থে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয় এবং যাঁরাই চেষ্টা করেছেন তাঁরাই ব্যর্থ হয়েছেন। কুমুদবাবুর পরেই যিনি গ্রন্থ রচনা করেন তিনি সংস্কৃত কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়। বিজয়বাবুর 'গ্রন্থাগার ও লোকশিক্ষা' ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত হয়। সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা নিয়ে কয়েকটি সুচিন্তিত আলোচনায় গ্রন্থখানি রচিত। আজকের দিনের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরণের বইয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার দেশ পুনর্গঠনমূলক নানাধরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনা রূপ দিতে সরকার গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা কিছুটা যে মেনে নিয়েছেন তার প্রমাণ সরকারী কার্যধারায় আমরা পেয়েছি। মনে হয় সরকারী কর্মপদ্ধতি দেশের মাটির সাথে যাতে যোগ রেখে চলতে পারে তার সহায়ক হিসেবে বংগীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারের সাথে যুক্ত শ্রীকৃষ্ণময় ভট্টাচার্য্যের "বাংলা দেশের গ্রন্থাগার" বইটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বৃহৎ কলিকাতা সহর ও সহরতলী হাওড়ার শিল্পাঞ্চলে জনসাধারণের সহযোগিতায় যে সকল গ্রন্থাগার গড়ে উঠেছে এবং অস্তিত্ব রক্ষা করে এসেছে তাদের ভিত্তি করে কাজে হাত দিলে সরকার কিছুটা সাহায্য পেতে পারেন। অবশ্য কৃষ্ণময় বাবু তাঁর গ্রন্থে ঐতিহাসিক দিকটিই ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে ইতিহাস সমাজ দেহের কঙ্কাল, তাতে নতুন করে রক্ত মাংস লাগিয়েই নতুন সমাজ রূপ পায়। বাংলাদেশের

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহক যে সব গ্রন্থাগার আজও বেঁচে রয়েছে তাদের কাঠামোকে নূতন রূপ দিলে কাজ যত সহজ হোতে পারে সে কথা চিন্তা করে দেখার বিষয়।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগার পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃতি পাবার ফলে এই বিশেষ বিজ্ঞানে শিক্ষিত কর্মীর আবশ্যকতা সারা ভারতবর্ষে দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশে এই কর্মিদল সৃষ্টির দায়িত্ব যুগপৎ 'বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ' ও কলিকাতা 'বিশ্ববিদ্যালয়' গ্রহণ করেছেন। শ্রীযুক্ত সুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় এই বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্মীদের নিত্যপ্রয়োজনের খাতিরে ১৯৫৭ সালে 'গ্রন্থাগার বিজ্ঞান' গ্রন্থখানি রচনা করেছেন। এই গ্রন্থখানি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের নরসিংহ দাস আগরওয়ালা পুরস্কার লাভ করেছে। ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মর্যাদা এর দ্বারা স্বীকৃতি পেয়েছে সন্দেহ নেই। বাংলা ভাষায় এই বিজ্ঞানের সর্বকনিষ্ঠ অবদান ডঃ আদিত্য কুমার ওহদেদার মহাশয়ের 'গ্রন্থবিদ্যা'।

'গ্রন্থবিদ্যা' অসম্পূর্ণ। লেখক, কাগজ ও মুদ্রণ সম্বন্ধে আলোচনা করে 'গ্রন্থবিদ্যার' প্রথম পর্যায় সম্পূর্ণ করেছেন। এই নবতম গ্রন্থ প্রকাশন গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের এক জটিলতম বিষয় বস্তুকে সাধারণের কাছে মাতৃভাষায় রূপায়িত করে গ্রন্থাগার আন্দোলন আজ কতটা অগ্রগতির পথে চলতে শুরু করেছে তার প্রমাণ দিয়েছে।

গ্রন্থাগার বিষয়ক পত্র-পত্রিকার প্রসঙ্গে এবার আসা যাক্।

গ্রন্থাগার আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী ও বর্তমানে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের কাউন্সিলার শ্রীঅনিল মৈত্র ও ডক্টর নীহার রঞ্জন রায় মহাশয়ের সম্পাদনায় 'পাঠাগার' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা ১৯৩৬-৩৮ সালে প্রকাশিত হয়ে বন্ধ হয়ে যায়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার উল্লেখ ইতিপূর্বে করেছি। মৌলিক প্রবন্ধ বিবিধ বিষয়ের আলোচনা ও সংবাদ এবং সৌষ্ঠবের দিক থেকে এ পত্রিকা সুনাম অর্জন করেছে। এই পত্রিকা দেশের মধ্যে গ্রন্থাগার আন্দোলন সৃষ্টি করায় যেমন সহায়তা করেছে তেমনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের উপর বিশেষজ্ঞদের সুচিন্তিত অভিমত ও নিত্যপ্রয়োজনীয় তথ্যের পরিবেশন করছে। যার ফলে সুদূর পল্লী অঞ্চলের ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলি বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে নিজেদের গ্রন্থাগার চালাতে সক্ষম হচ্ছে। পরিষদের

প্রকাশিত পত্রিকা ব্যতীত বাংলা ভাষার মাধ্যমে অপর একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়েছিল উৎসাহী গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রচেষ্টায় 'গ্রন্থবাণী' নামে। ১৯৫৪-৫৫ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসেবে এটি প্রকাশিত হোয়েছে। এ পত্রিকাও গ্রন্থাগার আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবেই কাজ করেছে। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান যা এর ছিল, তা হোচ্ছে প্রতি তিন মাস অন্তর বাংলা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থপঞ্জী সাধারণের দৃষ্টিতে ধরে দেবার প্রচেষ্টা।

ত্রিপুরার বীরচন্দ্র পাবলিক লাইব্রেরী থেকে 'গ্রন্থালোক' নামে আরও একটি পত্রিকা আমরা পাচ্ছি। সুদূর ত্রিপুরার সাথে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের সংযোগ কিছুটা বিচ্ছিন্ন, তা সত্ত্বেও গ্রন্থাগারিকে গ্রন্থাগারিকে যে হৃদয়ের তন্ত্রি এক হয়ে রয়েছে তারই যোগসূত্র এই পত্রিকা।

সম্প্রতি বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ থেকে 'পাঠাগার' নামে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রকাশ আরম্ভ হয়েছে। এই নবজাত পত্রিকা স্বাভাবিক ভাবেই একটা আশার সঞ্চার করেছে আমাদের মনে। এই পত্রিকার সহায়তায় বাংলাদেশের সুদূর পল্লী গ্রামে অবস্থিত গ্রন্থাগার গুলির ঐতিহ্য ও বিস্তৃতির বিবরণ আমরা পাচ্ছি। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলাভাষায় উপরের পত্রিকা কয়টি ব্যতীত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সমসাময়িক ব্যক্তির প্রবন্ধ গুলিও আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জয়নগর-মজিলপুর অঞ্চলের গ্রন্থাগার সঙ্ঘের উদ্যোগে 'প্রজ্ঞা' নামে একটি পত্রিকা কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের পর বছর তিনেক আগে বন্ধ হয়ে গেছে।

হ্যাণ্ডপ্রেস

চঞ্চলকুমার সেন

লিখনপদ্ধতি আবিস্কৃত হবার পরও মানুষের জ্ঞানের স্পৃহা চরিতার্থ ক'রবার অসুবিধা দূরীভূত হয়নি। মৃৎফলক, শিলাখণ্ড, প্যাপাইরাস, পার্চ্চমেন্ট, ভেলাম ও ভূর্জ্জপত্রের মধ্য দিয়ে ক্রমবিবর্ত্তনের কয়েক ধাপ পার হয়ে যখন কাগজ আবিষ্কৃত হোল তখন এ সমস্যার কিছুটা সমাধান হয়েছিল একথা অস্বীকার ক'রবার উপায় নেই। কাগজ আবিষ্কারের আরো কয়েক শতাব্দী পর মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের সাথে সাথে এ সমস্যার অনেকখানি সমাধান হয়ে যায়। মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তায় একই সঙ্গে অনেক বই ছাপা হয়ে অনেক মানুষকে পরিতৃপ্তি দিতে সমর্থ হয়েছে একথা আমরা জানি।

পৃথিবীতে প্রথম যে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয় তা' হ্যান্ড প্রেস (Hand Press) নামে পরিচিত। হাতের সাহায্যে এই প্রেসকে চালনা করতে হয় বলেই এই নামে একে অভিহিত করা হয়। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে এর ব্যবহার চলে আসছে। ওয়াইন প্রেস (Wine Press) ও ক্লথ প্রিন্টিং প্রেস-এর (Cloth Printing Press) অনুপ্রেরণায় এই যন্ত্রের আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে গুটেনবার্গ এই হ্যান্ড প্রেসের সাহায্যেই তাঁর বিয়াল্লিশ লাইনের বাইবেল ছেপে প্রকাশ করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ব্যবহৃত একটা হ্যান্ড প্রেসের বর্ণনা দেবার চেষ্টা এখানে ক'রব।

প্রথম যুগের হ্যান্ডপ্রেস কাঠের সাহায্যেই তৈরী করা হত। দুটো বড় কাঠের গুঁড়ি সমান ভাবে কেটে ঘরের মেঝে থেকে লম্বালম্বি ভাবে দাঁড় করান হত। এদের ওপরে সমস্ত প্রেসটা দাঁড়িয়ে থাকত বলেই এদের নামকরণ করা হয়েছে চিক (cheek)। মেঝে থেকে প্রায় দুফুট উঁচুতে একটা ভারী কাঠের খণ্ড চিক দুটোকে সংযুক্ত করেছে। একে বলা হয় উইনটার (Winter)। প্রায় সমস্ত প্রেসের ভারটা এই উইন্টারকেই বহন করতে হয়। উইন্টারের সামন্তরাল ভাবে আর একখণ্ড কাঠ চিক দুটোর উপরের অংশকে সংযুক্ত করেছে একে বলা হয় ক্যাপ (Cap)। ক্যাপ থেকে স্পিন্ডল্ (Spindle) ও হোসের

(Hose) সাহায্যে একটা ভারী ধাতব পদার্থ (লোহা দিয়ে তৈরী) এমনভাবে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় যার ফলে হ্যাণ্ডেলে চাপ দিলে সেটা বেশ খানিকটা নেমে আসতে পারে—হ্যাণ্ড প্রেসের জগতে প্ল্যাটেন (Platen) নামেই এর পরিচয়।
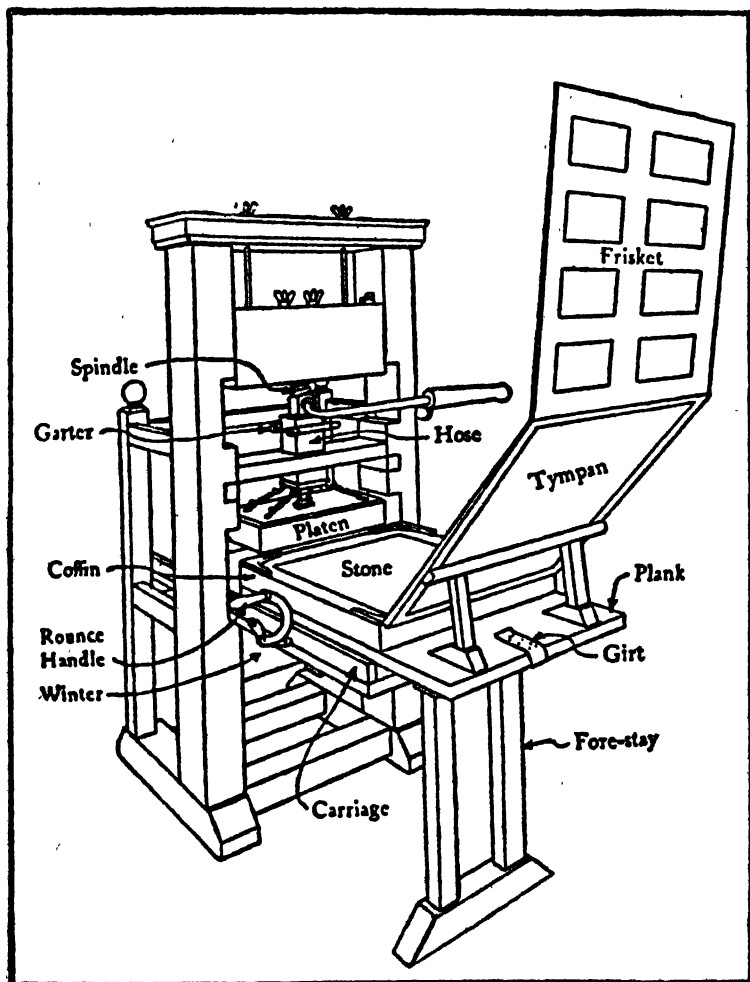
উইণ্টার এবং ক্যাপের মাঝামাঝি জায়গা থেকে দুটো চিকের মধ্য দিয়ে অনুভূমিক (Horizontal) অবস্থায় লোহার দুটো রেল স্থাপন করা হয়, মেঝের উপরে দাঁড় করান দুখণ্ড কাঠের উপর এদের শেষ প্রান্ত জুড়ে দেওয়া হয়। এই রেল

দুটোকে বলা হয় ক্যারেজ (Carriage) এবং যে দুটো খণ্ডের উপর এদের শেষ প্রান্ত স্থাপিত-তাদের বলা হয় হাইণ্ড পোষ্ট (Hind Post)। হাইণ্ড পোষ্ট থেকে সুরু করে চিক্ ছাড়িয়ে ক্যারেজের অনেকটা অংশ সামনের দিকে বেরিয়ে থাকে, এই অংশটাকেও মেঝের উপর লম্বালম্বি ভাবে দাঁড় করান দুখণ্ড কাঠের উপর স্থাপন করা হয়। Binns এর ভাষায় একে বলা যেতে পারে ফোর-স্টে (Fore Stay)।

হাইণ্ডপোষ্ট দুটোর উপরের অংশ এবং উইণ্টারের লেভেলের নীচের অংশকে আবার দুটো কাঠের খণ্ড সংযুক্ত করেছে। এখন ক্যারেজ কি ক্যারি করে দেখা যাক। একটা চৌকোনা ধাতব পদার্থ (সাধারণতঃ লোহা দিয়ে তৈরী) ক্যারেজের উপর বসান থাকে। একে বলা হয় প্ল্যাংক (Plank)। প্ল্যাংকের নীচে একটা কাঠের রোলার দুটো চামড়ার স্ট্যাপের সাহায্যে ক্যারেজের সাথে এমন ভাবে সেট করা থাকে যার ফলে একটা হ্যাণ্ডেল ঘোরালে প্ল্যাংকটাকে সামনে এবং পিছনে ইচ্ছেমত চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। এই হ্যাণ্ডেলটাকে বলা হয় রাউন্স হ্যাণ্ডেল (Rounce Handle)। প্ল্যাংকের উপরে একটা চৌকোনা বাক্স মত স্থাপন করা হয়। এর নাম কফিন (Coffin)। এই কফিনে মৃতদেহ থাকে না, থাকে একখানা মসৃণ পাথরের খণ্ড যার নাম স্টোন (Stone)।

প্ল্যাংকের যে অংশটা ফোর্-স্টের দিকে আছে তার উপর একটা লোহার ফ্রেমকে কব্জা এবং স্ক্রুর সাহায্যে এমন ভাবে দাঁড় করান হয় যাতে করে সহজেই তাকে ভাঁজ করে স্টোনের উপর নামিয়ে আনা যায়। এই লোহার ফ্রেমটাকে বলা হয় টিম্প্যান (Tympan) টিম্প্যানের উপরে আরো একটা ফ্রেম আছে যেটাকে ভাঁজ করে টিম্প্যানের উপর নামিয়ে আনা যায়। এর নাম ফ্রিস্কেট্ (Frisket)। এর মধ্যে গোটা আষ্টেক জানালা থাকে। যে কাগজটা ছাপা হবে সেটা টিম্প্যানের মধ্যে স্থাপন করে ফ্রিস্কেট দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। এর ফলে ফ্রিস্কেটের জানালা দিয়ে কাগজের সেই অংশটাই শুধু বেরিয়ে থাকবে যার উপর ছাপ পড়বে। সাধারণতঃ মার্জিনের সুবিধার জন্য, এবং ছাপা অংশ ছাড়া কাগজের অন্য অংশ কালি লেগে নষ্ট হয়ে যাবার আশঙ্কার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য ফ্রিস্কেট্ ব্যবহার করা হয়। হ্যাণ্ডপ্রেসের অংশগুলো জুড়বার জন্য স্ক্রু ব্যবহার করা হত।

এখন হ্যাণ্ডপ্রেসে কিভাবে ছাপা হয় দেখা যাক।

পাণ্ডুলিপি দেখে টাইপ কম্পোজ করে করে যখন একটা Forme-র মত

অর্থাৎ একশিট কাগজের একপিট মত ম্যাটার কম্পোজ করা হয়ে যায়, তখন কম্পোজ করা ম্যাটারটাকে চেজের (Chase) মধ্যে স্থাপন করা হয় একথা আমরা জানি। চেজ আর কিছুই নয় একটা চৌকোনা লোহার ফ্রেম, যার মধ্যে পৃষ্ঠা হিসাবে ভাগ করে একটা Forme এর মত ম্যাটার সাজিয়ে রাখা হয়। চেজটাকে কফিনের মধ্যে স্টোনের উপর শক্ত করে আটকে দেওয়া হয়। তারপর ইংক রোলারের (Ink Roller) সাহায্যে বেশ ভাল করে কালি লাগিয়ে নেওয়া হয় ওটার ওপর। এখন যে কাগজে ছাপা হবে সেটা টিম্প্যানের মধ্যে স্থাপন ফ্রিসকেটটা টিম্প্যানের উপর নামিয়ে আনতে হবে। এবার টিম্প্যানটা ভাঁজ করে কালি লাগান ম্যাটারের উপর রাখলেই কাগজটা টাইপের সংস্পর্শে এসে যাবে। রাউন্স হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে প্ল্যাংকটাকে প্ল্যাটেনের নীচে নিয়ে আসতে হবে। এখন হ্যান্ডেলে চাপ দিলেই প্ল্যাটেনটা টিম্প্যানের উপর চেপে বসবে এবং কাগজের উপর ছাপটা বেশ ভালভাবেই পড়বে। এখানেই কাজ শেষ হয়ে যাবে না। হ্যান্ডেলের সাহায্যে টিম্প্যানের উপর থেকে প্ল্যাটেনের নীচ থেকে প্ল্যাংকটাকে সরিয়ে আনতে হবে। তারপর চেজের উপর থেকে টিম্প্যানটা উঠিয়ে নিয়ে ফ্রিসকেটটা খুলে কাগজটা বের করে নিলেই Outer forme ছাপা হয়ে যাবে। এরপর ম্যাটারটা পরিবর্ত্তন করে কাগজটা উল্টিয়ে Inner Formeটা ছাপিয়ে নিলেই চলবে। প্ল্যাটেনের সাহায্যে চাপ দিয়ে ছাপা হয় বলে হ্যান্ড-প্রেসকে প্লাটেন প্রেসও বলা হয়ে থাকে। অন্যান্য প্রেসের তুলনায় হ্যান্ড প্রেসে ছাপা অনেক পরিস্কার এবং সুন্দর হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে একশ' বছরের উপর এই রকম স্ক্রুর সাহায্যে কাঠের তৈরী হ্যান্ডপ্রেসের ব্যবহার সারা পৃথিবীতে চলে চলে এসেছে। হল্যান্ডের অধিবাসী উইলেম জ্যানসজন ব্লিউ (Willem Janszon Blaeu) প্রথম এই প্রেসের কিছু সংস্কার সাধন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ফিলাডেলফিয়ার অ্যাডাম র‍্যামেজ (Adam Ramage) ও লণ্ডনের অন্তর্গত স্ট্যানহোপের আর্ল চার্লস (Charles, Earl of Stanhope) প্রায় সমসাময়িক ভাবে হ্যান্ডপ্রেসের সংস্কার সাধনে ব্রতী হন। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে স্ট্যানহোপের প্রেস প্রথম চালু হয়। কাঠের পরিবর্ত্তে পুরোপুরি লোহা দিয়েই এই প্রেস তৈরী করা হয়। এরপর জর্জ ক্লাইমার (George Clymer) হ্যান্ডপ্রেস তৈরীর ব্যাপারে স্ক্রুকে একেবারে বাতিল করে দেন। ক্লাইমারের প্রেস ওয়াশিংটন-প্রেস নামে পরিচিত।

ছাপার জগতে হ্যাণ্ডপ্রেসের পর আরো অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। আবিষ্কৃত হয়েছে সিলিণ্ডার প্রেস, রোটারী-প্রেস, ইউনিভার্সাল প্রেস। এরা অনেক জায়গা থেকে হ্যাণ্ডপ্রেসকে বিতাড়িত করেছে একথা সত্য কিন্তু হ্যাণ্ডপ্রেসকে একেবারে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত করে দেবার ক্ষমতা এদের নেই। সভ্যতার আদি যুগে যাতায়াতের বাহনরূপে গরুর গাড়ীকে দেখেছি আমরা সভ্যতার মধ্যযুগেও তাকে দেখেছি এবং সভ্যতার চরম উৎকর্ষের যুগে রেলগাড়ী, মোটর গাড়ী, ও উড়োজাহাজের সাথে সাথেও তাকে সমান ভাবে পা ফেলে চলতে দেখছি আমরা। তাই আমাদের মনে হয় গরুর গাড়ীর মত হ্যাণ্ডপ্রেসও আগামী দিনের সব রকম আবিষ্কারের সাথে সমান ভাবে পা ফেলে চলতে পারবে।

যে সব বইয়ের সাহায্য গ্রহণ করেছি

১। Mackerrow, R. B.—An Introduction to Bibliography for Literary Students
২। Binns, N. E.—An Introduction to Historical Bibliography
৩। Mallaber, K. A—A Primer of Bibliography
৪। Encyclopaedia Britannica Vol. 18.

সম্মেলন সংগঠন ও পরিচালন

হ্যারী এল মুর

সভা-সম্মেলন বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের ও তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যম ব্যতীত আর কিছুই নয়। বহু ব্যক্তি যাতে একত্র সমবেত হয়ে তাদের মৌলিক সমস্যাগুলির স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে ও সেই সকল সমস্যার সমাধান করতে পারে, পারস্পরিক আলাপ আলোচনার দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে ও নিজেদের জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলতে পারে এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে সে দিক থেকে তাদের সাহায্য করাই সম্মেলনের প্রধান কাজ। এইভাবে মানুষ স্বাধীন সমাজের নাগরিকরূপে তার দায়িত্ব সম্পর্কে আরও বেশী সচেতন হয়ে ওঠে।

যখনই কোন সংস্থার—সে সাংস্কৃতিক সংস্থাই হোক, অথবা রাজনৈতিক বা ধর্ম সংস্থাই হোক—কাজকর্মের পরিমাণ প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তখনই তার সুষ্ঠু পরিকল্পনার ও পরিচালনার প্রয়োজন হয় এবং সেই প্রয়োজন মেটাবার প্রথম পদক্ষেপ হল সভা-সম্মেলনের অনুষ্ঠান।

'সম্মেলন' বা 'কনফারেন্স' অথবা 'ওয়ার্কশপের' জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করা। আবার এই প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রস্তুত করার জন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা সমিতি গঠনের। কাজের বিভাগ অনুসারে পরিকল্পনা সমিতির আবার কতকগুলি উপ-সমিতি থাকে। সম্মেলন সার্থক করে তুলতে হলে প্রাথমিক পরিকল্পনা প্রণয়নে যথোচিত সময় দেওয়া উচিত।

তথ্যসন্ধান ও মূল্যাবধারণ

তথ্যানুসন্ধান ও মূল্যাবধারণ যে কোন প্রকার সম্মেলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সুতরাং পরিকল্পনা যাঁরা প্রস্তুত করবেন কতকগুলি বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্য তাঁদের হাতে থাকা চাই। এর মধ্যে সম্মেলনে যোগদানকারীদের প্রয়োজন ও সম্মেলনে তথ্য আদান-প্রদানের কার্যকারিতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

কোন্ কোন্ বিষয় সম্মেলনের অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত হবে, সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করবে কে কে, এ সকল বিষয় স্থির করার জন্য যে সংস্থা সম্মেনের উদ্যোক্তা তার নেতৃবৃন্দের কাছ থেকে, পূর্ব বৎসরের পরিকল্পনা সমিতি ও সম্মেলনে যোগদানকারীদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন।

সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করতে হলে সম্মেলনের পরিকল্পনা ও পরিচালনা প্রতিটি পর্যায়ে তথ্যানুসন্ধ্যান ও মূল্যাবধারণের কাজে ছেদ থাকলে চলবে না। ওয়ার্কশপের ব্যাপারে মূল্যাবধারণ প্রক্রিয়াটি হল বহুবিধ সূত্র থেকে সুষ্ঠুভাবে তথ্য সংগ্রহ। পরিকল্পনার কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা, প্রয়োজন মত কর্মপদ্ধতি সংশোধন এবং ভবিষ্যৎ সভা-সম্মেলনের পরিকল্পনা করাই তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য।

তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি

তথ্য সংগ্রহের নানা রকম পদ্ধতি রয়েছে। এর প্রত্যেকটির যেমন সুবিধা আছে তেমনি অসুবিধাও আছে। সভারম্ভের পূর্বে অংশ গ্রহণকারীদের কাছ

থেকে কিছু তথ্য লাভ করা যেতে পারে। সকল প্রতিনিধিদের কাছে প্রশ্নাবলী প্রেরণ করে সম্মেলনের কাছ থেকে প্রতিনিধিরা কি প্রত্যাশা করেন, অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁদের প্রস্তাব, অনুষ্ঠান সম্পর্কিত ব্যবস্থাদি ও অংশ গ্রহণকারীদের সমস্যাদি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

এই ধরণের প্রশ্নাবলী প্রেরণ করার সুবিধা এই যে, প্রশ্নগুলি নির্দিষ্ট ধরণের হওয়ার জন্য উত্তরগুলিও নির্দিষ্ট শ্রেণীর হয়ে থাকে। তাছাড়া, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তথ্যগুলি সংগ্রহ করা যায় এবং তা পরিকল্পনাকারীদের নিকট দ্রুত প্রেরণ করে তাদের সহায়তা করা যেতে পারে।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের সংগে সাক্ষাৎ করে তথ্য সন্ধান করা যেতে পারে। এই পদ্ধতির একটা বড় সুবিধা এই যে, সামনাসামনি আলোচনার জন্য কিছু বেশি তথ্য সংগ্রহ করা যায়। অনুষ্ঠান পরিকল্পনার মধ্যে সাধারণ অসন্তোষের কারণ কিছু আছে কি না উক্ত প্রতিনিধি-গণ প্রত্যক্ষ সাক্ষাতের ফলে তা আলোচনা করার অধিকতর সুযোগ পেয়ে থাকেন।

প্রস্তুতিসভাগুলি সম্মেলনের সুষ্ঠু পরিকল্পনার কাজে অত্যন্ত সহায়ক। এতে সম্যাগুলি সম্পর্কে পূর্ব থেকেই কিছুটা চিন্তা করবার সুযোগ পাওয়া যায়, সম্মেলনে যোগদানের উপযোগী করে নিজেদের প্রস্তুত করা যায়। এই সকল প্রাক-সম্মেলন প্রস্তুতি সভার রিপোর্ট পরিকল্পনা সমিতির নিকট প্রেরণ করা হয়।

সম্মেলন চলতে থাকাকালে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে অথবা ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় সহায়তাকল্পে তথ্য সংগ্রহের কয়েকটি প্রধান প্রধান পন্থা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সম্মেলনোত্তর প্রতিক্রিয়া যাচাই করা যেতে পারে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলীর সাহায্যে। বিশেষ কোন একটি অধিবেশন প্রতিনিধিদের কেমন লাগল, পরবর্তী অধিবেশনের জন্য তাঁদের কোন প্রস্তাব আছে কিনা ইত্যাদি বিষয় জানা যেতে পারে এই প্রশ্নাবলীর সাহায্যে।

সম্মেলন চলাকালে নির্বাচিত কয়েকজন অংশগ্রহণকারীর সংগে মাঝে মাঝে সাক্ষাৎ করা যেতে পারে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, প্রত্যহ সম্মেলন চলাকালে মধ্যাহ্ন-ভোজের বিরতির সময় ১০ জনের সংগে ৫ মিনিট কাল আলোচনা করে সব কিছু ব্যবস্থা সন্তোষজনক হচ্ছে কিনা জেনে নেওয়া যায়।

সম্মেলনে উপস্থিত ব্যক্তিরা যে সব প্রশ্ন করবেন বা প্রস্তাব করবেন সেগুলি বিশ্লেষণ করে অনেক ভাল ভাল তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।

ভ্রাম্যমাণ রিপোর্টাররা সম্মেলনস্থলের চতুর্দিকে ঘুরে সম্মেলনে অংশ গ্রহণকারীদের সাধারণ মনোভাব সম্পর্কে একটা ধারণা করতে চেষ্টা করবেন এবং সে সম্পর্কে পরিকল্পনা সমিতি বা পরিচালক সমিতির নিকট রিপোর্ট পেশ করবেন।

সম্মেলন শেষে তথ্য সংগ্রহের কয়েকটি ফলপ্রদ পন্থা আছে। সম্মেলনোত্তর প্রশ্নাবলী আর সম্মেলনে যোগদানকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ এদিক থেকে যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে।

তথ্যানুসন্ধান ও মূল্যাবধারণ সম্মেলনের পরিকল্পনা ও পরিচালনার পক্ষে অত্যাবশ্যক, একথা সম্মেলনের পরিকল্পনাকারীকে স্মরণ রাখতে হবে। পরিকল্পনাকারীকে বিশেষ করে এই সকল জানতে হবেঃ ১। কি কি তথ্য প্রয়োজন, ২। তথ্য কোথা থেকে আসবে, ৩। তথ্য সংগ্রহের জন্য কোন্ কোন্ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে, ৪। তথ্যলাভের পর তা কিভাবে ব্যবহার করা হবে, ৫। সম্মেলনে যোগদানকারীদের কাছ থেকে সংগৃহীত তথ্য কিভাবে ব্যবহার করা হয়েছে তা ঐ তথ্যদাতাদের কেমন করে জানান হবে।

তথ্যানুসন্ধান ও তার মূল্যাবধারণ সম্মেলনের পরিকল্পনার প্রতিটি পর্যায়ের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কার্যসূচী প্রণয়ন

কোন সম্মেলনের পরিকল্পনার প্রতিটি পর্যায়ে অস্থায়ীভাবে একটা কার্যসূচী প্রস্তুত করা হয়। যে সংস্থা সম্মেলনের আয়োজন করেছে তার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের প্রস্তাব, সম্মেলনে যারা অংশগ্রহণ করবে তাদের মতামত এবং অনুরূপ সম্মেলনের অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই কার্যসূচী প্রণয়ন করা হয়।

পরিকল্পনা প্রস্তুতকারকদের কর্তব্য হল এই সকল প্রস্তাবাদি ও ভাবধারা নিয়ে এমন একটা কার্যসূচী প্রস্তুত করা যা পরিকল্পনার লক্ষ্য অভিমুখে আমাদের নিয়ে যাবে।

বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের জন্য বিশেষ প্রকার সম্মেলনের আশ্রয় নিতে হয় এখানে প্রধান কয়েক প্রকার সম্মেলন ও তাদের বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

"কনভেনশন" বলা হয় বিশেষ উদ্দেশ্যে আহূত একবারের অনুষ্ঠানকে। এতে সাধারণ অধিবেশন হয় এবং বিভিন্ন বিভাগীয় সমিতির সভা হয়। সাধারণ ভাবে তথ্য বিতরণ করা হয় এই সকল সম্মেলনে, এবং যে সংস্থা কনভেনশন আহ্বান করে তার কার্যপরিচালন ব্যাপারে ভোট গ্রহণ করা হয়।

"ওয়ার্ক কনফারেন্সের" মধ্য দিয়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন, তথ্যানুসন্ধান, বা সমস্যা সমাধানের কাজ করা হয়। এতে সাধারণ অধিবেশনও হয়, আবার সামনাসামনি গোষ্ঠী আলোচনাও হয়।

"ওয়ার্কশপের" উদ্দেশ্য শিক্ষণ। এই ধরণের সম্মেলনেও সাধারণ অধিবেশনের অনুষ্ঠান হয় এবং সামনাসামনি গোষ্ঠী আলোচনাও চলে।

"সেমিনারে" বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ একদল লোক নিজেদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। সাধারণতঃ সামনাসামনি বসে আলোচনা চলে।

"ক্লিনিক" অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ কোন বিষয় বিশ্লেষণের জন্য। ক্লিনিকে যোগদানকারীরা সাধারণতঃ ছাত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেন, আর ক্লিনিকের নেতারা শিক্ষকের ভূমিকা। এক্ষেত্রে আলোচনা হয় সাধারণতঃ সামনাসামনি, তবে সাধারণ অধিবেশনও হয়ে থাকে।

এই ধরণের সম্মেলনগুলির মধ্যে কিছুটা জটিলতা আছে, কারণ এই সম্মেলনগুলি নানা বিভাগে বিভক্ত হয়ে অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ অধিবেশন, পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন, বিশেষ বিশেষ বিষয়ে আগ্রহশীল গোষ্ঠীর আলোচনা সভা (একবার বা একাধিকবার এদের সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে), ওয়ার্কগ্রুপ (বিশেষ কোন সমস্যা নিয়ে এই গোষ্ঠী আলোচনা করে ও সুপারিশ করে)। এই গেল বৃহৎ সম্মেলনের কথা। কিন্তু এ ছাড়া আছে ক্ষুদ্র সভা। এই ধরণের সভা একটি মাত্র গোষ্ঠী দ্বারাই পরিচালিত হয়ে থাকে, একটি মাত্র গোষ্ঠীই এতে অংশ গ্রহণ করে থাকে। স্টাফ মিটিং, বোর্ড মিটিং, কমিটি মিটিং প্রভৃতি এই শ্রেণীর আওতায় পড়ে।

আলোচ্য বিষয়ের প্রকারভেদে তা বিভিন্ন বিভাগের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আলোচিত হয়। কমিটি রিপোর্টের ওপর ভোট গ্রহণ ও ব্যবস্থাবলম্বন করা যদি বিষয় হয় তাহলে তা নিঃসংশয়ে সাধারণ অধিবেশনের অন্তর্ভুক্ত। বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বক্তাদের ভাষণাদি সাধারণ অধিবেশনের আওতায় পড়ে। ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে সুপারিশ করতে হলে বিবেচনা করে দেখতে হবে, সকল গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত একটি মাত্র অধিবেশনে এ প্রশ্নটি আলোচনা করা যুক্তিযুক্ত, অথবা ক্ষুদ্র

গোষ্ঠীগুলি পৃথক পৃথকভাবে এর বিবেচনা করবে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে অধিক-সংখ্যক লোক আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারে।

আলোচ্য বিষয়ের শ্রেণীবিভাগের পর বিষয়টি সম্মেলনের কোন অবস্থায় পেশ করতে হবে তা নির্ধারণ করতে হবে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। একটা কোন অতি গুরুত্বপূর্ণ নীতি সম্বলিত ভাষণের কথা ধরা যাক। সম্মেলনের প্রারম্ভেই যদি এই ভাষণের ব্যবস্থা থাকে তাহলে সম্মেলনের দিক থেকে তা খুব বেশী কার্যকরী হবে না। কারণ সম্মেলনের আরম্ভের একেবারে সুরুতেই নিজের প্রস্তুত করে তোলা প্রতিনিধিদের পক্ষে সম্ভব হয় না। অথবা দীর্ঘসময় সম্মেলন চলার পর সর্বশেষ অনুষ্ঠানটিতে যদি সারাদিনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার ব্যবস্থা থাকে তাহলে তা শ্রান্ত-ক্লান্ত প্রতিনিধিদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করবে কিনা সন্দেহ। শ্রোতার মনোভাব বুঝে নিয়ে তবেই কোন বিষয়ের আলোচনার সূত্রপাত করতে হয়।

অতঃপর সম্মেলনে যোগদানের উপযোগী সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। সাফল্যের সংগে সম্মেলনের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হলে এদিকে দৃষ্টি রাখা পরিকল্পনা প্রস্তুতকারকদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে সম্মেলনের ব্যবস্থা করলে সকলেই প্রত্যক্ষভাবে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে পারে। এই ধরণের গোষ্ঠীসমূহের নেতৃত্ব করবেন যাঁরা, আলোচনায় নেতৃত্ব করার দক্ষতা তাঁদের অবশ্যই থাকা চাই।

সম্মেলনের প্রস্তুতিপর্ব

সম্মেলনের পরিকল্পনা যতদিন ধরে চলতে থাকে সম্মেলনের প্রস্তুতিও প্রকৃতপক্ষে ততদিন ধরেই চলে। এই পর্যায়ের যা কিছু কার্যকলাপ সম্মেলন আরম্ভের অব্যবহিত পূর্বেই সম্পন্ন হয়।

সাধারণ অধিবেশনে আলোচনায় যাঁরা অংশ গ্রহণ করবেন তাঁদের পূর্ব থেকেই কিছুটা প্রস্তুত হওয়া উচিত। সম্মেলনের সংগঠকেরা অনেক সময় মনে করেন সম্মানিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তৃতার বিষয়ে মহলা দিয়ে নেওয়া অমর্যাদাকর। তাছাড়া এ বিষয়ে তাঁদের সময়ের অপচয় হতে দেওয়াও অনুচিত বলে সংগঠকেরা মনে করেন। কিন্তু এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বক্তাদের পূর্ব প্রস্তুতির ওপরই সম্মেলনের সাফল্য নির্ভর করে।

কতকগুলি তথ্য বক্তাদের পূর্ব থেকে জানা থাকা প্রয়োজন, যথা, সভাটি

কি ধরণের, শ্রোতাদের সংখ্যা কত হবে, উদ্যোগকারী ও তাদের স্বরূপ কি, কোন্ বিষয়ের ওপর বক্তৃতা দিতে হবে, বক্তৃতার জন্য কতখানি সময় তাঁকে দেওয়া হবে প্রভৃতি।

বক্তাদের প্যানেল গঠিত হওয়ার পর এই প্যানেলের একজন চেয়ারম্যান নির্বাচিত হবেন। সম্মেলনের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত এক প্রাথমিক আলোচনাসভায় চেয়ারম্যানদের নির্দেশে বক্তাদের তালিম দিয়ে নেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। এর ফলে তাঁরা নিজেদের বক্তব্য বিষয়কে মোটামুটি একটা ছকে ফেলে নিতে পারবেন, পূর্ব থেকে প্রস্তুত থাকার জন্য আলোচ্য বিষয়কে অযথা দীর্ঘ না করে সহজ সুন্দর ভঙ্গিতে উপস্থাপিত করতে পারবেন, ফলে সময়ের অপচয়ও হবে না, আর বক্তৃতাকালে অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্তা বলে শ্রোতাদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবার সম্ভাবনাও থাকবে না। এতদ্ব্যতীত প্রাথমিক আলোচনার ফলে বক্তারা পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান।

অনুরূপভাবে সম্মেলন পরিচালনা করবেন যাঁরা তাঁদেরও যোগ্যতার সঙ্গে কার্য সম্পাদন করতে হলে পুঙ্খানুপুঙ্খ তালিম দেওয়া প্রয়োজন।

সম্মেলন পরিচালনা

সম্মেলনের অব্যবহিত পূর্বে ও সম্মেলন চলাকালে ষ্টিয়ারিং কমিটির দায়িত্ব অনেকখানি। পরিকল্পনা সমিতিই ষ্টিয়ারিং কমিটি গঠন করে। ষ্টিয়ারিং কমিটির কাজ হল সম্মেলনের বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা। এইভাবে কোন কর্মসূচী বা তৎসম্পর্কিত ব্যবস্থা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা খুব সহজ হয়।

ষ্টিয়ারিং কমিটি প্রত্যেকটি বিভাগের নেতার কাছ থেকে রিপোর্ট নেবেন, কোন অনুষ্ঠান যেন দু'বার অনুষ্ঠিত না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখবেন, বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের মধ্যে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করবেন, অনুষ্ঠান পরিচালন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন, উপ-সমিতি সমূহের রিপোর্ট যথাস্থানে প্রেরণের ব্যবস্থা করবেন, অর্থাৎ এককথায়, ষ্টিয়ারিং কমিটি সম্মেলন পরিচালনা করবেন।

সুতরাং একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, সম্মেলনের সাফল্যের মূলে আছে এর পরিকল্পনা ও পরিচালনা।

প্রাচ্য বর্গীকরণ-এর উদ্ভাবক সতীশচন্দ্র গুহ

সুশীলকুমার ঘোষ

ভারতীয়দের মধ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে যাঁহারা মৌলিক চিন্তা ও গবেষণা এবং দেশোপযোগী পদ্ধতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগে নিজ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন 'প্রাচ্য বর্গীকরণ' খ্যাত সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। সতীশচন্দ্রের জীবনাবসানে দেশ আজ একজন কৃতী সন্তানকে হারাইল।

বন্ধুবর সতীশ চন্দ্র গুহ ঠাকুর মহাশয়ের জন্ম হয় ১২৯৪ বঙ্গাব্দে। তিনি বরিশাল জেলার লোক ছিলেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হন। স্বনাম প্রসিদ্ধঅধ্যাপক সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডন সোসাইটির যিনি প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন) মহাশয়ের তিনি শিষ্য ছিলেন। জাতীয় শিক্ষাপ্রবর্ত্তনে উৎসাহী নেতা, নিরলস কর্মী ও শিক্ষা ব্রতীগণের সংস্পর্শে আসিয়া সতীশ চন্দ্র গুহ ঠাকুর নিজ জীবন ও চরিত্র আদর্শ-মূলক সূত্র এবং তৎকালীন প্রথা অনুসারে গঠন করিয়া তুলিবার শুভ সুযোগ পাইয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিল দেশসেবা, জীবনের লক্ষ্য ছিল পরোপকার ব্রত পালন। সরলভাবে সংযমী ও অবিলাসী জীবন যাপন বন্ধু প্রবর চিরকাল সাধন করিয়া

আসিয়াছেন। সুরেন্দ্রে নাথ, বিপিন চন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতির নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করেন।

তাঁহার ন্যায় সংযমী, অমায়িক ও নিরহঙ্কার ব্যক্তি কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সদালাপী, মৃদুভাষী সতীশচন্দ্র দেশ হিতব্রতী, কর্ম্মচঞ্চল প্রাণে সতত স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার ও চরখা এবং খদ্দর প্রচার কল্পে আদর্শ বিস্তারের কথা ভাবিতেন। তাঁহাকে কোন দিন বিনা খদ্দরে দেখি নাই,—শীত কালেও নহে। অতিরিক্ত শীতে খদ্দরেয় কম্বল ব্যবহার করিতেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময় তিনি শিক্ষকেরকার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে দেশ সেবার যজ্ঞে দিবারাত্র আত্মনিয়োগ করেন।

দ্বারবঙ্গের অধীশ্বর তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। দ্বারবঙ্গের (দ্বারভাঙ্গা) ষ্টেট লাইব্রেরীর গ্রন্থাধ্যক্ষরূপে তিনি সুনামের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন শুনিয়াছিলাম। মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সুধীরত্ন সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুরের কর্ম্মকুশলতায় মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তাঁহার বিবেচনা শক্তি, পাঠস্পৃহা, স্বাধীন চিন্তা যেমন অপূর্ব্ব, তেমনই অসাধারণ ছিল চরিত্রবল, অমায়িক ব্যবহার, সদাচার পালন প্রভৃতি গুণ। পরম কৃতিত্বের সহিত তিনি গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য যে ভাবে সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। গ্রন্থাগার বিদ্যায় তাঁহার নিবিড় পারদর্শিতা, শ্রেণী বিভাগের চরম সূক্ষ্ম দর্শন, তালিকা প্রস্তুতের নিয়মনিষ্ঠা, গ্রন্থ-পঞ্জী প্রণয়নের বিধি, পরিচালনা পদ্ধতি প্রভৃতিতে তাঁহার সুনিপুণ জ্ঞান তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। বিহার বিদ্যাপীঠের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁহার মেধা, বিবিধ বিষয়ের অধ্যয়ন ও গবেষণা তাঁহার জীবনের বৈশিষ্ট্য ছিল।

শান্তিনিকেতনের সুপ্রসিদ্ধ কলা ভবনের সংগ্রহ সচিব রূপে কার্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক যখন তিনি কিছুকাল করিয়াছিলেন, সেই কার্য্যে (কিউরেটার পদে) তিনি কর্ম্ম তৎপরতা, বিবেচনা শক্তি দেখাইয়া সকলকে প্রীতি ও আনন্দে বশীভূত করেন। বিচারবোধ তাঁহার ছিল অমেয়। বৈজ্ঞানিক ক্রমপর্য্যায় নির্ণয়ের ক্ষমতা তাঁহার ছিল অসীম।

কর্ম্মদক্ষ সতীশ চন্দ্র কাশী বিদ্যাপীঠের সহিত সংযুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও হিন্দি ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল প্রচুর। সে কারণে বহু লোকের সংস্পর্শে আসিয়া অপরিসীম অভিজ্ঞতা লাভ করেন। তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা বিপদ সঙ্কট বা অর্থকষ্ট কমাইতে পারে নাই। আজীবন বিদ্যাচর্চ্চা ও গ্রন্থাগার-

বিজ্ঞানের অনুশীলন ছিল তাঁহার জীবনের ব্রতস্বরূপ। পুণ্যধাম বারাণসী ছিল তাঁহার বহুদিনের বাসস্থান এবং জ্ঞান সাধনার কেন্দ্র। মহামতি শিবপ্রসাদ গুপ্ত ছিলেন তাঁহার পৃষ্ঠপোষক, অভিন্ন বন্ধু ও মঙ্গলকর্ত্তা। গুপ্ত মহাশয় তিনি দানবীর, স্বদেশপ্রাণ ছিলেন। বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অকাতর দান তাঁহাকে চিরকাল অমর করিয়া রাখিবে। তাঁহার ছিল প্রচুর পুস্তক সংগ্রহ। যশস্বী শিব প্রসাদের বিরাট গ্রন্থশালায় নির্লোভ সতীশ চন্দ্র বহুকাল কার্য্য করিয়া সুনাম অর্জন করেন। প্রখ্যাত নামা শিব প্রসাদ গুপ্তের গ্রন্থাগারিক রূপে তাঁহার অর্থকষ্ট বিদূরিত হয়, উভয়ের মধ্যে সৌহার্দ্য ঘনীভূত হয়। তাঁহারই সৌজন্যে সতীশচন্দ্র গুহ ঠাকুর মহাশয়ের জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ হইবার সুযোগ ঘটে। বর্গীকরণ বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ, চিন্তা ও উদ্ভাবনা শক্তি দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করি। প্রচুর অভিজ্ঞতা,গ্রন্থপাঠ ও বিচারবোধ আমাকে মুগ্ধ করে। ডিউইর দশমিক শ্রেণীবিভাগ (Decimal Classification of Melvil Dewey) পদ্ধতি আমাদের ভারতীয় সাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থগুলির পক্ষে উপযুক্ত নহে এই অভিমত প্রকাশ করেন।

নিষ্ঠাবান সতীচন্দ্রের অমর কীর্ত্তি 'প্রাচ্যবর্গীকরণ'। প্রাচ্য বিদ্যার তিনি বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। সমস্ত জীবন তাঁহায় বৈজ্ঞানিক বর্গীকরণের প্রতীক। দক্ষতার সহিত তিনি বিভিন্ন বিষয় পর্যবেক্ষণ করিতেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে ভাষাতত্ত্ব বাঙ নির্ণয় পদ্ধতিরদ্বারা (philological system) তিনি প্রচুর গবেষণার সহিত ইংরাজী বা বিদেশী শব্দ ও ভাবধারা ভাষান্তরিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জ্ঞানের গভীরতার ফলে তাঁহার প্রচেষ্টা ও অনুবাদ হইয়া উঠিয়াছিল মনোজ্ঞ। উপযুক্ত শব্দ তাঁহার সবিশেষ কৃতিত্বের পরিচায়ক। দ্বারবঙ্গ (দার্ভাঙ্গা), কাশী প্রভৃতি স্থানে অধিককাল বসতি ও নিষ্ঠার সহিত কর্ম সাধনা ও গ্রন্থাগার পরিচালনা কার্যে ব্যাপৃত থাকিবার ফলে তিনি ইংরাজী, বাঙ্গলা, সংস্কৃত, হিন্দি, উর্দ্দু, ফার্সি প্রভৃতি বিষয়ে ভাষাগত পার্থক্য নির্ধারণ করিতে অপরিমেয় সুযোগ পাইয়াছিলেন। ঐ সকল ভাষায় জ্ঞান তাঁহাকে বর্গীকরণ কার্যে ও অন্যান্য গুরুতর সমস্যা সমাধানে সাহায্য করিয়াছিল। শব্দচয়ন ব্যাপারে ও বিচারবোধ সম্মত বর্গীকরণ ধর্মনির্ণয়ে তাঁহার মনোহর কৃতিত্ব বুঝিতে পারা যায় তাঁহার প্রবর্ত্তিত প্রাচ্যবর্গীকরণ ও অন্যান্য হৃদয়গ্রাহী রচনাবলী হইতে।

নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার সীনেটহলে এক সম্মিলনে স্থির করেন যে বর্গীকরণ ব্যাপারে পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রচলিত পদ্ধতিগুলি এদেশে সম্যকরূপে উপযোগী নহে, ঠিকভাবে খাপ খায় না, যে কারণ প্রাচ্য দেশসমূহগুলির জন্য একটি উপযুক্ত পদ্ধতি প্রণয়ন আবশ্যক। সে সভায় ভারতের বিভিন্ন স্থান ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থাগার হইতে যে সকল বিচক্ষণ গ্রন্থাগারিক ও কর্মসচিব উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের লইয়া একটি বিশেষ সমিতি গঠন করা হয়, তাহাতে সতীশচন্দ্র, ডাঃ রঙ্গনাথন, শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন।

এই বিশেষজ্ঞ সমিতির বৈঠক কদাপি (এক যোগে) না বসিলেও, ব্যক্তিগত-ভাবে সতীশচন্দ্র গুহ ও রঙ্গনাথন নিজ নিজ গবেষণা যথাক্রমে ১৯৩২ ও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। শ্রীসতীশচন্দ্র গুহ কৃত প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতিটি সরস্বতী ভবন গবেষণ বার্ষিকপত্রের প্রথম খণ্ডে (১৯৩০) সম্পাদনকর্ত্তা কর্তৃক তদানীন্তন রাজকীয় কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ আচার্য মহামহো-পাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের ভূমিকা সংবলিত হইয়া প্রকাশিত হয়। ডক্টর রঙ্গনাথন কৃত "কোলন ক্লাসিফিকেশন" ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ হইতে একেবারে পুস্তকাকারেই বাহির হয়। গ্রন্থাগার (আষাঢ়, ১৩৬৬) দ্রষ্টব্য।

"প্রাচ্যবর্গীকরণ পদ্ধতি" পুস্তকে যেমন সতীশচন্দ্রের মৌলিকতা পরিস্ফুট, "পুস্তকের জাতবিচার" নামক প্রবন্ধে সেইরূপ তাঁহার চিন্তার প্রসার ও প্রকাশ ভঙ্গীর নিপুণতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। শ্রেণী বিভাগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছিল তাঁহার অমেয়। বারাণসীর "ভারতীয় জ্ঞান পীঠ" এবং পার্শ্বনাথ জৈনাশ্রমে" তাঁহার প্রাচ্যবর্গীকরণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। সম্প্রতি প্রয়াগে হরিজন আশ্রমে "গান্ধী সাহিত্য ভবনে" ঐ পদ্ধতি অনুসারে গ্রন্থ বর্গীকৃত হইয়াছে। দক্ষিণ ভারতেও তৎ-প্রবর্ত্তিত প্রাচ্যবর্গীকরণ পদ্ধতি তিরুপতি নগরে শ্রীবেঙ্কটেশ্বর গবেষণাগারে (অধুনা তিরুপতি বিশ্ববিদ্যালয়) পঞ্চদশ বৎসর যাবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে [গ্রন্থাগার আশ্বিন ১৩৬৪ সাল দ্রষ্টব্য] এ ছাড়া বহু পত্র পত্রিকায় তিনি সুচিন্তিত ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

তাঁহার অসমাপ্ত কার্যের সূত্র ধরিয়া কেহ যদি তাহা সম্পূর্ণ করেন এবং তাঁহার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপিগুলি গ্রন্থাগার পরিষদ বা অনুরূপ কোনও সংস্থা প্রকাশের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা নিবেদিত হইবে।

পরিষদ কথা

বিশেষ সাধারণ সভায় পরিষদ সংবিধানের সংস্কার

গত ২৮শে আগষ্ট অপরাহ্ণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পরিষদ সংবিধানের কয়েকটি ধারার পরিবর্তন ও পরিবর্জন করা হয়। সংশোধিত ধারাগুলি 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় প্রকাশ করা হইবে।

পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন

২৮শে আগষ্ট বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের পর পরিষদের পঞ্চবিংশতিতম সাধারণ সভা এবং সংসদ ও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়,

সম্পাদক শ্রীফণিভূষণ রায় পরিষদের বিগত বর্ষের কার্যবিবরণী ও হিসাব পরীক্ষক কর্তৃক পরীক্ষিত আয়ব্যয়ের হিসাব ও উদ্বর্ত পত্র সভায় উপস্থিত করেন এবং তাহা সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ঐ সভায় নিম্নলিখিত সদস্যগণ সংসদ ও কার্যনির্বাহক সমিতির বিভিন্ন পদে নির্বাচিত হয়েছেন ঃ

সভাপতি

শ্রীতিনকড়ি দত্ত

সহ-সভাপতি

শ্রীবি. এস. কেশবন ; শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু ; শ্রীসুবোধকুমার মুখোপাধ্যায় ; শ্রীগোষ্ঠবিহারী চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রমোদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

কর্মসচিব

শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়

যুগ্ম-কর্মসচিব

শ্রীঅরুণকান্তি দাশগুপ্ত

সহ কর্মসচিব

শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী

গ্রন্থাগারিক

শ্রীচঞ্চল সেন

কোষাধ্যক্ষ

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রিকা সম্পাদক

শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

সংসদ

দাতা, আজীবন সদস্য ও ব্যক্তিগত সদস্যগণের প্রতিনিধি :

শ্রীবিধান অধিকারী ; শ্রীমতী বাণী বসু ; শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীবিশ্বাস ; শ্রীঅনাথ বন্ধু দত্ত ; শ্রীমতী কৃষ্ণা দত্ত ; শ্রীগোবিন্দ ভূষণ ঘোষ ; শ্রীবাসুদেব লাহিড়ী ; শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার ; শ্রীইন্দ্রনাথ মজুমদার ; শ্রীগণেশচন্দ্র মিত্র ; শ্রীপূর্ণেন্দু প্রামাণিক ; শ্রীঅমিয়ভূষণ রায় ; শ্রীগোবিন্দলাল রায় ; শ্রীফণিভূষণ রায় ; শ্রীঅভয় সরকার।

প্রতিষ্ঠানিক সদস্যগণের প্রতিনিধি

বাঁকুড়া	ধ্রুব সংহতি, বালসি
বীরভূম	জুবিলি পাবলিক লাইব্রেরী, সিউড়ি
বর্ধমান	মাখনলাল পাঠাগার, জাড়গ্রাম
কলিকাতা	ভারত সভা, ৬২, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট ; কালিঘাট তরুণ ঘংঘ, সাদার্ন মার্কেট ; মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী, মনসাতলা ;
কুচবিহার	পি, ভি, এন্‌ এন ক্লাব, হলদিবাড়ী
দার্জিলিং	ব্লুমফিল্ড পাবলিক লাইব্রেরী, কার্সিয়াং
হুগলী	গরলগাছা প্যাবলিক লাইব্রেরী, গরলগাছা
হাওড়া :	বিষ্ণুপদ স্মৃতি পাঠাগার, সালিখা
জলপাইগুড়ি :	বাবুপাড়া পাঠাগার, জলপাইগুড়ি
মালদহ :	বান্ধব পাঠাগার, হরিশ্চন্দ্রপুর
মেদিনীপুর :	রাজনারায়ণ বসু স্মৃতি পাঠাগার, মেদিনীপুর
মুর্শিদাবাদ :	জাহ্নবী স্মৃতি কিশোর পাঠাগার, গোরাবাজার, বহরমপুর
নদীয়া :	নবদ্বীপ সাধারণ গ্রন্থাগার, নবদ্বীপ
পুরুলিয়া :	বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির, গড়জয়পুর
২৪ পরগণা :	দমদম লাইব্রেরী ও লিটার‍্যারী ক্লাব, মনুজেন্দ্র দত্ত রোড ; নবাবগঞ্জ সাধারণ গ্রন্থাগার, ইছাপুর

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর, মধ্য শিক্ষা পর্ষদ, কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান, জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বঙ্গীয় প্রকাশক সভা, পশ্চিম বঙ্গ মিউনিসিপ্যাল এসোসিয়েসন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

ইউনাইটেড রিডিং রুমের ষষ্টিতম প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ২৪শে আগষ্ট সাহিত্যিক প্রমথ নাথ বিশীর পৌরোহিত্যে এক অনুষ্ঠানে নিমতলা অঞ্চলের এই গ্রন্থাগারটির ষষ্টিতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উদ্‌যাপিত হয়। প্রারম্ভে সাধারণ সচিবের ভাষণে জানা যায় যে ৮৮ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্টিত ক্যালকাটা রিডিংরুম ও ১৮৯১ সালে প্রতিষ্টিত আহিরীটোলা রিডিং রুমের সম্মিলনে বর্তমান এই গ্রন্থাগারটির জন্ম হয়। গ্রন্থাগারাটিতে রক্ষিত বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদির উপযুক্ত ব্যবহারের জন্যে সচিব মহাশয় তথ্য সন্ধানী পাঠক ও গবেষকদের বিশেষভাবে আমন্ত্রন জানান। সভাপতির ভাষণে শ্রীযুক্ত বিশী সাধারণ পাঠকের পঠন পাঠনের নিম্নগামী মানের উল্লেখ করে বাঙালী পাঠকদের যুগোপযোগী চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যে .ভারসাম্য গ্রন্থপাঠে প্রবৃত্ত হতে উপদেশ দেন। পরিশেষে স্থানীয় কুশলী শিল্পীদের উদ্যোগে প্রান্তিক ও বর্ষণ নামে দুটি মনোজ্ঞ গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয়।

দীপায়নের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন

গত ৫ই মে বিজয়গড়স্থিত দীপায়নের নবনির্মিত ভবনের আনুষ্ঠানিক ভাবে শুভ দ্বারোদ্ঘাটন করেন স্থানীয় জ্যোতিষ রায় কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয় ভূষণ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও এতদঞ্চলের অনেক গ্রন্থাগার কর্মী উপস্থিত ছিলেন। শ্রীচক্রবর্তী তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণে বর্তমান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংকটে গ্রন্থাগারের মূল্যায়ন করেন। দীপায়নের প্রতিষ্টা ও তার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে শ্রীনীহার কান্তি নাগ ও শ্রীযোগেশ চন্দ্র দাশ বক্তৃতা করেন। শ্রীবিমল নাথ দীপায়নের বর্তমান কর্মতৎপরতার বিবরণ প্রসঙ্গে স্থানীয় অধিবাসীদের ধন্যবাদ জানান এবং সকলকে অধিকতর গ্রন্থাগারমুখী করে তোলার জন্যে অনুরোধ করেন।

নারী শিল্প নিকেতনের নবম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

২২শে জুলাই থেকে তিনদিন ব্যাপী নারী শিল্প নিকেতনের (মেছুয়াবাজার) নবম প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন নিকেতন সভানেত্রী শ্রীযুক্তা চারুশীলা দেবী। ঐদিন বিগত বর্ষের কার্যবিবরণী পঠিত হয়। তাতে নিকেতনের বহুমুখী কার্যাবলীর মধ্যে কলিকাতা ও তার উপকণ্ঠের কয়েক জায়গায় নিকেতন পরিচালিত সেবা ও শিক্ষামূলক নানা কার্যবিবরণ বিবৃত হয়। নিকেতনের নিজস্ব গৃহ নির্মাণের প্রচেষ্টাও সভায় ঘোষিত হয়। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপিকা কল্যাণী কার্লেকার। মেয়েদের শিক্ষা সংক্রান্ত নানা সমস্যা ও তার প্রতিকার সম্পর্কে সভায় আলোচনা ও কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

চেতলা পরিতোষ স্মৃতি পাঠাগারের তৃতীয় বার্ষিক সভা

গত ২৫শে জুন স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি শ্রীমণি সান্যালের সভাপতিত্বে পাঠাগারের তৃতীয় বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিগত বর্ষের সম্পাদকীয় বিবরণীতে পাঠাগারের দৃঢ় ক্রমোন্নতির পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠাগারের সদস্য ও গ্রন্থ সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্থান সংকুলান সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সভায় শ্রীমণি সান্যাল, শ্রীসুনীতি সুন্দর ঠাকুর ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ নন্দী যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিকের পদে নির্বাচিত হন।

ঢাকুরিয়া বাপুজী স্মৃতি সংঘে গ্রন্থপক্ষ পালন

বিগত জুন মাসের ১লা থেকে ১৫ই পর্যন্ত বাপুজী স্মৃতি সংঘের গ্রন্থাগার বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক গ্রন্থপক্ষ পালন করা হয়। অঞ্চলের বিশিষ্ট স্থান ও গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করার দায়িত্ব—এই বিষয়ে পোষ্টার দ্বারা সংঘ ভবন সুসজ্জিত করা হয়। ছোট ছোট দলে বিভক্ত কর্মীরা বাড়ীতে বাড়ীতে যাইয়া গ্রন্থাগারকে আরো জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা করেন এবং আর্থিক ও গ্রন্থ সাহায্য সংগ্রহ করা হয়। এই উপলক্ষে ৭ই জুন বিশেষ "পতাকা দিবস" উদ্‌যাপন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করা হয়।

যাদবপুর বিবেক সংঘের একাদশ প্রতিষ্ঠা দিবস

গত ৯ই আগষ্ট বিবেক সংঘের (বিবেকনগর) একাদশ প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

গ্রন্থাগারিক শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়। সম্পাদক তাঁর কার্যবিবরণীতে বলেন যে সাড়ে বারো হাজার টাকা ব্যয়ে সংঘের পাঠভবন নির্মিত হয়েছে। দৈনিক গড়ে ৮৫ জন ব্যক্তি পাঠকক্ষ ব্যবহার করেন। সংঘের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ২৮৮ জন। বিগত বর্ষে যে সকল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান নানাভাবে সাহায্য দান করেছেন তা উল্লেখ করা হয়। সংঘের সভাপতি তাঁর ভাষণে দেশের বর্তমান পরিস্থিতির আলোচনা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক বেনিয়াপুকুর লাইব্রেরীর নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন

পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় গত ১৪ই আগষ্ট বেনিয়াপুকুর লাইব্রেরী ও রিডিং ক্লাবের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন করেন। মেয়র শ্রীকেশবচন্দ্র বসু পৌরোহিত্য করেন। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ ও সংখধ্বনির মধ্যে অনুষ্ঠান কার্য সূচীত হয়।

১৮৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি কলিকাতার প্রথম শ্রেণীর গ্রন্থাগারগুলির পর্যায়ভুক্ত ছিল। ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আনুমানিক তের হাজার বই ও যাবতীয় আসবাবপত্র লুন্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়। এই সময় গ্রন্থাগারের সুবর্ণ জয়ন্তীর উদ্যোগ-আয়োজন চলছিল। সুখের বিষয় যে গ্রন্ধাগারের শিশু বিভাগটি অন্যত্র থাকায় উহা কোন প্রকারে রক্ষা পায়।

গত কয়েক বছরে গ্রন্থাগারের নিষ্ঠাশীল কর্মীদের নিরবচ্ছিন্ন ও নিরলস প্রচেষ্টা ও প্রাক্তন মেয়র শ্রীনরেশ নাথ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য ও সহানুভূতি গ্রন্থাগারের নিজস্ব গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনাকে সার্থক রূপদান করেছে।

অনুষ্ঠানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

মনোহরপুকুর দেশবন্ধু পাঠাগার

গত ৩১শে জানুয়ারী পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা ও কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বিগত বর্ষের কার্যবিবরণীতে প্রকাশ যে আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ পাঠাগারের বহু কাজ ব্যাহত হচ্ছে। সরকার ও পৌর প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে গত কয়েক বছর কোন সাহায্য পাওয়া যায় নি। তবুও পাঠাগারের কর্মীদের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে দৈনন্দিন কাজকর্মের মান অক্ষুণ্ণ রয়েছে এবং সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সর্বশ্রী প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত ও পূর্ণেন্দু মজুমদার যথাক্রমে সভাপতি সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী। খিদিরপুর

মাইকেল লাইব্রেরী প'য়তাল্লিশ বৎসর বয়স অতিক্রম করল। লাইব্রেরীর সাম্প্রতিক কর্মতৎপরতার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হোল যে গ্রন্থাগার গৃহের দ্বিতল নির্মাণের জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হতে আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে বলে জানা গেছে। পাঠাগারের উদ্যোগে হিন্দী ভাষা শিক্ষা দানের জন্যে একটি বিভাগ খোলা হয়েছে। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও মধুমিলন উৎসব ও মধুস্মৃতি বার্ষিকী সাফল্যের সহিত উদ্‌যাপিত হয়েছে। লাইব্রেরীর অন্যান্য দৈনন্দিন কাজ ক্রমোন্নতির পরিচয় দেয়।

বীরভূম

সিয়ান সাধারণ পাঠাগার। সিয়ান

এই পাঠাগারটি শ্রীদুর্গা ক্লাবের একটি বিভাগ। পূর্বে এর নাম ছিল বৈদ্যনাথপুর সাধারণ পাঠাগার। পাঠাগারটির সদস্য সংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় ও গ্রামবাসীদের কাছে এর পাঠ কক্ষটি জনপ্রিয়তা লাভ করায় এর পক্ষে নিজস্ব পুস্তক সংগ্রহ থেকে সদস্যদের চাহিদা মেটানো সম্ভব হচ্ছে না—জেলা গ্রন্থাগার থেকে নিয়মিত গ্রন্থ-ঋণ পাওয়া সত্ত্বেও। সে জন্যে পাঠাগার কর্তৃপক্ষ শ্রীনিকেতন 'চলন্তিকা' পাঠাগার থেকে পনের দিন অন্তর ঋণ হিসেবে গ্রন্থ সংগ্রহের মাধ্যমে নিজ অসুবিধা কিছুটা দূর করেছেন। গ্রন্থাগারটির জন্যে গ্রামবাসীদের পূর্ণ সহানুভূতি থাকলেও আর্থিক অসচ্ছলতায় এর অনেক কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

মেদিনীপুর

এড়গোদা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার

নিত্যানন্দ ন্যাস সমিতির পরিচালনাধীনে গত বছরের জুন মাস থেকে এড়গোদা গ্রামে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অর্থানুকুল্যে একটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রতিনিধিমূলক একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি গ্রন্থাগারের দৈনন্দিন কার্যবিষয়ে পরামর্শ দান করেন। এড়গোদাকে কেন্দ্র করে বিনপুর থানার ১৪ নং ইউনিয়ন ও জাম্বনী থানার ১ নং ইউনিয়ন এলাকায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সর্বস্তরে জনপ্রিয় করে তোলাই এর মূল উদ্দেশ্য। এড়গোদা আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের অধীনে ৮টি শাখা গ্রন্থাগার গঠন করা হবে।

কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ১০৮ জন। গ্রন্থাগারটির কার্যকালের প্রথম নয় মাসে ২৮৭২ খানি গ্রন্থ বিলি হয়েছে। মাসে দু'বার শাখা গ্রন্থাগারগুলিতে গ্রন্থ-ঋণ দেওয়া হয়।

হাওড়া

কিশোর সংঘ পাঠাগার। বীরশিবপুর

ছোট গ্রামের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্মীদের সীমিত সংগতির মধ্যে এই পাঠাগারটি পরিচালিত হয়ে থাকে। পাঠাগারের বিগত বর্ষের কার্যবিবরণীতে তার কর্মচাঞ্চল্যের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সদস্য ও গ্রন্থ সংখ্যা বৃদ্ধি ছাড়াও উল্লেখযোগ্য কার্যাবলীর মধ্যে জেলা পাঠাগার সংঘের অনুমোদন লাভ, গৃহনির্মাণের জন্যে জমি ক্রয় ও ইহার রেজিষ্ট্রিকরণ অন্যতম, পাঠাগারে সমাজসেবার একটি বিভাগ আছে। ইহার সাংস্কৃতিক বিভাগের কার্যাবলী প্রশংসনীয়।

চব্বিশ পরগণা

দেশবন্ধু মিলন সংঘ। সোদপুর

বৎসরকাল পূর্বে সংঘে একটি গ্রন্থাগার বিভাগ খোলা হয়। তজ্জন্য স্থানীয় পৌর প্রতিষ্ঠান এককালীন চল্লিশ টাকা সাহায্য দান করেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে নানাবিধ সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে। জেলা গ্রন্থাগার থেকে প্রতিমাসে ২৫ খানা করে গ্রন্থঋণ দেওয়া হয়ে থাকে। সংঘের বহুবিধ কার্যাবলীর মধ্যে অম্বর চরখা শিক্ষার ব্যবস্থা স্থানীয় মহিলাদের মধ্যে প্রভূত উৎসাহের সৃষ্টি করেছে।

বজবজ ব্রতী সংঘ পাঠাগারের সাহায্য অনুষ্ঠান

গত ১২ই জুন সকাল ৯৷৷০ টায় বজ্‌বজ্‌ বীণা সিনেমায়, বজ্‌বজ্‌ ব্রতী সংঘ পাঠাগারের অবৈতনিক পাঠকক্ষের সাহায্যকল্পে "ক্ষণিকের অতিথি" চিত্রটী প্রদর্শিত হয়। স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা ও অকুণ্ঠ সমর্থনে অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়। সভ্যবৃন্দের দান ও বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাবদ মোট ৬১৫·৪৪ নঃপঃ (ছয় শত পনের টাকা চুয়াল্লিশ নঃপঃ) সংঘের অবৈতনিক পাঠ কক্ষ তহবিলে প্রদত্ত হয়। বীণা সিনেমা কর্তৃপক্ষ সিনেমা হলটি

বিনা ভাড়ায় ছাড়িয়া দিয়া এবং ২৪ পরগণার জেলা শাসক বিক্রয়লব্ধ অর্থের উপর আমোদ কর রেহাই মঞ্জুর করিয়া এই মহৎ প্রচেষ্টায় সহায়তা করেন।

হুগলী

গুড়াপ সুরেন্দ্র স্মৃতি পাঠাগারের পঞ্চম বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২৯শে শ্রাবণ পাঠাগারের পঞ্চম বাষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীসুখগণী চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করেন। কর্মসচিব শ্রীঅনিল কুমার হালদার বিগত বর্ষের কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপিত করেন। পাঠাগারটি সরকারী পরিকল্পনাধীনে পল্লী পাঠাগারে পরিণত হওয়ায় ইহার কর্মপরিধি বহুগুণে বর্ধিত হয়েছে। সেজন্যে পাঠাগার গৃহের দ্বিতল নির্মাণ আবশ্যক। ইহা বাবদ সরকার প্রদত্ত অর্থ অপর্যাপ্ত বলে জনসাধারাণর নিকট সাহায্যের জন্যে আবেদন জানানো হয়েছে। পাঠাগারের পুস্তক তালিকা শীঘ্রই মুদ্রিত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

বার্তা বিচিত্রা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে যে কয়েকটি নোতুন বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করা হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তার মধ্যে একটি। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের জন্যে সুন্দর গৃহ নির্মিত হয়েছে। নিযুক্ত হয়েছেন সুদক্ষ ও সুপণ্ডিত গ্রন্থাগারিক এবং উৎসাহী কর্মিদল। কাজের দিক থেকেও গ্রন্থাগার সুনাম অর্জন করেছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, কর্মীদের বেতন ও পদ সম্পর্কে এখনও পাকাপাকি কিছু ব্যবস্থা হয় নি। সতেরো জন কুশলী কর্মীর মধ্যে জন তিন চার বাদে কারুরই পদ নাকি মঞ্জুরীকৃত নয়। প্রতি দু'মাস অন্তর সেগুলির মেয়াদ বাড়ানো হয় এবং বেতন তাঁদের বাঁধাধরা ১২০৲ টাকা। অনির্দিষ্ট কাল যাবত অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ কর্মীদের মনোবল অটুট রাখার পক্ষে নিশ্চয় অনুকূল নয়। কুশলী কর্মীরা গ্রন্থাগারের স্তম্ভস্বরূপ। স্তম্ভকে উপেক্ষা করে হর্ম্যের অস্তিত্ব যে বিপদজনক সে কথা কর্তৃপক্ষের উপলব্ধি করা উচিত।

বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের চাঁদার হার বৃদ্ধি

চলতি বছরে বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ সকল স্তরের সদস্যদের চাঁদার হার বৃদ্ধি করেছেন। সাধারণ (ব্যক্তিগত) সদস্যদের চাঁদা বার্ষিক ৩৲ থেকে ৪।।০ ; প্রতিষ্ঠানিক সদস্যদের চাঁদা বার্ষিক ৫৲ থেকে ৮৲ এবং পল্লী গ্রন্থাগারের চাঁদা ১২৲ টাকা থেকে ১৮৲ টাকায় বর্ধিত হয়েছে। পল্লী গ্রন্থাগারের দেয় চাঁদা মাত্র গত বছরেই ৫৲ টাকা হতে ১২৲ টাকায় বাড়ানো হয়। চাঁদার হার বর্ধিত হওয়ায় জেলা পরিষদের সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

গ্রন্থাগার বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষণ গ্রহণের জন্য বিদেশ যাত্রা

কলিকাতা ইউ এস আই এস গ্রন্থাগারের কর্মী শ্রীশক্তিদাস রায় গ্রন্থাগার বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষণ গ্রহণের জন্য গত ১৯শে জুলাই বিমানযোগে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র রওনা হয়েছেন। শ্রী রায় হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত বেকের গ্রন্থাগারের ক্যাটালগ বিভাগে কাজ করবেন এবং সিমন্‌স কলেজের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ বিদ্যাভবনে অধ্যয়ন করবেন। শ্রী রায় বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একজন প্রাক্তন ছাত্র।

তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে 'মৌসুমী' পত্রিকার প্রথম বার্ষিক উৎসব

তমলুক জেলা গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষকতায়ও বিশেষ উৎসাহী পাঠকবৃন্দের সহযোগিতায় গঠিত তরুণ সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের অবদান হাতেলেখা মাসিক 'মৌসুমী পত্রিকা'র এক বৎসর পূর্ণ হওয়ায় তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে গত ২৫শে আগষ্ট, অপরাহ্ণ ৫ ঘঠিকায় উক্ত পত্রিকার প্রথম বার্ষিক প্রদর্শনী তমলুকের মহকুমা শাসক শ্রীসুবোধকুমার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

বালক-বালিকা, ছাত্র-শিক্ষক ও বহু সুধীজন উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। তরুণদিগকে জেলা গ্রন্থাগারে বই পড়া বাদেও সাহিত্য চর্চ্চায় উৎসাহিত ও প্রণোদিত করিতে জেলা গ্রন্থাগারের এই প্রচেষ্টার বিশেষ প্রশংসা করিয়া বহু মনোহর চিত্র সম্বলিত এই পত্রিকার উৎকর্ষ সাধনে সভাপতি মহাশয় একটি হৃদয়গ্রাহী জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দেন। শ্রীশ্রুতিনাথ চক্রবর্তী প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, শিক্ষাবিদ্ শ্রীবিভূতিভূষণ সাঁতরা, 'মৌসুমী' সম্পাদক শ্রীচিররঞ্জন মাইতি শ্রীবংকিম বোস, ও শ্রীদিগিন্দ্রনাথ মিশ্র আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। সভাশেষে সভাপতি মহাশয়

প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। প্রদর্শনী ২৫শে আগষ্ট হইতে এক সপ্তাহকাল-ব্যাপী খোলা থাকে। শিশু, তরুণ, কিশোর, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীগণ, শিক্ষক, শিক্ষিকা, অধ্যাপকবৃন্দ ও বহু সাধারণ লোক প্রদর্শনী দেখিয়া তৃপ্তি লাভ করেন।

গুটেনবার্গ বাইবেলের অনুলিপি

প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ গুটেনবার্গ বাইবেলের শীঘ্রই এক হুবহু মুদ্রিত অনুলিপি মার্কিন প্রকাশন সংস্থা পেজাণ্ট কোম্পানী বের করছেন। সর্বসমেত এক হাজার কপি প্রকাশিত হবে। দাম পড়বে পাঁচ থেকে ছয় শ' ডলার। দু'খণ্ডে বইটির আকার হবে লম্বায় ১৮½" আর চওড়ায় ১২"। ওজন হবে প্রায় আধমণ। গলানো সোনা, রূপা প্রভৃতির দ্বারা মূল রঙে গ্রন্থটি রঞ্জিত হবে ও সুদক্ষ দপ্তরীরা খণ্ডগুলিকে হাতে বাঁধাই কাজ করবেন। মূল গ্রন্থটির লেখা ও চিত্রের হুবহু অনুকরণে প্রস্তাবিত সংস্করণের ৯৭টি পৃষ্ঠা পাঁচটি পদ্ধতিতে মুদ্রিত ও চিত্রিত হবে। বাকি ১১৮৫টি পৃষ্ঠা লিথো পদ্ধতির সাহায্যে মুদ্রিত হবে। কাগজ, কালি, ছাপা ও বাঁধাইয়ের উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট মালমসলা ব্যবহার সম্পর্কে পরীক্ষা চলছে। গ্রন্থটির ভাঁজাই, বাঁধাই প্রভৃতি কাজ হস্তেই সম্পূর্ণ করা হবে।

সোভিয়েত দেশে বর্গীকরণ পদ্ধতি

সারা সোভিয়েত রাশিয়ায় বিভিন্ন গ্রন্থাগারে বর্গীকরণের সুবিধার্থে একটি নোতুন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে। এজন্যে সোভিয়েতের তিনটি বৃহত্তম গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিশন গঠিত হয়েছিল। তাঁরা হলেন মস্কোর লেনিন লাইব্রেরী, লেনিনগ্রাদের পাবলিক লাইব্রেরী, লাইব্রেরী অব সায়েন্স এবং লাইব্রেরী অব বুক চেম্বারের প্রতিনিধি। পদ্ধতিটি অনেকটা কোলন বর্গীকরণের অনুরূপ; মিশ্রিত চিহ্ন ও রুশ বর্ণমালার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। মার্কস ও লেনিনের মতবাদের ভিত্তিতে জ্ঞানের ক্ষেত্রকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথাঃ (১) সায়েন্স অব সোসাইটি, (২) সায়েন্সেস অব দি এ্যাকসন অব ম্যান অন নেচার এবং (৩) সায়েন্সেস অব নেচার। তপশীল-এর প্রথমে আছেঃ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ, ন্যাচারাল, ফিজিক্যাল এণ্ড বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস। পরে আছে সোসাল সায়েন্সেস

ও হিউম্যানিটিজ। বর্গীকৃত সূচীকরণ প্রণালীর সুবিধার উদ্দেশ্যেই এই নোতুন পদ্ধতিটির উদ্ভাবন করা হয়েছে।

পৃথিবীর পঁচাত্তরটি দেশে ডিউই বর্গীকরণ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়

'ডিউই ডেসিম্যাল ক্লাসিফিকেশন' প্রকাশন সংস্থার সম্পাদকের এক বিবরণীতে প্রকাশ যে ডিউই বর্গীকরণ গ্রন্থ বিক্রয়ের হিসাবে জানা গেছে যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য দেশে যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিকে বাদ দিয়েই পঁচাত্তরটি দেশে উক্ত গ্রন্থের ষোড়শ সংস্করণ অল্পবিস্তর বিক্রিত হয়েছে। তারমধ্যে অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, ভারতবর্ষ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রিটেনেই সর্বাপেক্ষা অধিক বিক্রয় হয়েছে।

কালা আদমীদের প্রবেশ নিষেধ

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়া রাজ্যের অন্তর্গত ড্যানভিল নামক স্থানের পাবলিক লাইব্রেরীগুলি বন্ধ করে দেবার সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। কারণ আদালত থেকে স্থানীয় টাউন কাউন্সিলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে শ্বেতকায়দের জন্যে পৃথক পাঠকক্ষে নিগ্রোদের প্রবেশাধিকার দিতে হবে। এজন্য সহরে অনুষ্ঠিত এক গণভোটে ২ : ১ ভোটে জনসাধারণ নিগ্রোদের প্রবেশাধিকার দেওয়ার চেয়ে গ্রন্থাগার একেবারে বন্ধ করে দেবার পক্ষে নিজেদের মনোভাব জানিয়েছে।

লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার গ্রন্থের সম্পূর্ণ সংস্করণ

শিল্প ও সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রশ্ন নিয়ে মতান্তর বহু দিনের। আদালতেও সব সময় তার নিষ্পত্তি হয় নি। জেমস জয়েসের সুবিখ্যাত 'ইউলিসিস' কিংবা এ্যালবার্টো মোরাভিয়ার 'উওম্যান অব রোম' গ্রন্থের প্রকাশ ও অনুবাদ নিয়ে মামলা মোকদ্দমার ঢেউ কিছুটা এদেশেও এসে গেছে। অমর কথাশিল্পী ডি, এইচ, লরেন্সের লেডি চ্যাটার্লিজ লাভার গ্রন্থটিকেও অশ্লীলতার অভিযোগে কিছু কিছু ছাঁটাই করতে হয়। সম্প্রতি পেঙ্গুইন কোম্পানী এই বইটির সম্পূর্ণ ও মূল সংস্করণ একটি বের করেছেন এবং বাজারে ছাড়ার আগে আদালতের অনুমতি চেয়েছেন। বইটি এখন স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের বিবেচনাধীনে আছে।

শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তীবিশ্বাসের

স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
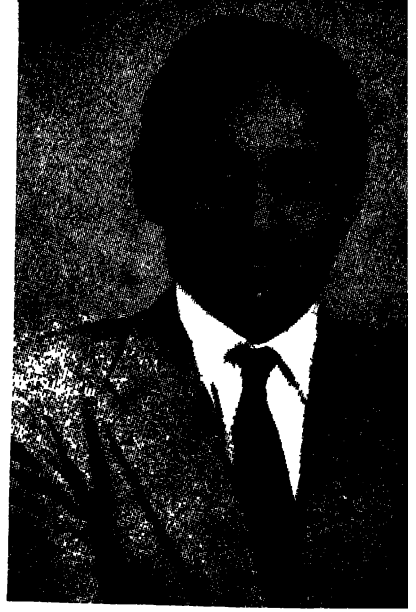
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুপরিচিত কর্মী ও একজন প্রাক্তন সম্পাদক শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তী বিশ্বাস গত বৎসর জুলাই মাসে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিদ্যায় (মাষ্টার অব সায়েন্স ইন লাইব্রেরীয়ানসিপ) শিক্ষণ গ্রহণের জন্যে নিউ ইয়র্ক গমন করেন। এজন্য ফুলব্রাইট ভ্রমণ বৃত্তি ও আমেরিকান মেডিক্যাল লাইব্রেরী এসোসিয়েসনেরও একটি বৃত্তি তিনি লাভ করেছিলেন। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করবেন বলে জানা গেল।

নিউ ইয়র্কের শিক্ষণ সমাপ্তি পরীক্ষায় পৌনে দুই শ' শিক্ষার্থীর মধ্যে রাখালবাবু শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন বলে প্রকাশ। সেখানে নয় মাস অবস্থানের পর তিনি ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্দিষ্ট বিশেষ বিষয়ে অধ্যয়নের জন্য যোগদান করেন।

আমেরিকায় থাকাকালে রাখালবাবু সেখানকার বিভিন্ন সহরে বহু ছোটবড় গ্রন্থাগার পরিদর্শন ও বিশিষ্ট গ্রন্থাগার কর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিভিন্নস্থানে অনুষ্ঠিত সভা ও সম্মেলনে তিনি যোগদান ও ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে ভাষণ দান করেন।

আমেরিকার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন সে বিষয়ে 'গ্রন্থাগার' পত্রিকায় তিনি প্রবন্ধ লিখিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন।

গত ১০ই জুলাই জাতীয় গ্রন্থাগারে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের সপ্তাহান্তিক বিভাগের

সম্পাদকীয়

সর্বজনীন গ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার পরিষদ

আমাদের দেশের সর্বজনের জন্য নিঃশুল্ক, অবাধ অধিগম্য সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইবার দিন ত্বরান্বিত হইয়া আসিতেছে। গ্রন্থাগার উপদেশক কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী গ্রন্থাগার আইনের সাধারণ কাঠামো প্রস্তুতির আয়োজন কেন্দ্রীয় সরকারের চেষ্টায় আরব্ধ হইয়াছে। করের জুজুর ভয় দেখাইয়া একদল মতলববাজ লোক এই চেষ্টাকে বানচাল করিবার জন্য তৎপর থাকিলেও সাধারণের মনোভাব আজ এমন ভাবে সুগঠিত হইয়াছে যে কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া তোলা সুকঠিন। আমাদের বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে জনমত গ্রন্থাগার আইনকে অভিনন্দিত করিবার জন্য সংগঠিত হইয়া ওঠে। বাংলা দেশের প্রধান নগরী কলিকাতা হইতে আরম্ভ করিয়া দূর পল্লীর নিভৃততম অঞ্চল পর্যন্ত সর্বত্র জ্ঞানের বর্তিকা অনির্বাণ রাখিবার প্রচেষ্টায় যে বাঙ্গালী জাতি সর্বস্বপণ করিয়া আসিয়াছে—আজিকার দেশীয় সরকারের শুভ প্রচেষ্টায় তাহারা সর্বথা সহযোগিতা করিবে, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। তবুও পরিষদের প্রধান দায়িত্ব যাহাতে বিরুদ্ধ প্রচারে জনমত বিভ্রান্ত না হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা। আমরা আমাদের সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিগত সভ্যদের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিতেছি। তাঁহারা পল্লীতে পল্লীতে, সহরে সহরে, নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার স্থাপনের জন্য গ্রন্থাগার আইনের দাবী তুলুন। দেশের রাজকোষে সামান্য কিছু চিহ্নিত অর্থ সংযুক্ত করিয়া তাঁহারা উহার রুদ্ধদ্বারটিকে গ্রন্থাগার ব্যয় নির্বাহের জন্য উন্মোচিত করিয়া দিন।

আমাদের দেশের গ্রন্থাগার কিরূপ হওয়া উচিত তাহা নির্ণয় করিবার দ্বিতীয় দায়িত্ব আমাদের এই পরিষদের। এই দেশের বিপুল সংখ্যক লোক অক্ষর জ্ঞান বর্জিত। তাহাদের প্রয়োজন কিন্তু বিচিত্র। তাহাদের মধ্যে কেহ কৃষির, কেহ কুটির শিল্পের, কেহ বা শ্রম বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকা অর্জন করে। এই সমস্ত লোকের আপনাপন কর্মে অধিকতর যোগ্যতা অর্জন করাইবার দায়িত্ব প্রধানতঃ গ্রন্থাগারের। এই দায়িত্ব গ্রন্থাগারগুলি যাহাতে গ্রহণ করে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব। আমাদের জনসমাজকে গ্রন্থাগারের এই দায়িত্বের বিষয়ে সচেতন করিয়া তুলিতে হইবে। তবেই দেশের সর্বত্র সকল গ্রন্থাগার বাধ্যতামূলকভাবে এই দায়িত্ব পালন করিতে অগ্রসর হইবে।

আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকের আর্থিক সঙ্গতি এত সামান্য যে সকলের পক্ষে ছেলেদের পাঠ্য পুস্তক সংগ্রহ করিয়া দেওয়াও দুঃসাধ্য। এমতাবস্থায় আমাদের গ্রন্থাগারগুলি যাহাতে ছাত্রদের পাঠক্ষেত্র রূপে গড়িয়া উঠিতে পারে সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখাও আমাদের কর্তব্য। সুখের বিষয় সরকার Day Students' Home প্রতিষ্ঠা করিয়া গ্রন্থাগারের দ্বারা এই কাজ কতটা সুন্দরভাবে পালিত হইতে পারে তাহার আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু Day Students' Home আজও মহানগরীর সীমারেখা অতিক্রম করিয়া নিকটবর্তী মফঃস্বল সহরগুলিতেও প্রসারিত হইতে পারে নাই। সুতরাং গ্রন্থাগারের এই রূপটি আজও বাংলাদেশের সর্বত্র সকলের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। যে পরিষদ একদিন "গ্রন্থাগার সর্বজনের" এই দাবী তুলিয়া সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা জনসমাজে প্রতিপন্ন করিয়াছে—তাহাকেই আজ আবার দায়িত্ব লইয়া ছাত্রদের স্বার্থরক্ষার জন্য অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের প্রতিষ্ঠান সভ্যগণ এই বিষয়ে পথপ্রদর্শক হইবেন, ইহাই আমরা আশা করি।

প্রত্যেক গ্রন্থাগারে স্থানীয় বিষয়ের যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করিবার উপাদান সংরক্ষিত থাকা কর্তব্য। আমাদের দেশের জাতীয় ইতিহাস লিখিতে হইলে এইসব উপাদান একান্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের প্রত্যেকটি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যগুলি যাহাতে হারাইয়া না যায় তাহার দায়িত্ব আজ গ্রন্থাগারকে গ্রহণ করিতেই হইবে।

এই সমস্ত বিষয়ে কর্মীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য পরিষদের শিবির শিক্ষার আয়োজন অব্যাহত থাকিবে।

গ্রন্থাগারের মান সমুন্নয়নের আরও অনেক দিক আছে। কিন্তু অন্ততঃ পূর্বোল্লিখিত বিষয়ে গ্রন্থাগারগুলি যাহাতে জনসেবার দায়িত্ব গ্রহণ করে সে বিষয়ে জনমত সুশিক্ষিত ও সংগঠিত করিবার দায়িত্ব পরিষদের সহিত সংযুক্ত সকলকে এখনই লইতে হইবে।

কলেজ-গ্রন্থাগার

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় কলেজ-গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব এখনও সম্যক্ উপলব্ধি হয় নাই। মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপন করিয়া আমাদের দেশের যে সব ছেলে কলেজে প্রবেশ লাভ করে, তাহাদের অনেকেরই উচ্চশিক্ষা লাভের যোগ্যতা ও আগ্রহ কিছুই থাকে না। নিতান্ত কর্মাভাবের জন্যই ইহাদের অনেককেই কলেজে প্রবেশ করিতে হয়। সুতরাং ছেলেদের

অধিকাংশের পক্ষ হইতে কলেজ গ্রন্থাগার সুগঠিত করিয়া তুলিবার দাবী উত্থিত হয় না। আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ সম্যক্ অগ্রসর হইলে এবং বুনিয়াদী শিক্ষা বাধ্যতামূলক হইলে সাধারণ গ্রন্থাগারের বহুল প্রসার অনিবার্য্য ভাবেই হইতে আরম্ভ করিবে কিন্তু কলেজ গ্রন্থাগার সুগঠিত করিয়া তুলিবার চেষ্টা এখন হইতেই সুরু না করিলে অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ইহার উন্নতির আশা করা বৃথা।

মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে ছাত্রদের ভাষাবোধ ও পাঠের অনুরাগ সঞ্চার করানোই গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য। গ্রন্থাগার ব্যবহারের সাধারণ কৌশলও এই সময়ই ছাত্রদের আয়ত্ত করাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। যে সমস্ত ছাত্র মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে এই সমস্ত যোগ্যতা অর্জন করিয়া আসে নাই, তাহাদিগকে কলেজে প্রবেশ করার পর নূতন করিয়া এইসব করিতে হয়। আমাদের দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির যে অবস্থা তাহাতে অধিকাংশ ছাত্রই যে এই সমস্ত যোগ্যতা অর্জন করিয়া আসে না, এ কথা বলা বাহুল্য। সুতরাং আমাদের কলেজগুলির আপন দায়িত্ব পালন ছাড়াও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে গ্রন্থাগারে যে কাজ হওয়া উচিত ছিল, তাহা করিতে হয়।

আমাদের দেশের কলেজীয় শিক্ষা এখনও প্রধানতঃ গুরুবাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্রেরা আপন চেষ্টায় জ্ঞানার্জন করিতে অগ্রসর হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষকের শিখান বুলি কিংবা প্রদত্ত টিপ্পনী ও উপদেশই ছাত্রের পরীক্ষা-বৈতরণী পারের একমাত্র কৃষ্ণবর্ণা গাভী। উৎসাহী ছাত্রেরা বড় জোর ইহার উপর নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের কয়েকখানি পাতা উল্টাইয়া দেখে। শিক্ষকের প্রদর্শিত পন্থা অনুসরণ করিয়া জ্ঞান রাজ্যের অজ্ঞান নূতন অঞ্চল আবিষ্কারের চেষ্টা বিরল। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত ছাত্রেরা শিক্ষায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা অর্জন করিতে পারিবে, ততদিন পর্যন্ত উচ্চশিক্ষা দান ও গ্রহণ নিরর্থক। পরীক্ষায় পাশের প্রমাণপত্র ছাত্রের জ্ঞান অর্জনের যোগ্যতার প্রমাণপত্র, জ্ঞানের নহে—এই কথা আমরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সমাবর্তন উৎসবে প্রতিবারই শুনিয়া থাকি। কিন্তু আমাদের বর্তমান পড়াইবার ধারা, পাঠ্য-তালিকা, পরীক্ষা গ্রহণ বিধি সমস্তই কি নিছক অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা মাত্র নহে? ছাত্রদের জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা বাড়াইবার প্রচেষ্টাও নাই, জ্ঞান অর্জনের স্পৃহা ঐহিক ফললাভের অনুকূলও নহে। এমতাবস্থায় নির্দিষ্ট পাঠ্য পুস্তকের বাইরে ছেলেরা পড়াশুনা করিবে সে সম্ভাবনা কোথায় বা কতটুকু?

কলেজ গ্রন্থাগারগুলিকে কার্যক্ষম করিয়া তুলিতে হইলে উপযুক্ত পুস্তক-সংস্থানের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের মর্যাদার দিকে লক্ষ্য দিতে হইবে। কলেজের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় স্থানে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। কলেজে প্রবেশ লাভের পরই ছাত্রেরা যাহাতে গ্রন্থাগারের প্রকৃত গুরুত্ব বুঝিতে পারে, সেই জন্য ছাত্রদের নিকট এই বিষয়ে বুঝাইয়া বলা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারিকের বেতন, মর্যাদা প্রভৃতি যাহাতে কোন ক্রমেই প্রবীণ শিক্ষকদের অপেক্ষা ন্যূন না হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। ছাত্রদের সহিত গ্রন্থাগারিকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনের নানা অবসর সৃষ্টি করা কর্তব্য। শিক্ষক ছাত্রের ঘনিষ্ঠতা অপেক্ষা গ্রন্থাগারিক-ছাত্রের ঘনিষ্ঠতা কম প্রয়োজনীয় নহে। বস্তুতঃ গ্রন্থাগারের মত প্রতিষ্ঠান যাহার প্রধান উদ্দেশ্য প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার প্রয়োজন ও যোগ্যতা অনুযায়ী উন্নতি অর্জ্জনে সাহায্য করা সেখানে একটিমাত্র সাধারণ নিয়ম বিনা বিচারে সর্বত্র প্রয়োগ কতখানি যুক্তিযুক্ত তাহা বিচার ও বিবেচনার বিষয়। কিন্তু একটি নিয়ম সর্বত্র প্রয়োগ না করিয়া ক্ষেত্র হিসাবে ব্যতিক্রম করিতে হইলে পাঠকদের সহিত গ্রন্থাগারিকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা আছে।

আমাদের দেশের ছাত্রেরা পাঠ্যপুস্তক-সর্বস্ব হওয়ায় পরীক্ষা পাশের পর জীবনে প্রবেশ করিবার সহজ পথ খুঁজিয়া পায় না। প্রত্যেক কলেজ-গ্রন্থাগারের কর্তব্য জীবন-সংগ্রামে সাফল্য লাভে ছাত্রদের সাহায্য করা। যদি ছাত্রেরা তাহাদের কলেজের পাঠ সমাপন করিবার পর কোন্ কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে তাহার সম্পূর্ণ ও সঠিক সংবাদ পঠদ্দশাতেই সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা পূর্ব হইতেই নিজেদের বিভিন্ন বৃত্তি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিতে পারে। ইহাতে পরীক্ষা পাশের পর তাহাদের অসহায়-বোধ অনেকখানি কমিয়া যাইতে পারে।

অধ্যয়নে অনুরাগ, বিভিন্ন বিষয়ে আপন চেষ্টায় জ্ঞান অর্জনে অগ্রসর হওয়া এই সব যদি ছাত্রদের সমাগত হইয়া না ওঠে তাহা হইলে উচ্চশিক্ষার সার্থকতা কোথায়? আমাদের কলেজ গ্রন্থাগারগুলিকে যথাযথ ভাবে সংগঠিত করিতে না পারিলে যে এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করা যাইবে না—ইহা নিশ্চয়ই প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন উচ্চশিক্ষার আমূল পরিবর্তনের জন্য প্রাণপাত করিতেছেন—কলেজ গ্রন্থাগার সম্বন্ধে ইঁহাদের সুপারিশ ও উপদেশগুলি সাধারণ্যে সত্বর প্রচারিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করি।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ভাদ্র ১৩৬৭

গ্রন্থবিদ্যা

চিত্রণ

আদিত্য ওহদেদার

বইয়ের মধ্যে মানুষ কেবলমাত্র লিখে নিজের মনের ভাব ব্যক্ত করেনি, তার লেখাকে সে চিত্রিতও করেছে। এই চিত্রণ কর্মের মূলে রয়েছে মানুষের শিল্পী-মন তথা সৌন্দর্যবোধ। তাই দেখি খৃঃ পূর্ব দেড় হাজার বছরেরও আগে লেখা মিশরীয় পেপিরি গ্রন্থ, বুক অফ্ দি ডেড্' (Book of the Dead) অতি সুচারুরূপে চিত্রিত হ'তে। প্রাচীন গ্রীক্ পুঁথিপত্রেও যথেষ্ট চিত্রণকার্যের নিদর্শন রয়েছে।

তবে পুঁথিপত্রে চিত্রণকর্মের প্রসার ও বিকাশ অতিমাত্রায় দেখা দেয় মধ্যযুগে। এর মূলে ছিল বাইজাইন্টাইন (Byzantine) সভ্যতার শিল্পরুচি ও পেরগামাম (Pergamum) ভেলাম আবিষ্কারের প্রভাব। ভেলাম চামড়া পেপিরি অপেক্ষা চিত্রণ কাজের পক্ষে উপযোগী হয়ে দেখা দিল, এবং বাইজাইন্টাইন শিল্পবোধ চিত্রণ কাজকে নানা ভাবে সমৃদ্ধ ক'রে তুলল। ফলে প্রায় এক হাজার বছর ধরে মধ্যযুগের ইউরোপে পুঁথিপত্র চিত্রিত করার মধ্য দিয়েই মানুষের শিল্পমন বিশেষ ভাবে চরিতার্থ হয়েছে।

এই চিত্রণ কর্মের তিনটে ধারা দেখতে পাই :

(১) লাল ও নীল রঙ দিয়ে অক্ষর অঙ্কিত করা। সাধারণত পরিচ্ছেদ, এবং অনেক স্থলে অনুচ্ছেদেরও প্রারম্ভিক অক্ষরটিকে এইভাবে আঁকা হত। এই কাজকে ইংরেজিতে বলে 'রুব্রিকেশন' (Rubrication) বা 'রুব্রিশিং' (Rubrishing)।

(২) সোনা ও রূপোর জল দিয়ে অক্ষর চিত্রিত করা। এই কাজকে বলা হয় 'ইলুমিনেশন' (Illumination)। ইলুমিনেশনের অর্থ ঔজ্জ্বল্য সাধন। সোনা রূপোর রঙ ফোটালে বইয়ের পাতা উজ্জ্বল হয়ে তো উঠবেই।

(৩) অক্ষর-চিত্রণ ছাড়াও অন্যান্য চিত্রের কাজ। এই সব ছবি সাধারণত বইয়ের বিষয়বস্তুকে প্রস্ফুট করার কাজে আঁকা হত, তবে অনেক ক্ষেত্রে শুধু কারুকার্যের বাহুল্য হিসেবেও প্রকাশ পেত।

পুঁথিপত্র চিত্রিত করার কাজটা মুসলমান সভ্যতায় খুবই উচ্চাঙ্গের হয়ে দেখা দেয়। হস্তলিখিত কোরাণ, শাহনামা ইত্যাদি ধর্ম ও সাহিত্য গ্রন্থগুলির চিত্রকর্ম যে কতো সুন্দর তা জানা যায় এইসব পুঁথিপত্রের দু'একটা নিদর্শন দেখলেই।

আমাদের দেশেও পুঁথিপত্র চিত্রিত করার রীতি ছিল। জৈনধর্ম প্রাবল্যের যুগে বহু গ্রন্থ সুচারুরূপে অঙ্কিত হয়েছে। তার একটা বড় নিদর্শন আছে 'প্রাজ্ঞপারমিতা'র একটি পুঁথিতে।

মুদ্রণযন্ত্রের যুগে হাতে আঁকা ছবিকে মুদ্রিত করার উপায় আবিষ্কৃত করতে হল। তিনটি উপায়ে ছবি মুদ্রিত করার ছাঁচ তৈরি করা যেতে পারে :

(১) রিলিফ (Relief) পদ্ধতি। বাংলার বলতে পারি উদ্গত বা উচ্চতল পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ছবি মুদ্রিত করতে হলে ছবির ছাঁচে ছবির নকসা উদ্গত ভাবে খোদাই করা প্রয়োজন। ছাপায় যে অংশগুলি গর্ত ক'রে নিচু করে দেওয়া হয় এবং যে অংশগুলি হতে ছাপ উঠবে সে অংশগুলি উঁচুই থাকে।

(২) ইন্ট্যাগ্লিও (Intaglio) পদ্ধতি। বাংলায় বলতে পারি অধোগত বা নিম্নতল পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ছবির নক্শা অধোগতভাবে ক্ষোদিত হয়। অর্থাৎ ছবির নক্শা ছাঁচের মধ্যে ক্ষোদিত হয়ে থাকে যেমন জমিতে নালা কাটা থাকে। ছাপার কালি ক্ষোদিত রেখাগুলিকে পূর্ণ করে, ছাঁচের উপরিভাগ পরিষ্কার থাকে।

(৩) সারফেস (Surface) অথবা সমতল পদ্ধতি। একে প্লেনোগ্রাফিক (Planographic) পদ্ধতিও বলা হয়। এই পদ্ধতিতে ছবির নক্শা ক্ষোদাই করার প্রয়োজন হয় না। যার থেকে ছবির ছাপ নেওয়া হয় তার ওপরে প্রথমে আঁকা হয় এবং তারপর ছবির রেখাগুলি ছাড়া বাকি জমি মোম জাতীয় পদার্থ দিয়ে অবলিপ্ত করা হয়, যার ফলে ছাপার কালি শুধু ছবির রেখাগুলিই ধরে রাখে, বাকি জমির কোথাও কালি ধরে না।

রিলিফ (Relief) পদ্ধতি

উদ্গত বা রিলিফ পদ্ধতিতে চিত্রাঙ্কনকে কাঠ খোদাই শিল্প বলে। এই শিল্প বহু প্রাচীন। প্রাগ ঐতিহাসিক যুগে মানুষ কাঠের ফলকে যে ছবি ও লেখা খোদিত করেছে তার নমুনা প্রত্নতত্ত্ববিদগণ আবিষ্কার করেছেন। ইতি-পূর্বে মুদ্রণ অধ্যায়ে ব্লক বুক-এর কথা বলা হয়েছে, সেই ব্লক বুক এই উদ্গত চিত্রণের একটি সুপরিচিত নিদর্শন।

রিলিফ্ পদ্ধতির বিশেষত্ব হল ছবির নক্শা উদগতভাবে থাকে এবং ছাপার কালি তার ওপর পড়ে। কিন্তু ছাপার কালি আর এক ভাবেও লাগানো যেতে পারে। ছবির আলেখ্য ছাঁচে কুঁদে নেওয়া হয় এবং ছবির বাইরের অংশগুলি উদগত হয়ে থাকে। এই উদগত অংশগুলিতে কালি দিয়ে ছাপ তুললে ছবির আলেখ্য সাদা রেখায় ফুঠে ওঠে। এইভাবে যে কাঠ খোদাই করা হয় তাকে বলা হয় "উড্ এন্‌গ্রেভিং" (Wood engraving)।

[ছবিটি কাঠেতে কুঁদে নেওয়া হয়েছে। ছবির উদ্গত অংশেই কেবল কালি লেগেছে।]

[ছবিটি কাঠেতে কুঁদবার সময় যে অংশে কালি লাগবে না সে অংশ-গুলি কেটে তুলে ফেলা হয়।]

[একটি রোলারের সাহায্যে কালি লাগানো হয়।]

[কালি লাগানোর পর তার ওপর একটা কাগজ রেখে একটা চামচের পেছন দিয়ে ঘষে ছবিটি কাগজে তুলে নেওয়া হয়।]

কাঠ খোদাই চিত্রাঙ্কনে আলোছায়ার খেলাও দেখানো যায়। নানা প্রকার বুলি (Graver)-র সাহায্যে খোদাইবার কুঁদিত চিত্রে সুস্পষ্ট (Pronounced) ও প্রশমিত (Subdued) স্থানগুলি সূক্ষ্মভাবে খোদাই ক'রে চিত্রে আলো ছায়ার সমাবেশ ঘটাতে পারে।

ইনট্যাগলিও (Intaglio) পদ্ধতি

ইন্‌ট্যাগলিও বা অধোগত পদ্ধতি অনেক প্রকারের। প্রত্যেকটি পদ্ধতিতে ছবির বৈশিষ্ট্য কীভাবে ফুটে ওঠে তা জানা প্রয়োজন।

(১) লাইন এন্‌গ্রেভিং (Line engraving) বা রেখালী খোদাই। একটি ধাতব পাতের (সাধারণত তামা কিংবা ইস্পাত) একটা দিক সুমসৃণ ক'রে নেওয়া হয় এবং সেই মসৃণ উপরিভাগে খোদাইকার শক্ত শলাকা দিয়ে ছবির নক্‌শা খোদাই করেন। নক্‌শার রেখা সরু মোটা হাল্‌কা কিংবা গভীর হয়ে কাগজে মুদ্রিত হবে খোদাইকার যেভাবে পাতের মধ্যে রেখাগুলি ক্ষোদিত করবেন। খোদাই হয়ে গেলে ঘন কালি পাতটির উপরিভাগে লেপন করা হয়, এবং রেখা-নালির মধ্যে কালি যাতে পূর্ণভাবে প্রবেশ করে সে সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। তারপর উপরিভাগের কালি মুছে নেওয়া হয়; কিন্তু রেখা-নালিগুলির মধ্যে কালি পূর্ণ অবস্থায় থাকে। এবার কাগজ ফেলে তাতে চাপ দিলে ছবির ছাপ কাগজে উঠে আসবে।

এই শিল্পের প্রথম অবস্থায় কেবলমাত্র তামার পাত ব্যবহার করা হত। কিন্তু ধাতু হিসেবে তামা নরম হওয়ায় তামার পাত থেকে ছবির সংখ্যা খুব বেশী পাওয়া সম্ভব হয় না। চাপ পড়তে পড়তে পাত ভোঁতা হয়ে আসে এবং ছবির নক্‌শা সুশ্রী হয় না।

এই অসুবিধা লাঘব করা গেছে তামার জায়গায় ইস্পাত ব্যবহার ক'রে। ইস্পাত কঠিন ধাতু, সুতরাং এই ধাতুর পাতে খুব সূক্ষ্ম রেখা যেমন ক্ষোদিত করা যায়, তেমনি ছবির ছাপ অনেক সংখ্যায় তোলা সম্ভব হয়।

রেখালী খোদাই ছবি নক্‌শা ফুটিয়ে তোলে রেখার সাহায্যে। এতে আলো-ছায়ার খেলা দেখানো চলে না। তবে অনেক শিল্পী এই আলো-ছায়ার খেলা দেখাবার চেষ্টা করেন ঘন-সন্নিবেশিত বহু সূক্ষ্ম রেখার সাহায্যে। ঘেঁষা-ঘেঁষি সূক্ষ্ম রেখাবলী ছায়ার মায়া সৃষ্টি করে।

(২) ড্রাইপয়েন্ট (Drypoint) পদ্ধতি। এই পদ্ধতি রেখালী পদ্ধতির অনুরূপ। একটি তীক্ষ্ণ ইস্পাত শলাকা অথবা হীরক শলাকার দ্বারা ছবির নক্‌শা ধাতব (তামা) পাতে খোদিত করা হয়। এখানে খোদিত রেখা-নালির একধারে কিংবা দুধারে furrow-র সৃষ্টি হয়। এই furrow অথবা burr হল এই পদ্ধতির বিশেষত্ব। কালি লাগালে কালি কোথাও ঘন কোথাও পাত্‌লা ভাবে ধরে এবং তা নির্ভর করে furrow-র তারতম্য অনুসারে। যেহেতু রেখার ছাপ ইচ্ছামত ঘন বা পাত্‌লা করা সম্ভব হয়, ড্রাইপয়েন্ট পদ্ধতিতে ছবির রূপ খোলে ভালো।

কিন্তু এই পদ্ধতির অসুবিধা হল এই যে এই পদ্ধতি অনুসারে ছবির খুব অল্পই ছাপ তোলা যায়। furrow বা burr অতি সহজেই নষ্ট হয়ে যায় কয়েকবার চাপ পড়লে, ফলে প্রায় কুড়িটা ভালো ছাপ পাবার পর নক্‌শা জ্যাবড়া হয়ে আসে। এই কারণে ড্রাইপয়েন্ট পদ্ধতিতে বইয়ের জন্যে ছবি ছাপা চলে না। বইয়ের ছবি যে অনেক সংখ্যায় ছাপতে হয়।

(৩) (Etching) বা দ্রাবোৎকীর্ণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে ছবি ছাপার কাজ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে শুরু হয়, এবং আজও এ পদ্ধতি (নিম্নের চিত্রে বর্ণিত) বিস্তৃতভাবে চালু আছে।

দ্রাবোৎকীর্ণ পদ্ধতিতেও তামার পাতে ছবির নক্‌শা খোদাই করা হয়। খোদাই করার উপায় হল এই রকম :—তামার পাতটিকে প্রথম সর্বতোভাবে

[একটা পালিশ করা তামার পাত। তার ধারটা মসৃণ আর কোনগুলো গোল। শাঁড়াসি দিয়ে সেটা ধরে তাতাবার সময় তার ওপর ক্ষারক দ্রব্য গলিয়ে লাগাতে হবে।]
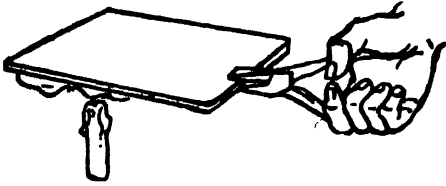
[সেটাকে উল্টিয়ে মোমবাতির ওপর ধরে আগুনের সিস লাগিয়ে কাল করে নিতে হবে।]
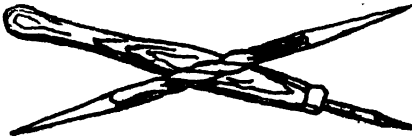
[সুচালো বস্তুর সাহায্যে চিত্র উৎকর্ণ হবে।]
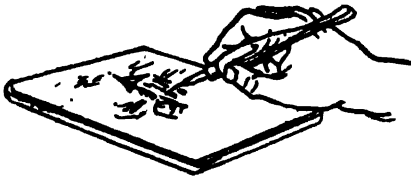
[পাতটার ওপর ফুটিয়ে ছবি আঁকতে হবে যাতে ওপরের পলাস্তরা ভেদ করে নীচের পাত পর্যন্ত উৎকীর্ণ হয়।]
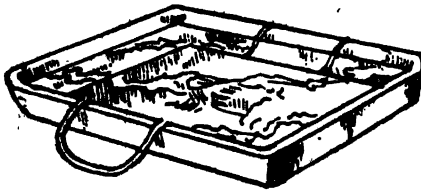
[তারপর সেটাকে এসিডে কিছুক্ষণের মত ডুবিয়ে নিতে হবে যাতে ফিকে অংশগুলি ক্ষয়ে যায়।]
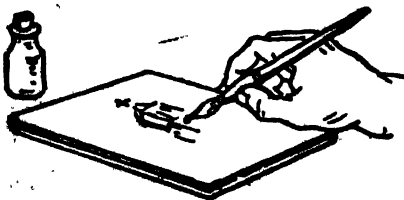
[সেটাকে তারপর শুকিয়ে নিয়ে বার্ণিসের সাহায্যে উৎকীর্ণ অংশ বুঁজিয়ে দেওয়া দরকার। পরে এসিডে প্রয়োজনমত কয়েকবার ডুবিয়ে নিতে হবে।]

পরিষ্কার ক'রে নিতে হয়। তারপর সাদা মোম ও অ্যাস্‌ফাল্‌টম্‌ (asphaltum) মিশ্রিত পদার্থ দিয়ে পাতটির উপরিভাগ আচ্ছাদিত করা হয়। এই পদার্থ অ্যাসিড প্রতিরোধক, অর্থাৎ অ্যাসিডে ক্ষয় না। আচ্ছাদন শুকিয়ে শক্ত হয়ে গেলে পাতটি মোমবাতির শিখার ওপর নাড়িয়ে চাড়িয়ে সম্পূর্ণ কালো ক'রে নেওয়া হয়। এবার যন্ত্র দিয়ে আচ্ছাদন অংশ কুরে কুরে ছবির নক্‌শা ফুটিয়ে তোলা হয়। আচ্ছাদন অংশ এমনভাবে তুলে ফেলতে হয় যাতে তামা বেরিয়ে পড়ে কিন্তু তামার গায়ে আঁচড় কাটে না।

ছবির নক্‌শা কাটা শেষ হলে পাতটির কিনারা ও উল্টো পিঠে বার্নিশ করা হয়, যাতে ছবির নক্‌শার অন্তর্ভুক্ত তামার রেখাগুলি ছাড়া পাতটির আর কোনো স্থানেই তামা বেরিয়ে না থাকে।

এই প্রাথমিক কাজ শেষ হলে এবং বার্নিশ শুকিয়ে গেলে পাতটিকে একটি নাইট্রিক অ্যাসিডের পাত্রে রাখা হয়। অ্যাসিড ছবির নক্‌শার অন্তর্গত অনাচ্ছাদিত তামার রেখার সংস্পর্শে আসে এবং দ্রাবগুণে তাকে ক্ষয়িত করে। দু'তিন মিনিট এইভাবে রাখার পর পাতটি তুলে নিলে দেখা যাবে ছবির নক্‌শা উৎকীর্ণ হয়েছে। নক্‌শার যে-সব অংশের ছাপ সূক্ষ্ম হওয়া দরকার সেই সব অংশের উৎকীর্ণ রেখাগুলি বার্নিশ দিয়ে আচ্ছাদিত ক'রে নিলে অ্যাসিড তাদের ওপর কাজ করতে পারে না। এবার পাতটি পুনরায় অ্যাসিডে ডুবিয়ে ছবির যে-সব অংশের ছাপ গভীর হওয়া প্রয়োজন তাদের অ্যাসিড দিয়ে গভীরভাবে ক্ষোদিত করা চলে।

এইভাবে প্রয়োজন মতো গভীর ও সূক্ষ্ম রেখা উৎকীর্ণ ক'রে ছবির নক্‌শা তোলা শেষ হলে পাতটিকে অ্যাসিড-মুক্ত ক'রে তার আচ্ছাদন তুলে ফেলা হয়। ছবির নক্‌শা নিম্নতলভাবে ক্ষোদিত হয়েছে, সুতরাং কীভাবে কালি লাগিয়ে ছাপ তুলতে হবে সেটা সহজেই অনুমেয়।

(৪) মেৎসোটিন্ট (Mezzotint)। এই নিম্নতল পদ্ধতির বিশেষত্ব হল যে এই পদ্ধতি ছবির আলো-ছায়ার খেলা সুন্দর ফুটিয়ে তুলতে পারে। ছবির ছাপ দেখলে মনে হবে যেন তুলির পোছ দিয়ে আলো-ছায়া ফোটানো হয়েছে। মেৎসোটিন্ট পদ্ধতিতে তাই মূর্তি ও দৃশ্যের প্রতিরূপ খুব স্বাভাবিক হয়ে ধরা পড়ে।

এই পদ্ধতিতে ছবির নক্‌শা তোলার কায়দা হল কালো থেকে শাদার রূপ ফুটিয়ে তোলা। এখানে শিল্পীর অস্ত্র হল একটা এমন ছুরি যাতে করাতের

মত কতকগুলি ধারালো দাঁত আছে। এই তীক্ষ্ণ দন্তের ফলা চালিয়ে একটি তামার পাতের উপরিভাগ এমনভাবে কর্ষিত করা হয় যার ফলে সমগ্র পাতটির উপরিভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ছিদ্র ও এবড়ো-খেবড়ো রেখাবলীতে ভরে ওঠে। এই অবস্থায় যদি কালি লেপন করা যায় তাহলে পাতটির আকার অনুযায়ী জাবড়া কালো ছাপ উঠবে।

এবার শিল্পী ছবির যে সব স্থানে আলোর খেলা আছে সেই অংশগুলি ফুটিয়ে তোলবার জন্যে তামার পাত থেকে সেই স্থানের চিত্র ও রেখাগুলি বিনষ্ট করে ফেলেন এবং স্থানগুলি মসৃণ ক'রে দেন যাতে যেখানে অল্প আলোর খেলা অর্থাৎ কিছু কালোর আমেজ আছে সেখানে ছিদ্র ও রেখাবলী একেবারে বিনষ্ট ও মসৃণ করা হয় না, ফলে কিছু কালি ধরে।

মেৎসোটিন্ট পদ্ধতির অসুবিধা এই যে এই পদ্ধতিতে ছবির ছাঁচ তুলতে বহু সময় লাগে এবং এই ছাঁচ থেকে অনেক ছবি তোলা সম্ভব হয় না, কারণ ছাঁচের সূক্ষ্ম কারুকার্য শীঘ্রই চাপ লেগে নষ্ট হয়ে যায়। এই জন্যে বইয়ের ছবি তোলার কাজে এ পদ্ধতি প্রায় অচল। তাছাড়া টাইপ ও মেৎসোটিন্ট পাত একসঙ্গে সাজিয়ে ছাপার কাজ করা যায় না, কারণ টাইপের ছাপ তুলতে যতটা চাপ দিতে হয় তার চেয়ে অনেক বেশি চাপ দিতে হয় মেৎসোটিন্ট পাত থেকে ছাপ তুলতে।

(৫) অ্যাকোয়াটিন্ট (Aquatint)। এই পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছিল জল-রঙা (water colour) ছবির প্রতিরূপ ছাপতে। জল-রঙা ছবির একটা কোমল রূপ থাকে, অ্যাকোয়াটিন্ট পদ্ধতিতে সেই কোমল রূপটা ফোটানো যায়।

পদ্ধতিটি অবশ্য দ্রাবোৎকীর্ণ পদ্ধতি। এখানে অ্যাসিড প্রতিরোধক দ্রব্য হল রজনচূর্ণ (rosin dust)। তামার পাত পরিষ্কার ক'রে নিয়ে তার উপর রজনের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিতে হয়। চারিদিকে সমান ভাবে ছড়িয়ে গেলে, সেই গুঁড়োর আচ্ছাদন যাতে পাতের ওপর বসে যায় সেজন্যে অল্প আগুনে গরম ক'রে নেওয়া হয়। এই আচ্ছাদন কিন্তু নিশ্ছিদ্র নয়, রজনের গুঁড়ো-গুলোর মধ্যে পারস্পরিক সূক্ষ্ম ব্যবধান আছে।

এবার এই প্রতিটি অ্যাসিড-পাত্রে ডুবিয়ে রাখলে অ্যাসিড ঐ সূক্ষ্ম ব্যবধান-গুলির মধ্যে প্রবেশ করে ও অনাবৃত তামা ক্ষোদিত করে। এই রকম সূক্ষ্মভাবে ক্ষোদন কার্য সম্পন্ন করা যেতে পারে বলেই পদ্ধতি জল রঙা ছবির কোমল ভাবটা ফুটিয়ে তুলতে পারে।

প্লেনোগ্রাফিক (Planographic) পদ্ধতি

প্লেনোগ্রাফিক বা সমতল পদ্ধতির দ্বারা ছবির মুদ্রণ ব্যাপারটা আশ্রয় ক'রে আছে একটি নিয়মের ওপর, সেই নিয়মটি হল এই যে তেলেজলে মিশ খায় না। এই মুদ্রণ ব্যাপারকে বলা হয় লিথোগ্রাফী (Lithography)। বাংলায় বলতে পাথর আঁকাই।

একটা চুনাপাথরের পাটা কিংবা দস্তা (zinc) বা অ্যালুমিনিয়মের পাতের ওপর ছবির নক্‌শা একটা বিশেষ ধরণের তেলকালি (যা খুব চিট্‌চিটে) দিয়ে আঁকা হয়। এই কালি শুকিয়ে গেলে পাথরের ওপর শক্ত হয়ে এঁটে থাকে।

এবার গোটা পাটা জল দিয়ে ভিজিয়ে নিতে হয়। তেল-কালিতে আঁকা ছবির নক্‌শায় জল বসবে না কারণ তেলেজলে মিশ খায় না। জল বসবে নক্‌শার বাইরের জমিতে। এখন এই পাটার ওপর ছাপার তেল-কালি মাখালে কালি থিথিয়ে বসবে ছবির নক্‌শার ওপর, কারণ তেলা জমিতে তেল বসে, কিন্তু নক্‌শার বাইরের জমিতে কালি ধরবে না, কারণ সেখানে জল রয়েছে—তেল জলে মিশ খাবে না।

এবার কাগজ ফেলে চাপ দিলে কাগজে ছবির ছাপ পাওয়া যাবে। তবে কাগজ যাতে জবজবে হয়ে ভিজে না যায়, তার জন্যে আগে থেকে বাতাস দিয়ে জল বেশ শুকিয়ে নিতে হয়।

লিথোগ্রাফ প্রস্তুতিকরণ
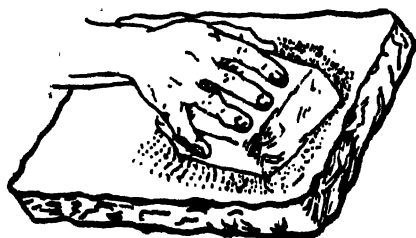
লিথোগ্রাফ পাথরের ওপর মিহি বালি রেখে অন্য একটি পাথর দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘষে জমি মসৃণ করা হচ্ছে।

পাথরে তোলার আগে একটা কাগজে ছবির স্কেচটা একটা ট্রেসিং কাগজে তুলে নিয়ে পাথরের উপর উলটো করে রেখে পেছন থেকে স্কেচটা পাথরে তুলতে হয়।
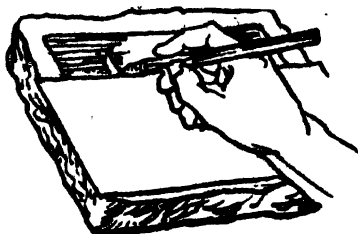
পাথরের ওপর স্কেচ থেকে তোলা রেখাগুলির মাধ্যমে ছবিটি এঁকে নেওয়া হয়। আঁকবার সময় পাথরের ওপর রাখা একটি কাগজের ওপর হাত রেখে ছবি আঁকার নিয়ম।

ব্রুশের সাহায্যে আরবী গাম ও নাইট্রিক এসিড পাথরের ওপর বুলিয়ে এক রাত্রি রাখতে হবে।
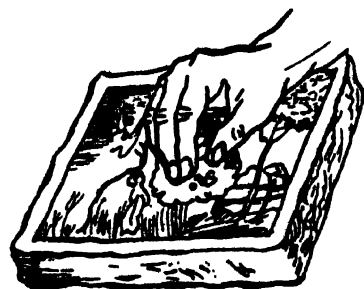
জল দিয়ে স্পঞ্জের সাহায্যে আঁচড়গুলি তুলে ফেলতে হবে। তারপর আরবী গাম লাগিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে।

টারপেনটাইনে ভেজানো পরিষ্কার নরম নেকড়া দিয়ে স্কেচের দাগগুলো তুলে ফেলা দরকার। রয়ে যাবে শুধু গ্রীজ। ফাঁকা স্থানগুলিতে গাম লাগানোর ফলে কালি লাগবে না।

লিথোগ্রাফ মুদ্রণ পদ্ধতি

মুদ্রা যন্ত্র না থাকলে হাতেই ছেপে নেওয়া যায়।

পরিস্কার জল দিয়ে স্পঞ্জের সাহায্যে প্রথমে গামটা মুছে ফেলা দরকার।
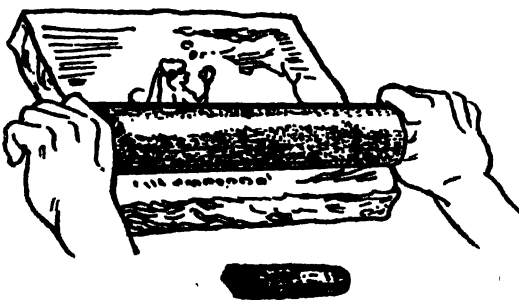
রোলারের সাহায্যে কালি লাগালে কেবল অঙ্কিত অংশেই কালি লাগবে।

পাথরটার ওপর হাতে তৈরী কাগজ রেখে চামচের সাহায্যে ঘসলে ছবিটা উঠে আসবে।

চিত্রণ কার্যে ফটোগ্রাফি

এতক্ষণ যে সব পদ্ধতির কথা আমরা আলোচনা করেছি তাতে দেখেছি যে চিত্র মুদ্রণ করবার ব্লক বা ছাঁচ তৈরি করবার জন্যে দক্ষ খোদাই শিল্পীর প্রয়োজন। মূল ছবির প্রতিরূপ তাঁকে খোদাই করতে হয়। কিন্তু মানুষের হাত সর্বদাই যে অবিকল প্রতিরূপ তৈরি করতে পারবে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাছাড়া অবিকল প্রতিরূপ খাড়া করতে বহু সময়ও দরকার।

এই অসুবিধা দূর করেছে ফটোগ্রাফি। ফটোগ্রাফ কৌশল মূল ছবির অবিকল প্রতিরূপ তৈরি করতে সক্ষম। এবং এতে সময় কিছুমাত্র লাগে না বললেই হয়। তাছাড়া. ফটোগ্রাফ মূল ছবির প্রতিরূপ ইচ্ছামত ছোট বড় করতে পারে, অথচ মূলের কোনো বিকৃতি কোনো অংশেই দেখা যাবে না।

ফটোগ্রাফির সাহায্যে তৈরি করার যে-সব পদ্ধতি আছে তাদের মধ্যে দুটি পদ্ধতি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

জিঙ্কোগ্রাফি (Zincography)

এই পদ্ধতিকে লাইন ব্লক পদ্ধতিও বলা হয়। এই ব্লক-এ ছবি ফুটে ওঠে রেখা ও ঘন কালো ক্ষেত্রের সমাবেশে। এতে টোন (tone) বা আলোছায়ার সুষম সমাবেশ পাই না।

প্রথমে মূল চিত্রের একটি ফটেগ্রাফ নেওয়া হয়। আমরা জানি যে ফটোগ্রাফের 'নেগেটিভ'-এ যেখানে শাদা দেখায় মূল চিত্রে সেখানে কালো, এবং নেগেটিভ-এ যেখানে কালো দেখায় মূল চিত্রে সেখানে শাদা। এবার একটি দস্তার (zinc) পাতে এমন এক রাসায়নিক দ্রব্য (Solution) ঢালা হয় যা আলোর সংস্পর্শে এলে কঠিন আকার ধারণ করে। এই দ্রব্য তৈরি হয় ডিমের শ্বেতাংশ ও বাইক্রোমেট্ অফ্ অ্যামোনিয়া (Bichromate of ammonia) মিশিয়ে— এখন ছবির নেগেটিভ সূর্যের আলোয় অথবা আর্ক ল্যাম্পের সামনে ধরা হয়, যার ফলে আলোর রশ্মি নেগেটিভের শাদা বা স্বচ্ছ অংশগুলির মধ্য দিয়ে প্রবেশ ক'রে দস্তার পাতের ওপর পড়ে এবং সংশ্লিষ্ট অংশকে কঠিন করে। কিন্তু নেগেটিভের কালো অংশগুলি আলোক-রশ্মিকে প্রতিহত করে, সুতরাং সে-সব অংশ দিয়ে আলো প্রবেশ করে না এবং এর ফলে পাতের ওপরের রাসায়নিক দ্রব্য, যেমন ছিল তেমনিই থাকে। এখন এই পাত জলধারার নিচে রাখলে কাঁচা রাসায়নিক দ্রব্য জলে গলে ধুয়ে যাবে, কিন্তু জমাট বাঁধা দ্রব্য ঠিক থাকবে।

পাতটি এবার শুকিয়ে নিতে হয়। তারপর পাতটি অ্যাসিড-পাত্রে রাখা হয়। অ্যাসিড অনাবৃত অংশগুলি ক্ষোদিত করে, যার ফলে ছবির নকশা উদ্‌গত বা উচ্চতল ভাবে ফুটে ওঠে।

হাফ্‌-টোন (Half tone) পদ্ধতি। টোন অর্থাৎ আলোছায়ার সুষম সমাবেশ ছাপানো ছবির মধ্যে দেখতে পেলে খুবই ভাল লাগে, মনে হয় যেন ফটোগ্রাফ নেওয়া হয়েছে। হাফ্‌-টোন পদ্ধতি আলোছায়ার সমাবেশ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করে, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে পারে না বলেই এই পদ্ধতির নাম হাফ্‌-টোন অর্থাৎ আধা-টোন।

এই পদ্ধতিতে ছবির নেগেটিভ তোলবার সময় ক্যামেরার লেন্স আর ছবির মাঝখানে একটা স্ক্রীন বা জালতি থাকে। এই স্ক্রীন তৈরি হয় একজোড়া কাঁচের সাহায্যে যাদের গায়ে আড়া-আড়ি ভাবে দাগ কাটা আছে। কাঁচ দুটোকে গায়ে গায়ে লাগিয়ে দিলে একটা তারের জালতির মতো মনে হবে।

স্ক্রীন ব্যবহারের ফলে সমস্ত ছবিটার রূপ নেগেটিভে ছোট বড় অসংখ্য ফুটকির সমষ্টিতে পরিণত হয়। ছবির যে-সব অংশ গাঢ় কালো, সে-সব স্থানে ফুটকিগুলো ছোট ছোট ও ঘেঁসাঘেসি ভাবে থাকে, কম কালোর জায়গায় ফুটকিগুলো আর একটু বড় ও কম ঘেঁসাঘেসি হয়। ছবির শাদা অংশ-গুলোতে ফুটকিরা থাকে বড়-বড় ও ছাড়া-ছাড়া হয়ে।

এরপরের ব্যাপার লাইন ব্লকের মতোই।

হাফ-টোন স্ক্রীন মিহি ও মোটা হয় প্রতি ইঞ্চিতে কাটা লাইনের সংখ্যা অনুসারে। যেমন প্রতি ইঞ্চিতে ৫৫ বা ৬৫ লাইন থাকলে বলবো মোটা স্ক্রীন; ১০০ থেকে ২০০ লাইন থাকলে বলব মিহি। মিহি স্ক্রীন মানে জালতির ফাঁকগুলি সরু সরু। মিহি স্ক্রীন খুব সরু সরু ও ঘেঁষাঘেষি ফুটকির সাহায্যে ছবির প্রতিরূপ ফুটিয়ে তোলে, ফলে 'টোন' পাওয়া যায় মনের মতো।

রঙিন ছবি

এতক্ষণ ছবির ব্লক তোলার যে-সব পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে তাতে ছবির রূপ পাওয়া যায় শাদায় কালোয়। কিন্তু আধুনিক উপায়ে রঙিন ছবির ব্লকও তৈরি করা সম্ভব। রঙিন ছবির জন্যে লাইন ব্লক হতে পারে, আবার হাফ-টোন ব্লকও হতে পারে।

রঙের ব্যাপারে একটা বৈজ্ঞানিক সত্য আমাদের জানা দরকার। সে-সত্য হল এই যে সকল রঙের মূলে আছে তিনটি প্রধান রঙ। এই তিনটি রঙ হল, হলদে, লাল আর নীল। অন্য যা কিছু রঙ দেখি না কেন, তারা হল প্রধান রঙগুলির মিশ্রণ। যেমন হলদে ও নীল মিশিয়ে সবুজ, লাল ও নীল মিশিয়ে বেগুণি, লাল ও হলদে মিশিয়ে কমলা ইত্যাদি আর লাল, নীল, হলদে এক সঙ্গে সমান মিশলে পাই কালোরঙ। রঙ সম্বন্ধে আর একটা বৈজ্ঞানিক সত্য হল এই যে, বস্তুর রঙ ফুটে ওঠে সেই রঙের বিচ্ছুরণে ও আলোর অন্যান্য রঙের শোষণে। অর্থাৎ, কোন বস্তুর রঙ যখন লাল দেখি, তখন বুঝতে হবে যে সে বস্তুটি আলোর অন্যান্য রঙ শুষে নিয়ে শুধু লাল রশ্মি বিকীরণ করছে।

সুতরাং রঙিন ব্লক করতে গেলে রঙিন ছবিকে বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে হবে হলদে, লাল ও নীল রঙ কীভাবে ছবির মধ্যে মিশিয়ে আছে, এবং এই তিন রকম কালি দিয়ে দাগিয়ে দিতে হবে কোথায় হলদে, কোথায় লাল ও কোথায় নীল রঙ হবে। দাগতে হয় অবশ্য একটা পাতলা কাগজ ছবির ওপর এঁটে। একে বলে কলার চার্ট (colour chart)।

রঙিন লাইন ব্লক তৈরি করতে হলে ছবির একটা নেগেটিভ তুলে নিয়ে তার থেকে তিনটে প্লেট তৈরী করা হয়। এববার কলার চার্টের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে প্লেট থেকে অন্য দুটো রঙের অংশ অ্যাসিডে খাইয়ে বাদ দিতে হবে। একটা প্লেটে থাকবে শুধু হলদে রঙের অংশ, একটার লালের অংশ ও বাকি প্লেটে নীলের অংশ। এইভাবে তিন রঙের তিনখানা আলাদা প্লেট বা ব্লক তৈরি হল। এবার এই ব্লকগুলি আলাদা আলাদা ছেপে রঙিন ছবির রূপ ফুটিয়ে তুলতে হবে।

রঙিন হাফ-টোন ব্লক তৈরি করতে হলে মূল রঙিন ছবি ক্যামেরার সামনে ধরতে হয়, কিন্তু ক্যামেরা ও ছবির মাঝখানে থাকে একটা রঙিন কাচ, যাকে বলা হয় 'ফিলটার' (Filter)। ফিলটারের কাজ হল. যে রঙের ফিলটার সেই জাতীয় রঙ ছেড়ে দিয়ে বাকি রঙ শুষে নেয় যেমন ফিল্টারের রঙ যদি বেগুনি হয় তাহলে লাল ও নীল ও তাদের মিশেলী রঙ ছেড়ে দিয়ে হলদে ও মিশেলি হলদে শুষে নেবে। ফলে হলদে রঙের জায়গা নেগেটিভ শাদা হয়ে ফুটবে। নেগেটিভ দিয়ে যে ব্লক তোলা হবে তা হলদে ও যে সব রঙে হলদে মিশেল আছে তার ব্লক তৈরি হবে।

আবার, সবুজ রঙ যেহেতু নীল ও হলদে রঙের মিশ্রণ, সবুজ ফিলটারের সাহায্যে লাল ও মিশেল লাল রঙের ব্লক তৈরি হবে এবং কমলা রঙের ফিলটার দিলে নীল ও মিশেল নীল রঙের ব্লক তৈরি করা সম্ভব হবে, কারণ কমলা রঙ হল লাল ও হলদে রঙের মিশ্রণ।

এই তিনটে ব্লক পর-পর ছাপলে রঙিন চিত্র সুন্দর হয়ে ফুটে উঠবে। প্রথমে ছাপতে হয় হলদে ব্লক, তারপর যথাক্রমে লাল ও নীল। বলা বাহুল্য, রঙিন হাফ-টোন ব্লক মূল ছবির নানা রঙের সমাবেশকে বেশ ফুটিয়ে তোলে।

চিত্রণ পদ্ধতির সন-তারিখ

চিত্রের প্রতিরূপ মুদ্রিত করার যে সব পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের আবিষ্কারের সময়-কাল দেওয়া গেল ঃ

রিলিফ উড্-কাট বা কাঠ-খোদাই ঃ রিলিফ পদ্ধতির কাঠ খোদাই বহু পুরাতন যুগের শিল্প। চীনে প্রথম আবিষ্কার হয়। কিন্তু সাদা রেখার সমাবেশে ছবির নক্শা পুস্তকে প্রথম তোলা হয় ১৪৬১ খৃষ্টাব্দে।

ইনট্যাগলিও পদ্ধতি ঃ লাইন এনগ্রেভিং বা রেখালি করা হয় ১৪৪৬ খৃষ্টাব্দে, ইতালীয় লেখক বোকাচিও (Boccaccio)-র একটি বইতে।

ড্রাইপয়েন্ট খোদাই আনুমানিক ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে। এচিং বা দ্রাবোৎকীর্ণ খোদাই আনুমানিক ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে। মেৎসোটিন্ট খোদাই আনুমানিক ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে। অ্যাকোয়াটিন্ট খোদাই ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দ।

প্লেনোগ্রাফিক পদ্ধতি ঃ ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে অলোয়া শেনেফেল্ডার (Alois Senefelder) কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়।

ফটোগ্রাফ পদ্ধতি ঃ জিন্কোগ্রাফি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে। হাফ্-টোন ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। রঙিন ব্লক ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে।

বাংলা মুদ্রণ শিল্পে প্রথম সচিত্র পুস্তক হল ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রণীত 'ভারতচন্দ্র' নামক গ্রন্থের একটি সংস্করণ যা ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার ফেরিস এণ্ড কোং (Ferris and Co.) নামক প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে ছয়টি ছবি লাইন এন্গ্রেভিং পদ্ধতিতে তোলা। ব্লক প্রস্তুত করেন রামচন্দ্র রায় নামে এক শিল্পী।

পশ্চাৎপট

এস, আর, রঙ্গনাথন

কৃষ্ণা দত্ত কর্তৃক অনূদিত

০২৫ মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ

বিধাতার আশীর্বাদে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন কয়েক জনকে এক্ষেত্রে পাওয়া গেল। কে, ডি, কৃষ্ণস্বামী আয়ার আশ্চর্য্য উপকারে এলেন। তিনি আইন ব্যবসায়ে প্রতিষ্ঠিত থাকাতে সহরের বহু গণ্যামাণ্য ব্যক্তিকে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সংগে যুক্ত করতে পেরেছিলেন। মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে গ্রন্থাগার আন্দোলন বিষয়ে প্রচার কার্যের জন্যে একটি বিভাগও ছিল। পরিষদ সত্বর গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের একটি বিদ্যায়লয়ও প্রতিষ্ঠা করলো। প্রথম কয়েকবছর এই বিভাটির কাজ ছিল। গ্রন্থাগার আন্দোলনের আদর্শ প্রচার করা। শেষের দিকে গ্রন্থাগার কর্মীদের বৃত্তিশিক্ষা দেওয়াই এই বিভাগটির প্রধান কাজ হলো। পরবর্ত্তীকালে গ্রীষ্মকালীন বিদ্যালয়ের ব্যাপক ও সমষ্ঠিগত আ্যালাচনা ভারতবর্ষের উপযোগী একটি আদর্শ গ্রন্থাগার আইনের খসড়া তৈরী করতে সাহায্য করে ছিলো।

০২৬ আদর্শ গ্রন্থাগার আইন

ভাগ্যক্রমে আমরা আরও সহায়তা পেলাম। পি, শেষাদ্রি ১৯৩০ সালে এক সারা এশিয়া শিক্ষা সম্মেলন আহ্বান করেন। এর দু'বছর আগে মাদ্রাজে তিনি সারা ভারত শিক্ষা সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। তারপর তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ও পরিদর্শন করেন। ১৯৫১ থেকে তখনকার পরিবর্ত্তন তাঁর চোখে পড়লো। তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। তখন তিনি স্থির করেন যে বেনারসে প্রথম সারা এশিয়া শিক্ষা সম্মেলনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি বিভাগ রাখতে হবে। আমাকে তিনি এই বিভাগটির দায়ীত্ব নিতে বলেন। এতে করে ভারতে যে ক'জন গ্রন্থাগারিক আছেন তাদের সংগে মিলিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া গেল। এই সমাবেশ আন্দোলনকে আরও অগ্রগামী করেছিল। আদর্শ গ্রন্থাগার আইন নিয়ে আলোচনার সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল।

০৩ জনসাধারণের সাড়া

০৩১ আইন বিধিবদ্ধ করার দাবী

মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ গ্রন্থাগার আইনের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করলো। কয়েকজন উপযুক্ত সদস্যকে দেশের নানাস্থানে পাঠানো হল। তাঁরা প্রত্যেকটি অঞ্চল পরিভ্রমণ করলেন। জনসাধারণের মধ্যে তাঁরা বক্তৃতা দিলেন। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন কর্তৃপক্ষের সংগে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরা পরস্পরকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। অপ্রত্যাশিত ভাবে সাড়া পাওয়া গেল। গ্রন্থাগার আইনের দাবীতে প্রত্যেক অঞ্চলে প্রস্তাব গৃহীত হল। এমন কি কোন অঞ্চলে ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলে গ্রন্থাগারও প্রতিষ্ঠিত হল। কয়েকটি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ স্বায়ত্বশাসন আইনের অন্তর্গত ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা করলেন। এর ফলে তারা বই সরবরাহের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলেন।

০৩২ অন্ধ্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদ

অন্ধ্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদ স্বাধীন ভাবে কাজ চালিয়ে আসছিল। স্থানীয় কর্ম প্রদর্শনের উপর ইহা মনোনিবেশ করেছিলেন। ইহা গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনসাধারণের আন্দোলনে পরিণত করেছিল। নৌ-গ্রন্থাগার ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, সাইকেল শোভাযাত্রা, তালুক সম্মেলন, জেলা সম্মেলন—ইত্যাদি ছিল গণ-সংযোগের পদ্ধতি। গ্রন্থাগার আন্দোলনের আদর্শ প্রচার কার্যে জি, হরিসর্বোত্তম রাও ও পি, নাগভূষণমের মত ব্যক্তিরা কার্যতঃ সর্বক্ষণের কর্মীরূপে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এই ধারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়লো।

০৩৩ কেরালা গ্রন্থাগার পরিষদ

কেরালা গ্রন্থাগার পরিষদ যথাসময়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এম, কৃষ্ণকুরূপ এবং ই, রথন মেনন এ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাঁরা খ্যাতনামা লেখক ছিলেন। তাঁরা ব্যাপকভাবে গণ-সংযোগ স্থাপন করলেন। তাঁদের প্রভাব সুদূর গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত হল। ১৯৪৫-এ তাঁদের সাথে আমি কেরালা পরিভ্রমণে যাই। সুদূর গ্রামাঞ্চলে রাত্রি ৯ টার সময় কেরোসিন বাতির চারিদিকে জনা চব্বিশ নিরক্ষর লোককে দেখার কি আনন্দ! সেই গ্রামের পাঠক্ষম কেউ তাদের কাগজ বা বই পড়ে শোনাচ্ছেন। কতই না তারা বুদ্ধিমান আর সচেতন। তারা বলেছিল, "আমাদের কালিকটের বড় বড় প্রকাশকদের কাছে বলবেন কি?"

নানা বিষয় ও চারু ও কারু শিল্পের উপর বইয়ের প্রয়োজন তারা বোধ করেছিল। শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নির্বিশেষে, জ্ঞান-পিপাসায়, বই-এর রসগ্রাহিতায়, গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গ্রহণ করা আমাদের দেশের জনসাধারণ অদ্বিতীয় এ ধারনা আমার দৃঢ় হয়েছিল।

০৪ ত্রুত মন্তব্য

ভারতীয় জনগণের সৎ সাহিত্যের প্রতি নিস্পৃহতা সম্পর্কে Hartog Report এ যে ক্ষতিকর মন্তব্য করা হয়েছে তার দৃঢ় প্রতিষেধক হিসেবে এই দৃশ্যগুলি আমার মনে রেখাপাত করল। বলা বাহুল্য, Hartog-এর ভাল উদ্দেশ্যই ছিল। আসল কথা, জনসাধারণ ও বইকে একত্রিত করার তাঁর দেশে যে সব সুবিধা আছে সে সম্বন্ধে তাঁর কোন ধারনা ছিল না। তিনি অবশ্য এসবের মধ্যেই বড় হয়েছিলেন এবং সেই কারণেই এই বিষয়ে তিনি সচেতন ছিলেন না। ভারতবর্ষে থাকাকালে শাসকগোষ্ঠীর গজদন্ত মিনার থেকে বেরোবার সুযোগ কখনও তিনি পান নি। সেজনা সারা ভারতে বই সরবরাহ ব্যবস্থা যে নেই, এমন কি কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়েও নেই—সে কথা তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি। তাই তিনি বিবেচনা না করেই জনসাধারণকে অপবাদ দিলেন। প্রকৃত সত্য জানা থাকলে, দায়িত্ব অবহেলা করার জন্যে শাসকগোষ্ঠীর তিনি অপযশ গাইতেন।

০৪১ চির প্রবাহমান উৎসাহ

Hartog-এর মন্তব্য যাই হোক না কেন, বইয়ের ব্যবস্থার মূল্যবোধ সম্বন্ধে আমাদের দেশের জনসাধারণের স্পৃহার যথেষ্ট প্রমাণ ছিলে। শিক্ষিতজন, যাঁদের অনুভূতি পরীক্ষামূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনেক পরিমানে ভোঁতা ও সীমিত করেছে তাঁদের অপেক্ষা যাঁরা শিক্ষালয়ে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার সুযোগ পাননি তাঁদের সুপ্ত আগ্রহ অনেক বেশী সাড়া দিয়েছিলো। দিল্লী পৌরসভার সমাজশিক্ষার কেন্দ্রগুলি এর নির্ভুল প্রমাণ দিয়েছে। দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী বইয়ের চাহিদা মেটাবার প্রচেষ্টা করেছে। মহানগরীতে অবস্থিত বলে এগুলো দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রচারকার্য এগুলিকে লোকগোচরে আনলো। বিগত কুড়ি বছরে দেশের প্রত্যেকটি অঞ্চলের জনসাধারণের জ্ঞানপিপাসা আমি নিরীক্ষণ করেছি। গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় জনসাধারণের আগ্রহ একটি চির প্রবাহমান উপাদান।

৩৪২ দুস্কৃতিপরায়ণদের দ্বারা ক্ষতি

একথা সত্য যে দুস্কৃতিপরায়ণদের হাতে অংকুরিত গ্রন্থাগার সমূহের বিনষ্ট সাধন সম্ভব। বছর পঁচিশ আগে মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদ সরকারকে একটি পুস্তক সংগ্রহকে এক সজীব গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করতে প্রভাবান্বিত করতে পেরেছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ নতুন সৃষ্ট পদগুলি পূরণের সময়, সংশ্লিষ্ট আমলাতান্ত্রিক কর্মচারীদের মধ্যেও পরিবর্ত্তন হয়েছিল। এর ফলে দুস্কৃতি-পরায়ণদের প্রবেশ ঘটলো। মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদের অভিপ্রায় ধূলিসাৎ হোল। এ অঘটন অন্য তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারেও হোল। অপর একটি গ্রন্থাগারেও বিশবছরের বিকাশ বিনষ্ট হল। এধরনের দুর্ঘটনা জীবনে অস্বাভাবিক ছিল না। সবরকম সমাজ-সেবার কাজে দুর্জ্জনদের অনিষ্টকারীতা সম্পর্কে আমাদের প্রস্তুতি প্রয়োজন।

৩৪৩ আইন বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা

এত বিপত্তি সত্ত্বেও আমার আশাবাদ অবিচল রইল। আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের আগ্রহ নির্ভরযোগ্য। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে সুসংবদ্ধ, উদ্দেশ্য পূর্ণ, ব্যাপক ও রাজ্য ব্যাপী সক্রিয় প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। সর্বত্র জনসাধারণের মধ্যে সমাজ-সেবার সুপ্ত মনোভাবকে জাগ্রত করতে কর্মীবৃন্দ এর মেরুদণ্ড স্বরূপ থাকবে। এঁরা আঞ্চলিক উদ্যোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য স্থায়ী বন্দোবস্ত করবেন। এরকম কার্যসূচীর জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইনানুগ প্রতিবিধান গ্রহণ করা দরকার—একথা দৃঢ়ভাবে উপলব্ধি করেছিলাম।

৩৫ সমস্যার সম্মুখীন

১৯৪৪ এর শেষে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হলাম। আমার ক্ষমতা নিঃশেষ হওয়ার আগেই বাঁধাধরা কার্যক্রম থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছা আমার বরাবর ছিল। দেশ পরিভ্রমণের ইচ্ছা ছিল। যাঁরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত নন তাঁদের কাছে যাবার ও মেশার আগ্রহ ছিল। এ সম্প্রদায়ের নিগ্রহ যা নীরবে ও নির্ম্মমভাবে সুরু হয়েছিল—তা শাপে বর হয়ে দাঁড়াল। আমি আক্ষেপহীন চিত্তে বেড়িয়ে এলাম। ব্যাপকভাবে দেশ পরিভ্রমণ করলাম। সর্বসাধারণের মধ্যে নব জীবনের সঞ্চার আমাকে পুনরু-

জীবিত করলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিতদের গতানুগতিক কার্যক্রম, কৃত্রিমতা, ঔদাসীন্য, আত্মশ্লাঘা, আলস্য ও জটিলতার সংগে কি ব্যবধান। জনগণের নবজাগরণের পেছনে ছিল, মহাত্মা গান্ধীর ব্যক্তিত্ব। দুঃখের বিষয়, খুব স্বল্প সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁর অভিমত গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এতেও আমি নিরুৎসাহ হইনি। জনগণের প্রাণশক্তির তখন স্ফুরণ সুরু হয়েছে। আমি নিজেকে বললাম, "এই বাস্তব নিদর্শনেই সাফল্য প্রমাণিত হয়েছে। ১৯২৫ সালে গ্রন্থাগার আইন সম্বন্ধে যা মনস্থির করেছিলাম তাতে আবার হাত দেব। সমস্যার সম্মুখীন হতেই হবে।"

কীট পতঙ্গ ও গ্রন্থাগার সংরক্ষণ

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত

(১)

পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী গ্রন্থাগার প্রসংগে বলেছিলেন যে এর অনেক শত্রু আছে—রোদ, জল, ইঁদুর, উঁইপোকা। কিন্তু তার মতে সবার বড় শত্রু হল পন্ডিতের মূর্খপুত্র। তাঁর উক্তি অবশ্য পন্ডিতের ব্যক্তিগত গ্রন্থসম্ভার সম্পর্কে। সাধারণ গ্রন্থাগারে পুস্তকের শত্রু হল পাঠকদের অবহেলা অযত্ন এবং অপব্যবহার। এগুলি বাদ দিলে বাকী থাকে কীট পতংগেরা।

পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কীট পতংগের আক্রমণে প্রতি বৎসর অজস্র পুস্তক এবং পত্রপত্রিকা ধ্বংস হয়। এ সমস্যা কেবলমাত্র আধুনিক যুগের গ্রন্থাগারিকদের বিব্রত করেনি; আবহমান কাল হতে কীট পতংগ গ্রন্থাগারের ক্ষতিসাধন করে আসছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার অনেক নজীর আছে। অতি প্রাচীন কালের মনীষিগণ কীট পতংগের উপদ্রব সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং এর আক্রমণ থেকে গ্রন্থাগারকে রক্ষা করবার জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনও করেছিলেন। অবশ্য তখন চামড়া, ভূর্জপত্র, papyrus অথবা vellumএর উপর লিখনকেই গ্রন্থ বোঝাতো।

গ্রীক দার্শনিক Aristotle (খৃঃ পূঃ ৩৮৪—৩২২), গ্রীক নাট্যকার Antiphanes (খৃঃ পূঃ ৪০৮ ?—৩৩৪) ? লাতিন কবি Lucilius (খৃঃ পূঃ ১৮০ ?—১০৩), রোমান কবি Martial (প্রথম শতাব্দী) রোমান নিসর্গবেদী এবং *Historia Naturalis* গ্রন্থের রচয়িতা Pliny the Elder (Gaius Plinius Secundus, ২৩ খৃঃ—৭৯ খৃঃ) প্রমুখ প্রাচীনকালের পণ্ডিতগণের বিভিন্ন রচনায় কীট পতঙ্গের আক্রমণের কথা উল্লিখিত হয়েছে। কীট পতঙ্গের এই সাধারণতঃ ভূমধ্যসাগরীয় এবং মন্দোষ্ণ মণ্ডলে (Sub-tropical region) সীমাবদ্ধ থাকলেও নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল এদের আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পায়নি।

Aristotle খৃঃ পূঃ ৩৩৫ সালে লিখিত *Historia animalium* নামক গ্রন্থে লাঙ্গুলবিহীন বৃশ্চিকের অনুরূপ এক প্রকার কীটের উল্লেখ করেছেন। তিনি এই কীটকে বইয়ের ভিতর বিচরণ করতে দেখেছেন। অবশ্য এই "লাঙ্গুলবিহীন বৃশ্চিক"কে পরে arachnid (*Chelifer concroides*) বলে সনাক্ত করা হয়েছে (Plumbe 2,291)। এরা প্রকৃত কীট পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত নয়। বইএর ভিতর পোষাক পরিচ্ছদের ভিতর বিচরণকারী কীটের অনুরূপ কয়েকটি কীট পতঙ্গেরও অস্তিত্ব তিনি আবিষ্কার করেছিলেন।

রোমান কবি Horace (খৃঃ পূঃ ৬৫—৮) আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে তাঁর রচিত সমস্ত পুঁথিপত্র এক সময় ধ্বংসকারী কীট পতঙ্গের খাদ্যে পরিণত হবে।

Philippus of Thessalonica প্রথম শতাব্দীতে রহস্যচ্ছলে তৎকালীন বৈয়াকরণিকদের গ্রন্থনাশক কীট পতঙ্গের সাথে তুলনা করেছিলেন—তারপর থেকেই বোধ হয় অতি অধ্যয়নশীলদের "গ্রন্থকীট" বা "বইএর পোকা" অখ্যায় ভূষিত করবার প্রচলন (Back 127)।

ধুলো বালি যে কীট পতঙ্গ সৃষ্টি ও বংশবিস্তারের সহায়ক Pliny the Elder এর এই অভিমত আধুনিক কীটতত্ত্ববিদেরাও সমর্থন করেন। (Back 127)

সিলভার ফিস জাতীয় কীট পতঙ্গের অস্তিত্ব বৃটিশ রসায়নবিদ্ এবং পদার্থবিদ্ Robert Hookএর সপ্তদশ শতাব্দীর রচনায় উল্লেখ আছে।

ফরাসী গ্রন্থবিবরণীবিদ্ (bibliographer) E. G. Peignot *Insectes qui rongent les livres* (১৮০২) নামক গ্রন্থে এক প্রকার কীটের উল্লেখ

করেছেন। এই কীট পাশাপাশি রাখা ২৭ খণ্ড পুস্তকের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ খনন করেছিল (Plumbe 2, 292)।

প্রাচীন যুগের পণ্ডিতগণ কীটপতঙ্গের অস্তিত্ব এবং ধ্বংসপ্রবণতা সম্বন্ধে যেমন অবহিত ছিলেন তেমনি তার আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য বিবিধ প্রকার পন্থারও উদ্ভাবন করেছিলেন। সেই প্রাচীনকাল থেকেই গ্রন্থসংরক্ষক হিসাবে Cedar তৈলের প্রচলন। Cedar তৈলই বোধ হয় প্রাচীনতম গ্রন্থসংরক্ষক। Horace উল্লেখ করেছেন যে কীটপতঙ্গের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য পুঁথিপত্র Cedar তৈল নিষিক্ত করে পালিশ করা cypress কাঠের আলমারীতে বন্ধ করে রাখা হত। Pliny the Elder লিখেছেন যে রোমের দ্বিতীয় সম্রাট Numa Pompilius এর কবরে, Cedar তৈল প্রযুক্ত গ্রন্থ পাঁচশত বৎসর পরেও অবিকৃত অবস্থায় ছিল। বাইবেলের অপ্রামাণিক গ্রন্থে (Apocryphal books of the Bible) উল্লিখিত আছে যে Moses, Old Testament এর অন্তর্ভুক্ত Pentateuch গ্রন্থ সংরক্ষণের জন্য Cedar তৈল প্রয়োগ করে তা মৃত্তিকা পাত্রে রাখবার জন্য Josuaকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। (Back 126—127) ওলন্দাজ পণ্ডিত Desiderius Erasmus (১৪৬৬ খৃঃ ?—১৫৩৬) উপদেশ দিয়েছিলেন যে কীটপতঙ্গের আক্রমণ থেকে গ্রন্থ রক্ষা করবার সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা হ'ল যথা সম্ভব তার ব্যবহার। ব্যবহারিক অভিজ্ঞতায় বর্তমান যুগেও এই অভিমতের যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে।

মধ্যযুগে এবং তার পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেশের মধ্য মানুষ এবং বইয়ের অবাধ চলাচল বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বইয়ের সঙ্গে কীটপতঙ্গ এক দেশ থেকে অন্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থ ও পত্র পত্রিকারও সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে। ফলে গ্রন্থ সংরক্ষণের সমস্যা'ও জটিল হয়েছে। এই সমস্যা নিয়ে তাই বর্তমানকালে অনেক গবেষণা ও আলোচনা হয়েছে। এই ব্যাপারে উৎসাহিত করবার জন্য Royal Society of Goettingen কর্তৃক ১৭৭৪ খৃঃ এ এবং আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলন (International Library Congress) কর্তৃক ১৯০৩ খৃঃ এ পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল। Peignot রচিত পুস্তকের নাম পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। William Blade প্রণীত *The Enemies of Books* (১৮৮৮) গ্রন্থে "গ্রন্থকীট" (Book-worm) শীর্ষক একটি পরিচ্ছেদ আছে। ১৯০৩ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সম্মেলনে (International Library Congress)

পুস্তক সংরক্ষণ সম্বন্ধে আলোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে C. V. Houlbert *Les Insectes Enemis des Livres* (Paris, 1903) নামক পুস্তক প্রণয়ন করেছিলেন। বইয়ের শত্রু হিসাবে কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে এটিই প্রথম পূর্ণাঙ্গ পুস্তক।

পরবর্তীকালের উল্লেখযোগ্য পুস্তক হল Arturo Scarone রচিত *El libro y sus enemigos* (Montevideo, 1917)

১৯৩০ সালে Hunting Library (New orleans) যখন গ্রন্থকীটের (bookworm) আক্রমণে জর্জরিত হয়েছিল তখন এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংরক্ষক Thomas M. Iiams বিভিন্ন কীটতত্ত্ববিদ্‌দের উপদেশ প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু অধিকাংশ কীটতত্ত্ববিদেরা গ্রন্থাগারে বিচরণকারী কীটপতঙ্গ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত তথ্য সরবরাহ করতে অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন। শেষোক্ত দুখানি গ্রন্থই তখন Iiams এর সহায়ক হয়েছিল। (Iiams 33)

কীট পতঙ্গের সমস্যা নিয়ে এ পর্যন্ত কি পরিমাণ আলোচনা হয়েছে তার খানিকটা হদিশ পাওয়া যাবে *Bulletin of the New york Public Library* (Vol. 40, Sept—Dec, 1936) পত্রিকায় প্রকাশিত H. B. Weiss এবং R. H. Carruthers সংকলিত রচনাপঞ্জীতে। এই পঞ্জীতে ৪৯৩টি রচনা তালিকাভুক্ত হয়েছে। আধুনিককালে মালয় বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুয়ালালামপুর) গ্রন্থাগারিক W. J. Plumbe সঙ্কলিত ১০৮টি রচনার তালিকা উল্লেখযোগ্য (Plumbe I, 156)

ইতিহাসের কথা বাদ দিলেও কীট পতঙ্গের উপদ্রব গ্রীষ্ম প্রধান দেশের প্রত্যেক গ্রন্থাগারিককেই সদা শঙ্কিত করে রাখে; অবশ্য নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলেও তাদের প্রকোপ প্রবল।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পুস্তক সংরক্ষণের ব্যাপারে আমরা Cedar তৈলের যুগ অতিক্রম করে রাসায়নিক যুগে এসে পৌঁছেছি। অবাঞ্ছিত কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ এবং ধ্বংস করে ব্যাধি সংক্রমণ বন্ধ করা, খাদ্যশস্যের অপচয় রোধ এবং মানবসভ্যতার অগ্রগতির বাহক এবং নিদর্শন যাবতীয় গ্রন্থ সম্ভারকে রক্ষা করবার জন্য নতুন নতুন রাসায়নিক দ্রব্য এবং কলাকৌশল সম্বন্ধে গবেষণা চলেছে। সহস্র সহস্র কীটপতঙ্গের উপদ্রব থেকে গ্রন্থাগারের পুস্তক এবং পত্রপত্রিকা রক্ষা করতে হলে গ্রন্থাগারিককে একাধারে কীটতত্ত্ববিদ্‌ এবং অন্যদিকে রসায়নবিদ্‌ও হতে হবে। যে সমস্ত কীটপতঙ্গ গ্রন্থাগারে

হানা দেয় তাদের শারীরস্থান, শারীরবৃত্ত জনন পদ্ধতি, বসতি, খাদ্যাসক্তি এক কথায় তাদের সমগ্র জীবন বৃত্তান্ত সম্বন্ধে গ্রন্থাগারিককে অবহিত হতে হবে। তারপর কোন রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগে তাদের ধ্বংস অথবা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা যাবে অথচ বই, মানুষ এবং গৃহপালিত পশু পক্ষীর কোন ক্ষতি হবেনা সে সম্বন্ধে যথোপযুক্ত জ্ঞানার্জন করতে হবে।

(২)

কীট পতঙ্গের জগৎ অত্যন্ত বিশাল। কীটতত্ত্ববিদেরা এদের অন্ততঃ ৬৪০,০০০ প্রজাতির সঙ্গে পরিচিত। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র নতুন কীট-পতঙ্গ আবিষ্কৃত হচ্ছে। H. A. Gossard তাই অনুমান করেন যে এই প্রজাতির সংখ্যা ২৫ লক্ষ থেকে এক কোটীর মধ্যে। কীটপতঙ্গ জগতের বিশালতার আভাস দিতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেছেন যে কোন কীটতত্ত্ববিদ্ যদি পাঁচ বৎসর বয়সে এদের প্রতিটি প্রজাতির পরিচয় আয়ত্ত্ব করবার প্রচেষ্টা সুরু করে দিবারাত্র নিরবচ্ছিন্ন পরীক্ষা চালান তবে "কীট পতঙ্গের সেই দীর্ঘ শোভাযাত্রার শেষ প্রতিভূটি তাঁর সমুখ দিয়ে অতিক্রম করবার পূর্বেই একশত গ্রীষ্মের বর্ষণ ধারা তার গৃহের উপর পড়বে।" (Metcalf, 186) এই বিশাল কীটপতঙ্গ রাশির পরিচয় আয়ত্ত্ব করতে হলে এদের সমগ্র জীবনচক্র, শারীরস্থান ও শারীরবৃত্তের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য অনুসারে যথাযথ শ্রেণীবিন্যাসকরা প্রয়োজন।

বর্ত্তমানে প্রচলিত উদ্ভিদ্ এবং প্রাণী জগতের শ্রেণীবিন্যাস পদ্ধতির প্রবর্ত্তক হলেন সুইডিস বৈজ্ঞানিক Carl von Linne Linnaeus (১৭০৭—১৭৭৮)। তাঁর প্রণীত *Systema Naturae* (১৭৩৫) গ্রন্থে এ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হয়েছে। এই পদ্ধতিতে প্রাণীর প্রতিটি প্রজাতির সঙ্গে অন্যান্য জীবন্ত বস্তুর সম্বন্ধ নিরূপিত হয়েছে।

কীট পতঙ্গ অমেরুদণ্ডী প্রাণী। প্রাণী জগতের সর্বপ্রথম এবং সর্ববৃহৎ বিভাগকে পর্ব (*Phylum*) বলে। সংখ্যায় প্রায় বারোটি পর্বের মধ্যে *Arthropoda* অন্যতম। প্রাণীজগতের শ্রেণীবিন্যাসের পরবর্তী পর্যায় হল শ্রেণী (*class*) Arthropoda পর্বকে পাঁচটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। সমস্ত কীটপতঙ্গ ছয়পদ বিশিষ্ট Hexapoda (*Insecta*) শ্রেণীভুক্ত। সমগ্র প্রাণীজগতের শতকরা ৭৫ ভাগ হল Arthropoda পর্বের অন্তর্ভুক্ত এবং এই

পর্বের শতকরা ৯০ ভাগ হল প্রকৃত কীটপতঙ্গ (True insects)। কীট-পতঙ্গের দেহ তিন অংশে বিভক্ত ঃ মস্তক, ও গলা এবং উদর।

প্রাণীজগতের শ্রেণীবিন্যাসের পরবর্তী ধাপগুলি হল পর্যায়ক্রমে বর্গ (*Order*), গোত্র (*Family*) গণ (*genus*) এবং প্রজাতি (*Species*)।

Hexapoda শ্রেণীকে আরো দুটো উপ-শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ

(১) *Apterygota* (সম্পূর্ণ শব্দ Apterygogeneaর সংক্ষিপ্ত রূপ) ঃ এদের জীবনচক্রে দৈহিক রূপান্তর (Metamorphosis) ঘটেনা অর্থাৎ শিশু এবং বয়স্কী কীটের মধ্যে কেবলমাত্র আকারগত পার্থক্য। এরা মূলতঃ পক্ষহীন।
(২) *Pterygota*—(Pterygogenea শব্দটির সংক্ষিপ্ত রূপ) ঃ

(ক) এদের জীবনচক্রে ধীর এবং ক্রমান্বয়িক অথবা অজটিল দৈহিক রূপান্তর ঘটে। শৈশব অবস্থায় এদের পক্ষোদ্গম হয় এবং পুঞ্জাক্ষি (compound eye) আছে।

এবং (খ) এদের জীবনচক্রে সম্পূর্ণ অথবা জটিল দৈহিক রূপান্তর ঘটে। শূক অথবা লার্ভা অবস্থায় এদের পক্ষোদ্গম হয়। লার্ভার পুঞ্জাক্ষি নেই।

কীটপতঙ্গের পক্ষ এবং মুখোপাঙ্গের (mouth parts) গঠন প্রকৃতি এবং জীবন বৃত্তান্তের উপর ভিত্তি করে তাদের বর্গ নির্ণীত হয়। Hexapoda শ্রেণীকে সাধারণতঃ এই রকম ২৫টি বর্গে বিভক্ত করা হয়। এদের ভিতর মাত্র তিনটি বর্গে Thysanura, Collembola এবং Protura Apterygota উপশ্রেণীভুক্ত। অধিকাংশ বর্গের নাম প্রাচীন গ্রীক থেকে সংগৃহীত হয়েছে এবং অধিকাংশ নামের শেষে "—ptera" কথাটি যুক্ত থাকে। গ্রীক ভাষায় এর অর্থ হল "পক্ষ" (Gaul, 31)।

বর্গ যথারীতি ক্রমপর্যায়ে গোত্র, গণ এবং প্রজাতিতে বিভক্ত। প্রজাতি কীটপতঙ্গ শ্রেণীর শেষতম পর্যায়। মানুষ এবং মাছির সম্পূর্ণ বর্গীকরণের উদাহরণ দিয়ে বর্গীকরণ পদ্ধতি সহজ করে বোঝানো হল ঃ

জগৎ (Kingdom)	প্রাণী Animal	প্রাণী (Animal)
পর্ব (Phylum)	Chordata	Arthropoda
শ্রেণী (Class)	Mammalia	Hexapoda
বর্গ (Order)	Primates	Diptera
গোত্র (Family)	Hominidae	Muscidae
গণ (Genus)	Homo	Musca
প্রজাতি (Species)	Sapiens	domestica
প্রকার ভেদ (Variety)	Caucasian	×
প্রাতিস্বিক (Individual)	John Smith	যে কোন মাছি

প্রজাতি কীট পতঙ্গ শ্রেণীর শেষতম পর্যায়। একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত কীট পতঙ্গের বাহ্যিকরূপ, অঙ্গসংস্থান, বসতি, আচরণ, খাদ্যাভ্যাস মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একই পন্থায় তাদের ধ্বংস অথবা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

উপরের উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে মানুষের শ্রেণীবিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রজাতি শেষতম পর্যায় নয়। এক অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে অন্য অঞ্চলের মানুষের প্রকার ভেদ আছে, এবং একই অঞ্চলের দুই ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে দৈহিক, বুদ্ধিমত্তার এবং আচরণ গত পার্থক্য আছে। সুতরাং মানুষের শ্রেণীবিন্যাসে ব্যক্তি বিশেষ হল নিম্নতম একক (unit)। একজন মানুষকে অন্য একজন মানুষ থেকে পৃথক করবার এবং সনাক্ত করণের জন্য প্রত্যেকের নাম করণ করা প্রয়োজন হয়। একই প্রজাতির অন্তর্গত সমস্ত কীটপতঙ্গের মধ্যে কোন পার্থক্য না থাকায় গোটা প্রজাতির নামকরণ করলেই চলে।

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন ভাষার প্রচলনের ফলে একই প্রাণী অথবা কীট-পতঙ্গের বিভিন্ন নামকরণ হয়, ফলে তাদের সঠিক সনাক্তকরণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেজন্য প্রাণীতত্ত্ববিদের সর্বসম্মতিক্রমে সমগ্র প্রাণীজগতের বৈজ্ঞানিক নামকরণ পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। কীটপতঙ্গের ক্ষেত্রে প্রজাতি নিম্নতম একক—সুতরাং প্রত্যেকটি প্রজাতির বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক নামকরণ দ্বারা আন্ত-র্জাতিক পর্যায়ে কীটপতঙ্গের সনাক্তকরণের সমস্যা সমাধান করা সম্ভবপর হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক নামকরণকে দ্বিপদ নাম করণ (binomial nomenclature) পদ্ধতি বলা হয়। এই পদ্ধতি অনুযায়ী প্রত্যেক প্রজাতির নামের দুটি অংশ থাকে। প্রথম অংশ হল প্রজাতিটি যে গণের অন্তর্ভুক্ত সেই গণের নাম (Generic name) এবং দ্বিতীয় অংশ হল প্রজাতির নাম (Specific name)। অনেক সময় এই নামের একটি তৃতীয় অংশও থাকে। যিনি সেই প্রজাতির নামকরণ এবং সম্পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন সেই বৈজ্ঞানিকের নামও সংযোজিত করা হয়।

এই সমস্ত নামের ক্ষেত্রে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম পালন করা হয়। কেবলমাত্র গণনামের আদ্যাক্ষরটির জন্য রোমান বড় হরফ (Captial) ব্যবহৃত হবে এবং সমগ্র গণনাম এবং প্রজাতিনাম বাঁকা ছাদের হরফে (Italics) মুদ্রিত হবে। হস্ত লিখিত অথবা মুদ্রলিখ যন্ত্রে (Typewriter) মুদ্রিত পাণ্ডু-লিপিতে এই দুই অংশের নিম্নদেশ রেখাঙ্কিত করতে হয়।

কাঠের আসবাবপত্র আক্রমণকারী এক প্রকার কীটের (Furniture bettle অথবা ঘুণ পোকা) বৈজ্ঞানিক নাম হল *Anobium punctatum* De Geer। এই নাম থেকে বোঝা যায় যে এই কীট যথাক্রমে *Anobium* এবং *punctatum* গণ এবং প্রজাতিভুক্ত এবং সুইডিস নিসর্গবেদী De Geer (অষ্টাদশ শতাব্দী) সর্বপ্রথম এই কীটের নামকরণ এবং বিবরণ প্রণয়ন করেছিলেন।

(৩)

গ্রন্থাগারে কীট পতঙ্গ হানা দেয় খাদ্যের সন্ধানে। সাধারণতঃ বই বাঁধানোর জন্য ব্যবহৃত শিরীষ আঁঠা অথবা শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত আঁঠা, বইয়ের মলাটের চামড়া এবং কাপড় শক্ত করবার জন্য ব্যবহৃত মাড় ইত্যাদী এদের লোভনীয় খাদ্য। খাদ্যাভ্যাস এবং পরিপাক শক্তির বৈশিষ্ট্য অনুসারে গ্রন্থাগারের কীট পতঙ্গদের তিনভাগে বিভক্ত করা যায় (Bracey 157, 158)।

১। **শ্বেতসার (Starch) ভোজী** ঃ—এরা শ্বেতসার জাতীয় আঁঠা শিরীষ, মাড় ইত্যাদি পছন্দ করে। এই সমস্ত শ্বেতসার পদার্থ খেতে গিয়ে বইয়ের ক্ষতি করে ঃ

(ক) আরশোলা (Cockroaches)

(খ) সিলভার ফিস (Silver fish)

(গ) ফায়ারব্যাটস (firebats)

(ঘ) বুক লাইস (book lice), Psocids ইত্যাদি

২। **সেলুলোজ (Cellulose) ভোজী**—এরা সরাসরি বইয়ের কাগজ, বাঁধাইয়ের কাপড়, কাঠের আসবাব ইত্যাদি আক্রমণ করে। এরাই গ্রন্থাগারের অধিক ক্ষতিসাধন করে ঃ

(ক) গ্রন্থকীট (book worms)—গ্রন্থাগারে যে সমস্ত গ্রন্থকীট হানা দেয় তাদের সকলকেই আমরা গ্রন্থকীট আখ্যা দিয়ে থাকি। কিন্তু Coleptra বর্গভুক্ত কয়েকটি সেলুলোজ ভোজী প্রজাতি প্রকৃত গ্রন্থকীট।

(খ) উই পোকা (termites)

৩। **প্রোটীন (protein) ভোজী**—বই বাঁধানোর জন্য ব্যবহৃত চামড়া অথবা যে কোন প্রকার প্রাণীজ দ্রব্য এদের পরম প্রিয় খাদ্য। এদের ভিতর উল্লেখযোগ্য হল Brown House অথবা False clothes moths এবং Spider beetle.

Back লিখেছেন যে গ্রন্থাগারে হানাদার সমস্ত কীটই বইপত্র ধ্বংস করে না। ধ্বংসকারী কীটপতঙ্গদের তিনি তিনভাগে বিভক্ত করেছেন (Back 131) :

(১) প্রকৃত গ্রন্থকীট (true book worms)

(২) উই পোকা (termites)

(৩) পৃষ্ঠভোজী (surface feeders)

উপরোক্ত সেলুলোজ ভোজী Coleptra বর্গের অন্তর্গত কয়েকটি প্রজাতিকে তিনি "প্রকৃত গ্রন্থকীট" আখ্যা দিয়েছেন। পৃষ্ঠভোজী পর্যায়ে তিনি শ্বেতসার ভোজী আরশোলা, সিলভার ফির্স, বুক লাইস প্রভৃতি পতঙ্গের উল্লেখ করেছেন।

১ (ক) **আরশোলা** (Cockroaches)—উপশ্রেণী : *Pterygota*, বর্গ : *Orthoptera*, গোত্র : *Blattidae* এদের প্রায় ১২০০ প্রজাতির সঙ্গে (মতান্তরে ৩৫০০) সঙ্গে কীটতত্ত্ববিদেরা পরিচিত। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (১) প্রাচ্যদেশীয় বা সাধারণ আরশোলা *Blatta orientalis* (Linne) (২) আমেরিকান আরশোলা *Periplaneta americana* (Linne) এবং (৩) জার্মাণ আরশোলা *Blattella germanica* (Linne).

Ulysses Aldrovandus ১৬০২ খৃষ্টাব্দে আরশোলাকে বইয়ের শত্রু বলে উল্লেখ করেছিলেন। ১৮৩৭ সালে West Indies এ এদের প্রকোপ এত প্রবল হয়েছিল যে এরা কেবলমাত্র বই পত্র নয়—দুর্বল এবং রুগ্ন ব্যক্তিদের উপর অবাধে আক্রমণ চালিয়েছিল। (Plumbe 2, 296)

প্রাচ্য দেশীয় আরশোলার সঙ্গে অপরিচিত ভারতবাসী বিরল। কুৎসিত দেহাকৃতি, দৈহিক দুর্গন্ধ এবং নোংরা স্বভাবের জন্য আরশোলার উপস্থিতি বিরক্তিজনক এবং বমনোদ্রেক করে। সমস্ত প্রজাতির মধ্যে প্রাচ্য দেশীয় আরশোলাই সর্বাধিক নোংরা (Metcalf 864)

প্রাচ্যদেশীয় আরশোলার রঙ ঘন পিঙ্গল বর্ণ (dark brown)। দৈর্ঘে সাধারণতঃ এক ইঞ্চি। স্ত্রী আরশোলা পক্ষ হীন কিন্তু পুরুষ আরশোলার উদর অপেক্ষা দৈর্ঘে ক্ষুদ্র পক্ষ আছে। সকলেরই মাথায় দুটি শুঁড় থাকে। এদের পরমায়ু প্রায় ১৩ মাস।

স্ত্রী আরশোলা ১২ থেকে ১৬টি ডিম্ব সমন্বিত কালচে রঙের ক্যাপসুলাকৃতি বিশিষ্ট বস্তু (ootheca) প্রসব করে। এরা গড়পড়তা এই রকম প্রায় ১৪।১৫টি ক্যাপসুল প্রসব করতে সক্ষম।

আমেরিকান আরশোলা ১৪।১৬ ডিম্ব সমন্বিত ১৫ থেকে ৯০টি ক্যাপসুল প্রসব করে। অর্থাৎ একটি স্ত্রী আমেরিকান আরশোলা ১৪৪০টি ডিম্ব প্রসব করতে সক্ষম। আরশোলা উষ্ণ অথচ আর্দ্র স্থানে বাস করা পছন্দ করে। সাধারণতঃ নর্দামা, জলের পাইপের প্রবেশপথ ইত্যাদি দিয়ে ঘরে প্রবেশ করে। পুরুষ আরশোলা জানালা দিয়েও উড়ে আসতে পারে। দেহ চেপ্টাকৃতি হওয়ায় দিনের বেলা এরা ঘরের দেওয়াল অথবা মেঝের ফাটলে, বইয়ের তাকের এবং টেবিলের দেরাজের তলদেশে এবং অন্যান্য যে কোন সংকীর্ণ ও নিভৃত কোণে সহজেই আত্মগোপন করে থাকতে পারে। আরশোলা নিশাচর, অন্ধকারে সক্রিয় হয়ে ওঠে।

নিজের দেহে রোগ বীজাণু না থাকলেও আরশোলা একস্থান থেকে অন্যস্থানে কলেরা টাইফয়েড পলিওমাইলেটিস প্রভৃতি কঠিন রোগের বীজাণু বহন করে নিয়ে যায়। আরশোলা মাংসাশী এবং স্বগোত্র ভোজনকারী। দুর্গন্ধযুক্ত জঞ্জাল, ভুক্তাবশেষ, গলিত জৈব পদার্থ ইত্যাদি এদের পরম প্রিয় খাদ্য। এককথায় এরা সর্বভুক। বই বাঁধানোর জন্য ব্যবহৃত শ্বেতসার জাতীয় আঁঠা, শিরীষ আঁঠা এবং বইয়ের মলাটের কাপড় রঞ্জিত করবার জন্য ব্যবহৃত কয়েক প্রকার রঞ্জনদ্রব্য এবং কাপড় শক্ত করবার জন্য ব্যবহৃত শ্বেতসার জাতীয় মাড় গ্রন্থাগারে আরশোলার অন্যতম আকর্ষণ। এই খাদ্যের লোভে বইয়ের দেহ ক্ষতবিক্ষত করে এবং দেহনিঃসৃত দুর্গন্ধযুক্ত কৃষ্ণবর্ণের মলদ্বারা কাগজপত্র কালিমালিপ্ত করে।

(১খ) **সিলভার ফিস (Silverfish)** *Lepisma Saccharine* Linne, উপশ্রেনী : Apterygota, বর্গ : Thysanura, গোত্র : Lepismatidal।

সিলভার ফিসের দেহাকৃতি গাজরের ন্যায়। দৈর্ঘে ¼ থেকে ½ ইঞ্চি। এরা মূলতঃ পক্ষহীন। মাথার দিকে দুটো শুঁড় আছে। পিছনে শলাকার মত লেজ এবং লেজের পার্শ্বে বক্রকার আরো দুটি শুঁড় আছে। এর সবগুলির দৈর্ঘ প্রায় দেহের সমান। দেহে রূপোলী রংএর পাতলা আঁশের মত জিনিষ থাকে। স্পর্শ করলে হাতে এই রঙ লেগে যায়।

সিলভার ফিসও আরশোলার ন্যায় উত্তপ্ত এবং আর্দ্র স্থানে বাস করে। আলোর সংস্পর্শ মাত্রই এরা দ্রুত আত্মগোপন করে। রাত্রি অন্ধকারে এদের কর্মকান্ড সুরু হয়। ক্ষুদ্রাকৃতি দেহের জন্য সিলভারফিস সহজে বইয়ের ভিতর আত্মগোপন করে থাকতে পারে।

স্ত্রী সিলভার ফিস একবারে ৬টি থেকে ১০টি ডিম্ব প্রসব করে। ডিম্বগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি, সাদা রঙের, দৈর্ঘে প্রায় ৩/২৫ ইঞ্চি। গ্রন্থাগারে অব্যবহৃত বইয়ের ভিতর এরা ডিম্ব প্রসব করে। এগুলি কাগজের সঙ্গে লেগে থাকেনা, ঝাড়লেই পড়ে যায়। ডিম্ব থেকে সরাসরি শিশু সিলভারফিস জন্মগ্রহণ করে। শিশু সিলভার ফিসের সঙ্গে বয়স্কীর পার্থক্য কেবল দৈর্ঘগত। এদের পরমায়ু প্রায় তিন বৎসর।

এরা আরশোলার ন্যায় শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের আকর্ষণে গ্রন্থাগারে বাস করে। সিলভারফিস চরম খাদ্যাভাবের মধ্যেও দীর্ঘকাল জীবিত থাকতে পারে। বয়স্কী সিলভারফিসের ৩১৯ দিন পর্যন্ত অনাহারে জীবিত থাকবার নজীর আছে। (Katos, D. *Pest Control* 19, Oct 1951, 32)

১ (গ) ফায়ার ব্যাটস (Firebats) *Thermobia domestica* (Packard)

Thysanura বর্গের অন্যতম প্রজাতি হল ফায়ারব্যাট। এদের আকৃতি প্রায় সিলভারফিসের অনুরূপ। কিন্তু এরা সধারণতঃ ১০০ থেকে ১০২ ডিগ্রী ফারেনহিট উত্তাপ বিশিষ্ট স্থানে বাস করে। কিন্তু উষ্ণ অঞ্চলের খুব কম গ্রন্থাগারের অভ্যন্তরের উত্তাপ ১০০ ডিগ্রীর বেশী। সেজন্য গ্রন্থাগারে এদের উপস্থিতি কচিৎ লক্ষিত হয়।

১ (ঘ) **Psocids এবং বুক লাইস**। বর্গ : Corrodentia : Atropidae গোত্রের দুটি প্রজাতি *Tocles divinatorius* এবং *Atropos pulsatoria* এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য (Comstock 333)

এগুলি খুব ক্ষুদ্রাকৃতি ধূসর অথবা লঘু হরিদ্রা বর্ণের কীট। আকারে সাধারণ একটি আলপিনের মস্তকভাগের ন্যায়। এদের দেহ খুব নমনীয়। চোয়ালের গঠন চর্বণের উপযোগী। সাধারণতঃ অব্যবহৃত পুরাতন আর্দ্র পুস্তকের ভিতর এদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। আরশোলা এবং সিলভারফিসের মত শ্বেতসার জাতীয় আঁঠা শিরীষ ইত্যাদির লোভে বই পত্রের ক্ষতি করে। তবে এবিষয়ে মতান্তর আছে। অনেকে অনুমান করেন যে আর্দ্র আবহাওয়ায় পুস্তকে যে ছত্রাকের জন্ম হয় সেই ছত্রাকই হল বুকলাইসের খাদ্য। সেজন্য সাম্প্রতিক কালের লেখকগণ বুকলাইসকে পুস্তক ধ্বংস করবার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন (Plumbe 1, 157)

২ (ক) **গ্রন্থকীট (Bookworms)**

"The bookworm glides adown the row
Of hoarded tomes from long ago

With ruthless augur boring on
From title page to colophon···"

—Jas C. Woods

"Through and through the inspired leaves
Ye maggots, make your windings ;
But oh ! respects his lordship's taste,
And spare his golden bindings"

—Robert Burns (1759-1756)

একজন অভিজাত বংশীয়ের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে Robert Burns গ্রন্থকীটের উদ্দেশ্যে এই কবিতা রচনা করেছিলেন। গ্রন্থকীটেরা কবির এই অনুরোধে কর্ণপাত করে না। গ্রন্থ সৃষ্টির আদিম যুগ থেকেই তারা সক্রিয়। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে তালপত্রের এবং ইজিপ্টের Papyrus-এর পুঁথিপত্র ধ্বংস করেছে। বর্তমান কালে ভারতবর্ষের বহু পারিবারিক অথবা সাধারণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থ সংগ্রহ গ্রন্থকীটের আক্রমণে জর্জরিত হয়েছে। ১৯৩০ সালে আমেরিকার Huntington গ্রন্থাগারে (New Orleans) গ্রন্থকীটের প্রাদুর্ভাবের নজীর আছে এই গ্রন্থাগারে গ্রন্থকীটের উপদ্রব নিরসনের জন্য পরীক্ষা নীরিক্ষার অভিজ্ঞতার প্রকাশিত বিবরণ থেকে গ্রন্থাগারিক উপকৃত হবেন (Iiams 31—40)

Coleoptera বর্গের নিম্নলিখিত গোত্রভুক্ত প্রায় ১৬০টি গ্রন্থকীট প্রজাতি সাধারণতঃ গ্রন্থাগারে দৃষ্ট হয় ঃ

(১) Anobiidae (২) Bostrichidae (৩) Lyctidae এবং (৪) Ptinidae। অনেক কীটতত্ত্ববিদ্ Anobiidae এবং Ptinidaeকে একই গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করেন। (Fowler 143)।

Anobiidae (Death watch family) গোত্রভুক্ত কয়েকটি প্রজাতি হল প্রকৃত গ্রন্থকীট (Bracey 158)।

এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(অ) Drug store beetle (*Sitodrepa=stegobium panicea.*)

(আ) Cigarette beetle (*Lasioderma sarricornea.*)

(ই) Common furniture beetle (*Anobium pumctatum* De Geer)

(ঈ) Death watch beetle (*Xestobium rufovillosum*)

Death watch beetle সুড়ঙ্গ খনন করবার সময় মাথা অথবা চোয়াল দিয়ে কাঠের উপর আঘাত করে এক প্রকার শব্দ করে। বিভিন্ন দেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ব্যক্তিদের মতে কোন রুগ্ন ব্যক্তির শয্যাপার্শ্বে এই শব্দ মৃত্যুর পূর্ব লক্ষণ সূচনা করে। সেজন্য এর নাম Death watch beetle.

Bostrichidae (Powderpost beetle) গোত্রের প্রজাতিগুলির আক্রমণে কাঠের আসবাব পত্র কিছুদিনের মধ্যেই সূক্ষ্ম চূর্ণে পরিণত হয়। সেজন্যে এর নাম Powderpost beetle। Lyctidae গোত্রের প্রজাতি *Lyctus brunneus* ও অনুরূপ ভাবে কাঠের আসবাব পত্র ধ্বংস করে।

Ptinidae গোত্রের Ptinus fur (Spider beetle) বই বাঁধাই চামড়াও আক্রমণ করে।

অনেক সময় অব্যবহৃত বই খুললে দেখা যায় তার সর্বাঙ্গে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার সুড়ঙ্গ; প্রতিটি পৃষ্ঠা কেবলমাত্র কয়েকটি ছিদ্রের সমষ্টি। বইয়ের ভিতর সুড়ঙ্গ খননই করাই গ্রন্থকীটের বৈশিষ্ট্য। খুব অভিনিবেশ সহকারে অনুসন্ধান না করলে বইয়ের ভিতর এদের অস্তিত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব নয়। এবং বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে হলে অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। সাধারণতঃ সমস্ত প্রজাতির কর্ম প্রক্রিয়া প্রায় একরকম। এই সমস্ত গ্রন্থকীট লার্ভা অবস্থাতেই বই অথবা কাঠের আসবাব পত্রের ক্ষতি করে।

Houlbert এর মতে Anobiidae গোত্রের *Sitodrepa panicea* বই পত্র ধ্বংসের ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা অধিক সক্রিয়। তাঁর *Les Insects Enemis des Libres* গ্রন্থে এই প্রজাতির পুস্তক ধ্বংস প্রবণতা সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। এই প্রজাতি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত:

আমেরিকা: *Sitodrepa panicea* (Drugstore beetles) (Iiams 33, 34)

য়ুরোপ: *Anobium panicea* (Biscuit weevils অথবা Bread beetles) (Icams 33, Fowler 143)

ফরাসী: *Vrillete du pain France* (Iiam 34)

জার্মাণী: brad kapfer (Iiams 34)

ভারতবর্ষে এবং ব্রহ্মদেশে যে প্রজাতির দৌরাত্ম্য আছে তার নাম *Gastrallus indicus*। Anobiidae গোত্রের প্রজাতিদের সঙ্গে এদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

(*Indian Archives* Vol. I p. 194)। Ghosh ব্রহ্মদেশের প্রজাতির নাম *Gastrallus laticollis* Pic বলে উল্লেখ করেছেন (Ghosh 213—214)।

Howard, L. O. এবং Marlett, C. L. সম্পাদিত The Principal Household Insests of U.S. (Washington, 1896) গ্রন্থে F. H. Crittenden এদের সম্বন্ধে বলেছেন যে শুকনো রুটির ভিতর এই কীটের জন্ম, সে জন্য রুটির ল্যাটিন নাম *Panis* থেকে এই প্রজাতির নামকরণ হয়েছে। য়ুরোপের অনেক অঞ্চলে এরা এখনও bread beetle নামে পরিচিত। কিন্তু ওষুধের দোকানে এদের উপদ্রব বেশী ; সে জন্য এর নাম drug store beetle। গোলমরিচ এদের পরম প্রিয় খাদ্য। ওষুধের দোকানে এদের খাদ্যাখাদ্যের বাছবিচার নেই। স্বাদহীন ময়দার বিস্কুট থেকে কটু স্বাদযুক্ত যে কোন পদার্থ, সুগন্ধি এলাচ থেকে বিষাক্ত aconite এবং belladona সব কিছুরই এরা পরম ভক্ত। এরা নাকি টিন এবং দস্তার পাতও ছিদ্র করতে সক্ষম—এক কথায় এরা "লোহা ব্যতীত আর সব কিছুই ভক্ষণ করে।" (Iiams 32)

Houlbert এদের পুস্তক ধ্বংস করবার প্রক্রিয়ার বিবরণ দিতে গিয়ে বলেছেন যে স্ত্রী কীট বইয়ের মলাটের অথবা পাতার কিনারায় ডিম্ব প্রসব করে। পাঁচ ছ'দিনের ভিতর ডিম্ব লার্ভাতে রূপান্তরিত হয়। লার্ভা তখন সুড়ঙ্গ খনন ক'রে বইয়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ আরো অভ্যন্তরে অগ্রসর হতে থাকে। লার্ভা পিউপা (pupa) অথবা ক্রিস্যালিস (chrysalis) অবস্থায় রূপান্তরিত হয়ে নিষ্ক্রমণের রাস্তা খোঁজে। মঞ্চে সাজানো অবস্থায় শিরদাঁড়াই বইয়ের অনাবৃত অংশ। সে জন্য সাধারণতঃ শিরদাঁড়ার কাছেই লার্ভা দেহের থেকে আকারে একটু বড় একটি প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করে। এই প্রকোষ্ঠের ভিতর সিল্ক জাতীয় সুতোয় আবরণী প্রস্তুত করে তার মধ্যে লার্ভা পিউপা অথবা ক্রিস্যালিস অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। ১৫।২০ দিন পরে পূর্ণাঙ্গ কীট এই আবরণ ছিন্ন করে উড়ে বেরিয়ে যায়। সাধারণতঃ বাঁধানো বইয়ের শিরদাঁড়ায় অসংখ্য গোলাকার ছিদ্র এই সমস্ত কীটের নিষ্ক্রমণের পথ (Iiams 34)।

লার্ভা, পিউপা এবং পূর্ণাঙ্গ কীট দৈর্ঘ্যে ২ মিলিমিটারের বেশী নয়। শ্বেতবর্ণ লার্ভার দেহের গঠন বেলনাকার এবং বক্র। মুখোপাঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ। পূর্ণাঙ্গ কীটের দেহ পিঙ্গলবর্ণ।

গ্রন্থকীট খুব দ্রুত হারে বংশ বৃদ্ধি করতে সক্ষম। এক বৎসরের মধ্যেই কোন কীটের চার পুরুষের অস্তিত্ব খুব বিচিত্র ঘটনা নয়। প্রতি স্ত্রী

কীট গড়পড়তা ৬০ টি ডিম্ব প্রসব করে। Houlbert এর মতে এক বৎসরে এই একটি স্ত্রী কীট থেকে প্রায় ৮১০,০০০ টি কীটের উৎপত্তি হয়। (Iiams 34) এই হারে এদের সংখ্যা বৃদ্ধি হলেও কিন্তু সকল গ্রন্থকীট শেষ পর্যন্ত জীবিত থাকেনা। আকারে আরো ক্ষুদ্র এক প্রকার পরভুক (parasite) কীটের (*Entedon longiventris*, *Eulophus pilicornis* ইত্যাদি) আক্রমণে এরা ধ্বংস হয়। সুড়ঙ্গ খনন করবার সময় কয়েক প্রকার গ্রন্থ কীটের (*Neogastuallus librinocens*) দেহ থেকে জিলেটীন জাতীয় একপ্রকার পদার্থ নির্গত হয়। এর ফলে বইয়ের পৃষ্ঠাগুলি একত্রে জুড়ে ব্যবহারের অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। (ক্রমশঃ)

পল্লীর একটি গ্রন্থাগার

মোহিত রায়

'যে গ্রামাঞ্চলের শতাব্দীর ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর নাম কোথাও ছিল না, সেখানকার পড়তে জানা চাষী মহলে আজ এই আঞ্চলিক পাঠাগারটির মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের যাতায়াত সুরু হয়েছে।'—একথা সেদিন সগর্বে ঘোষণা করলেন নদীয়া জেলার নিভৃতগ্রাম বড় আন্দুলিয়ার লোক-সেবা-শিবিরের শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক আকবর আলি সাহেব। একথা শুনলে সত্যিই অবাক্ হয়ে যেতে হয়। দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক বিশিষ্ট গান্ধীবাদী এবং চারণ-কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় একদা এই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন। গত ১৯৫১ খৃষ্টাব্দে কবি বিজয়লালের দেওয়া একটি আলমারিতে খানকয়েক বই নিয়ে এই গ্রন্থাগারের শুভযাত্রা সুরু হয়। আজ এই গ্রন্থাগার সরকার অনুমোদিত 'আঞ্চলিক গ্রন্থাগার'রূপে মর্যাদা লাভ করেছে। নিজস্ব গৃহও নির্মিত হয়েছে; হয়েছে পাঠকক্ষও। আলমারির সংখ্যা বেড়েছে। এখন সভ্য-সভ্যা একশ'র ওপর, এছাড়া শিশুবিভাগে কিছু শিশু সভ্য-সভ্যা আছে। গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার। গ্রামের জনসাধারণের গ্রন্থ-পাঠ স্পৃহা পরিতৃপ্ত করে চলেছে এই গ্রন্থাগার। বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থ এখানে আছে, গঠনমূলক-গ্রন্থও বাদ যায়নি। নদীয়া জেলার এই বিস্তীর্ণ গ্রামাঞ্চলের পুনরুজ্জীবনে এই গ্রন্থাগারের অবদান অপরিসীম।

এই গ্রন্থাগারের উদ্যোগে মাঝে মাঝে লোক-উৎসব বা লোক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। গ্রামের বৈচিত্র্যহীন জীবনে এই সমস্ত অনুষ্ঠান আনে নতুন জীবনের স্পন্দন, আনে গ্রামের মানুষের গভীর একত্ববোধ ও পরস্পরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ।

এখানকার পরিবেশ খুবই সুন্দর। একান্তভাবে পল্লীকেন্দ্রিক এবং কাব্যিক। বিজয়লাল কবি, তাই তিনি পরিবেশও কাব্যময় করে তুলেছেন। সামনে দিগন্ত বিস্তৃত বিস্তীর্ণ ধুধু প্রান্তর—দূরে বহুদূরে যেয়ে মিশে গেছে দিগন্ত রেখা। এখানকার নিস্তব্ধ প্রকৃতি মনে গভীর রেখাপাত করে। গ্রন্থাগারের সুন্দর ফুলের বাগান সব সময়ই যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে, স্নিগ্ধ মধুর ফুলগুলি দীপ্তিতে সমুজ্জ্বল। এই আবহাওয়ায় কোন কৃত্রিমতা নেই, যথার্থ পল্লীসুরের রাগিনী এখানে অনুরণিত।

আমাদের দেশের শতকরা প্রায় আশিজন লোকই লেখাপড়া জানে না। এই নিরক্ষর মানুষেরা প্রায় সকলেই গ্রামে বাস করে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জাতীয় সরকার পল্লী-পুনর্গঠনে ব্রতী হয়েছেন। গ্রামাঞ্চলের অভাব অভিযোগ আর দুঃখের দিনের দ্রুত অবসান ঘটানো হচ্ছে। ব্যাপকভাবে রাস্তাঘাট তৈরী হচ্ছে, স্বাস্থ্যকেন্দ্র খোলা হচ্ছে, বিদ্যালয় হচ্ছে, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হচ্ছে। কিন্তু এই সমস্তই নির্ভর করে জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতার উপর। যেখানে গ্রামের মানুষ অগ্রণী হ'য়ে সরকারের সংগে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে নিজেদের উন্নতি করার জন্য এগিয়ে এসেছে—সেখানেই সরকার ও তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে, ব্যর্থতার বন্যায় প্লাবিত হয়নি, সরকারের পরিকল্পনা সেখানে জলে আল্পনা হয়ে ওঠেনি। নদীয়া জেলার বড় আন্দুলিয়া গ্রামের 'শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার' এই রকম এক সাফল্যমণ্ডিত কার্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

সরকারের সহযোগিতা না পেলে এমন সুন্দর গ্রন্থাগার গৃহ, পাঠকক্ষ, আলমারি, এত সংখ্যক গ্রন্থ হত না, তেমনি সরকার ও গ্রামবাসীর এমন সহযোগিতা না পেলে হয়ত এত টাকা সার্থকভাবে খরচ করতে পারতেন না।

এই গ্রন্থাগার গড়ার পিছনে আছেন কয়েকজন নিষ্ঠাবান কর্মী—যাঁদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এত দ্রুত উন্নতি সম্ভব হয়েছে। জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর পবিত্র মহান আদর্শ অনুসারে এখানে গ্রাম-পুনর্গঠনের কাজ চলেছে। আজ নিরক্ষর গ্রামবাসীদের জ্ঞানের আলোদান করবার জন্যে জ্ঞানের মশাল

আলিয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগার। বড় আন্দুলিয়া গ্রামে লোক-সেবা শিবিরের অঞ্চলের মধ্যেই শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের পাশেই স্থাপিত হয়েছে প্রাথমিক নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়, নার্শারী বিদ্যালয় এবং নিম্নতর বুনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়। এছাড়া বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, অডিও-ভিস্যুয়াল ইউনিট প্রভৃতি তো আছেই।

আজ বাংলা দেশের পল্লী-অঞ্চলের মানুষেরা যদি এইভাবে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করে পল্লী পুনর্গঠনে ব্রতী হন তবে মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হবে, হবে মানুষের পরম কল্যাণ।

নদীয়া জেলার বড় আন্দুলিয়া গ্রামের এই শ্রীরামকৃষ্ণ পাঠাগারের গত বার্ষিক উৎসবে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে সহযাত্রী হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আমিও ঐ উৎসবে যোগদান করেছিলাম এবং লোক-সেবা-শিবিরে ঐ দিন আনন্দের সঙ্গে কাটিয়ে ধন্য হয়েছি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে পুস্তক প্রকাশ

পৃথিবীর সমস্ত দেশের পুস্তক প্রকাশন সম্পর্কে ইউনেস্কো কিছুদিন আগে একখানা তথ্যমূলক বই প্রকাশ করেছে। এর হিসেব অনুসারে দেখা যায় যে পৃথিবীর সমস্ত দেশ মিলে যত বই ছেপে থাকে একা সোবিয়েত ইউনিয়ানই প্রকাশ করে তার পাঁচভাগের একভাগ।

১৯৫৬ সালে আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মাণী মিলে যত বই ছেপেছে একা সোবিয়েত ইউনিয়ানই ছেপেছে তার সমান। আর ১৯৫৯ সালে সোবিয়েত ইউনিয়ন ছেপেছে ৬৯০৭২ খানা (বিভিন্ন) বই যার মোট সংখ্যা হচ্ছে ১,১৬৮৭০০,০০০ কপি। উল্লেখিত দেশগুলির প্রকাশিত মোট বই-এর সংখ্যাকে অতিক্রম করে গেছে।

শাদা মাঠা হিসেব থেকেই দেখা যায় যে বর্তমানে সোবিয়েত ইউনিয়ান প্রতিদিন গড়পরতা ১৯০ খানা বিভিন্ন বিষয়ের বই প্রকাশ করেছে, আর একমাসে মোট বই ছাপা হচ্ছে ৯০ কোটিরও বেশি।

প্রাক বিপ্লব জার-শাসিত রুশিয়ায় যদি মোট জনসংখ্যার মাথা পিছু বছরে ০·৬ খানা বইও প্রকাশিত হয়ে থাকে তবে বর্তমানে মাথাপিছু প্রকাশের হার ৫·৫ খানা। সুতরাং সোবিয়েত আমলে মাথাপিছু বই প্রকাশের হার বেড়ে গেছে ন' গুণ আর মোট সংখ্যার দিক থেকে বেড়ে গেছে ১৩·৫ গুণ।

সোবিয়েতের মানুষ আজ বিশেষ করে আনন্দিত, কেননা প্রাক বিপ্লব যুগে যে সব ইউনিয়ন রিপাবলিকগুলো ছিল আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে অনগ্রসর পুস্তক প্রকাশের দিক থেকে আজ তারা শীর্ষস্থানে এসে পেঁাছেছে।

১৯১৩ সালের তুলনায় এই ধরণের কতগুলো ইউনিয়ানে কি হারে বই-এর প্রকাশ বেড়েছে তারই একটা তুলনামূলক হিসেব দেওয়া গেল ঃ—

আজারবাইজান রিপাবলিক	৭৪ গুণ
বেইলেরুশিয়ান রিপাবলিক	৮০ ”
আর্মেনিয়ান রিপাবলিক	৮৮ ”
উজবেক রিপাবলিক	১৮০ ”

১৯১৩ সালে কাজাক রিপাবলিক ছেপেছিল ১৩খানা বই, আর সে বইগুলোর মোট সংখ্যা ছাপা হয়েছিল চার হাজার কপি। আর সেখানে ১৯৫৯ সালে ছাপা হয়েছে ১৭৯৩ খানা বিভিন্ন বই যার মোট সংখ্যা হচ্ছে ১৫,৮০০,০০০ কপি।

সোবিয়েত ইউনিয়ন বর্তমানে ৮৪টি বিভিন্ন ভাষায় বই প্রকাশ করছে। এই ৮৪টি ভাষার ভিতরে ৪০টির প্রাক্‌সোবিয়েত যুগে কোনো লেখ্য ভাষা ছিল না।

বিদেশী ভাষা পড়ার দারুণ আগ্রহ জন্মাবার ফলে বিভিন্ন ভাষার অভিধান প্রকাশের কাজ ব্যাপকভাবে বেড়ে গেছে। দেশী ও বিদেশী অভিধানের সরকারী প্রকাশ প্রতিষ্ঠানই কেবল পঁচাত্তরটি ভাষায় বিভিন্ন ধরণের ৫৩০ খানা অভিধান প্রকাশ করেছে যার মোট বই সংখ্যা তিন কোটি ত্রিশলক্ষ। এর ভিতরে আছে দুখানা রুশ-বাংলা ও বাংলা-রুশ অভিধান।

সোবিয়েত পুস্তক প্রকাশনার বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক হল এই যে এখানে ব্যাপকভাবে ও বিপুল সংখ্যায় রুশ ও বিদেশী ক্লাসিক-সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বই প্রকাশিত হচ্ছে। সোবিয়েত পাঠকেরা তাদের প্রিয় বিজ্ঞানী বা সাহিত্যিকের এই সব বই নিজেদের ব্যবহারের জন্য সংগ্রহ করে রাখতে ভালোবাসে।

সোবিয়েত ইউনিয়নের মতো আর কোনো দেশই এমন বিপুল সংখ্যায় এত গ্রন্থাবলী প্রকাশ করে না। হালে যে বই প্রকাশিত হয়েছে তারই উদাহরণ

দিলে এ কথার যথার্থতা প্রমাণিত হবে। মহান রুশ সাহিত্যিক লিও.তলস্তয়ের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়েছে ২০ খণ্ডে। প্রত্যেকটি সংস্করণ ৫০০,০০০ কপির। আর মোট প্রকাশিত বই-এর সংখ্যা এক কোটি। রুশ ক্লাসিক আন্তন চেকভের গ্রন্থাবলী ছাপা হয়েছে আরো বেশী সংখ্যায়। বারো খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর গ্রন্থাবলীর প্রতিটি সংস্করণ ৬,০০০০০ কপি করে ছাপা হয়েছে। বিদেশী ক্লাসিক সাহিত্যও বিপুল সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে থাকে। উদাহরণ স্বরূপ, ৩০ খণ্ডে এমিল জোলার গ্রন্থাবলীর প্রতিটি খণ্ডের সংস্করণ ৩,০০০০০ কপি; বারো খণ্ডে প্রকাশিত মার্ক টোয়াইনের গ্রন্থাবলীর সংস্করণও অনুরূপ। আর আট খণ্ডে প্রকাশিত সেক্সপিয়ারের গ্রন্থাবলীর প্রতি খণ্ডের সংস্করণে ছাপা হয়েছে ২২৫,০০০ কপি করে। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী ছাপা হচ্ছে ৮ খণ্ডে, তার প্রত্যেক খণ্ডের সংস্করণ হচ্ছে ২,০০০০০ কপির।

বিদেশী সাহিত্য

বিদেশী সাহিত্যের প্রতি সোবিয়েৎ পাঠকদের প্রবল আগ্রহ। দিনে দিনে সে আগ্রহ বেড়েই চলেছে। একমাত্র ১৯৫৯ সালেই সোবিয়েত প্রকাশ ভবনগুলি ৪৮টি দেশের সমসাময়িক ও ক্লাসিক্যাল সাহিত্যিকদের ১৩২৪ খানা বিভিন্ন বই প্রকাশ করেছে যার মোট সংখ্যা হল আট কোটি দশ লক্ষ। পৃথিবীর আর কোন দেশে এরূপ বিপুল সংখ্যায় বিদেশী সাহিত্য প্রকাশিত হয় না।

কোন্ কোন্ বিদেশী সাহিত্য সোবিয়েত দেশে জনপ্রিয়? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া শক্ত। কারণ সোবিয়েত পাঠকেরা যা কিছু সৎ সাহিত্য যা কিছু প্রগতিশীল সাহিত্য তারই সম্পর্কে আগ্রহশীল, আর বিদেশী লেখকদের লেখার অনুরাগী। ১৯৫৯ সালে সোবিয়েত প্রকাশ ভবনগুলি যে, সব অনূদিত বিদেশী বই প্রকাশ করেছে তার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছে চীনা সাহিত্য—১৬৬ খানা বই। তারপর ফরাসী সাহিত্য ১৬১ খানা, জার্ম্মাণ ১২১ খানা, ব্রিটিশ ১১৪ খানা, আমেরিকান ৫৪ খানা, চেক ও স্লোভাক ৫৪ খানা, ভারতীয় সাহিত্য ৪৪ খানা।

সোবিয়েত সরকার দেশের ভিতরে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব চালিয়ে যাচ্ছে তা যে কী বিস্ময়কর ফলপ্রসূ হয়েছে উপরের ঐ হিসেব থেকেই তার সুদৃঢ় প্রমাণ মেলে।

[কলিকাতা সোভিয়েত ইনফরমেশন অফিসের সৌজন্যে প্রকাশিত]

পরিষদ কথা

কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের পঞ্চাশীতিতম জন্মবার্ষিকী

বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পথিকৃৎ কুমার মুনীন্দ্র দেব রায় মহাশয়ের পঞ্চাশীতিতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর অনুরাগী ও সহকর্মীরা পরিষদ কার্যালয়ে গত ৩১শে জুলাই এক অনুষ্ঠানে সমবেত হন। শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু সভাপতিত্ব করেন। শ্রীশচীন্দ্র নাথ রুদ্র, শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীপরিমল আচার্য ও শ্রীতিনকড়ি দত্ত ভাষণ দান করেন। কুমার মুনীন্দ্র দেবের নামে সহরের কোনও একটি রাস্তার নামকরণের জন্যে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জানিয়ে সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। অন্য একটি প্রস্তাবে তার রচনাবলী পুনর্মুদ্রণের জন্যে পরিষদকে অনুরোধ জানানো হয়।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব উপসমিতি

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের প্রস্তুতিকার্যের জন্যে পরিষদ কার্যনির্বাহক সমিতি ডক্টর নীহার রঞ্জন রায়ের সভাপতিত্বে একটি উপসমিতি গঠন করেছেন। সমিতির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়, শ্রীবিমল দত্ত, শ্রীকানন বিহারী মুখোপাধ্যায়, শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর আদিত্য ওহদেদার, শ্রীঅনিল দত্ত ও শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (আহ্বায়ক) আছেন। উৎসবের কর্মসূচী প্রণয়নে সকলের পরামর্শ ও সুপারিশ আহ্বান করা হয়েছে।

পরিষদের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ সমাপ্তি পরীক্ষার ফলাফল

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের গ্রীষ্মকালীন ও সপ্তাহান্তিক বিভাগদ্বয়ের সমাপ্তি পরীক্ষা গত ১৮ই আগষ্ট হতে সাতদিন যাবৎ একত্র অনুষ্ঠিত হয়। দুটি বিভাগে মোট ১৬৬ জন শিক্ষার্থী যোগদান করে-ছিলেন। বিগত বর্ষের ৩৫ জন শিক্ষার্থী সমেত এবৎসর ১৪৩ জন পরীক্ষায়

অবতীর্ণ হন, তম্মধ্যে নিম্নলিখিত ১০০ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে প্রথম নয় জন বিশেষ সম্মান সহ উত্তীর্ণ হয়েছেন ঃ

গুণানুসারে

৪০ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৭২ রবীন্দ্রনাথ গুঁই
২৪ চিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য
৩৫ অজয় কুমার চক্রবর্তী
৮৩ স্নেহাংশু কুমার মিত্র
৩০ রেণুকা ভট্টাচার্য
৬ পরিমলচন্দ্র বক্সী
৩১ সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য
৪৩ অণু চৌধুরী

রোল নম্বর অনুযায়ী

১ ছন্দা আচার্য
২ রিণা বাগচী
৩ সনৎ কুমার বাগচী
৫ ঝর্ণা বক্সী
৭ জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৯ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
১১ রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১২ সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৩ সুলেখা বন্দ্যোপাধ্যায়
১৪ সুনীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
১৫ অমিতাভ বসু
১৯ দেবীপ্রসাদ বসু চৌধুরী
২১ সুভাষ চন্দ্র ভড়
২৩ অজিত কুমার ভাওয়াল
২৫ দিলীপ কুমার ভট্টাচার্য
২৭ কমলেন্দু ভট্টাচার্য
২৮ মৃগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য
২৯ রেখা ভট্টাচার্য
৩৩ অসিত কুমার ব্রহ্ম
৩৪ অজিত কুমার চক্রবর্তী
৩৮ পথিক চক্রবর্তী
৩৯ প্রিয় রঞ্জন চক্রবর্তী
৪৪ আশা চৌধুরী
৪৫ যতীন্দ্রলাল চৌধুরী
৪৬ প্রদীপ কুমার চৌধুরী
৪৯ শেফালী দাস
৫০ ভবরঞ্জন দাশ চাকলাদার
৫২ চিনু দত্ত
৫৪ মাধবিকা দত্ত
৫৫ প্রীতিকুমার দত্ত
৬১ ইরা গাঙ্গুলী
৬৫ সুভাস চন্দ্র ঘোষ
৬৬ দীপ্তি ঘোষ দস্তিদার
৬৮ বিজনবিহারী গোস্বামী
৬৯ সুলেখা গোস্বামী
৭০ মঞ্জু গুহ
৭৩ জলি গুপ্ত
৭৫ গৌর মোহন হালদার
৭৬ শৈলেন্দ্র নাথ হালদার
৭৭ কুশ কুমার কর
৭৮ জয়কৃষ্ণ লস্কর
৮১ প্রণতি প্রকাশ মণ্ডল

৮৬　তরুণ কুমার মিত্র
৮৮　দীপালী মুখোপাধ্যায়
৯১　পরিমল কুমার মুখোপাধ্যায়
৯২　রজতকান্তি মুখোপাধ্যায়
৯৩　রঞ্জিত কুমার মুখোপাধ্যায়
৯৫　তেজোময় মুখোপাধ্যায়
৯৭　সুনীল কুমার নস্কর
৯৯　গৌরী নিয়োগী
১০০　সুমিত্রা নিয়োগী
১০২　বিনয় ভূষণ রায়
১০৫　সত্যব্রত রায়
১০৬　বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
১০৭　মঞ্জু রায়চৌধুরী
১০৮　অঞ্জলি রুদ্র
১১০　কৃষ্ণা সমাজদার
১১১　তুষারকান্তি সরকার
১১২　অপর্ণা সেন
১১৩　বিমল কান্তি সেন
১১৪　মনোরমা সেন
১১৮　গায়ত্রী সেনগুপ্ত
১২১　সুব্রতা সেনগুপ্ত
১২২　রবীন্দ্র প্রসাদ শা
১২৩　অরুণ কুমার শীল
১২৫　রাম প্রসাদ সিংহ
১২৬　শম্ভু নারায়ণ সিংহ
১২৭　মারু ভাদা সূর্যনারায়ণ
এন ১　অমলিন বন্দ্যোপাধ্যায়
এন ২　অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়
এন ৪　প্রদ্যোৎ কুমার বসু
এন ৫　রুমা বসু
এন ৬　গীতা ভদ্র
এন ৮　ফণিন্দ্র মোহন চক্রবর্ত্তী
এন ১০　শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী
এন ১১　চন্দনা চট্টোপাধ্যায়
এন ১৩　শেফালিকা চৌধুরী
(মিসেস রায়)
এন ১৪　অচিন্ত্য কুমার দেব
এন ১৬　অসীম কুমার ঘোষ
এন ১৭　সৌরেন্দ্র নাথ ঘোষ
এন ১৯　সুশীল কুমার গুপ্ত
এন ২১　জ্যোতিন্দ্রনাথ কুন্ডু
এন ২২　অমর কুমার লাহিড়ী
এন ২৩　ফণিভূষণ পুসিলাল
এন ২৪　যূথিকা রায়
এন ২৬　ভারতী রায় চৌধুরী
এন ২৯　অনিল বরণ সেন
এন ৩০　সুবোধ কুমার সেন
এন ৩৩　প্রমোদ রঞ্জন সেনগুপ্ত
এন ৩৪　যোগেন্দ্র পাল সিং
এন ৩৫　অমিতা ভট্টাচার্য

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

বয়েজ ওন লাইব্রেরীর বার্ষিক সাধারণ সভা ও উৎসব

গত ৭ই সেপ্টেম্বর স্টার থিয়েটারে বয়েজ ওন লাইব্রেরী ও ইয়ং মেনস ইনষ্টিটুটের ৫১তম বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিচারপতি শ্রীজ্যোতি প্রকাশ মিত্র সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন রেঞ্জার্স ক্লাবের সভাপতি ভিক্টর লেভি। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীঅনিল কুমার বসাক বিগত বর্ষের কার্যবিবরণী পাঠ করেন। তাতে গ্রন্থাগারের নানাবিধ কর্ম তৎপরতার পরিচয় পাওয়া যায়। অনুষ্ঠানে গ্রন্থাগারের সদস্যগণ শ্রীভানু চট্টোপাধ্যায় রচিত 'কানাগলি' নাটকটি অভিনয় করেন।

তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর নামে রাস্তার নামকরণ

কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান তালতলার নিয়োগী পুকুর লেনের নাম পরিবর্তন করে কলিকাতার প্রাচীন গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর নামে "তালতলা লাইব্রেরী রো' নামকরণ করেছেন বলে জানা গেল।

স্থানীয় নিয়োগী পরিবারের পুস্করিণীতে যাবার পথটি নিয়োগীপুকুর লেন নামে অভিহিত ছিল। উক্ত পুস্করিণীটি পৌর প্রতিষ্ঠান ক্রয় করে বুজিয়ে ফেলেন। এই অঞ্চলের শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক কর্মচাঞ্চল্যে তালতলা লাইব্রেরীর এক বিরাট অবদান আছে। ১৮৮২ সালে স্থাপিত এই লাইব্রেরীর সভাপতির পদে সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত ছিলেন। লাইব্রেরীর গ্রন্থসংখ্যা বিশ হাজারের অধিক। এই গ্রন্থাগারের শিশু বিভাগটি নানাবিধ কর্মতৎপরতার ফলে খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

নজরুল পাঠাগারের দশম বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬০ রবিবার ৬নং এন্টনি বাগান লেনে পাঠাগারের দশম বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গ্রন্থাগার আইনকে

অবিলম্বে কার্যকরী করার দাবী জানাইয়া এবং আসামের সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়। অপর এক প্রস্তাবে বিগত এক বৎসরে লোকান্তরিত স্বদেশ এবং বিদেশের কয়েকজন শিল্পী ও সাহিত্যিকের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় পরবর্তী বছরের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

চব্বিশ পরগণা

তারাগুণিয়া বীণাপাণি পাঠাগারে সাহিত্য সভা

গত ৯ই সেপ্টেম্বর বাদুড়িয়ার ব্লক ডেভলপমেণ্ট অফিসার শ্রীযুক্ত পরিমল গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে তারাগুণিয়া বীণাপাণি পাঠাগারের সাহিত্য সভার উদ্বোধন হয়। প্রথমে পাঠাগারের সহ সভাপতি শ্রীসুধীর কুমার মিত্র অভ্যাগত-গণকে স্বাগত সম্ভাষণ জ্ঞাপনের সঙ্গে অনুরূপ সভার আবশ্যকতা, তাৎপর্য্য এবং ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনে ইহার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরে শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ সুর "বাঙলা সাহিত্যে মধুসূদন" সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায়, মহাকবি মধুসূদনের কালজয়ী প্রতিভার বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তৃত, আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার রচনায় যে ভারতীয় ভাবধারাই প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা বিবৃত করেন। পরিশেষে সভাপতি মহাশয়ের একটী সময়োপযোগী ভাষণ দিবার পর সভার কার্য্য শেষ হয়। সভায় বাদুড়িয়ার সাব-রেজিষ্টার শ্রীআশীষ চট্টোপাধ্যায়, পুঁড়া হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীমন্মথনাথ বিশ্বাস, শ্রীপ্রমথনাথ নাগ চৌধুরী প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।

বেলগড়িয়া সুধা স্মৃতি পল্লী পাঠাগারে বিদ্যাসাগর জয়ন্তী

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বেলগড়িয়ায় সুধা স্মৃতি পল্লী পাঠাগারে এক সভার আয়োজন হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীগিরীন্দ্র নাথ বসু। প্রধান অতিথির পদ গ্রহণ করেন শ্রীরাজ কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। পাঠাগার প্রকাশিত 'ইছামতী' প্রাচীর পত্রের শারদীয় সংখ্যা অনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেন স্থানীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী রত্না বিশ্বাস। শ্রীশ্যামসুন্দর মিত্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের

উদ্দেশে লিখিত একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন। শ্রীসুনীল বিশ্বাস, শ্রীমতী রত্না বিশ্বাস, তমাল ঘোষ প্রভৃতি বিদ্যাসাগরে জীবনীর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন। সর্বশ্রী রণজিত বসু, ডলি আচার্য, শঙ্কর বসু প্রভৃতি সংগীতানুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

বর্ধমান

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারে শিল্প-শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রদর্শনী

সেপ্টেম্বরের ২৭শে থেকে পাঠাগারে নয়দিন ব্যাপী অষ্টম বার্ষিক শিল্প-শিক্ষা স্বাস্থ্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠানের খবর পাওয়া গেল। প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে শিক্ষামূলক প্রাচীর পত্র, দেশবিদেশের পত্রপত্রিকা ও কুটির শিল্প দ্রব্যের নিদর্শন প্রদর্শিত হয়। পাঠাগার পরিচালিত বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষক ও ছাত্রগণ কর্তৃক লোকনৃত্য অনুষ্ঠান সকলে উপভোগ ও প্রশংসা করেন।

বাঁকুড়া

মহেশপুর রামকৃষ্ণ পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা

রামকৃষ্ণ পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা গত জুন মাসে অনুষ্ঠিত হয়। বিগত বর্ষের কার্যবিবরণীতে জানা যায় যে জনসাধারণকে বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ দেওয়া হয়। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে সংগৃহীত দানের অর্থেই এর ব্যয় নির্বাহ হয়। সরকারের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাওয়া যায়নি। পাঠাগারের বয়স্ক শিক্ষা বিভাগে ৩০ জন শিক্ষালাভ করেছেন। কর্মীদের নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টা পাঠাগারটিকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। ডাঃ অর্ধেন্দু শেখর বসু, শ্রীপাঁচুগোপাল রক্ষিত ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিকের পদে নির্বাচিত হয়েছেন;

বীরভূম

জুবিলী গ্রন্থাগারের হীরক জয়ন্তী উৎসব

গত ২৫শে আগষ্ট রামরঞ্জন পৌর ভবনে জুবিলী গ্রন্থাগার ও রামরঞ্জন পৌরভবনের হীরক জয়ন্তী উৎসব সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব সভায় পৌরোহিত্য করেন জেলা সমাহর্তা শ্রী বি, মজুমদার। গ্রন্থাগারের

সম্পাদক শ্রীআনন্দগোপাল মিত্র জুবিলী গ্রন্থাগারের প্রতিষ্ঠা ও ক্রমোন্নতির এক সুন্দর বিবরণ দান প্রসঙ্গে সিউড়ীর জন জীবনের সঙ্গে এই গ্রন্থাগারের সম্পর্ক ও শহরের সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতায় গ্রন্থাগার যে ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে তা বিবৃত করেন। সভায় শ্রীকমলকৃষ্ণ রায় ও ডাঃ কালিগতি বন্দ্যোপাধ্যায় বক্তৃতা করেন।

লাভপুর অতুলশিব গ্রন্থাগারে সাহিত্যিক তারাশঙ্করের সম্বর্ধনা

গত ৩০শে আগষ্ট গ্রন্থাগারে সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যসভার সদস্যপদে মনোনীত হওয়ায় তাঁকে এক অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জানানো হয়। সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়; সভার শেষে তারাশঙ্করবাবু ঐ অঞ্চলের বিভিন্ন পাঠাগারের জন্য দুই শতটি পুস্তক দান করেন।

নদীয়া

জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের পঞ্চমবার্ষিক সাধারণ সভা

গত ৭ই জুলাই নদীয়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের ৫ম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদক প্রদত্ত কার্যবিবরণীতে প্রকাশ যে পরিষদের সদস্যসংখ্যা বর্তমানে ৩২৬। পুস্তক সংখ্যা এগারো হাজারের উপর। গত বৎসর ভ্রাম্যমাণ বিভাগের মাধ্যমে ২৩,০৭৩ খানি পুস্তক বিলি হয়েছে। বিগত বর্ষে ৭টি পল্লী গ্রন্থাগারের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে।

পরিষদের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনোৎসব

আগামী ১৯শে ডিসেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের এক পুনর্মিলনোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আহ্বায়ক, প্রস্তুতি সমিতির সহিত যোগাযোগ করুন।

সম্পাদকীয়

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও গ্রন্থাগা..

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া প্রকাশিত হয়েছে। আগের দুটির মত এতেও গ্রন্থাগার সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে কিছু বলা হয় নি, কিংবা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্যে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হবে তাও উল্লিখিত হয় নি। তবে ভিন্নসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনাধীনে শিক্ষার খাতে গ্রন্থাগার বিষয়ে সরকারী নীতির কিঞ্চিৎ আভাষ পাওয়া গেছে।

পূর্ববর্তী পরিকল্পনাকালে গ্র থাগার সম্পর্কে রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুসৃত নীতিই বজায় রাখা হবে বলে জানা গেছে। অর্থাৎ জেলা, আঞ্চলিক ও পল্লী গ্রন্থাগার ও গ্রন্থযানের সাহায্যে গ্রন্থ সরবরাহের ব্যবস্থা চালু রাখা হবে। সাধারণ পরিচালিত গ্রন্থাগারগুলিকে সরকারী অর্থ-সাহায্য যেমন দেওয়া হচ্ছে তেমনি দেওয়া হবে। মোট অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে কিনা তা জানা যায় নি। এছাড়া রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের প্রস্তুতিপর্ব সম্পূর্ণ ও তার কাজ পূর্ণোদ্যমে সুরু করা হবে। নতুনত্বের মধ্যে রাজ্যের ১২৫ টি মহকুমায় ও ৭৫০ টি গ্রামে একটি করে গ্রন্থাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রতি পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার যে গুরুত্ব দিচ্ছেন তার জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। এই প্রসঙ্গে ইতিমধ্যে প্রবর্তিত সরকারী ব্যবস্থার ভালমন্দ দিকগুলির পর্যালোচনা করা আমাদের একটা নৈতিক কর্তব্য বলে মনে করি।

আমরা প্রায়শঃই বলে থাকি যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্যে একটি স্থায়ী, সুনির্দিষ্ট ও সুচিহ্নিত অর্থাগমের পথ থাকা দরকার। মূলতঃ অস্থায়ী পরিকল্পনার অর্থে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চলেছে। যোজনাকাল শেষ হলে রাজ্য সরকারের আয় থেকে কি তার পূর্ণ ব্যয় নির্বাহ সম্ভব হবে? যোজনার অর্থ সংস্থান নিয়ে ইতিমধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে মনান্তর সুরু হয়ে গেছে। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ না হলে গ্রন্থাগার বাবদ বরাদ্দ অর্থই যে হ্রাস পাবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়। অনিশ্চিত ও অস্থায়ী আর্থিক বুনিয়াদ চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে থাকার সামিল নয় কি?

দেশের অধিকাংশ গ্রন্থাগারই এখন সাধারণের অর্থানুকুল্যে নির্ভরশীল। সরকারী অর্থ সাহায্য প্রথমতঃ সকলকে দেওয়া হয় না আর যাও বা দেওয়া হয় তাও অনিয়মিত ও অতি নগণ্য। তাছাড়া নীতির দিক থেকে দেখলে চাঁদায়

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

আশ্বিন ১৩৬৭

গ্রন্থবিদ্যা

গ্রন্থন

আদিত্য ওহদেদার

কাগজে যখন অক্ষর ও চিত্র ছাপার কাজ শেষ হল তখন বাকি রইল গ্রন্থন। গ্রন্থন না হলে গ্রন্থ কি করে হয়! বাঁধাই না হলে বই!

গ্রন্থন ব্যাপারে প্রাথমিক কাজ হল আভাঁজা ছাপা কাগজকে ভাঁজ ক'রে ক'রে বইয়ের পাতার মাপে এনে ফেলা। যদি ষোল পেজি ফর্মা হয় তাহলে আভাঁজা একটা ছাপা কাগজ ভাঁজ ক'রে ষোল পৃষ্ঠার একটা গোছা পাব। এইভাবে ফর্মা ভাঁজ ক'রে ফর্মাগুলি একটার উপর একটার সাজিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু এইভাবে সাজালে কী করে বুঝব যে বইয়ের পাতা ঠিক পর পর চলেছে? অর্থাৎ ফর্মা সাজাতে কোনো গন্ডগোল হচ্ছে কি না? যাতে কোনো অসুবিধা না হয় সেজন্যে প্রত্যেক ফর্মায় একটি ক'রে চিহ্ন মুদ্রিত করা হয় যে চিহ্ন দ্বারা জানা যাবে কোন্ ফর্মা আগে আসবে, কোন ফর্মা পরে। এই চিহ্ন সাধারণতঃ ১, ২, ৩ ইত্যাদি সংখ্যা কিংবা ক, খ, গ ইত্যাদি বর্ণ ধরা হয়, এবং ফর্মার প্রথম পৃষ্ঠার একেবারে নীচে বাঁ-ধারে মুদ্রিত করা হয়। যেমন, ষোল পৃষ্ঠার ফর্মা হলে, দ্বিতীয় ফর্মার প্রথম পৃষ্ঠায়, অর্থাৎ সতের পৃষ্ঠার নীচে ২ বা খ চিহ্ন মুদ্রিত থাকবে। এই চিহ্নকে ইংরেজিতে বলে সিগনেচার (Signature)।

এবার এই সাজানো ফর্মাগুলির গোছের ওপর বেশ করে চাপ দিতে হয় যাতে কাগজগুলোর ফাঁপা ভাব কেটে যায় এবং একটা ঘন সন্নিবিষ্ট রূপ ফুটে ওঠে।

তারপর সেলাইয়ের পালা। প্রত্যেকটি ফর্মার মাঝখান দিয়ে দু-তিনটে ফোঁড় দিয়ে সুতো বের ক'রে এনে পরের ফর্মাগুলোর ফোঁড়ের সুতোর সঙ্গে গিঁঠ দিয়ে দিতে হয়। একেই আমরা বলি 'জুস' সেলাই। জুস সেলাই

পড়লে বইয়ের পাতা স্বচ্ছন্দে খোলা যায়, যে-কোনো ভাবে বই খুলে জমিতে রাখলে পাতা গুলো শুয়ে থাকে—গুটিয়ে উঠে আসতে চায় না।

বইয়ের পেছন বা সেলাইয়ের ধারটাকে বলে 'স্পাইন' (Spine)। আমাদের দপ্তরীরা বলে 'পুট'। মোটা মোটা বই সেলাই করার পর স্পাইনকে গোল ক'রে দেওয়া হয়। গোল ক'রে দিলে বই বারবার নাড়াচাড়ায় তেমন জখম হয় না।

এবার বোর্ড লাগানোঃ বইয়ের পাতার মাপের চেয়ে বোর্ড একটু বড়ো ক'রে কাটা হয় যাতে বইয়ের তিন ধারে একটুখানি ক'রে বেরিয়ে থাকে। এই বারকরা কিনারা অনেকটা ছাউনির কাজ করে, তাছাড়া দেখতেও ভালো লাগে। বোর্ড লাগানো হয় এইভাবে—'পুট' বা বইয়ের পেছনে পাতলা কাগজ সেঁটে তারই কিনারা দুই দিক থেকে বার ক'রে বোর্ডে সেঁটে দেওয়া হয়; আবার এক শীট কাগজ বইয়ের আখ্যাপত্রের ওপর থেকে নিয়ে গিয়ে বোর্ডের সবটা জুড়ে সেঁটে দেওয়া হয়। এই কাগজকে বলে এণ্ড পেপার (End paper) এই রকমই বইয়ের অপর দিকে শেষ পৃষ্ঠার ওপর দিয়ে আর একটা 'এন্ড পেপার' নিয়ে গিয়ে পিছনের বোর্ডের সবটা সেঁটে দেওয়া হয়। এবার বোর্ডের ওপর ছাপা কাগজ বা রেক্সিন কিংবা চামড়া দিয়ে মুড়ে দিলে বই বাঁধাইয়ের কাজ শেষ হল। তবে রেক্সিন বা চামড়া দিয়ে মুড়লে তার পরেও একটা কাজ বাকি থাকে। সে কাজ হল লেটারিং (Lettering) অর্থাৎ সোনার জলে বা অন্য কোনো রঙে বইয়ের নাম ও লেখক উল্লেখ করা।

আমাদের দেশে নূতন প্রকাশিত বই যে-ভাবে বাঁধাই হয় তা খুবই দুর্বল এবং অমজবুত। দু চার জনের হাতে বই ফিরলেই দেখা যায় বইয়ের মলাট ছিঁড়ে গেছে। মলাট সাধারণতঃ ছেঁড়ে 'পুট' ও বোর্ডের সংযোগস্থল থেকে—ইংরেজিতে থাকে বলে ফ্রেঞ্চ জয়েন্ট (French joint)। কাগজ দিয়ে মলাট জোড়া হয় বলে দু চার বার ভাঁজ পড়লেই ফেঞ্চ জয়েন্ট ছিঁড়ে যায়, বোর্ড আলাদা হয়ে আসে। আমাদের বইয়ের মলাট সুদৃশ্য হবার আগে সুদৃঢ় হওয়া চাই। মলাটকে, সুদৃঢ় করতে গেলে বইয়ের পুট ও মলাটের বোর্ড কাপড়, চামড়া বা অন্যান্য শক্ত আবরণ দিয়ে জুড়তে হবে। আমাদের প্রকাশকদের এ সম্বন্ধে অবহিত হওয়া উচিত।

ভালো বাঁধাই বইয়ের পাতা গাঁথা হয় জুস সেলাই দ্বারা। কিন্তু মলাট সুদৃঢ় ও টেঁকসই করবার জন্যে অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন জিনিসের সাহায্য নেওয়া হয়। তবে মলাটের ওপর কাগজ মোড়া কখনই উচিত নয়।

মলাট মুড়বার উপকরণ

মলাট মুড়বার উপকরণ প্রধানত দুই প্রকার—কাপড় ও চামড়া। আজকাল কাপড়ই হল মলাট মুড়বার প্রধান উপকরণ—বিদেশী বই প্রায় সবই কাপড়ে বাঁধাই হচ্ছে।

সবচেয়ে ভালো ও মজবুত কাপড় হল বাক্‌রাম (Buckram)। লিনেন (Linen) অথবা সুতোর কাপড়ে আঠা দিয়ে তৈরি হয়।

আজকাল যাকে রেক্সিন বলা হচ্ছে, সে-ও প্রায় অনুরূপ বস্তু। কাপড় ও রবার কিংবা প্লাস্টিক (Plastic) দিয়ে তৈরি।

চামড়া ব্যবহার করা উচিত সেই সব বইতে যে-সব বই খুব বড় ও মোটা এবং প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। বই যদি তেমন ব্যবহৃত না হয়, তাহলে তাতে চামড়া লাগানো উচিত নয়, কারণ তাতে চামড়া শীঘ্রই কীটদষ্ট হয়।

আজকাল বই বাঁধাবার কাজে সাধারণত দু রকমের চামড়ার খুব চল। শূকরের চামড়া ও ছাগলের চামড়া। শূকরের চামড়া খুব বড় ও মোটা বইয়ের পক্ষে উপযোগী। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে সেই বই যেন খুব ব্যবহৃত হয়, নইলে দেখা গেছে যে মাত্র বছর কুড়ি পরেই এই বইয়ের বাঁধাই নষ্ট হয়ে যায়।

ছাগলের চামড়াকে সাধারণত মরোক্কো (Morocco) বলা হয়। এই নামকরণের কারণ আফ্রিকার মরোক্কো দেশ থেকেই খ্রীষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এই চামড়া ইয়োরোপে যায়। ছাগলের চামড়া ঠিকভাবে প্রস্তুত ক'রে নিলে সেই চামড়া বই বাঁধাইয়ের পক্ষে পরম উপযোগী হয়ে ওঠে। তবে অপেক্ষাকৃত ছোট বইয়ের পক্ষেই এর চল বেশি। এই চামড়ায় বই বাঁধালে দেখতে বেশ মসৃণ হয় এবং সোনার জলে লেখার কাজ খুব ভালো হয়।

শূকর ও ছাগলের চামড়া ছাড়াও অন্যান্য চামড়া দিয়ে বই বাঁধানো হয়। তবে সে-বাঁধাইয়ের চলন তেমন নেই। ব্যক্তিগত সংগ্রহের বই ব্যক্তিগত রুচি অনুযায়ী যে-কোনো চামড়া দিয়ে বাঁধানো যেতে পারে। এমন কি মানুষের চামড়াও বাদ যায় না। যেমন, আমেরিকার বোষ্টন অ্যাথেনিয়ম (Boston Athaeneum) গ্রন্থাগারে মানুষের চামড়া দিয়ে বাঁধানো একখানি বই আছে। যে ব্যক্তি এই বই গ্রন্থাগারে দান করেছিলেন তাঁর উইলে বিশেষ ভাবে লেখা ছিল যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দেহের চামড়া দিয়ে যেন ঐ বই বাঁধানো হয়!

অন্যান্য চামড়ার গুণাগুণ এইরূপ ঃ

ভেড়ার চামড়া সস্তা কিন্তু খুব পলকা। গ্রন্থাগারের বই এ চামড়ায় বাঁধানো উচিত নয়।

বাছুরের চামড়া দেখতে ছাগলের চামড়ার মতো। যদিও এমনিতে শক্ত, কিন্তু বেশিদিন টেঁকসই হয় না। খুব মসৃণ বলে এ চামড়ার একদা খুব প্রসার ছিল। কিন্তু গ্রন্থাগারের বইয়ের পক্ষে এ চামড়া উপযোগী নয়।

সীল মাছের চামড়া (যে সীল মাছ গ্রীণলাণ্ড দ্বীপের কাছে পাওয়া যায়) খুব মজবুত। এ চামড়া তৈলাক্ত ব'লে খুব নমনীয় এবং টেঁকসই হয়। কিন্তু খুব দামী ব'লে গ্রন্থাগারের বই বাঁধানো সাধ্যে কুলোয় না।

ক্যাঙগারুর চামড়া বই বাঁধাবার কাজে আজকাল বেশ ব্যবহৃত হচ্ছে।

সাপের চামড়া, গিরগিটি ও কুমীরের চামড়া ব্যক্তিগত বই বাঁধাবার জন্যে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়।

বইয়ের মলাট যে সবটাই চামড়া দিয়ে মুড়তে হবে এমন কোনো কথা নেই। মলাটের খানিকটা অংশ মুড়লেও চলে।

যে-বাঁধাইয়ে বইয়ের 'পুট' ও মলাটের চারটে কোন্ চামড়ায় মোড়া হয় তাকে অর্দ্ধেক চামড়ার বাঁধাই (½ Leather) বলে।

যে-বাঁধাইয়ে কেবলমাত্র 'পুট'ই চামড়ায় মোড়া হয় তাকে সোয়া চামড়ার (¼ Leather) বাঁধাই বলে।

যদি চামড়ার স্থানে কাপড় ব্যবহার করা হয় তাহলে অর্দ্ধেক কাপড় ও সোয়া কাপড়ের বাঁধাই বলব।

কী ধরণের বই কী-ভাবে বাঁধানো উচিত তার একটা নির্দেশ দেওয়া গেল ঃ

(১) যে সব বই কোষগ্রন্থ (reference books) এবং খুব ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে যারা আকারে খুব বড় তাদের বাঁধানো উচিত অর্ধেক চামড়ায় ও বাকিটা বাক্‌রাম অথবা ভালো কাপড়ে। আকার বড় না হলে সোয়া চামড়া ও বাকিটা বাক্‌রাম।

(২) মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয় এমন কোষ গ্রন্থের মধ্যে যারা আকারে বড় তাদের জন্যে শুধু বাক্‌রামই ভালো। আকারে বড় না হলে, ভালো কাপড় দেওয়া উচিত।

(৩) যে সব কোষগ্রন্থ প্রায় মোটেই ব্যবহৃত হয় না, তাদের বাঁধাই কাপড়ের হওয়া উচিত।

(৪) পত্র-পত্রিকা যদি বড় আকারের হয় তাহলে বাক্‌রাম, আর যদি আকারে তেমন বড় না হয় তাহলে ভালো কাপড় দেওয়া উচিত।

(৫) সংবাদপত্র যদি আড়াই ইঞ্চির কম মোটাভাবে বাঁধাতে হয়, তাহলে শুধু বাক্‌রাম ব্যবহার করা ভালো। যদি আড়াই ইঞ্চির বেশি মোটা হয় তাহলে অর্ধেক চামড়ার বাঁধাই ভালো।

(৬) পুস্তিকা বা চটি বই (Pamphlets) বাঁধানো উচিত সোয়া কাপড় ও বোর্ডে মজবুত কাগজ মুড়ে।

(৭) গ্রন্থাগারের যে সব বই বাড়িতে পড়বার জন্যে যায় তাদের মধ্যে যেগুলি প্রবন্ধ জাতীয় বই তাদের বাঁধানো উচিত ভালো কাপড় দিয়ে। উপন্যাস জাতীয় বই সাধারণ কাপড় দিয়ে। কিংবা অর্ধেক কাপড়ের বাঁধাইও চলতে পারে।

মেরামতি কাজ

বই পুরনো হলে জখম হয় নানা ভাবে। বইয়ের পাতা ছিঁড়ে যায়, ফেটে যায়, ভাঁজ করা ম্যাপ বা অন্যান্য চিত্রের ভাঁজ ফেটে যায়। খুব পুরনো হলে পাতা প্রায় মুড়মুড়ে হয়ে আসে। এ রকম বাঁধাতে হলে আগে পাতাগুলি সব দেখেশুনে মেরামত ক'রে নিতে হয়। ভাঁজ ফেটে গেলে পাতাকে মেরামত করার উপায় হল পাতার পেছনে পাতলা, নমনীয় টিস্যু কাগজ অথবা লিনেন কাপড় দিয়ে জোড়া।

যদি গোটা পাতা ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে তাহলে তার যে দিকটা বাইরের পুটের দিকে থাকবে সেদিকে কাগজ জুড়ে পরের পাতার সঙ্গে লাগিয়ে ভাঁজ ক'রে সেলাই করতে হয়।

কাগজ যখন মুড়মুড়ে (brittle) হয়ে যায় তখন তাকে স্বচ্ছ টিস্যু কাগজ বা স্বচ্ছ সিল্কের কাপড় দিয়ে জুড়তে হয়। মূল্যবান পুরনো বই বা দলিল যতই জখম হোক, তাকে ব্যবহারের মতো বাঁচিয়ে রাখতেই হবে, কারণ হাজার নকল থাকলেও আসলের একটা মূল্য আলাদা। সুতরাং পুরনো ফাটা কাগজকে কীভাবে সহজে ও উন্নত ধরণে মেরামত করা যায় সে বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলছে।

গ্রন্থনের পর বই ব্যবহার-যোগ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু বই যাতে বহুদিন অক্ষত অবস্থায় ব্যবহার-যোগ্য থাকে তার ব্যবস্থা জানা উচিত। গ্রন্থবিদ্যার এই দিকটাকে বলা হয় সংরক্ষণা (Preservation)। পুস্তক সংরক্ষণার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন ঃ

(১) আর্দ্রতা। স্যাঁতসেঁতে স্থানে বই রাখা উচিত নয়। আর্দ্রতা বইয়ের কাগজ, বাঁধাই ও মলাট নষ্ট করে। কাগজে যে সব খনিজ দ্রব্য মিশে থাকে তা আর্দ্রতায় অম্লজান-জারিত (Oxidise) করে, যার ফলে কাগজে বাদামি রঙ ধরে। অবশ্য কলে প্রস্তুত কাগজেই আর্দ্রতা খুব শীঘ্র নিজের অধিকার বিস্তার করে; কিন্তু খুব দামী হাতে-তৈরী কাগজও আর্দ্রতায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া থেকে বাদ পড়ে না, তবে সময় লাগে, এই যা। এই কাগজ সাইজিং (Sizing) করার সময় যে আঠা ব্যবহার করা হয় সেই আঠাকে আর্দ্রতা নষ্ট করে, যার ফলে ধুলো ময়লা সহজেই কাগজের গায়ে জমতে পায়।

আর্দ্রতা বাঁধাইয়ের শক্তিকে জখম করে, কারণ বাঁধাইয়ের সময় যে আঠা ব্যবহার করা হয়, তা আর্দ্রতার স্পর্শে এসে নরম হয়ে যায় এবং তাতে বাঁধাইয়ের শক্তি কমে যায়।

চামড়ার বাঁধাই হলে, চামড়ার ওপর স্যাঁতসেতে জায়গায় সহজেই ছাতা পড়ে, ফলে চামড়া জখম হয় এবং খানিক ব্যবহারে নষ্ট হয়ে যায়।

(২) উত্তাপ। উত্তাপ-ও বইয়ের খুব ক্ষতি করে। খুব গরম শুকনো হাওয়া বইয়ের পক্ষে প্রায় আর্দ্রতারই মতো অপকারী।

কাগজের মধ্যে যে জলীয় অংশটুকু থাকে উত্তাপ তা শুষে নেয়, ফলে কাগজ মড়মড়ে ও ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।

বেশি উত্তাপের ফলে বইয়ের পাতার সাদা ভাব চলে যায়, বিশেষ ক'রে পাতার কাগজ যদি দামী না হয়।

বইয়ের পাতার চাইতে বইয়ের বাঁধাইয়ের ওপর উত্তাপের অপকারিতা বেশি দেখা যায়। আঠা এবং মলাটের আবরণ—বিশেষত, সে আবরণ যদি চামড়ার হয়—খুব শক্ত ও শুষ্ক হয়ে পড়ে, ফলে যদি তেমন যত্ন না নিয়ে বই খোলা যায়, মলাট ফেটে যেতে পারে, এমন কি ভেঙে যেতেও পারে। খুব গরম জায়গায় বই রাখলে বইয়ের মলাট দুমড়ে যায়।

(৩) আলো। আলো, বিশেষ ক'রে রোদ বইকে বেশ জখম করে। বেগুনি পারের রশ্মি (ultra-violet rays) লাগলে কাগজ ক্ষয়ে যায় এবং মলিন হয়। এবং গ্রন্থনের বাঁধন আলগা হয়ে যায়।

(৪) ধোঁয়া ও গ্যাস। ধোঁয়া ও গ্যাস হল বইয়ের সব চাইতে অপকারী পরিবেশ। ধোঁয়া ও গ্যাসে শীকরবিন্দু রূপে যে গন্ধকাম্ল (Sulphuric acid) থাকে তা কাগজ ও মলাটের চামড়া বা কাপড়কে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে।

(৫) ধুলো। ধুলোর মধ্যেও অল্প পরিমাণ অ্যাসিড থাকে, তবে ধুলোর অপকারিতা চট্ করেই নজরে পড়ে যেহেতু ধুলো লাগলেই বইয়ের পাতা, ছবি ও মলাট ময়লা হয় এবং সে ময়লা সহজে দূর করা যায় না। এইজন্যে বইতে ধুলো যাতে না জমে, তার ব্যবস্থা করা উচিত। একটা ব্যবস্থা হল বই প্রত্যহ ঝাড়া ও পরিস্কার করা।

(৬) বই সাজানো। বইয়ের আয়ু ও পরিচ্ছন্নতা অনেকটা নির্ভর ক'রে বই সাজানো ও নাড়াচাড়া করার উপর। অযত্নে নাড়াচাড়া করলে বই তাড়াতাড়ি নষ্ট হবে। আলমারির খুব ঠাসাঠাসি কিম্বা খুব ছাড়াছাড়ি ভাবে বই সাজানো বইয়ের পক্ষে ক্ষতিকর।

খুব ঠাসাঠাসি ভাবে বই সাজানো থাকলে বই পাড়বার সময় 'পুটের' ওপর ধরে ধানতে হয়, এবং এইভাবে দু চারবার টানলেই পুট ছিঁড়ে যায়। তাছাড়া, এই ঠাসাঠাসির ভেতর থেকে বই টেনে আনতে ও তার মধ্যে বই ঢোকাতে গেলে পার্শ্বস্থিত বইয়ের মলাটের সংগে যথেষ্ট ঘর্ষণ লাগে, এবং মলাটের ক্ষতি করে। অনেক ক্ষেত্রে অত্যধিক চাপের ফলে বইয়ের পুট ফুলে ওঠে কিম্বা চুপসে যায়।

খুব ছাড়াছাড়ি ভাবে বই সাজানো থাকলে বইয়ের পাতা আল্‌গা হয়ে খানিক খুলে যায়, এবং বইয়ের ভেতর ধুলো ধোঁয়া ইত্যাদি ঢুকবার পথ পায়। তাছাড়া, পাতার ভারে বই বেসামাল হয়ে পড়ে এবং মলাট ও পাতা দুমড়ে মুচড়ে যায়।

সুতরাং আলমারিতে বই এমন ভাবে সাজানো উচিত যাতে বই খুব ঠাসাঠাসি কিংবা খুব ছাড়াছাড়ি ভাবে না থাকে।

(৭) মলাটের রঙ। অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখা গেছে যে বইয়ের মলাট যদি কালো, ঘন সবুজ, কিম্বা কালোটে কোনো রঙের হয় তাহলে তেলাপোকা ও অন্যান্য আরও পোকা মলাট কাটতে আকর্ষিত হয়। কিন্তু লাল রঙে তাদের কোনোই আকর্ষণ নেই!

গরম কাপড়-চোপড় পোকায় যাতে না কাটে সেজন্যে যেমন ন্যাপ্‌থেলিন গুলি ব্যবহার করি, সেই রকম বইকেও যাতে শীঘ্র পোকায় না কাটে তার জন্যে বইয়ের মাঝে মাঝে আলমারিতে ন্যাপথেলিনের বড় বড় খণ্ড রাখা উচিত। পোকার হাত থেকে বই বাঁচাবার এ একটা ভালো উপায়।

জলধর সেনের জন্ম-শতবার্ষিকী

মোহিত রায়

'বাংলা সাহিত্যের জন্যে আমি কি করেছি ?……আমি কিছুই করিনি। শুধু আপনাদের সেবা করেছি ।……'

সপ্ততিতম জন্মদিবসের অভিনন্দনে জলধর সেনের এই প্রতিভাষণ গভীর বিনয়েরই প্রতিভাস। বঙ্গভারতীর একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন জলধর সেন। জীবনের উপান্তে এসে 'আমি কিছুই করিনি' বললেও সুদীর্ঘ প্রায় ষাট বৎসর বাণীর সাধনায় মগ্ন ছিলেন। সমগ্র সাহিত্য-জীবনে তিনি সংখ্যাতীত ছোট গল্প, কুড়িখানি উপন্যাস, দশখানি ভ্রমণকাহিনী, একাধিক জীবনী এবং অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর কলম থেকে শিশুপাঠ্য গ্রন্থও সৃজিত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে জলধর সেন ভ্রমণ-সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবেই খ্যাত। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'সাহিত্যতীর্থ-পথিক' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। জলধর সেনই সর্বপ্রথম ভ্রমণকাহিনী আস্বাদবহ এবং সুখপাঠ্য করে তোলেন। তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীই সর্বপ্রথম সাহিত্যের মূল্য পায়, সাহিত্যের মর্যাদা পায়।

গ্রন্থাকারে তাঁর প্রথম ভ্রমণ-গ্রন্থের নাম 'প্রবাসচিত্র'। ১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১৫ই বৈশাখ এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। তাঁর দশখানি ভ্রমণ-গ্রন্থ হল: প্রবাস-চিত্র, হিমালয়, পথিক, হিমাচল-বক্ষে, হিমাদ্রি, দশদিন, দক্ষিণাপথ, মধ্যভারত, মুসাফির-মঞ্জিল। এছাড়া, তাঁর 'পুরাতন-পঞ্জিকা' গ্রন্থে কয়েকটি অধ্যায়ে ভ্রমণ-কাহিনী লেখা আছে। বর্ধমানাধিপতির দেশ ভ্রমণের স্মৃতি অনুযায়ী জলধর সেন 'আমার য়ুরোপ ভ্রমণ' গ্রন্থ রচনা করেন।

জলধর সেনের প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা কুড়ি। মাত্র পনের বৎসর বয়সে তিনি 'দুঃখিনী' নামে একখানি মনোজ্ঞ উপন্যাস রচনা করেন। এই উপন্যাসখানি প্রকাশিত হয় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে। 'বড়বাড়ী' উপন্যাসও তাঁর কৈশোরকালের রচনা। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলি হল: বিশুদাদা, করিম সেখ, অভাগী (তিন খণ্ডে বিভক্ত), হরিশ ভাণ্ডারী, ঈশাণী, পাগল, চোখের জল, ষোল আনি, সোনার বালা, দানপত্র, পরশ-পাথর, ভবিতব্য, তিন পুরুষ এবং উৎস। এছাড়া উর্দু 'চাহার দরবেশ' ও ইংরেজী 'আল্যান কোয়াটারমেন' উপন্যাস বাংলায় অনূদিত করেন।

তিনি প্রচুর গল্প লিখে গেছেন। তাঁর গল্পগ্রন্থগুলি হল : ছোট কাকী, নূতন গিন্নী, আমার বর, পরাণ মণ্ডল, আশীর্বাদ, এক পেয়ালা চা, কাঙালের ঠাকুর, মায়ের নাম এবং বড় মানুষ।

জলধর সেন দুখণ্ডে তাঁর শিক্ষক কাঙাল হরিনাথের জীবনী রচনা করেন।

তাঁর কতকগুলি প্রবন্ধ একত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

তাঁর রচিত শিশুপাঠ্য গ্রন্থগুলি হল : কিশোর (গল্প), মায়ের পূজা (গল্প), শিব সীমন্তিনী (গল্প), আফ্রিকায় সিংহ শিকার, আইসক্রীম-সন্দেশ প্রভৃতি। শিশুবোধ, প্রথম শিক্ষা, নবীন ইতিহাস, বঙ্গগৌরব প্রভৃতি কয়েকখানি বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রন্থও রচনা করেন।

জলধর সেন অর্ধ-শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা। এছাড়া, তাঁর অপ্রকাশিত বহু রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। এই অপ্রকাশিত রচনার মধ্যে প্রবন্ধই বেশী।

এ বছর জলধর সেনের জন্ম শতবর্ষ অতিক্রম করল। এই উপলক্ষে তাঁর যাবতীয় প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত বিভিন্ন ধরণের রচনাবলীর একটি সুনির্বাচিত সংকলন প্রকাশ হওয়া উচিত।

কীট পতঙ্গ ও গ্রন্থাগার সংরক্ষণ

অরুণকান্তি দাশগুপ্ত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

২ (খ) **উইপোকা** (**Termites**), বর্গ : *Isoptera*

ইংরাজীতে উইপোকা "white ants" নামে পরিচিত হলেও এরা পিপীলিকা (বর্গ *Hymenoptera*) শ্রেণীভুক্ত নয়। উইপোকা কেবলমাত্র পিপীলিকার মত দলবন্ধ ভাবে বাস করে। কয়েকটি বিভিন্ন গোত্র এবং গণভুক্ত প্রায় ১,৫০০টি প্রজাতি নিয়ে Isoptera বর্গ গঠিত (Metcalf 853) ; মতান্তরে প্রজাতির সংখ্যা ১,৮৬১ (Plumbe 2,294)। মাদ্রাজে বসবাসকালে J. G. Koenig (?—1785) এই কীট সম্বন্ধে প্রথম অনুসন্ধান করেছিলেন।

পৃথিবীতে উইপোকার আবির্ভাব প্রায় ২০ কোটি বৎসর পূর্বে, পক্ষান্তরে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব এক কোটি বৎসরেরও বেশী নয়। উইপোকার আদিম বাসভূমি আফ্রিকা মহাদেশে, কিন্তু বর্তমানে পৃথিবীর সমগ্র উষ্ণমণ্ডলে এর পরিব্যাপ্তি। এদের বাঁচার জন্য ২০ থেকে ৩৬ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা প্রয়োজন (Latimer)।

বাসস্থান অনুসারে উইপোকাকে দুভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ—

(১) মাটীর নীচে বসবাসকারী উইপোকা (earth-dwelling অথবা sub-terranean termites)।

(২) কাঠের ভিতর বসবাসকারী উইপোকা (wood-dwelling termites)।

মৃত্তিকাবাসী উইপোকা আর্দ্রতা পছন্দ করে। সেজন্য এরা আর্দ্র নরম মাটীর নীচে বাসস্থান নির্মাণ করে। এদের দুটি মুখ্য গোত্র হল *Rhino-termitidae* এবং *Termitidae*। সেলুলোজ সমন্বিত কাগজপত্র, কাঠ প্রভৃতি এরা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে দেয়। কাঠের ভিতর বসবাসকারী উই পোকাদের বাসস্থানের পক্ষে অনুকূল হল শুষ্ক আবহাওয়া। এরা একখানি শুষ্ক কাষ্ঠ খণ্ডের মধ্যেই সমগ্র জীবনচক্র অতিবাহিত করে দিতে পারে। সাধারণতঃ গৃহ নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত কাঠ এদের আক্রমণের লক্ষ্য—গ্রন্থাগারের বইপত্র ধ্বংস করা গৌণ কর্ম।

উই সমাজবদ্ধ কীট। S. H. Skaife তাঁর *Dwellers in darkness* গ্রন্থে বলেছেন যে উইপোকা "একটি সুসংহত সমাজব্যবস্থার উদ্ভাবন করেছে। সেখানে ব্যক্তি বিশেষের কোন অধিকার নেই, সমষ্টির মঙ্গলের জন্যই সমগ্র কার্যক্রম পরিচালিত হয়···অন্যান্য সমাজবদ্ধ কীটের ন্যায় উইপোকা নির্মম টোটালিটেরিয়ান" (Plumbe 2,294)।

পাঁচটি "শ্রেণী" (caste) নিয়ে উই পোকার সমাজ গঠিত (Comstock 275—277) ঃ

(১-৩) প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের জননক্ষম শ্রেণী (first, second, and third reproductive caste)।

(৪) কর্মী শ্রেণী (workers)

(৫) সৈন্য অথবা রক্ষী শ্রেণী (soldiers)

(১) **প্রথম জননক্ষম শ্রেণী ঃ** উই পোকার রাজতন্ত্রী সমাজব্যবস্থার শীর্ষে হল রাজা এবং রাণী। রাজা এবং রাণী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শাসক নয়। পূর্ণ যৌন ক্ষমতা সম্পন্ন এই রাজ দম্পতী হ'ল প্রকৃত পক্ষে এক একটি উই উপনিবেশের (termite colony) সমগ্র অধিবাসীর জন্মদাতা। একটি উপনিবেশে এক জোড়ার অধিক জননক্ষম শ্রেণীর উই পোকার অস্তিত্ব সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয় না। এই রাজ দম্পতীই কেবলমাত্র নিজেদের মত জননক্ষম শ্রেণী সহ উপরোক্ত সকল শ্রেণীর উই পোকার জন্মদান করতে পারে। স্বচ্ছ এবং চারিটি সম আকারের দীর্ঘ পক্ষ সমন্বিত এই শ্রেণীর (*macropterous*) উই পোকার ত্বক কৃষ্ণবর্ণের। এদের পুঞ্জাক্ষি আছে।

গ্রীষ্মের অবসানে এবং বর্ষার প্রাক্কালে পূর্ণ জননক্ষম অসংখ্য পুরুষ এবং স্ত্রী উই পোকা ঝাঁকে ঝাঁকে তাদের অন্ধকার আবাসস্থল পরিত্যাগ করে উজ্জ্বল আলোকে উড়ে বেরিয়ে আসে। এদের পক্ষপেশী খুব সবল নয়। সেজন্য অল্প সময়ের মধ্যে এরা ভূপাতিত হয়। তখন পক্ষচ্ছেদিত হয়ে এদের উড্ডয়নের পালা শেষ হয়। Latimer এই দৃশ্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেছেন ঃ ' মহীশূর রাজ্য সীমান্তের মহারণ্যে অদৃশ্য উৎস হতে প্রবলবেগে উৎক্ষিপ্ত স্ফীত জলধারার মত এই উড্ডয়ন আমি দেখেছি। তারপরই সুরু হয় কীটপতঙ্গ, পক্ষী এবং জীবজন্তুদের আক্রমণ ও ভোজনোৎসব।" (Latimer)।

যে সমস্ত উইপোকা এই আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় তারা নতুন বাসস্থানের সন্ধান করে। সাধারণতঃ এক এক জোড়া পুরুষ এবং স্ত্রী উইপোকা একত্রিত হয়ে নতুন এক একটি উপনিবেশের পত্তন করে। এরাই এই উপনিবেশের রাজা এবং রাণী। উই রাজদম্পতীর সম্পর্ক আমৃত্যুকাল।

রাণী উইপোকার ডিম্বধারণ ক্ষমতা বিস্ময়কর। এক একটি উপনিবেশে কত দ্রুত উইপোকার বংশ বিস্তার হয় নিম্নের উদাহরণ থেকে তার খানিকটা আভাস পাওয়া যাবে ঃ

উইপোকা বিশেষজ্ঞ Alfred E. Emersonএর মতে কোন কোন স্ত্রী উইপোকা তাদের ১৫ থেকে ৫০ বৎসর পর্যন্ত জীবনকালের দৈনিক ৬০০০ থেকে ৭,০০০ ডিম্ব প্রসব করে। Korl Escherich পূর্বআফ্রিকার চারিটি বিভিন্ন স্ত্রী উইয়ের (*Macrotermes bellicosus*) প্রতি দু সেকেন্ড অন্তর একটি করে অর্থাৎ দিনে ৪৩,০০০টি ডিম্ব প্রসব পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। কিন্তু কতদিন পর্যন্ত এই হারে রাণী উইপোকার ডিম্ব প্রসব ক্ষমতা বর্তমান থাকে তার

প্রামাণিক তথ্য সংগৃহীত হয়নি। (Sabrosky, C. W. : How many insects are there? *The Yearbook of agriculture. Insects, 1952.* Washington U. S. Dept of Agriculture. p. 3)

অন্য একটি উপনিবেশে একটি রাণী উইয়ের উদর ব্যবচ্ছেদ করে ডিম্বাশয়ের মধ্যে ৪৮,০৯০টি ডিম্ব পাওয়া গিয়েছিল (Klots 46)

Latimerএর মতে রাণী উই দৈনিক ৩০,০০০ অর্থাৎ বৎসরে ১০,৯৫০,০০০টি ডিম্ব প্রসব করে এবং এই হারে চার পাঁচ বৎসরের জীবনকালের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে প্রায় ৫০,০০০,০০০টি ডিম প্রসক করে থাকে (Latimer)। ডিম্ব প্রসব সুরু করার পর রাণী উইপোকার উদরের পরিধি ক্রমশঃ স্ফীত হতে থাকে, ফলে তারা আর স্থানত্যাগ করতে পারে না। কর্মী শ্রেণীর উই পোকারা নিজ প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ স্ফীতোদরা রাণীর খাদ্য সরবরাহ এবং পরিচর্যা করে। রাণী উইপোকা আকারে কর্মী উই পোকা অপেক্ষা ২০ থেকে ৩০ হাজার গুণ বড় (Latimer)। সমস্ত প্রজাতিদের মধ্যে ভারতীয় রাণী উই পোকাই আকারে সর্বাপেক্ষা বড়—দৈর্ঘে সাধারণতঃ ১৫০ থেকে ২০০ মিলিমিটার (Comstock 276)। ডিম্ব প্রসব বন্ধ হয়ে গেলে কর্মীরা রাণী উইপোকার খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। উপবাসক্লিষ্ট রাণীর মৃত্যুর পর তার দেহটি অন্য সকলের খাদ্যে পরিণত হয়।

রাণী অপেক্ষা আকারে ক্ষুদ্র রাজার জীবনে বৈশিষ্ট্য কিছুই নেই। বিপুলাকৃতি রাণীর দেহের অন্তরালে রাজপ্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে কর্মীদের পরিচর্যায় রাজার দিন অতিবাহিত হয়।

(২) এবং (৩) **দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ের জননক্ষম শ্রেণী।**

প্রথম জননক্ষম শ্রেণীর অবর্তমানে হ্রস্বাকার পক্ষ সমন্বিত *(brachypterous)* দ্বিতীয় পর্যায়ের জননক্ষম শ্রেণীভুক্ত প্রতিকল্প রাজদম্পতী ডিম্ব সৃষ্টি এবং বংশ বিস্তার করে। পূর্ণ যৌন ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও অপরিণত বয়স্ক (nymphal) উই পোকাদের মত এদের দেহাকৃতি। তৃতীয় পর্যায়ের জননক্ষম শ্রেণী পক্ষহীন *(apterous)*। আকারে কর্মী উই পোকার মত।

এরা প্রথম পর্যায়ের জননক্ষম শ্রেণীর জন্মদানে অক্ষম বলে এদের বংশধরেরা নতুন উপনিবেশ পত্তন করতে পারে না।

(৪) **কর্মী শ্রেণী :** পক্ষ এবং চক্ষুবিহীন শ্বেতবর্ণের নমনীয় এবং পাতলা দেহত্বক বিশিষ্ট কর্মী শ্রেণীই হল উপনিবেশের নিরলস কর্মী। কর্মীদের

মধ্যে পুরুষ এবং স্ত্রী এই উভয় শ্রেণীই বিদ্যমান। কিন্তু জননেন্দ্রিয় অপরিণত হওয়ায় এরা প্রায়শঃই বংশ বিস্তার করতে অক্ষম।

খাদ্য সংগ্রহ, বাসস্থান নির্মাণ, রাজদম্পতীসহ উপনিবেশের অন্যান্য সকলের পরিচর্যা এবং ডিম্ব ও শিশু উই পোকাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব এই অন্ধ কর্মীদের উপর ন্যস্ত। কর্মী শ্রেণীই হল গ্রন্থাগারের প্রকৃত শত্রু। এরা সেলুলোজ ভোজী কিন্তু সেলুলোজ পরিপাক করতে অক্ষম। এদের পাকস্থলীর মধ্যে অসংখ্য প্রোটোজোয়াই (protozoa) অর্থাৎ এককোষী প্রাণী আছে। এই প্রোটোজোয়া সেলুলোজ জীর্ণ করে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত প্রোটোজোয়াই কর্মী উইপোকা পরিপাক করে এবং প্রয়োজনমত নিজ পাকস্থলী হতে অন্যান্যদের অর্ধপাচ্য খাদ্য সরবরাহ করে (Metcalf 210, 854 ; Latimer)।

(৫) **সৈন্য শ্রেণী :** এরাও পক্ষ এবং চক্ষু বিহীন। এদের কর্তব্য হল বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে উপনিবেশ রক্ষা করা। উপনিবেশের সমগ্র অধিবাসীর এক পঞ্চমাংশ হল সৈন্য শ্রেণী। কর্মী শ্রেণীর মত এরা বংশ বিস্তার করতে অক্ষম।

কর্মী এবং সৈন্য শ্রেণীর উন্মুক্ত বাতাস এবং আলোকের প্রতি প্রবল বিরূপতা পরিলক্ষিত হয়। উন্মুক্ত স্থানে পরিভ্রমণের সময় সেজন্য এরা নিজ দেহক্ষরণ মিশ্রিত মাটী দিয়ে আচ্ছাদিত রাস্তা নির্মাণ করে নেয়।

উই পোকাদের বাসস্থান termitary অনেক সময় মাটির উপরেও নির্মিত হয়। মাটি এবং দেহক্ষরণ মিশ্রিত উপাদানে নির্মিত এই আবাসস্থল তীব্র ঝড় এবং বৃষ্টি উপেক্ষা করেও অক্ষত অবস্থায় থাকে। আফ্রিকা মহাদেশে ২০ থেকে ২৫ ফিট উচ্চ termitary দেখা গেছে। মাটীর নীচেও এর অনুরূপ বিস্তৃতি।

৩। **ব্রাউন হাউস মথ (Brown House Moth) :** প্রোটীন ভোজী Brown House অথবা False cloth moth, *Hofmannophila pseudospretella* উত্তর আমেরিকা, উত্তর য়ুরোপ, অষ্ট্রেলিয়া এবং এশিয়ার সিংহল এবং ভারতবর্ষে দৃষ্ট হয়। এরা গ্রন্থাগারে বই বাঁধাইয়ের কাপড় অথবা calf leather আক্রমণ করে। কিন্তু মরক্কো চামড়ায় বাঁধাই বই স্পর্শও করে না (Plumbe 2, 298)।

(৪)

Cedar তৈল গ্রন্থসংরক্ষক হিসাবে প্রাচীনত্ব দাবী করলেও বিভিন্ন প্রকারের অন্য দ্রব্যাদিও গ্রন্থসংরক্ষণের কাজে প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এর একটি তালিকা এই প্রবন্ধের শেষে সংযোজিত হবে। এই

তালিকাভুক্ত সমস্ত দ্রব্যেরই যে কীটনাশক গুণাগুণ আছে তা প্রমাণসাপেক্ষ। এদের ভিতর অনেকগুলির গুণাগুণ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত তথ্য না থাকার জন্যে অনেক সময় ব্যবহার করে প্রতিকূল ফল লাভ হয়েছে। যেমন গ্রন্থকীটের (bookworm) প্রতিশেধক হিসাবে গোলমরিচ ব্যবহার করে গ্রন্থাগারে এদের আমন্ত্রণই জানানো হয়, কারণ গোলমরিচ গ্রন্থকীটের কয়েকটি প্রজাতির অতি প্রিয় খাদ্য (Iiams 32)। এদের ভিতর অনেকগুলি বর্তমানকালেও গ্রীষ্মপ্রধান দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ স্বরূপ mercuric chloride, শুষ্ক নিম পাতা এবং তামাক পাতা, napthalene ইত্যাদীর নাম উল্লেখযোগ্য।

রসায়ন শাস্ত্রের ব্যাপক অগ্রগতির সঙ্গে বর্তমান যুগে অধিক কার্যকরী অনেক কীটপতঙ্গনাশক রাসায়নিক দ্রব্য আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সমস্ত রাসায়নিক দ্রব্যের গুণ বা ধর্ম এবং প্রয়োগবিধি সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কোন কীটনাশক দ্রব্য বই, পত্র পত্রিকার পক্ষে ক্ষতিকারক কিনা সর্বাগ্রে সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া কর্তব্য। **অধিকাংশ কীটপতঙ্গ নাশক রাসায়নিক দ্রব্য বিষ। মানুষ, গৃহপালিত পশুপক্ষীর উপর এদের সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে সচেতন থাকতে হবে। বিন্দুমাত্র অবহেলা চরম বিপর্যয় ঘটাতে পারে।**

কীটপতঙ্গের দেহে এই সমস্ত দ্রব্যাদির রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেই তাদের প্রাণনাশ হয়। কীটনাশক দ্রব্য কোন পথ দিয়ে কীটপতঙ্গের দেহে প্রবেশ করে তা বিচার করে এদের তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ

(১) পাকস্থলী বিষ (stomach poison)

(২) স্পর্শ বিষ (contact poison)

(৩) বিষাক্ত ধূম (fumigants)

কীটনাশক দ্রব্যাদির অন্যভাবেও শ্রেণী বিন্যাস করা যায়ঃ

(১) অজৈব রাসায়নি দ্রব্য (inorganic chemicals)

(২) জৈব রাসায়নিক দ্রব্য (organic chemicals)। জৈব রাসায়নিক দ্রব্য দুপ্রকারঃ (ক) সাংশ্লেষিক জৈব রাসায়নিক দ্রব্য (synthetic organic chemicals) এবং (খ) উদ্ভিজ জৈব রাসায়নিক দ্রব্য (organic chemicals of plant origin).

সাধারণতঃ অজৈব রাসায়নিক দ্রব্য পাকস্থলী বিষ হিসাবে ফলপ্রদ।

উদ্ভিজ জৈব রাসায়নিক দ্রব্য মুখ্যতঃ স্পর্শ বিষ। পক্ষান্তরে সাংশ্লেষিক দ্রব্যাদি পাকস্থলী, স্পর্শ বিষ এবং বিষাক্ত ধূম হিসাবে ব্যবহার করা যায়।

(১) **পাকস্থলী বিষঃ** মুখ দিয়ে এই বিষ দেহে প্রবেশ করে বলে মুখ্যতঃ চর্বণকারী কীটপতঙ্গ ধ্বংস করবার জন্য এই বিষ ব্যবহৃত হয়। এদের ব্যবহার পদ্ধতি দুপ্রকারের ঃ

(ক) কীটপতঙ্গের প্রিয় খাদ্যবস্তুর সঙ্গে এই বিষ মিশ্রিত করে তাদের গতায়ত পথের ধারে ইতস্ততঃ এই বিষের টোপ (poison bait) রেখে দিতে হয়। কীটপতঙ্গ এই খাদ্য উদরাসাৎ করে বিষক্রিয়ার ফলে প্রাণত্যাগ করে।

(খ) কীটপতঙ্গের গতায়ত পথের উপর এমনভাবে এই বিষ চূর্ণ ছড়িয়ে রাখতে হবে যেন সেই পথ পরিক্রমণকালে তাদের পা অথবা শুঁড়ে (antenne) এই বিষ লেগে যায়। মুখ দিয়ে তারা যখন এই চূর্ণ পরিষ্কার করবার চেষ্টা করে তখন কিছু অংশ পাকস্থলীতে প্রবেশ করে বিষক্রিয়া সুরু হয়। যদি এই বিষে কীটপতঙ্গের পা অথবা শুঁড়ে জ্বালা সৃষ্টি হয় তবে খুব শীঘ্র বাঞ্ছিত ফল লাভ হবে।

পাকস্থলী বিষ হিসাবে নিম্নলিখিত রাসায়নিক পদার্থগুলির নাম উল্লেখযোগ্য ঃ

(১) আর্সেনিক ঘটিত যৌগিক পদার্থ (Arsenicals)

যথা ঃ Lead arsenate, Calcium arsenate, Copper aceto-arsenate (Paris Green) Arsenic trioxide (White arsenic) ইত্যাদী।

(২) ফ্লোরিণ ঘটিত যৌগিক পদার্থ (Fluorine compounds)

যথা ঃ Sodium fluoride, Sodium fluosilicate

(৩) পারদ ঘটিত যৌগিক পদার্থ (Compounds of Mercury)

এ ছাড়া DDT, BHC জাতীয় কয়েকটি সাংশ্লেষিক জৈব পদার্থও পাকস্থলী বিষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(২) **স্পর্শ বিষ (Contact poison)** ঃ এই জাতীয় বিষ সরাসরি কীটপতঙ্গের দেহের সংস্পর্শে এসে ত্বকের (integument) মধ্য দিয়ে রক্তে মিলিত হয়ে কীটপতঙ্গের মৃত্যু হয়, অথবা স্পিরাক্‌লের (spiracles)এর মাধ্যমে শ্বাসনালির (trachea) ভিতর প্রবেশ করে সমগ্র শ্বাসতন্ত্রকে বিকল করে দেয়। অনেক ক্ষেত্রে নার্ভতন্ত্র বিকল হয়ে দেহ অসাড় হয়ে কীটের মৃত্যু ঘটে।

এই বিষ চূর্ণ অথবা দ্রবণ আকারে স্প্রের সাহায্যে কীটপতঙ্গের দেহে নিক্ষেপ করতে হয়, অথবা কীটপতঙ্গ অধ্যুষিত স্থানে এবং তাদের গতায়াত পথের উপর ছড়িয়ে দিতে হয়। এই পথ পরিক্রমণের সময় কীটপতঙ্গের পা অথবা শুঁড় বিষের সংস্পর্শে আসে। কীটের কিউটিকলে (cuticle) বিষ গলিত হয়ে দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। কীটপতঙ্গের কিউটিকলের এই সমস্ত বিষ শোষণ করবার ক্ষমতা আছে। যে মাত্রা বিষ কীটপতঙ্গের দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিলে তাদের মৃত্যু হবে ঠিক সেই পরিমাণ বিষ বহির্দেশে প্রয়োগ করলেও আকাঙ্খিত ফল লাভ হয়। কীটপতঙ্গের কিউটিকলের শোষণ ক্ষমতার উপর প্রকৃতপক্ষে বিষের কর্মক্ষমতা নির্ভর করে।

কোন কোন স্পর্শ বিষের কর্মক্ষমতা সাময়িক, কারণ এরা অপ্রতিষ্ঠ (unstable) রাসায়নিক পদার্থ। আলো, বাতাস অথবা উত্তাপের সংস্পর্শে রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে কীটনাশক ধর্ম লুপ্ত হয়। এদের অস্থায়ী (non-residual) স্পর্শ বিষ বলে বলে। সরাসরি কীটপতঙ্গের দেহে নিক্ষেপ করবার জন্য এই স্পর্শ বিষ খুব কার্যকরী। কিন্তু গতায়াত পথের উপর ছড়িয়ে রাখবার জন্য প্রয়োজন স্থায়ী (stable) রাসায়নিক পদার্থ। উন্মুক্ত স্থানে প্রয়োগ করবার পর দীর্ঘকাল পর্যন্ত এদের রাসায়নিক ধর্ম তথা কীটনাশক ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই জাতীয় বিষের নাম হল স্থায়ী (residual) স্পর্শ বিষ।

স্থায়ী স্পর্শ বিষের ক্রিয়া সাধারণতঃ খুব ধীর গতি। অন্ততঃ কয়েক মিনিট পর্যন্ত বিষের সঙ্গে কীটের সংস্পর্শ প্রয়োজন। সংস্পর্শে আসার এক ঘণ্টার পূর্বে সাধারণতঃ মৃত্যু ঘটে না।

অস্থায়ী স্পর্শ বিষ হিসাবে pyrethrum পুষ্পজাত জৈব রাসায়নিক পদার্থ pyrethrin অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

বর্তমান যুগে কীটনাশক নতুন নতুন সাংশ্লেষিক জৈব রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কারের ফলে স্থায়ী স্পর্শ বিষের ক্ষেত্রে যুগান্তর এসেছে। স্থায়ী স্পর্শ বিষের মধ্যে chlorine ঘটিত hydrocarbon (chlorinated hydrocarbons) গুলিই মুখ্য। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ DDT, BHC, Dieldrin, Toxaphane, Chlordane, Dinitrophenol ইত্যাদি। অনেক কীটপতঙ্গের মধ্যে chlorinated hydrocarbon সমূহের বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা জন্মাতে দেখা যায়। এই অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কীটপতঙ্গের

উপর phosphorous ঘটিত কয়েকটি জৈব পদার্থের (organo-phosphorous compounds) বিষক্রিয়া সম্বন্ধে পরীক্ষা চালিয়ে কিছু সুফল লাভ হয়েছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল: parathion, malathion, diazinon, TEPP, HETP প্রভৃতি। কর্মক্ষমতার বিচারে এরা সকলে কিন্তু এখনও chlorinated hydrocarbonএর পর্যায়ে পৌঁছায়নি (Davidson 5)। কয়েকটি **Phosphorus ঘটিত জৈব পদার্থ হল মানুষের পক্ষে মারাত্মক বিষ।**

বিষাক্ত ধূম (fumigants): মুখোপাঙ্গের গঠন নির্বিশেষে সমস্ত প্রকার কীটপতঙ্গ ধ্বংস করবার জন্য বিষাক্ত ধূমের ব্যবহার করা চলে। কেবলমাত্র অবরুদ্ধ প্রকোষ্ঠে এই বাষ্প প্রয়োগ করা চলে। কীট জর্জরিত পুস্তকাদি সাধারণতঃ বিশেষভাবে প্রস্তুত প্রকোষ্ঠে রেখে এই ধূম প্রয়োগ করে কীট মুক্ত করা হয়। নাসারন্ধ্র অথবা দেহত্বক দিয়ে এই বিষ দেহে প্রবেশ করে কীটপতঙ্গের নার্ভতন্ত্র এবং শ্বাসতন্ত্র বিকল করে।

কীট ধ্বংস করবার জন্য বিষাক্ত ধূম ব্যবহার প্রাচীন যুগের গ্রীক ও রোমানদের অজ্ঞাত ছিলনা। এই ধূম প্রস্তুত করবার জন্য গন্ধকের ব্যবহারের কথা হোমারের রচনায় উল্লিখিত আছে। বিষাক্ত ধূম উৎপাদক রাসায়নিক দ্রব্য সাধারণতঃ গ্যাসীয়, তরল এবং কঠিন এই তিন অবস্থায় পাওয়া যায়। তরল এবং কঠিন পদার্থগুলি সাধারণ গৃহ উত্তাপেই অথবা খুব সামান্য উত্তাপ প্রয়োগ করলেই গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলঃ Carbon disulphide, paradichlorobenzene, napthalene, hydrocyanic acid, ethylene oxide, formaldehyde প্রভৃতি।

কোন কোন বিষ তিন পথেই কীট পতঙ্গের দেহে প্রবেশ করে। এই তিনপ্রকার কীটনাশক বিষ ব্যতীত আরো কতগুলি রাসায়নিক দ্রব্য কেবলমাত্র কীট বিতাড়নের (repellants) জন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলির বিষক্রিয়া খুব মৃদু, কিন্তু এদের ব্যবহারে কীটপতঙ্গের খাদ্য বিস্বাদ অথবা আবাসস্থল বাসের অনুপযোগী হয়ে যায়। উই অথবা ঘুণ পোকার আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য কাঠের আসবাবপত্রে ব্যবহৃত trichlorobenzene, crude creosote অথবা pentachlorophenol এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মশক এবং অন্যান্য রক্তশোষণকারী কীট পতঙ্গের আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের দেহে প্রযুক্ত Dimethyl phthalate জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য সমূহ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আমাদের দেশেও অতি প্রাচীন কাল থেকেই এই একই উদ্দেশ্যে বইয়ের ভিতর অথবা আলমারীতে নিম, তামাক পাতা ইত্যাদি রাখবার প্রচলন আছে।

(ক্রমশঃ)

পাঠক, পাঠাগার ও পাঠতৃষ্ণা

নির্মল চন্দ্র চৌধুরী
গ্রন্থাগারিক, বীরভূম জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, সিউড়ী

সাধারণ গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হল প্রত্যেক পাঠকের চাহিদা অনুযায়ী পুস্তক সরবরাহ করা। যে অঞ্চলে সাধারণ গ্রন্থাগারের কাজ চলছে সে অঞ্চলের সকল নাগরিকই প্রয়োজনীয় পুস্তকের জন্য দাবী জানাবার অধিকারী। অবশ্য আজকের দিনের সাধারণ গ্রন্থাগার বলতে আমরা বুঝি,—"The internationally accepted definition of public library is a library (i) which is financed for the most part out of public funds (ii) which charges no fees from readers and yet is open for full use by the public without distinction of caste, creed or sex (iii) which is intended as an auxiliary educational institution, providing a means of self-education, which is endlees (iv) which houses learning materials giving reliable information freely and without partiality or prejudice on as wide a variety of subjects as will satisfy the interests of the reader" সাধারণ গ্রন্থাগারের পাঠকদের এই দাবীর বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। এই বৈচিত্র্যের কারণ মানুষের রুচির বিভিন্নতা।

পাঠকের সব দাবীই কি মেটাতে হবে? এর পর যখন প্রশ্ন আসে কি ধরণের দাবী? পাঠকের চাহিদার বা পাঠতৃষ্ণার কোন হিসাব আছে কি? আমরা কি সহজে বলতে পারি পাঠকের চাহিদার কোন্ অংশ সংগত আর কোন্ অংশ সংগত নয়?

বিদেশে পাঠরুচির অনুসন্ধানের জন্য বিভিন্ন ধরণের সার্ভে করা হয়ে থাকে। পুস্তক নির্বাচনে এগুলির সাহায্য পাওয়া যায়। আমাদের দেশে এই ধরণের প্রচেষ্টা খুব কমই দেখা যায়। সম্প্রতি দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরীর পাঠতৃষ্ণার অনুসন্ধানের জন্য ইউনেস্কোর তরফ থেকে সার্ভে করা হয়। এই ধরণের অনুসন্ধানের ফলে গ্রন্থাগারিক, প্রকাশক, পুস্তক বিক্রেতা ও শিক্ষাবিদেরা লাভবান হবেন। "প্রত্যেকটি রাজ্য সরকার স্থানীয় প্রকাশকদের সংস্থা ও গ্রন্থাগারগুলির সহায়তায় আঞ্চলিক ভিত্তিতে এই ধরণের অনুসন্ধান কার্য্য সুরু করতে পারেন। জেলায় জেলায় গ্রন্থাগারের ভিত্তি স্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে এই অনুসন্ধানের ফলাফল জেলা গ্রন্থাগারগুলির উদ্দেশ্য সফল করিবে।"

—গ্রন্থাগার পত্রিকা।

পশ্চিম বাংলার প্রতি জেলায় জেলা গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগারের বুক মোবিল সার্ভিস, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপন ও পরিচালনার কাজ সুরু হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের চাহিদার সাথে জেলা গ্রন্থাগারগুলির মোটামুটি পরিচয় ঘটেছে। তাছাড়া জেলা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে জেলা শহরগুলির পাঠকেরও পরিচয় কিছু কিছু মিলেছে।

জেলা গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে পাঠতৃষ্ণার অনুসন্ধান করলে বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাঠতৃষ্ণার বর্ত্তমান রূপ ও চাহিদা নির্ণয় সহজ হবে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পাঠতৃষ্ণার রূপ সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য সময় সময় দেওয়া থাকে। যদিও এগুলি খুবই বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায় তবুও তথ্য হিসাবে এগুলির মূল্য আছে।

১৯৩২ সালের একটি রিপোর্ট ('A village library in Bengal' শীর্ষক প্রবন্ধ Indian Librarian (Punjab)—পত্রিকায় প্রকাশিত হয়)।

"কোলকাতা থেকে ৯ মাইল দূরে পাণিহাটী একটি ছোট শহর। চার হাজার লোকের বাস। স্ত্রী-পুরুষ মিলিয়ে শতকরা পঞ্চাশ জন শিক্ষিত। ইংরেজী শিক্ষিত অধিকাংশ লোকই কোলকাতায় চাকুরী করে। একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। শিক্ষকেরা গ্রাজুয়েট। লোকেরা বই সংবাদপত্র পড়তে ভালবাসে। ১৮৯৮ সালে একটি ছোট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংরেজী ও বাংলা মোট পুস্তকের সংখ্যা ২৫০০ এবং ৬ খানা পত্রিকা নেওয়া হয়। কর্ম্মক্লান্ত মানুষগুলি অধিকাংশই আমোদের জন্য এখানে বই পড়েন। এখানকার পাঠকরা কি ধরণের বই পড়েন দেখবার জন্য একটা ছোট কমিটী তৈরী করা হয়।

কি ধরণের বই ইসু করা হয় তাহার শতকরা হিসাব ঃ

	১৯২৮ শতকরা	১৯২৯ শতকরা	১৯৩০ শতকরা
উপন্যাস ও নাটক—	৭৪.৫	৭১.২৭	৬১
পত্রিকা—	৮.৪	৯.৫	১০
ইতিহাস ও জীবনী—	৪	৫.৭	৩.৮
ধর্ম্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান—	৩	৭	১১.১
বাংলা সাহিত্য—	২.২	১.৯	১.৫
ভ্রমণ—	৩	৩.৪	০.৭
ইংরেজী সাহিত্য—	৩.৯	৩.৪	০.৭
বিবিধ—	০.৯	০.১	০.৪

ধর্ম্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের বিভাগ এক সাথে হওয়ায় চাহিদা কোন্ বিভাগে বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলা কঠিন। তা সত্বেও ১৯৩২ সালে কোলকাতার নিকটবর্ত্তী শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত অঞ্চলের পাঠতৃষ্ণার index মূল্যবান সন্দেহ নাই।

১৯৫৮ সালের সুবারবন রিডিং ক্লাব ও বৈদ্যবাটী যুবক সমিতির পুস্তক ইস্যুর হিসাব ঃ

	সুবারবন রিডিং ক্লাব	বৈদ্যবাটী যুবক
উপন্যাস ও গল্প	১৫৩৯১	১৬৮১৯
অনুবাদ উপন্যাস	৬৩৭	২০১
ডিঃ উপন্যাস ও গল্প	১৪০১	×
চরিত	৭২৮	৩৬৮
ধর্ম্ম ও দর্শন	১৩৪৯	৩৬৪
প্রবন্ধ, নাটক ও কাব্য	৩৮৭	১১০৫
ইতিহাস, বিজ্ঞান ও রাষ্ট্রনীতি	৪০৯	৪৫২
রেফারেন্স বই	৬০২	৪২৬
ইংরাজী	৯০১	৩৪৪
ভ্রমণ		৬৩৪
ইংরাজী ও অন্যান্য		১৫৪
অন্যান্য	১৩৯০	

প্রতি ৪ জন উপন্যাস পাঠকে একজন অন্যান্য বিষয়ের পাঠক এবং প্রতি ৪০ জন বাংলা পুস্তক পাঠকে একজন ইংরেজী পুস্তকের পাঠক। উন্নততর পুস্তকের চাহিদা সৃষ্টির জন্য বৈদ্যবাটী যুব সমিতির প্রচেষ্টার কথা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে।

পশ্চিম দিনাজপুর জেলা পাঠাগার সংঘের ১৯৫৭-৫৮ সালের বার্ষিক কার্য্য বিবরণীতে প্রকাশ ঃ—

(১) বিভিন্ন বিষয়ের পাঠকদের শতকরা হার—

সাহিত্য— ৮২% (এ বিভাগ সম্পূর্ণ নয়, কারণ এর ভিতর উপন্যাস আছে)।
ইতিহাস, ভ্রমণ কাহিনী ইত্যাদি— ১০% অন্যান্য— ৭%

(২) মহিলা বিভাগের পাঠিকার সংখ্যা খুবই নগণ্য।

(৩) অবধূত রচিত 'মরুতীর্থ হিংলাজ' বইখানির চাহিদা দেখা যায়।

বর্তমান সময়ে উত্তর কলিকাতার একটি গ্রন্থাগার 'পূর্বাচলের' আয়োজিত

পাঠতৃষ্ণার সার্ভে থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ হিসাব পাই। জবাব চেয়েছি শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে। অনেকেই বিষয়টি চিন্তা করেছেন এবং তাদের মন্তব্য যা লিখেছেন তা অনেক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে।

পরিসংখ্যানের জবাব দিয়েছেন শতকরা ২০ জন মহিলা। পুরুষদের মধ্যে ১৫ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে উত্তর দিয়েছেন শতকরা ৮৫ জন। প্রৌঢ়রা খুব কম অংশ গ্রহণ করেছেন।

বাংলা বই পড়েন শতকরা ৯০ জন। বাংলা ও ইংরেজী উভয় ভাষাতেই বই পড়েন শতকরা ৫ জন।

কি কি ধরণের বই পড়েন তার ক্রমঃ (১) উপন্যাস (২) ভ্রমণ (৩) রহস্য রোমঞ্চ (৪) রম্য রচনা (৫) কবিতা (৬) ছোট গল্প (৭) প্রবন্ধ (৮) জীবনী।

রাজনীতি, নাটক, ইতিহাস ইত্যাদির প্রতি তেমন টান নাই। তবে অনুবাদের চাহিদা বেশী।

বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম সংক্রান্ত পুস্তক অনেকেই চেয়েছেন। বেশীরভাগ লোকের ভ্রমণ ও উপন্যাস ভালো লাগে। প্রিয় লেখক শরৎচন্দ্র, তারপরেই অবধূত।

প্রায় লোকই ছুটির দিন ও রাত্রে বই পড়েন। মেয়েরা কিছু কিছু দুপুরে বই পড়েন। বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা ও চাকুরেরা। ব্যবসায়ীরা শতকরা তিনজন।

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার থেকে পাঠতৃষ্ণার অনুসন্ধানের জন্য নানা রকমের প্রচেষ্টা চালান হয়ে থাকে। ইসু রেজিষ্টার থেকে অবশ্য হিসাব পাওয়া যায় তা থেকে সঠিক ধারণা করা সম্ভব নয়। "...one would be to go through the village library issue registers and find out what types of books are issued and their frequency of issue. But there are certain limitations of this method, i.e. it would not be certain whether the books issued by the new reader were read by him or some one else. It is possible that the person might have got the book issued for the sake of prestige or for some other social consideration. The issue register might, therefore, be a poor guide to this probable reading interests, likes and dislikes." তথাপি ঠিকমত রক্ষিত দৈনিক ইসু রেজিষ্টার বহুলাংশে সহায়তা করে থাকে এ ধরণের কাজে। Classfied daily statistics থেকে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়।

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারে মুক্তাক (open access system) প্রণালী প্রথম থেকেই প্রবর্ত্তন করা হয়। নিজেহাতে ইচ্ছামত পুস্তক বেছে নেওয়ায় পাঠকদের বিভিন্ন বিষয়ে বই পড়বার আগ্রহ অনেক বেড়েছে। উন্নততর পাঠের সৃষ্টির পক্ষে মুক্তাক প্রণালী নির্ভরযোগ্য হাতিয়ার।

পরিসংখ্যান পত্রের সাহায্যে অনেক সময় বহু উত্তর পাওয়া যায়। অবশ্য অনেকে উত্তর দিতে হবে মনে করে অনেক ভালো ভালো কথা লিখে থাকেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকের কাছে যে সব form পাঠানো হয় তার শতকরা ৫০ ভাগও ফেরৎ আসেনি। খুব একটা উৎসাহ সহকারে তাঁরা এ কাজ করেন নি। এ বিষয়ে পাইকর গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকের খুব সহায়তা পাওয়া গেছে। জেলা শহর সিউড়ী থেকে যারা জবাব দিয়েছেন তারা অধিকাংই ছাত্র। অধিকাংশই পাঠ্যপুস্তকের দাবী জানিয়েছেন।

আমাদের বাংলা দেশে যে ধরণের ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার চালু হয়েছে জেলা গ্রন্থাগারের মাধ্যমে তার সাথে গ্রামের পাঠকদের যোগাযোগ নাই। এগুলি থেকে গ্রামের কোন একটি সভ্যভুক্ত লাইব্রেরীকে বই দিয়ে আসা হয়ে থাকে আবার নিয়ে আসা হয়। পাঠকদের চাহিদার সাথে সরাসরি পরিচয় হবার সুযোগ ঘটে না। ফলে মোবাইল পুস্তক ইসু রেজিষ্টারের উপর নির্ভর করতে হয়। অনেক সময় এইসব রেজিষ্টার থেকে সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না।

মাঝে মাঝে পাঠকদের সাথে সাক্ষাৎ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে পাঠকদের প্রয়োজনের কথা জানতে পারা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আবার তারা কি কি বই চান তা Suggestion Register-এ লিপিবন্ধ করে রাখা হয়।

Reservation slip-এর মাধ্যমেও বহু ক্ষেত্রে পাঠকের প্রয়োজনের Intensity বোঝা যায়।

গ্রামের তথাকথিত সাধারণ পাঠাগারের সাথে গ্রামের সাধারণের কোন যোগাযোগ নাই। কারণ এই সব পাঠাগার মুষ্টিমেয় শিক্ষিত যুবকদের দ্বারাই পরিচালিত হয়। বই যে কখানা কেনা হয় তা কেবলমাত্র তাদেরই জন্য। সমাজ শিক্ষার কাজে বা সাধারণের পাঠে আগ্রহ সৃষ্টির কাজে এসব গ্রন্থাগার বিশেষ অংশ গ্রহণ করতে পারে না। গ্রামের একজন গ্রন্থাগারিক লিখেছেন "প্রায় দুই বৎসর যাবৎ আমি আমাদের গ্রামের গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের পদে অধিষ্ঠিত আছি। কিন্তু পাঠক শ্রেণীর রুচি দেখে আমি বড়ই বিব্রত বোধ করি। তাঁরা চান কেবল নভেল"।

গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপনের পর থেকে অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে। কিন্তু এই সব গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকের সামনে একটা কর্ম্মসূচী থাকা দরকার নতুবা দৈনিক সামান্য কিছু পুস্তক ইসু ছাড়াও মাসে দুই একদিন মোবাইলের কাজ ছাড়া এইসব গ্রন্থাগারিকদের কোন কাজ নাই। অথচ কাজের সম্ভাবনাও প্রচুর। যে সব জায়গায় গ্রামীণ গ্রন্থাগার আছে সেই সব জায়গায় সমাজ শিক্ষাকেন্দ্রও আছে। আবার follow up education চালাবার জন্য প্রত্যেকটি সমাজ শিক্ষাকেন্দ্রে একটি করে ছোট গ্রন্থাগার আছে। সমাজ শিক্ষাকেন্দ্রের কাজ চললেই এ সব গ্রন্থাগার একেবারেই ব্যবহৃত হয় না। ভালোভাবে কাজ চালাবার জন্য গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলির সাথে সমাজ শিক্ষাকেন্দ্রগুলি যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। আক্ষরিক ও সমাজ শিক্ষা ছাড়াও গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক এই সমাজ শিক্ষাকেন্দ্রের follow up education-এর কাজ খুব ভালো ভাবে চালাতে পারেন। নানা রকম পোষ্টার, চার্ট, কৃষি, শিল্প, সমবায়, পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ে লিখিত সমাজ শিক্ষার পুস্তকের সাহায্যে গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রদের সাথে নিয়মিত আলোচনা করতে পারেন। বীরভূমে যে-সব অঞ্চলে গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে তাদের ভিতর কয়েকটির অবস্থিতি বিদ্যালয়ের নিকট। যেমন বাহিরী, পাইকর, পাঁচড়া, অবিনাশপুর, কুরুমগ্রাম। গ্রামীণ গ্রন্থাগারিক এই সব বিদ্যালয়ের শিশুদের কাছে গ্রন্থাগারকে আকর্ষণীয় করে শিশুপাঠের আগ্রহ সঞ্চার করেতে পারেন।

গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ চাহিদাই উপন্যাস। গ্রামাঞ্চলের চাহিদা রহস্য রোমাঞ্চের পাতা থেকে উপন্যাসের পর্য্যায়ে এসেছে। প্রতি ১১২৫ পুস্তক ইসুর উপন্যাস ১০২৭ আর অন্যান্য ৮৫। গ্রামাঞ্চলে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরা বেশী বই পড়ে।

উপন্যাস ছাড়া আর কি আমরা গ্রামীণ গ্রন্থাগারে পৌঁছে দিতে পারি? বয়স্ক ও সমাজ শিক্ষার যে সব পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে তাতে লেখক ও প্রকাশকরাই লাভবান হয়েছেন, ছোট ছোট শিল্পে নিযুক্ত বিভিন্ন গ্রামবাসীদের বৃত্তিগত যোগ্যতা বৃদ্ধিতে এ সব পুস্তক খুব বেশী সাহায্য করে না। বিশ্বভারতীর লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা, লোক বিজ্ঞান গ্রন্থমালা উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণীর লোকদের জন্য, গ্রামের সাধারণ পাঠকদের জন্য নহে।

'আমাদের দেশের খ্যাতনামা মনীষীরা তাঁদের গবেষণা লিপিবদ্ধ করেছেন ইংরেজী ভাষায়। ফলে ইংরেজী না জানা লোকের কাছে তাঁদের বিভিন্ন জ্ঞান

ভাণ্ডার আর উন্মুক্ত হয় না। জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, বিপিনচন্দ্র পাল, হীরালাল হালদার, যদুনাথ সরকার, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ সরকার, মানবেন্দ্র নাথ রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রমুখের শ্রেষ্ঠ স্মরণীয় কাজ যা, তার সবটুকুই রয়েছে ইংরেজী কারাগারে আবদ্ধ। দেশের লোকেরা এঁদের নাম জানেন, এঁদের মহাপণ্ডিত ব্যক্তি বলেন, কিন্তু কোন্ বিষয়ের পণ্ডিত এঁরা, কি কি উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন, তার খবর ইংরেজী না জানা পাঠকরা রাখেন না মোটেই। বিজ্ঞান, শিল্পকলা, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয় ইংরেজী না জানা পাঠকের কাছে অপরিচিত থেকে যায়।

গ্রামাঞ্চলে ছোট গল্প, অনুবাদ ও কবিতা প্রভৃতি পুস্তক পাঠে আগ্রহ নাই। প্রতি ১০০০ হাজার পুস্তক ইসুতে ৫ খানা অনুবাদ সাহিত্য, ৫ খানা ছোট গল্পের ও ১ খানা কবিতার বই ইসু হয়। সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি বিষয়ক পুস্তকের চাহিদা নাই।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, ভারতের সংবিধান বিষয়ক পুস্তকের কেউ কখনও আগ্রহ প্রকাশ করেন না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকের অনুসন্ধান শিক্ষকরা ক'রে থাকেন।

অপরাধ বিজ্ঞান, নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর, নিষিদ্ধ দেশ আর নিষিদ্ধ কথা, ফ্রয়েডের ভালবাসা বইগুলির চাহিদা গ্রামাঞ্চলে আছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুস্তকের পাঠক গ্রামাঞ্চলে খুবই কম। এ অঞ্চলের প্রিয় লেখক তারাশংকর, ফাল্গুনী ও শৈলজানন্দ। তারপর শরৎচন্দ্র। 'পক্ষ-পাতিত্বের কারণ তিন জনেরই বীরভূমের লালমাটীতে জন্ম।'

একটি গ্রামের পাঠতৃষ্ণা

গ্রামের নাম পাইকর, থানা মুরারই, থানার লোকসংখ্যা—১,০৩,৪৭০। শিক্ষিতের সংখ্যা—১৩৮৭৮। (Census Report-1951)

লাইব্রেরীর মাধ্যমে সার্ভে—অধিকাংশ যাঁরা জবাব দিয়েছেন তাঁদের বয়স ২০—৩০-এর ভিতর। ৪০-এর উপর যারা জবাব দিয়েছেন তাদের সংখ্যা—৭।

অধিকাংশ ব্যবসায়ীর বয়স ২০—৩০ এর ভিতর। ছাত্ররা জবাব দিয়েছে কম। গ্রন্থাগারের সাথে এদের যোগাযোগ কম।

(ক) অধিকাংশেরই ভাল লাগে উপন্যাস।

(খ) তারপর যথাক্রমে ভ্রমণ, রহস্যরোমাঞ্চ, জীবনী, শেষে ধর্ম্ম। প্রিয় লেখক হিসাবে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, তারপর শৈলজানন্দ, শরৎচন্দ্র।

সবাই বাংলা বই পড়েন। [পাঠাগার (সিউড়ী) পত্রিকা থেকে মুদ্রিত]

পরিষদ কথা

রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব সম্পর্কে আবেদন

আগামী ১৯৬১ খৃষ্টাব্দের ৭ই মে তারিখ থেকে আরম্ভ ক'রে পূর্ণ এক বৎসর ধ'রে রবীন্দ্রনাথের জন্ম-শতবার্ষিক উৎসব সম্পন্ন হবে। ভারতবর্ষে এবং পৃথিবীর সর্বত্র এই উপলক্ষে নানা উদ্যোগ আয়োজন ইতিমধ্যেই সুরু হয়েছে। দেশবিদেশের সকল ছোট বড় প্রতিষ্ঠান যার যার সামর্থ্যানুযায়ী এই উৎসব পালন ক'রবে, নানা উপায়ে এবং নানা মাধ্যমে। এ বিষয়ে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং বাংলা দেশের সকল গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদেরও একটি গুরু দায়িত্ব আছে, সবিনয়ে আমি তা' আপনাদের স্মরণ রাখতে অনুরোধ করি। রবীন্দ্রনাথ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রথম সভাপতি ছিলেন। বাংলাদেশের বহু গ্রন্থাগার বার বার তাঁর স্পর্শ ও আশীর্বাদ লাভ ক'রেছে।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সম্প্রতি এই স্মরণীয় উৎসব যাতে সুষ্ঠুভাবে পালন ক'রতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক'রেছেন। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তানুযায়ী কাজ ক'রতে হ'লে আপনাদের সকলের সক্রিয় সহানুভূতি ও সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন এবং প্রার্থনীয়ঃ

১। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই শতবার্ষিকী উপলক্ষে সম্পূর্ণ রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের ব্যবস্থা ক'রছেন এবং এই গ্রন্থাবলী যাতে আমাদের সকল সাক্ষর জনসাধারণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হ'তে পারে সেজন্য সুলভ মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থাও ক'রছেন। যথাসময়ে তা' বিজ্ঞাপিত হবে। আমাদের অনুরোধ বাংলা দেশের প্রত্যেকটি গ্রন্থাগার অচিরেই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগে এই গ্রন্থাবলীর জন্যে তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করে রাখুন।

২। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যে যে সব গ্রন্থকার সাহিত্য বিস্তার ক'রেছেন এবং যে যে পুস্তক তিনি পড়েছেন তার একটি তালিকা প্রণয়ন ও প্রকাশ করবার সিদ্ধান্ত পরিষদ গ্রহণ ক'রেছেন।

৩। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্রনাথ যে সব প্রবন্ধ লিখেছেন, বক্তৃতা করেছেন এবং বিভিন্ন গ্রন্থাগারে নানা বাণী পাঠিয়েছেন—তা' একত্র সংকলন করে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করার সিদ্ধান্তও পরিষদ গ্রহণ ক'রেছেন।

৪। বাংলা দেশের গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের নিকট আমাদের অনুরোধ ঃ

(ক) শতবার্ষিক উৎসবের এক বৎসর তাঁরা বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্র জীবন, রবীন্দ্র কর্ম ও রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করুন।

(খ) বিভিন্ন সময়ে রবীন্দ্র জীবন, রবীন্দ্র কর্ম ও রবীন্দ্র সাহিত্য আলোচনার জন্য সভা আহ্বান ক'রে বক্তৃতা ও আলোচনার ব্যবস্থা করুন। এই সব সভায় রবীন্দ্র রচনা পাঠ ও আবৃত্তির ব্যবস্থা এবং রবীন্দ্র সংগীত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

এক কথায় রবীন্দ্র জীবন, রবীন্দ্র কর্ম ও রবীন্দ্র সাহিত্যের আলোচনা ও উপলব্ধি যাতে বাড়তে পারে এবং আমরা তাঁর আদর্শ ও উদ্দেশ্য বেশী উপলব্ধি ক'রতে পারি তার ব্যবস্থা করা আমাদের পবিত্র কাজ ও দায়িত্ব।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী সমিতি
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

শ্রীনীহাররঞ্জন রায়
সভাপতি

পরিষদের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনোৎসব

আগামী ১৯শে ডিসেম্বর মহাজাতী সদনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের এক পুনর্মিলনোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্যে শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, আহ্বায়ক, প্রস্তুতি সমিতির সহিত যোগাযোগ করুন।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

ভবানীপুর পাঠাগারের উদ্যোগে গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটিকা রচনা, বিতর্ক, আবৃত্তি, চিত্রাঙ্কন, সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিযোগিতা

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও ভবানীপুর পাঠাগারের উদ্যোগে এক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। অভিনব ও অনন্যসাধারণ এই অনুষ্ঠানটি বিশেষ প্রশংসা ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। প্রতিযোগিতার কয়েকটি বিষয়ে সর্বসাধারণের এবং প্রায় সকল বিষয়েরই কয়েকটি পর্যায়ে বয়স অনুযায়ী শিশু, কিশোর ও বড়দের যোগদেবার সুযোগ দেওয়া হবে। বিভিন্ন বিষয়ের খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞগণ বিচারক মন্ডলীতে আছেন। ২৪, শাঁখারীপাড়া রোড, কলিকাতা-২৫—এই ঠিকানায় বিস্তারিত খবরাখবর পাওয়া যাবে।

চব্বিশ পরগণা

বনগ্রাম সাধুজন পাঠাগারের ষড়বিংশতিতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

গত ২৮শে আশ্বিন সাধু পাঠ মন্দিরে সাধুজন পাঠাগারের ২৬তম প্রতিষ্ঠা উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ, পতাকা উত্তোলন ও শুভেচ্ছাবাণী পাঠের পর শ্রীগোপালচন্দ্র সাধু বার্ষিক কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করেন। বিবরণীতে জানা যায় যে পাঠাগারটি সম্পূর্ণরূপে নিঃশুল্ক ব্যবস্থায় চলে। বর্তমানে এটি সরকারী 'পল্লী পাঠাগার" পরিকল্পনাধীনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এতদুপলক্ষে আয়োজিত এক প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শ্রীফণিভূষণ রায়। শ্রীমনীন্দ্রভূষণ বিশ্বাস প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। নবদ্বীপ বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ অশোকনাথ মুখোপাধ্যায় পৌরোহিত্য করেন। সাহিত্য ও অভিনয়ে কৃতী হিসাবে নির্বাচিত স্থানীয় সাহিত্যিক ও শিল্পীগণকে এই সভায় পুরস্কার ও সম্বর্ধনা করা হয়।

বর্ধমান

কালনায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পাঠকেন্দ্রের উদ্বোধন

৯ই অক্টোবর স্থানীয় কংগ্রেস ভবনে নিউ ওয়েষ্ট বেঙ্গল ওয়েলফেয়ার বোর্ড পরিচালিত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পাঠকেন্দ্রের উদ্বোধন কালনা মিউনিসিপ্যালিটীর চেয়ারম্যান শ্রীপ্রকৃতিভূষণ দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন নিউ ওয়েষ্ট বেঙ্গল ওয়েলফেয়ার বোর্ডের সহ সম্পাদক শ্রীশম্ভুনাথ মল্লিক। উক্ত পাঠকেন্দ্রে কালনা কলেজের ২৫ জন ছাত্র পুস্তক লইয়া বসিয়া পড়াশুনা করিতে পারিবেন। ছাত্রদের বৈকালিক জলযোগের ব্যবস্থা থাকিবে।

বীরভূম

সিয়ান শ্রীদুর্গা সাধারণ পাঠাগারের পুনর্গঠন

পাঠাগারটি এতাবৎকাল শ্রীদুর্গা ক্লাবের একটি বিভাগ ছিল। এখন ইহা স্বতন্ত্রভাবে পরিচালিত হচ্ছে। শ্রীনিকেতন ব্লকের উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীতারক চন্দ্র ধরের সভাপতিত্বে একটি নূতন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছে। শ্রীনিবারণ চন্দ্র মন্ডল ও শ্রীমানিকচন্দ্র মন্ডল যথাক্রমে সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক পদে নির্বাচিত হয়েছেন। সরকারী অর্থ সাহায্যের জন্য পাঠাগারটি এখন সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। সম্প্রতি শ্রীমতী সন্ধ্যারাণী মন্ডল পাঠাগারে পুস্তক ক্রয়ের জন্য ১০৪৲ টাকা দান করেছেন।

নদীয়া

শান্তিপুর অঘোর-কামিনী পাঠাগার ভবনের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠান

গত ১৪ই অক্টোবর অপরাহ্ণে শান্তিপুর ব্রহ্মমন্দির প্রাঙ্গণে দেবী অঘোর-কামিনী স্মৃতি পাঠাগার ভবনের ভিত্তি স্থাপন উপলক্ষে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। শান্তিপুরের পৌরপতি শ্রীবিশ্বরঞ্জন রায় অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ও পাঠাগার ভবনের ভিত্তি স্থাপন করেন। "লেখা ও রেখা" পত্রিকার সম্পাদক শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, প্রবীণ শিক্ষক শ্রীকমলকুমার মিত্র, পণ্ডিত শ্রীঅজিতকুমার স্মৃতিরত্ন প্রমুখ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। পশ্চিম বাংলার মুখ্য-

মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মাতৃ-স্মৃতি রক্ষার্থে এই পাঠাগারটির গৃহ-নির্মাণকল্পে দুই হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করিয়াছেন ও ভবিষ্যতে আরও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

কৃষ্ণনগর গোখলে স্মৃতি গ্রন্থাগারের নরেন্দ্র পাঠকক্ষের দ্বারোদ্ঘাটন

১৫ই অক্টোবর কৃষ্ণনগরস্থ শক্তি-মন্দির নেতাজী বাগে শক্তি-মন্দিরের গ্রন্থাগার বিভাগ গোখেল স্মৃতি গ্রন্থাগারের ৪৫ তম বাৎসরিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উপমন্ত্রী শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন নদীয়া জেলা স্কুল বোর্ডের সভাপতি শ্রীফজলুর রহমন এম-এল-এ। এই গ্রন্থাগার সংলগ্ন 'নরেন্দ্র পাঠাগারের' দ্বারোদ্ঘাটন করেন শ্রীশঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এল-এ। গোখেল স্মৃতি গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীভবেশগোবিন্দ রায় সম্পাদকীয় বিবরণী পাঠ করেন। গ্রন্থাগারের সভাপতি এবং অধ্যাপক শ্রীপ্রবোধ সরকার প্রারম্ভিক ভাষণ দেন।

বার্তা বিচিত্রা

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতন হার সম্পর্কে ইউ. জি. সি.'র সুপারিশ

নয়াদিল্লীর এক সংবাদে প্রকাশ যে, ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্টস কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ গ্রন্থাগারের শিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের বেতনের হার অধ্যাপনা পর্যায়ের বেতন হারের সমতুল করার জন্য সুপারিশ করেছেন।

কমিশনের গত সভায় সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, যাঁরা স্নাতক ও এক বৎসরের শিক্ষণ প্রাপ্ত তাঁরা লেকচারারদের অনুরূপ অর্থাৎ মাসিক ২৫০৲ থেকে ৩৬০৲ টাকা বেতন পাবেন।

উপরিউক্ত গুণাবলী ছাড়াও যে সব কর্মিদের পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতা আছে তাঁরা রীডারের হার অর্থাৎ ৩০০৲ থেকে ৮০০৲ টাকা হারে বেতন পাবেন।

অধিকতর গুণাবলী সম্পন্ন ১০ বৎসরের অভিজ্ঞ কিংবা অনুমোদিত কোন বিষয়ে গবেষণা অথবা বিশেষ কোন কাজে কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন যে সব কর্মী তাঁরা প্রফেসরের বেতন হারে অধিকারী হবেন (৮০০৲—১২০০৲)।

কমিশনের সুপারিশ বিশ্ববিদ্যায়গুলি মেনে নিলে সেগুলির শতকরা ১০জন কর্মচারী এই বেতন হার লাভ করবেন।

বর্তমানে ৮টি বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রতি বৎসর প্রায় ২৫০ ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষণ লাভ করে থাকেন। এই শিক্ষণের মেয়াদ এক বৎসর। স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্সের মেয়াদ ২ বৎসর। সারা ভারতে বর্তমানে কেবল ২৮ জন ডিগ্রী প্রাপ্ত লোক আছেন।

প্যারাচুটের সাহায্যে ব্রিটিশ কাউন্সিলের গ্রন্থ সরবরাহ ব্যবস্থা

গ্রন্থ সরবরাহের নানা উপায় আছে। সাইকেল, মোটর গাড়ী, রেলপথ ও নৌকোয় করে বই বিলি করার পদ্ধতিই সকলে জানে। কিন্তু সম্প্রতি ব্রিটিশ কাউন্সিল এক অভিনব পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। সারওয়াকের উত্তর-পূর্বে বেরিও গ্রামে হেঁটে ও নৌকোয় যেতে প্রায় দু' সপ্তাহ লেগে যায়। অথচ সারওয়াকের উত্তর-পশ্চিমের জেলা হেড কোয়ার্টার মারুডি থেকে বিমান পথের দূরত্ব হল মাত্র ৯০ মাইল। সে জন্য ব্রিটিশ কাউন্সিল প্যারাচুটের সাহায্যে উক্ত পাহাড়ী গ্রামে দেড়শত গ্রন্থ সরবরাহ করেছেন। গ্রামবাসীদের গ্রন্থের প্রতি অনুরাগ প্রবল। শিশুগ্রন্থ, পাঠ্য পুস্তক ও সচিত্র বইপত্রের চাহিদাই অধিক।

সুচীকরণে ভারতীয় নামের সমস্যা সম্পর্কে সেমিনার

ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার সংস্থার (ইয়াসলিক) উদ্যোগে আগামী ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৬০ ও ১লা জানুয়ারী ১৯৬১ তারিখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সূচীকরণে ভারতীয় নামের সমস্যা ও ভারতীয় ভাষায় সূচীকরণের বিভিন্ন বিষয়ের তালিকা নির্মাণ সম্পর্কে এদটি দুদিনব্যাপী সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। এই সেমিনার সম্পর্কে ইয়াসলিক বুলেটিনের পঞ্চম খণ্ডের ২য় ও ৩য় সংখ্যায় যথাক্রমে প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী এবং শ্রীবিনয় সেনগুপ্তের একটি প্রবন্ধ (সেমিনারের উদ্দেশ্য, পরিধি ইত্যাদি সম্পর্কে) প্রকাশিত হয়েছে। এই সেমিনারে যোগদানের জন্য ইয়াসলিকের সভ্য ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও বৃত্তিকুশলী কর্মীদের যোগদানের জনা আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। এই সেমিনারে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার সংস্থার

(ইফ্‌লা) উদ্যোগে ১৯৬১ সালে সূচীকরণের বিশেষজ্ঞদের যে সম্মেলন হবে তাতে পেশ করা হবে। সূচীকরণে ভারতীয় নামের সমস্যাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ভারতীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের উপস্থিতিতে সেমিনারে এই সম্পর্কে সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ করা হবে।

গ্রন্থাগার পরিচালনে যান্ত্রিকীকরণ

হেগ-এ অবস্থিত ডেল্ট হিলার টেকনিকাল কলেজ গ্রন্থাগারে অতি আধুনিক পদ্ধতিতে বই সরবরাহের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। পাঠক কার্ড ক্যাটালগ দেখে কাউন্টারে অবস্থিত টেলিফোনে প্রয়োজনীয় বইয়ের নম্বর 'ডায়াল' করলে ঐ নম্বরটি গ্রন্থাগারের স্ট্যাকে নির্দিষ্ট স্থানে জ্বলে উঠবে। ঐ স্থানের কর্মীরা তখন সেই বইটি নিয়ে একটি বৈদ্যুতিক 'কনভেয়র' বা লিফ্‌টের সাহায্যে ইস্যু কাউন্টারে পাঠিয়ে দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে "ইলেক্ট্রনিক ব্রেণ"-এর সাহায্যে বইটি কোন পাঠককে কবে দেওয়া হ'ল ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা হবে। এই "ইলেক্ট্রনিক ব্রেণ"টি পাঠককে জানাবে তার প্রয়োজনীয় বইটি কবে বাইরে গেছে আর কবে ফিরে আসবে।

গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী

দিল্লীতে ইউনেস্কোর উদ্যোগে ও ভারত সরকারের ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ এশিয়ার গ্রন্থাগার উন্নয়ন সম্পর্কে একটি বারদিন ব্যাপী সেমিনার গত ৩রা অক্টোবর থেকে ১৪ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই সেমিনারে আফগানিস্থান বর্মা, সিংহল, ভারত, ইরাণ, নেপাল, পাকিস্থান ও থাইল্যাণ্ডের প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। সম্মেলন উদ্বোধন করতে গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ শ্রীমালী বলেছেন যে ভারতে সুসংবদ্ধভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি "আদর্শ গ্রন্থাগার আইন" প্রণয়নের চেষ্টা চলছে। এই আদর্শ আইনের অনুরূপ গ্রন্থাগার আইন বিভিন্ন রাজ্যে প্রবর্ত্তন করা হবে। বিগত কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহ গ্রন্থাগার আইন প্রবর্ত্তনের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টেও আইনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয়েছে। এই খসড়া আইন রচনাকালে গ্রন্থাগার আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিকদের সাথে আলোচনা করলে সব দিক থেকেই ভাল হ'ত বলে অনেকে মনে করছেন। ইউনেস্কোর এই সেমিনারে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে, কিন্তু এই সম্মেলনে ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদকে আমন্ত্রণ জানানো হয় নি।

বেঙ্গল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী ও স্পেশ্যাল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে যে বেঙ্গল লাইব্রেরী ডাইরেক্টরী প্রকাশের প্রস্তুতি চলছে তারজন্য এ পর্যন্ত সহস্রাধিক সাধারণ গ্রন্থাগার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এই ডাইরেক্টরীতে শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার, বিশেষ গ্রন্থাগার ও প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রন্থাগারকে ধরা হয়নি। আশা করা যায় এই ডাইরেক্টরী সত্বর প্রকাশিত হবে। বিশেষ গ্রন্থাগারসমূহেরও একটি বহু তথ্যপূর্ণ ডাইরেক্টরী প্রকাশের চেষ্টা চলেছে। ই তমধ্যে দেড়শতাধিক বিশেষ গ্রন্থাগার প্রয়োজনীয় তথ্য প্রেরণ করেছেন। ইয়াসালিক কর্তৃপক্ষ আশা করছেন ১৯৬১ সালের মধ্যে তাঁরা এই ডাইরেক্টরী প্রকাশ করতে পারবেন।

কলিকাতায় ইউনেস্কো প্রতিনিধি শ্রীমাইকেল ফডার

সরস্বতী প্রেসের শ্রীযুক্ত শৈলেন গুহ রায়ের আমন্ত্রণে ২০শে অক্টোবর অপরাহ্ণে গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে ইউনেস্কোর ডকুমেন্টেশন এন্ড ইনফরমেশন বিভাগের অধিকর্তা মিঃ মাইকেল ফডারকে আপ্যায়ন করিবার জন্য ভারতীয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সমিতি এবং মুদ্রাকর সঙ্ঘের প্রতিনিধিদের এক সভা হয়।

আলোচনা প্রসঙ্গে মিঃ ফডার বলেন যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ইউনেস্কোর সহযোগিতা পাইতে হইলে দেশের সরকারের নিকট আবেদন করিতে হইবে। সরকারের মাধ্যমে ব্যতীত ইউনেস্কোর পক্ষে কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সহযোগিতা করা সম্ভব নহে।

ইউনেস্কো বর্তমানে ভারতীয় গ্রন্থের প্রচারে নিম্নলিখিতভাবে সাহায্য করিতেছেন—

(১) ইউনেস্কো এই বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য একটি ফেলোশিপ দিয়াছেন ;

(২) ছাত্রদের জন্য পুস্তক সংগ্রহে সাহায্য করেন ;

(৩) শিশু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়া থাকেন—দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী এই সাহায্য পাইয়াছেন ;

(৪) ভারতীয় ভাষা সমূহে ২০ খানি পুস্তক প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছেন ;

(৫) বোম্বাই সহরে একটি সম্মেলনের আয়োজনে সাহায্য করিতেছেন।

আগামী গ্রন্থাগার দিবসে আমাদের কর্ত্তব্য

এ বছরের থাগার সপ্তাহ (২০শে ডিসেম্বর থেকে) পালনের সময় এগিয়ে আসছে। গ্রন্থাগার আন্দোলন এখনও তার প্রাথমিক লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে রয়েছে। বিনা চাঁদায় সব অঞ্চলের মানুষকে সবরকম জ্ঞানের অংশ নিতে সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা আজও অনেক দূরের জিনিস। মানুষের স্বশিক্ষায় পূর্ণ হয়ে ওঠার এ অধিকার আজও আমাদের সমাজে কার্যতঃ স্বীকৃত নয়। কাজেই আমরা যারা গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এই কল্যাণময় রূপকে সমাজে পূর্ণ বিকশিত করতে চাই তাঁদের দায়িত্ব সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বেড়েই গিয়েছে। দেশের সাধারণ লোক, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি তথা সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকেআমাদের বোঝাতেই হবে যে—

দেশ গড়তে মানুষ চাই—কারণ দেশ মাটিতে তৈরী নয়, দেশ মানুষে তৈরী। দেশের সব পরিকল্পনা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য যদি তা উপযুক্ত পরিমাণে উন্নত মানুষের সৃষ্টি না করে।

মানুষ গড়তে শিক্ষা চাই—এ সত্য আজ তর্কের অতীত বলে গৃহীত হয়েছে, যদিও শিক্ষা বিতরণের ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে পর্যাপ্ত কিনা তার সঠিক হিসাবনিকাশ অনেক সময়েই করা হয় না।

শিক্ষার ব্যাপক এবং গভীর বিস্তারের জন্য গ্রন্থাগার চাই—স্কুল কলেজ আমাদের দেশের অবস্থা ও প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাছাড়া স্কুল কলেজের রুটিন মাফিক ছক বাঁধা শিক্ষা ব্যক্তি-মানুষের চিন্তা ও বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশের জন্য কখনোই যথেষ্ট নয়। স্কুল-কলেজের বিতরিত শিক্ষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হ'লেও উত্তর জীবনে জ্ঞান আহরণের জন্য গ্রন্থাগার চাই।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনের জন্য গ্রন্থাগার আইন চাই সাধারণের দানের টাকায় বা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা বা চালিয়ে চলা আর সম্ভব নয়। কর্ম্মীর অর্থের যোগানের অনিশ্চয়তা বর্ত্তমানের প্রায় সমস্ত গ্রন্থাগারের জীবনেই সঙ্কট এনে দিয়েছে। এই কর্ম্মীর অর্থের যোগান স্থিরীকৃত করে দিতে পারে উপযুক্ত আইন।

উপরের কথাগুলিকে নিজ নিজ অঞ্চলের লোকের মনে জাগিয়ে দেওয়ার জন্য—

● প্রাচীর পত্র নিয়ে মিছিলের ও প্রভাত ফেরীর আয়োজন করুন—প্রাচীরে আঁটা পত্রের চেয়ে তা অনেক কার্যকরী হবে।

● সভার আয়োজন করুন—তার বক্তব্য অনেকের মনকেই স্পর্শ করবে।

● প্রদর্শনীর আয়োজন করুন—ছবি বা চার্টের উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকলে অল্পশিক্ষিতদের বা শিশুদের মনকে বিশেষভাবে স্পর্শ করবে।

● অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা করুন—সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ যত সামান্যই হোক না ক তা দাতার মনকে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সচেতন করবে।

সম্পাদকীয়

কলিকাতা কর্পোরেশনের লাইব্রেরী গ্র্যাণ্ট

পরিষদ কার্যালয়ে ইদানিং কলকাতার গ্রন্থাগারগুলি থেকে প্রতিদিনই লোক ও চিঠির মারফত এবং টেলিফোনযোগে অনেকে জানতে চান কলকাতা পৌর-প্রতিষ্ঠানের দেয় গ্রন্থাগার গ্রান্ট দীর্ঘকাল যাবৎ পাওয়া যাচ্ছে না কেন; এবং সেজন্যে তাঁদের কি করা উচিত সেবিষয়ে তাঁরা পরিষদ থেকে পরামর্শ ও নির্দেশ চান।

বস্তুতঃ পরিষদের পক্ষে সরকার বা পৌর প্রতিষ্ঠানের ভিতরের বিস্তারিত খবর জানা সম্ভব নয়। তবে সারা পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগারগুলির কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসাবে পরিষদ ওয়াকিফহাল মহলের সংস্পর্শে কিছুটা এসে থাকে বলে টুকিটাকি তথ্য সেখান থেকেই যা কিছু সংগৃহীত হয়। এবং তার ভিত্তিতেই সাধ্যমত সকলকে নির্ভুল সংবাদ সরবরাহ করে থাকে।

সহর ও রাজ্যের গ্রন্থাগারগুলির ভালমন্দ প্রশ্নের সহিত পৌর প্রতিষ্ঠান ও রাজ্য সরকারের যথেষ্ট সুবাদ আছে। গ্রন্থাগারের জন্যে উভয়েই অল্প-বিস্তর ব্যয়বরাদ্দ করে থাকেন। অথচ রাজ্যের সমস্ত গ্রন্থাগারের একমাত্র কেন্দ্রীয় সংস্থা এই পরিষদের সংগে উভয়েই কার্যতঃ কোন যোগাযোগই রক্ষা করেন না। গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের প্রতিষ্ঠান হিসাবে এর কাছ থেকে পরামর্শ ও সুপারিশ গ্রহণও করেন না। অন্ধ্র, কেরালা, মাদ্রাজ প্রভৃতি যে-সব রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সর্বাপেক্ষা উন্নত সেখানে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সংগে রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষদগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

আমরা যতদূর জানি পৌর-প্রতিষ্ঠানের দেয় গ্রান্ট ১৯৫৭-৫৮ সাল থেকে বাকী পড়েছে। এই বৎসরের প্রথম দিকে ষ্ট্যাণ্ডিং এডুকেশন কমিটি ১৯৫৭-৫৮ এবং ১৯৫৮-৫৯ সালের জন্যে গ্রন্থাগার বাবদ বাজেটে বরাদ্দ করা ১ লাখ ১০ হাজার টাকার অনেক বেশী অর্থের সুপারিশ করে গ্রন্থাগার গ্রান্ট মঞ্জুর করেছেন বলে বিষয়টি এখন ষ্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির বিবেচনাধীনে আছে। ফিনান্স কমিটি বিষয়টি এডুকেশন কমিটির কাছে টাকা কমাবার জন্যে ফেরৎ পাঠাবেন,

নাকি অনুমোদন করে পৌর প্রতিষ্ঠানের কাউন্সিলের সামনে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্যে প্রেরণ করবেন তা বলা শক্ত। পৌর প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আর্থিক সংকটে অনুমোদনের সম্ভাবনা একদিকে যেমন কম তেমনি টাকা কমিয়ে সহরের সোয়া দুই শ' গ্রন্থাগারের অসন্তুষ্টি ঘটানো অপেক্ষা ঘাটতি টাকা মঞ্জুরিকৃত করার সম্ভাবনাও রয়েছে।

এই সহরের গ্রন্থাগারগুলি চাঁদার অর্থ ও মূলতঃ স্বেচ্ছাসেবায় পরিচালিত হয়ে থাকে। আলো, ঘর-ভাড়া ইত্যাদির খরচ যোগানোর পর বইপত্র কেনার জন্যে বলতে গেলে কিছুই থাকে না। সরকার ও পৌর প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্যের অপেক্ষায় তারা দিন গোনে। সরকার গোটা সহরের আড়াই শ' গ্রন্থাগারের জন্যে বছরে ন্যূনাধিক বার হাজার টাকা খরচ করেন। কাজেই সব গ্রন্থাগারের ভাগ্যে লটারীর টিকিট ওঠে না। যাদের ওঠে তারা পায় বড় জোর একশ' টাকা। পৌর প্রতিষ্ঠান খানিকটা খোলা হাতেই অর্থ বন্টন করেন। কারণ তার বাজেটে সরকারের পাঁচ গুণ অর্থ মঞ্জুর করা হয়। দুঃখের বিষয় টাকাটা পাওয়া যায় অত্যন্ত দেরিতে।

এছাড়াও পৌর প্রতিষ্ঠানের গ্রান্ট এর বিধিব্যবস্থায় প্রচুর গলদ আছে। তার কয়েকটির উল্লেখ করলেই চলবে। প্রথমতঃ গ্রান্টের নির্দিষ্ট কোনও নিয়ম-কানুন নেই। দ্বিতীয়তঃ গ্রান্টের জন্যে দরখাস্ত জমা দেবার তারিখ জানতে হলে শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সারা বছর নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হয়। তৃতীয়তঃ গ্রন্থাগারগুলির গ্রান্ট পাওয়া না পাওয়া সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলার-দের স্বাক্ষরের উপর নির্ভর করে। ব্যক্তিগত আক্রোশ বশতঃ পৌরপিতা স্বাক্ষর না দেওয়ায় হামেশাই দেখা যায় গ্রান্টের দরখাস্ত বিবেচিত হচ্ছে না, নয়ত মঞ্জুরিকৃত অর্থ পৌরপিতার স্বাক্ষরের অভাবে আটকে থাকছে। অস্তিত্বহীন প্রতিষ্ঠান গ্রান্ট পাচ্ছে এবং তাও হয়ত বিনা দরখাস্তে। অর্থাৎ পৌরপিতার স্বাক্ষর থাকলে অস্তিত্বহীন গ্রন্থাগারও গ্রান্ট পেয়ে যায়, অন্যদিকে পৌরপিতার সঙ্গে মনান্তর হবার ফলে অনেক ভাল গ্রন্থাগারেরই গ্রান্ট আটকে যায়। সবচেয়ে অদ্ভুত বিষয় এই যে বাড়ীওয়ালাকে গ্রন্থাগারের দেয় ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে থাকা সত্ত্বেও গ্রন্থাগারকে প্রদত্ত গ্রান্ট থেকে বাড়ীওয়ালার বকেয়া টেক্সোর টাকা কেটে নেওয়া হয়।

সহরের পৌরপিতাদের অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। গ্রন্থাগারগুলির উন্নতির জন্যে তাঁদের খুবই আগ্রহ ও

সহানুভূতি আছে। তবুও পৌর প্রতিষ্ঠানের বহুবিধ কার্যাবলীর মধ্যে একমাত্র প্রশংসিত শিক্ষা বিভাগীয় প্রচেষ্টার মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত এই বিষয়টি কলঙ্কের পরিচয় দিচ্ছে কেন তা বুঝতে পারি না।

নিখরচায় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার দায়িত্বকে পৌর-প্রতিষ্ঠান কৃতিত্বের সহিত যেমন পালন করেছেন, ঠিক তেমনি সম্পূর্ণ নিখরচায় গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ সুবিধা দানের দায়িত্ব পালন পৌর প্রতিষ্ঠানের একটি নীতিগত কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। এ দায়িত্ব লণ্ডন, রোম, আমস্টার্ডাম প্রভৃতির পৌর প্রতিষ্ঠান কার্যে রূপায়িত করেছেন বহুকাল পূর্বে।

দৈনন্দিন জীবনে নাগরিকদের বহু প্রাথমিক অধিকারই যেখানে অবহেলিত সেই সহরে Free Library Service এর আশা দুরাশা মাত্র। কিন্তু প্রজ্ঞানানন্দ পাঠগৃহ নামক একটি ভাল গ্রন্থাগার পাওয়া সত্ত্বেও পৌর প্রতিষ্ঠান আজও পর্যন্ত তাঁদের একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের দীর্ঘকালের প্রতিশ্রুতি পালনে ব্যর্থ হলেন কেন ?

কলকাতার গ্রন্থাগারগুলির নানাবিধ সমস্যা ও বকেয়া গ্রান্টের প্রসঙ্গ পরিষদ নানাভাবে পৌরপিতাদের গোচরে এনেছেন। কিন্তু তা যে নিষ্ফল হয়েছে সেকথা বলা বাহুল্যমাত্র।

ব্যাপারটি আমাদের একটি কথা যেন মনে করিয়ে দেয় যে কারুর দয়াদাক্ষিণ্য বা অনুকম্পার ভরসায় গ্রন্থাগারের ন্যায় সমাজজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের নির্ভরতা বিপজ্জনক। পৌর প্রতিষ্ঠানের অর্থে জনসাধারণের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। কিন্তু আইনানুগ কোনও ব্যবস্থা না থাকায় আজ সহরের গ্রন্থাগারগুলি আর্থিক অসচ্ছলতা ও অনিশ্চয়তায় বহুবিধ অসুবিধা ভোগ করছে।

সহরের গ্রন্থাগারগুলিকে তাদের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ সেগুলিকে সঙ্ঘবদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করছে। গ্রন্থাগারগুলি পরিষদের সঙ্গে যথোচিত সহযোগিতা না করলে এ প্রচেষ্টা সাফল্য লাভ করবে না।

সহরের গ্রন্থাগারগুলিকেও নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। নিজ নিজ ওয়ার্ডের পৌরপিতাকে পৌর প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্যের বিষয়ে যত্নবান করে তোলা তাদের আশু কর্তব্য।

—অরুণকান্তি দাসগুপ্ত

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

কার্তিক ১৩৬৭

পুঁথির সূচী

বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়

আমাদের দেশে যত রকম পড়্‌বার উপকরণ আছে পুঁথি তার মধ্যে একটা। আজ ছাপাখানার দৌলতে পুঁথির গৌরব ম্লান হ'য়ে প'ড়েছে বটে, কিন্তু এখনও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এবং সংস্কৃতের পড়াশুনোর ক্ষেত্রে পুঁথির গুরুত্ব অসাধারণ। প্রাচীন কবিরা তাঁদের রচনা গেয়ে বা আবৃত্তি ক'রে লোকদের শোনাতেন। উৎসাহী শ্রোতা, পেশাদার গাইয়ে বা কথকেরা কখনও কখনও তাঁদের এই সব রচনা সংগ্রহ করবার চেষ্টা ক'রতেন। যাঁদের পক্ষে সম্ভব হ'ত তাঁরা সরাসরি লেখকের রচনা নকল ক'রে নিতেন। কিন্তু অনেকের পক্ষেই এই সুযোগ ঘটে উঠত না। তাঁদের ঐ সব রচনা সংগ্রহ ক'রতে হ'ত—হয় কোন পাঠক বা গায়কের মুখ থেকে শুনে—নয়ত আর কারুর সংগ্রহের নকল থেকে। এই রকম ভাবে এক পুঁথির অনেকগুলো প্রতিলিপি গ'ড়ে উঠ্‌ত। কালে কালে এই গুলোর সংখ্যা যেত বেড়ে। অবস্থা তখন এমন দাঁড়াত যে আসল পুঁথি কোন্‌টা আর কোন্‌টা নকল আর কোন্‌টা নকলের নকল এ বোঝাই হ'ত ভার। এর মধ্যে কোন পুঁথি যদি ছাপাখানার দৌলতে জনসমাজে স্বীকতি পেয়ে যেত-তা'হ'লে আর সব পুঁথি পড়ে থাকত অবহেলার আস্তাকুঁড়ে। সাধারণ পাঠক হাতে-লেখা অক্ষর পড়বার কষ্ট স্বীকার ক'র্‌তে চায় না। বাড়ীতে হাতে-লেখা পুঁথি থাক্‌তেও তারা ছাপার বই কিনে পড়াশুনা ক'র্‌তে থাকে। ফলে ঐ সব পুঁথির যে কোন রকম প্রয়োজন আছে বা থাক্‌তে পারে একথা কারুর মনেই হয় না।

কিন্তু কখনও কখনও দিন আসে পরীক্ষার। ঐ ছাপান পুঁথি প্রকৃত পন্ডিত বিচারকের হাতে প'ড়ে যায়। তখন দেখা যায় ওর সব জায়গায় ঠিক মিল নেই।

মনে হয় কোথায়ও হয়ত অদরকারী কথা জুড়ে দেওয়া হ'য়েছে, কোথায়ও হয়ত বলবার কথার খেঁই হারিয়ে গেছে। তখন খোঁজ প'ড়ে যায় পুঁথির—আরও পুঁথির। ঐ আস্তাকুড়ের ছাই গাদার ভেতর সন্ধান ক'রতে ক'রতে পাওয়া যায় অযত্নে-ফেলে-দেওয়া বহুমূল্য মাণিকের। একশ' বছরের না বোঝা বা ভুল বোঝা জায়গা গুলোর মানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে।

ছাপা বই নিয়ে গবেষণা করতে পুঁথির যে কত দরকার পড়ে তা সংস্কৃত বা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যে কোন গবেষকের সঙ্গে আলোচনা ক'রলেই বোঝা যাবে। কিন্তু আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের বেশীর ভাগই আজও ছাপাখানার সভ্য পোষাকের অভাবে সাধারণ মানুষের সমাজে পরিচিতও হ'তে পারেনি—একথাও আমাদের মনে রাখ্‌তে হবে। এই অ-ছাপা বইয়ের পুঁথিগুলোকে আরও বেশী দামী মনে করা হয়। ছাপা বইয়ের পুঁথি-গুলো কোন্ অনিশ্চিত ভবিষ্যতে কাজে আস্‌বে বা আস্‌বে না এই সন্দেহ যাঁদের মনে ওঠে তাঁরা ওগুলোকে খুব কিছু গুরুত্ব দিতে চান না—কিন্তু অ-ছাপা বইয়ের পুঁথির কথা শুন্‌লে তাঁরাই আবার অনেক বেশী আগ্রহ নিয়ে ওগুলো জোগাড় ক'রে থাকেন।

আমাদের দেশের যে সব গ্রন্থাগার প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বা সংস্কৃতের গবেষণায় সাহায্য ক'র্‌তে চায়—পুঁথি তাদের সংগ্রহ করতে হয়ই। যে সব সাধারণ গ্রন্থাগার এমন এমন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত যে সেখানের প্রাচীন ঐতিহ্য আছে—সেখানে এককালে লেখকদের বা কথকদের, গায়কদের বাড়ী ছিল, কিংবা সেখানে প্রাচীন টোল বা বিদ্যার চর্চা ছিল—সেই সব গ্রন্থাগারকেও স্থানীয় সংগ্রহ হিসাবে পুঁথি সংগ্রহ ও রক্ষা ক'রতে হয়।

এখন কথা হ'চ্ছে এই সব পুঁথিগুলোকে পাঠকদের উপকারের জন্য কেমন ভাবে সাজাতে হবে—কেমন ভাবে তৈরী ক'র্‌তে হবে এদের সূচী। আজ একথা সকলেই মেনে নিয়েছেন যে গ্রন্থাগারের বই, পুঁথি বা পড়্‌বার অন্যান্য উপকরণ শুধু জড় ক'র্‌লে চ'ল্‌বে না—সেগুলোকে ঠিকমত গোছাতে হবে—তার উপযুক্ত সূচী (catalogue) তৈরী ক'রতে হবে এবং পাঠকের বোঝবার মত ক'রে এগুলোকে রাখতে হবে।

প্রধান প্রধান গ্রন্থাগারে ছাপা বইয়ের সূচী হয় অনুবর্গ (classified) বা অনুবর্ণ (Dictionary)। এই দুই রকম সূচীতেই গ্রন্থকারের নাম জানা থাকলে বা গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় জানা থাকলেই যাতে বইখানা খুঁজে পাওয়া

যায় তার ব্যবস্থা থাকে। সুতরাং প্রত্যেকখানা বইয়ের অন্ততঃ দুইখানা ক'রে সূচক পত্রক (Index card) তৈরী ক'রতে হয়। একখানায় বইখানার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ থাকে—আর এক খানায় থাকে মাত্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ। ছাপা বইয়ের পূর্ণাঙ্গ সূচকে (main card) থাকে (১) শিরোনামা (Heading) (২) আখ্যাপূর্বক, আখ্যা পত্রের প্রয়োজনীয় অংশের অবিকল নকল (title) সংস্করণ সংখ্যা ও গ্রন্থকার, অনুবাদক, সম্পাদক প্রভৃতির নাম (৩) প্রকাশের স্থান, প্রকাশকের নাম, প্রকাশকাল, (Imprint) (৪) কলেবরের বিবরণ (collation) এবং (৫) টিপ্পনী (annotation)। অনুপূরক সূচকে (Added entry) এত কিছু দেওয়া হয় না। উপযুক্ত শিরোনামা আর বইখানা বুঝতে যতটুকু না লিখলে নয় তাই মাত্র লেখা হয়।

এখন পুঁথির সূচী কেমন হবে? ছাপা বইয়ের সূচীর মত ক'রে পুঁথির সূচী তৈরী করা হবে, না এগুলো ভিন্ন আকারের ক'রতে হবে এই হ'চ্ছে আমাদের আলোচ্য।

পুঁথিও যে বই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একটা বিষয়ের সমস্ত পড়বার উপকরণের হদিস একসঙ্গে পাওয়া উচিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্তও নিশ্চয়ই খুবই সমীচীন। সুতরাং প্রথমেই মনে হয় পুঁথির সূচী-গুলোকে বইয়ের সূচীর মতন তৈরী ক'রে একসঙ্গে রাখাই যুক্তিযুক্ত।

কিন্তু বিষয়টা একটু ভেবে দেখা দরকার। পুঁথি পড়তে হ'লে শুধু বিষয়ের জ্ঞান বা অনুরাগই যথেষ্ট নয়। পুঁথি পড়তে চাই অসীম ধৈর্য, আর প্রাচীন অক্ষরের জ্ঞান। পুঁথির প্রয়োজন সাধারণের নয় গবেষকদের। সুতরাং সাধারণ ছাপা বইয়ের সূচীর সঙ্গে পুঁথির সূচী মিশিয়ে রাখলে সাধারণ পাঠককে অযথা অনাবশ্যক অনেকগুলো পত্রকের বেড়া ডিঙিয়ে তবে তার প্রয়োজনীয় সূচীটি পেতে হবে। এতে পাঠকের সময় বাঁচাবার যে নির্দেশ গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান দিয়েছে তাকে অমান্য করা হবে এবং বহুকষ্টে-তৈরী-করা পুঁথির সূচীগুলোর পরমায়ু কমিয়ে দেওয়া হবে।

বর্গীকরণের ক্ষেত্রে আমরা স্বতন্ত্র বা সমান্তরাল বর্গের (Parallel classification) কথা শুনে আসছি। একই বিষয়ের বই বিভিন্ন ভাষায় থাকলে গ্রন্থাগার, পাঠকের সুবিধা হবে মনে ক'রলে প্রত্যেক ভাষার বইগুলোকে আলাদা ক'রে সাজাতে পারেন এবং সেগুলো যাতে না মিশে যায় সেই জন্যে বই-গুলোর বিষয় সঙ্কেত সংখ্যার সঙ্গে একটা ক'রে ভাষাজ্ঞাপক বর্ণ জুড়ে

দিতে পারেন। যদিও এক বিষয়ের বই বিভিন্ন ভাষায় লেখা হ'লেও সে গুলোকে একসঙ্গে সাজানই সাধারণ বিধি তবুও পাঠকের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে এর একটু ব্যতিক্রম স্বয়ং ডিউইই অনুমোদন ক'রে গেছেন। আমরা পুঁথির সূচীর ক্ষেত্রেও স্বতন্ত্র সূচীকরণের (Parallel cataloguing) সমর্থন ক'রছি। সাধারণতঃ সব রকম পড়ার উপকরণের সূচী এক সঙ্গে রাখা উচিত হ'লেও পাঠকের দরকার অদরকার লক্ষ্য ক'রে পুঁথির সূচীকে আলাদা রাখলে অন্যায় হবে না এই আমাদের অভিমত।

এখন পুঁথির সূচী (index) কী কী বিষয়ের খোঁজ দেবে ? সব চেয়ে প্রথমে পুঁথির ক্রমিক সংখ্যা ও অবস্থান মূলক সংখ্যা দিতে হবে এ কথা বলা বাহুল্য। এইটুকুতে ছাপা বই আর পুঁথির মধ্যে কোন বিশেষ না থাকলেও তারপর থেকেই আরম্ভ হয় পুঁথির সম্বন্ধে বিশেষ ব্যবস্থা। একই বইয়ের একই সংস্করণের ছাপা দু'খানা বইয়ের প্রতিলিপির মধ্যে বিশেষ কিছু তফাৎ থাকে না। তাই বইখানার পূর্ণাঙ্গ বিবরণেও আমরা যতটুকুর উল্লেখ ক'রেছি তার বেশী কিছু জানাবার দরকার হয় না। কিন্তু পুঁথির বেলায় একথা খাটে না। প্রত্যেক খানা পুঁথির আগাগোড়া—একটি একটি অক্ষর ক'রে ধীরে ধীরে লিখতে হয়। লেখবার সময় পাঠকের অন্যমনস্কতার জন্যে, বোঝবার ভুলের জন্যে কিম্বা অন্য কারণে ঠিক্ ঠিক্ নকল করা হ'য়ে ওঠে না। প্রতিলিপিকার পণ্ডিত হ'লে মানে বুঝে লিখতে চান এবং মানে বুঝতে না পারলে মূলের হেরফের ক'রে বোঝার মত পাঠ লেখেন। প্রতিলিপিকার অপণ্ডিত হ'লে না বুঝে লেখেন, ফলে অনেক সময় ভুল পড়েন এবং ভুল লেখেন। সুতরাং একই পুঁথির দু'খানা নকল অবিকল এক রকম হয় না। নকল আরম্ভ ক'রে অনেক সময় বইখানা শেষ করা হ'য়ে ওঠে না। তার উপর আমাদের দেশের পুঁথি প্রায়ই বাঁধা হ'ত না ব'লে তার পাতাগুলো এদিকে ওদিকে সরিয়ে ফেলা খুব সহজ ছিল। পুঁথির এক অংশ ব্যবহার করার দরকার হ'লে সমস্ত পুঁথির থেকে সেই অংশটাকে আলাদা ক'রে নেওয়া হ'ত। এতে পুঁথিগুলো হয়ে প'ড়ত খণ্ডিত। হাতে-লেখা পুঁথি যতগুলো পাওয়া গেছে তার রকম বার আনা অংশই এই রকমে খণ্ডিত। হয় তার গোড়া নেই, নয় শেষ নেই, নয় মাঝখানের কয়েকখানা পাতা পাওয়া যায় না। এই সব কারণে পুঁথির কলেবরের বিবরণে অনেক বেশী খবর থাকা দরকার।

সাধারণতঃ পুঁথির কলেবরের বর্ণনায় লেখা থাকে এর উপাদানের কথা। পুঁথিটি যদি কাগজে লেখা হয় তবে কাগজ হাতের না কলের তাও লেখা হয়। এতে পুঁথির বয়স বোঝবার সুবিধা হয়—সেটা নিয়ে কাজ করা সুবিধা হবে কিনা তাও বুঝতে পারা যায়। যেমন তালপাতার বা ভোজপাতার পুঁথি যদি পুরাণো হয় তবে তার থেকে পাঠ উদ্ধার করা খুবই শক্ত। হাতে তৈরী কাগজ সাধারণতঃ ভঙ্গুর হয় না—এবং নাড়াচাড়া করার উপযুক্ত থাকে। উপাদানের পর লিখতে হয় পুঁথির আকার—এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের বর্ণনা। তার পর পাতার সংখ্যা। আমাদের দেশের পুঁথিতে সাধারণতঃ এক পিঠেই পাতার সংখ্যা লেখা হ'ত। ছাপা বইয়ের মত, পুঁথির ডান বাম নেই, কিংবা বিজোড় অক্ষর এক দিকের পাতায় হবে এমন নিয়ম নেই। সুতরাং পুঁথির পত্রমুখ (Recto) বা পত্রপৃষ্ঠ (Verso) নির্ণয় করার বাঁধা গদ্ নেই। তবুও অনেক সময়ই একই বইয়ের শেষ হ'য়ে যাওয়া পাতার ঠিক্ পর থেকেই আরম্ভ করা হয় আর এক খানা বই। তাই এই বইয়ের আরম্ভ ও ঐ বইয়ের শেষ ঠিক্ কোন্ খান থেকে হ'ল তা' বোঝাবার জন্য সঙ্কেতের দরকার। সেইজন্য পুঁথির পাতার যে ভাগে পত্রসংখ্যা লেখা থাকে, তা পত্রমুখ মনে করা হয় আর তাকে বোঝান হয় 'ক' এই চিহ্ন দিয়ে—আর যে ভাগে পত্রসংখ্যা লেখা থাকে না তাকে পত্রপৃষ্ঠ মনে করা হয় আর তা' বোঝান হয় 'খ' এই চিহ্ন দিয়ে। সুতরাং পুঁথির কলেবরের বর্ণনায় আমরা অনেক সময় পাতার সঙ্গে 'ক' বা 'খ' যুক্ত দেখতে পাই।

পাতার সংখ্যার পর উল্লেখ ক'রতে হয়—প্রত্যেক পাতার পংক্তির সংখ্যা এবং প্রত্যেক পংক্তিতে শব্দের সংখ্যা। একথা বলা বাহুল্য পুঁথির লেখায় সব পাতার পংক্তির সংখ্যা সমান হয় না বা সব পংক্তিতে একই সংখ্যক শব্দ থাকে না। তবুও ঐ সংখ্যাগুলো গড় বোঝবার পক্ষে সুবিধা ক'রে দেয়। এছাড়াও পুঁথিতে মোট শ্লোক সংখ্যা কত তাও লেখা হয়। মোটের উপর নানাদিক্ দিয়ে পাঠককে পুঁথির কলেবরের সবরকম খবর দেওয়া হয়। পুঁথিটি সম্পূর্ণ অবস্থায় আছে—খণ্ডিত অবস্থায় আছে একথাও বিবরণে লিখে দেওয়া হয়। এত সব খবর দেবার উদ্দেশ্য খণ্ডিত পুঁথিটি সম্পূর্ণ পুঁথির কতটুকু অংশ অভিজ্ঞ পাঠক যাতে সেটা সহজেই বুঝতে পারেন। তারপর লিখতে হয় পুঁথির ভাষা। সংস্কৃত ভাষার পুঁথি হ'লে তার লিপির নামও লেখা দরকার—কেননা ভারতের সব অঞ্চলের লিপিতেই সংস্কৃতের পুঁথি লেখা হ'য়েছে। যদি লিপিটা পাঠকের

জানা না থাকে তা' হ'লে তার পক্ষে পুঁথিখানা ব্যবহার অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। সুতরাং বিভিন্ন লিপিতে লেখা একই পুঁথির মধ্যে থেকে পাঠক আপনার জানা লিপির বই খানারই খোঁজ প্রথমে ক'রে থাকে। তারপর পুঁথির শারীরিক অবস্থা—ভাল বা জীর্ণ তা লেখা হয়। আর লেখা হয় পুঁথিখানা মোটামুটি শুদ্ধ বা অশুদ্ধ সেই কথা। স্পষ্টতঃ বোঝা যাচ্ছে বইয়ের সূচী করার চেয়ে পুঁথির সূচী ক'রতে বিষয় সম্বন্ধে ঢের বেশী জানাশুনো থাকা দরকার।

আগের ঐ সব বিবরণ-ই কিন্তু পুঁথিটাকে সনাক্ত করার পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রত্যেক পুঁথিতেই তাই লিখ্‌তে হয় তার আরম্ভের কয়েকটা পংক্তি এবং শেষের কয়েক পংক্তি। খণ্ডিত পুঁথিখানার কতটুকু আছে এই বিবরণ থেকে তা' স্পষ্ট হ'য়ে যায়। সুরু আর শেষের বিবরণের পর লিখ্‌তে হয় পুষ্পিকা (colophon)। এই পুষ্পিকা থেকেই পুঁথিখানার ও তার গ্রন্থকারের নাম জানা যায়। পণ্ডিত সূচীকাররা অবশ্য সব সময় পুষ্পিকা মাত্রের উপর নির্ভর করেন না। বইখানা প'ড়েই তাঁরা এর নাম প্রভৃতি নির্ণয় ক'রে থাকেন। তবুও পুষ্পিকাটুকু প্রত্যেক সূচীতেই নকল ক'রে দিতে হয়। ঐ পুষ্পিকাই হ'চ্ছে আধুনিক আখ্যাপত্রের (Title Page) প্রতিনিধি। ওখানেই লেখকের নাম ও বইয়ের নাম লেখা থাকে। দুঃখের বিষয় অনেক পুঁথিরই পুষ্পিকা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। অনেক পুঁথিতে পুষ্পিকার পর পুঁথির লিপিকারের নাম বা অধিকারীর নাম বা অন্য কিছু লেখা থাকে। একে বলে উত্তর পুষ্পিকা (Postcol-ophon)। এর থেকে অনেক সময় পুঁথির গুরুত্ব বোঝা যায়। পুঁথির পাশে পাশে যদি টিপ্পনী বা এই রকম কিছু লেখা থাকে তাও সূচীতে লিখে দিতে হয়। যদি ঐ পুথি কোন ভাল পণ্ডিতের পড়ান'র কাজে ব্যবহৃত হ'য়ে থাকে তা' হ'লে এই টিপ্পনীর মূল্য অনেক বেশী।

উপরে যেগুলো বলা হ'ল এই পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করা খুব কঠিন নয়। এ অনেকটা ছকে ফেলা গতানুগতিক কাজ। কিন্তু পুঁথির সূচীকে প্রকৃত মূল্যবান্‌ ক'রতে হ'লে আরও অনেক বিষয় এর সঙ্গে যোজনা করা দরকার। সেগুলো হ'চ্ছে পুথির বিবরণ। পুঁথিটি যদি ছাপান বা সর্বজন-পরিচিত হয় তা' হ'লে এই অংশের জন্যে বেশী মাথা ঘামানো উচিত নয়। পুথিটির ভাল সংস্করণ কোথায় কোথায় পাওয়া যায় সেইটুকু লিখে দিলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'য়ে যায়। কিন্তু যদি ছাপান পুথির থেকে বেশ কিছু পাঠান্তর লক্ষ্য করা যায় আর ঐ সব পাঠান্তরের যদি গুরুত্ব আছে ব'লে মনে হয় তবে সূচীতে স্পষ্ট

লেখা উচিত বইখানি এ সব জায়গায় ছাপা হ'য়ে থাকলেও এর পাঠান্তরের জন্য গুরুত্ব আছে।

যে পুঁথি ছাপা পাওয়া যায় না—তার বিষয় বিস্তৃত ভাবে লিখতে হয়। ঐ পুঁথির আলোচিত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখা দরকার। অবশ্য এ কাজ খুব সহজ নয়। আমাদের দেশে সংস্কৃতকে একটা মাত্র শাস্ত্র যাঁরা মনে করেন তাঁরা অনেকেই খেয়াল রাখেন না ইংরেজীর মত সংস্কৃতও মাত্র একটা ভাষা। ইংরেজীতে যেমন বিজ্ঞান, রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি আছে সংস্কৃতেও তেমনই ঐ সব বিষয় একজনের পক্ষে এতগুলি বিষয় আছে অধিগত করা সম্ভব নয়—দুই তিন চারজন সূচীকারের পক্ষেও সংস্কৃতের সব বিষয়ের সব পুঁথি পুরাপুরি বোঝা ও ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তাই সব পুঁথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঠিকমত লেখা সহজ নয় তবুও মনে রাখ্তে হবে যে ছাপা বই জোগাড় করা অনেক সহজ। কিন্তু পুঁথি জোগাড় করা কষ্টকর। তাই কোন গবেষক পুথি জোগাড় করার আগে মোটামুটি জান্তে চান যে ঐ পুথির গুরুত্ব তাঁর পক্ষে কতখানি। সূচীর থেকে পুঁথির আলোচিত বিষয়ের অন্ততঃ নির্ঘন্টটুকু না পেলে সেই সূচী দিয়ে তাঁর বিশেষ কাজ হয় না। সুতরাং অ-ছাপা বইয়ের সূচী ক'র্তে হ'লে তার আলোচিত বিষয়ের নির্ঘন্টটুকু যোগ ক'রে দিতেই হবে।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা গেল যে পুথির যে রকম সূচীর কথা আমরা ব'ল্লাম এ সাধারণ সূচী নয়। একে বিবরণাত্মক সূচী (Descriptive) (Catalogue) বলে। এর আকার সাধারণতঃ হয় বইয়ের মত। যে সব গ্রন্থাগারে পুথির ভাল সংগ্রহ আছে তার এই রকম সূচী থাকা একান্ত দরকার। আর ঐ সূচী সারা জগতের সর্বত্র সংগৃহীত ক'রে রাখা হয়।

সাধারণতঃ বিষয় হিসাবে পুঁথিগুলোকে ভাগ করে এক এক বিষয়ের সব পুথির বিবরণ পর পর লেখা হয়। সব শেষে ঐ সমস্ত পুথির এক অনুবর্ণ তালিকা যোগ করা হয়। এই তালিকায় প্রত্যেক নামের সঙ্গে সঙ্গে মূল সূচীর ক্রমিক সংখ্যা লেখা থাকে। এই তালিকার সাহায্যে কোন পুথির বিস্তৃত বিবরণ খুজে নেওয়া হয়।

পুঁথি শব্দের স্থলে যেখানে পুথি মুদ্রিত হইয়াছে, উহাকে পুঁথি ধরিয়া লইবেন।

পশ্চাৎপট

এস, আর, রঙ্গনাথন

কৃষ্ণা দত্ত কর্তৃক অনূদিত

০৬১ মাদ্রাজ

স্বপ্রদেশ মাদ্রাজের জন্য একটি গ্রন্থাগার বিল রচনা করলাম। গ্রন্থাগার উন্নয়নের একটি পরিকল্পনাও তৈরী করলাম। এটি ছিলো তিরিশ বছরের পরিকল্পনা। এতে করে সমস্যার একটি বাস্তব চিত্রও পাওয়া গেল। এম, আর, ইউ, সাবুর তখন শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা ছিলেন। আমার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তিনি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

০৬২ মধ্য প্রদেশ

১৯৪৬ সালে, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে ভাওয়ালকর আমার সাথে দেখা করেন। তিনি ছিলেন উদ্দীপনার প্রতিভূ। আমার মাদ্রাজ পরিকল্পনা তিনি অনুধাবন করলেন। তিনি তাঁর নিজের রাজ্য মধ্য প্রদেশের জন্য একটি পরিকল্পনা রচনা করতে বললেন। কয়েক-মাস আগে নাগপুরে প্রথম মধ্য প্রদেশ গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করি। তখন আমি উপাধ্যক্ষ জাষ্টিস্ পুরানিকের অতিথি ছিলাম। তাঁর মধ্যে মধ্য প্রদেশ গ্রন্থাগার আন্দোলনের বন্ধুকে খুঁজে পেলাম। এই স্মৃতি আমাকে উৎসাহিত করলো। মধ্য প্রদেশের জন্য গ্রন্থাগার আইনের খসড়া তৈরী করলাম। এর সংগে ত্রিশ বর্ষ উন্নয়ন পরিকল্পনা সংযোজন করেছিলাম। ভাওয়ালকর, তাঁর শিক্ষামন্ত্রী, এস, ভি, গোখেলের কাছে পরিকল্পনাটি পাঠিয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ স্যার মরিস গয়ারের নিমন্ত্রণে দিল্লীতে উপস্থিত হলাম। গোখেলের দিল্লীতে আসার কথা ভাওয়ালকর আমায় জানিয়ে ছিলেন। তাঁর সাথে দেখা করলাম। তিনি গ্রন্থাগার আইনে আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি কথা দিলেন। গ্রন্থাগার আইন পরিকল্পনাটি তিনি যত্ন সহকারে অনুধাবন করবেন। বিলটি উপস্থাপিত

করার আগেই তিনি অর্থ মন্ত্রী হ'ন। ১৯৪৯ সালে জানুয়ারী মাসে অষ্টম সারাভারত গ্রন্থাগার সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে নাগপুরে গিয়েছিলাম। গোখেল তাঁর উত্তরসূরী পি, কে, দেশমুখের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি বয়সে নবীন ছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন বিলটি জুলাই মাসে আইন সভায় উপস্থাপিত করবেন। আমলাতন্ত্র আবার হস্তক্ষেপ করলো। ২১শে জুলাই, ১৯৪৯। এক চিঠিতে জানানো হোল, "গ্রন্থাগার আইন, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সহায়ক হবে কিনা এই বিষয় আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ, প্রকৃত পক্ষে খুব অল্পসংখ্যক গ্রন্থাগার বর্তমানে আছে এবং অদূর ভবিষ্যতে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রতিষ্ঠাণগুলির চেষ্টায় বহু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। অবশ্য গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য আমি সর্ব উপায়ে উৎসাহ দিচ্ছি। আমার মনে হয়, এখনই বিলটি আইন সভায় উপস্থাপিত করার যথাযথ সময় নয়। আশাকরি, এ সম্বন্ধে আপনি আমার সঙ্গে একমত হবেন।"

উত্তরে লিখলাম, "আমি আপনার সঙ্গে একমত যে আপনার রাজ্যে খুব অল্প সংখ্যক গ্রন্থাগার আছে। সেজন্যও গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজন আছে। এছাড়া, গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার আর কোন উপায় নেই।" কিন্তু একথা আমলাতন্ত্রের চিরাচরিত নীরবতার সম্মুখীন হোল।

০৬৩ ত্রিবাঙ্কুর

১৯৪৭ এর ফেব্রুয়ারীতে কোট্টায়মে গ্রন্থাগার সম্মেলন উদ্বোধন করার জন্য ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আমন্ত্রণ জানালো। সি, পি, রামস্বামী আয়ার তখন রাজ্যেশ্বর দেওয়ান। ত্রিবাঙ্কুর যাত্রার পূর্ব মুহূর্তে, ত্রিশ বর্ষ উন্নয়ন পরিকল্পনা সংযোজিত ত্রিবাঙ্কুরের জন্য একটি গ্রন্থাগার আইনের খসড় প্রস্তুত করলাম। সেটি সি, পি, রামস্বামী আয়ারের কাছে অগ্রীম পাঠিয়ে দিলাম। কিন্তু সম্মেলনের সময় ঘটনাচক্রে তিনি দিল্লীতে ছিলেন। এবং শিক্ষা অধিকর্তাকে এ সম্মেলনে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিয়ে এসেছিলেন। সমবায় সমিতির পরিচালককে নিয়ে তিনি আমার সাথে দেখা করলেন। তাঁরা বললেন, তিরিশ বছর বড় দীর্ঘ সময় আমি বল্লাম, "সম্ভব হলে তার আগেই পরিকল্পনাটি কার্যকরী করুন।" ফেরার পথে মাদ্রাজে সি, পি, রামস্বামী আয়ারের সাথে সাক্ষাৎ করলাম তিনি বললেন, "জুনমাসে ত্রিবান্দ্রামে আসুন। আমার সঙ্গে মাসখানেক থাকুন।

আমরা এটির ব্যবস্থা করবো।" ইতিমধ্যে রাজনৈতিক গোলযোগ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ সময় খুব ব্যস্ত থাকা তার পক্ষে স্বাভাবিক। শেষ পর্যন্ত তিনি পদত্যাগ করলেন। তারপর আমলাতন্ত্র থেকে উত্তর আসে, "আমাদের মনে হয়না গ্রন্থাগার আইনের প্রয়োজান আছে। আমাদের এখন বহু গ্রন্থাগার আছে।" মধ্য প্রদেশ ও ত্রিবাঙ্কুরের বিরুদ্ধ যৌক্তিকতা আমাকে একথাই স্মরণ করালো, যে, আমি দু দিকেই জিতেছি। প্রকৃতপক্ষে এগুলিই আমলাতন্ত্রের চিরাচরিত প্রথা।

০৬৪ কোচিন

কোট্টায়ম যাত্রার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কোচিনের শিক্ষা মন্ত্রী পনামপল্লী গোবিন্দ মেননের একটি চিঠি পেলাম। ত্রিবাঙ্কুর যাত্রার পথে একদিন তিনি কোচিনে কাটিয়ে যেতে বললেন। তাই করলাম। তাঁর কথাগুলি আমায় সান্ত্বনা দিল। গোবিন্দমেনন তখন যুবক। তিনি বললেন, "কয়েক বছর আগে আমি মাদ্রাজ ল' কলেজের ছাত্র ছিলাম। তখন আপনার সুন্দর গ্রন্থাগারের আমি একজন নিয়মিত পাঠক ছিলাম। জনতার মধ্যে আমাকে হয়তো আপনার চোখে পড়েনি। কিন্তু আপনার সংগঠন ও ব্যবস্থা আমাকে মুগ্ধ করেছিল। আপনার গ্রন্থাগার এত মনোমুগ্ধকর ছিল! এর একটা বিশেষ পরিবেশ ছিল। একদিন আমার রোজনামচায় লিখেছিলাম, "কোচিন রাজ্যে এ রকম একটি গ্রন্থাগার দরকার।" শিক্ষামন্ত্রী হবার সাথে সাথে. তরুণের স্বপ্নে আমার স্মৃতিকে সঞ্জীবিত করতে সেই রোচনামচায় চোখ বুলিয়েছি। এটা চোখে পড়লো, আপনার কথাও মনে পড়লো। পরের দিনই এই ঘোষণা চোখে পড়লো যে আপনি কোট্টায়মে আসছেন। আপনাকে লিখলাম। এখন বলুন কি ভাবে অগ্রসর হওয়া যায়।" প্রয়োজনীয় তথ্যাদি তিনি আমাকে দিলেন। বাড়ী ফিরে কোচিনের জন্য ত্রিশবর্ষ উন্নয়ন পরিকল্পনা সংযোজিত একটি আইন তৈরী করলাম। কাজে হাত দেবার আগেই রাজনৈতিক পটভূমিকা পরিবর্তিত হোল। ঘটনাবশতঃ ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন একটি রাজ্যে পরিণত হোল। আবার এ বিষয় কিছু করা দরকার। বোধহয় তা কেরালা রাজ্য হবার পরে করাই ভাল।

০৬৫ বোম্বাই

বোম্বাই রাজ্যের জন্য আর, এস, পারখি অনুরূপ একটি আইন ও উন্নয়ন পরিকল্পনার খসড়া করে দিতে বললেন। করে দিলাম। আউধের রাজ

পরিবারে তাঁর প্রভাব ছিল ১৯৫৭ সালে রাজ্য "গ্রন্থাগার আইনের খসড়া ও ত্রিশবর্ষ কার্যসূচী সহ গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা" প্রকাশ করেন। মুখ্যমন্ত্রী খেরের কাছে এক কপি পাঠানো হোল। তাঁর সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হয়। তিনি আমলাদের একটি কমিটি মনোনয়ন করলেন। এর সাফল্য সহজেই অনুমান করা যায়। খেরকে আবার স্মরণ করিয়ে চিঠি দিলাম। মনে হয় তিনি সব চিঠিই কমিটির কাছে পাঠিয়েছিলেন। কমিটি বোধহয় বই-এর সাথে এই চিঠিগুলিও ফাইলের স্তূপে সমাহিত করেছিল।

০৬৬ উত্তর প্রদেশ

সম্পূর্ণানন্দের সাথে বেনারসে দেখা হোল। এটা তাঁর মন্ত্রী হবার আগের কথা। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের Pro Vice-Chancellor রঙ্গবিহারীলাল আমাদের সাক্ষাৎ করিয়ে দেন। এটা ঘটেছিল ১৯৪৬ সালে তাঁর মন্ত্রী হবার ঠিক আগে। গ্রন্থাগার আইন সম্বন্ধে তিনি খুব উৎসাহী ছিলেন। আমি একটা আইনের খসড়া ও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করি। এম, এল, নাগর বেনারসে এক প্রকাশক পেলেন। বইটির শিরোনামা হোল, "উত্তর প্রদেশের গ্রন্থাগার আইনের খসড়া ও ত্রিশবর্ষের কার্যক্রম সহ গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা" এটি সম্পূর্ণানন্দের ভূমিকা সম্বলিত হয়ে ১৯৪৯ সালে প্রকাশিত হোল। আইন সভায় বিলটি আনার জন্য আবেদনের উত্তরে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। যাহোক, এখানেই শেষ নয়। এলাহাবাদের বি, এন, ব্যানার্জ্জী এই বিলটি আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

০৬৭ কাশ্মীর

পি, এন, কাউলা কাশ্মীরের জন্য অনুরূপ একটি গ্রন্থাগার আইন ও ত্রিশবর্ষের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। শেখ আবদুল্লাকে সেটি তিনি দিয়েছিলেন। কাশ্মীরের অবস্থা এখন অনিশ্চিত। কাউলার পান্ডুলিপির কি হোল তা এখনো জানা যায়নি।

০৬৮ মধ্য ভারত

মধ্য ভারতের জন্য গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনাসহ একটি গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন করার জন্য ইন্দোর পাবলিক লাইব্রেরীর জুবিলী কমিটি আমাকে আমন্ত্রণ

জানায়। এটি তারা তাদের স্মারকপত্রের অন্তর্ভুক্ত করতে চেয়েছিল। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণার্থে মধ্য ভারত সরকার চারজনকে নির্বাচিত করে পাঠান। সম্ভবত এটা তৎপরতার লক্ষণ। খসড়া অনুযায়ী একটি ব্যাপক গ্রন্থাগার আইনের উপর ভিত্তি করে গ্রন্থাগার উন্নয়ন খুব সুখের হবে।

০৬৯ সারা ভারত

ভারত সরকারের পরিকল্পনা বিভাগের বিবেচনার্থে ১৯৪৪-এর ডিসেম্বরে স্যার মরিস গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য একটি স্মারকলিপি রচনা করতে বলেন। সেই বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা স্যার মরিসের সঙ্গে একই পাবলিক স্কুলে পড়েছেন। তিনি আশা করেছিলেন এই স্মারকলিপিটি তাঁর সুবিবেচনা পাবে। ১৯৪৫-এর ফেব্রুয়ারীতে সেটিকে স্যার মরিসের কাছে পাঠিয়ে দিলাম। রাজনৈতিক পটভূমিকার দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল। ১৯৪৭ সালে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষণ বিভাগের উন্নতির জন্য এবার এম, এ ও ডক্টরেট ডিগ্রীর ছাত্রদের শিক্ষকতা করার জন্য স্যার মরিস আমায় আমন্ত্রণ জানান। স্বাধীনতা তখন আসন্ন। খানিকটা সাহসে ভর করে স্বাধীন দেশের উপযোগী একটি স্মারকলিপি আবার প্রণয়ন করলাম। শিক্ষা দপ্তরের সচিব স্যার জন সার্জেন্টের কাছে স্যার মরিস সেটিকে পাঠিয়ে দিলেন। স্যার জনের তখন অবসর গ্রহণের পূর্ব মুহূর্ত। সেজন্য তিনি তাঁর পরবর্তী সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য স্মারকলিপিতে মতামত লিপিবদ্ধ করলেন।

০৬৯১ উদাসীনতা ও বিরোধিতা

শান্তি স্বরূপ ভাটনগর,—সি রাজাগোপালাচারীর ভাষায় যিনি জীবন্ত বিদ্যুৎ—স্যার জনের পরেই সে পদে উন্নীত হন। স্যার মরিসের কথামত ভাটনগরের সাথে দেখা করলাম। স্মারকলিপিটি সঙ্গেই ছিল। তিনি ফাইল চেয়ে পাঠালেন। মূল স্মারকলিপিটি সেখানে ছিলনা। যেসব আমলারা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁরা স্মারকলিপির প্রাপ্তি পুরোপুরি অস্বীকার করেন। ভাটনগর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ক্ষিপ্রতায় এতে হস্তক্ষেপ করলেন। তিনি আরেকজন কর্মকর্তাকে ডেকে পাঠালেন। তিনি বললেন, "স্মারকলিপিটি আমি পড়েছি। সেটি ফাইলে ছিল।" দেশের গ্রন্থাগার উন্নয়ন ব্যবস্থা ও গ্রন্থাগার আইনের প্রতি এটা কি আমলাতন্ত্রের উদাসীনতা, না বিরোধিতা?

০৬৯২ বিস্মৃতির অতলগর্ভে

ন্যাশনাল সেন্ট্রাল লাইব্রেরী কমিটির সদস্য হিসাবে ত্রিশবর্ষের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার স্মারকলিপির সাথে ইউনিয়ন লাইব্রেরী বিল আমি উপস্থাপিত করি। ১৯৪৮-এর ১৫ই মে, কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশনে একটি মাত্র বিষয় আলোচনা সূচীতে রাখা হয়। সেটি হোল, 'গৃহ, সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার ও ও সংযুক্ত গ্রন্থাগার আইন সম্বন্ধে ডঃ রঙ্গনাথনের স্মারকলিপিটির বিষয় আলোচনা।" অবান্তর প্রসঙ্গ এড়ানোর জন্য আমি একক সংযুক্ত গ্রন্থাগার আইনের খসড়া কমিটির বিবেচনার জন্য তৈরী করি। কার্যকরী কিছু হবার আগেই খসড়া আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহের বিবেচনার জন্য অধিবেশন মুলতুবী রইলো। প্রায় বছর খানেক কমিটির বিষয় আর কিছুই শোনা গেলনা। ১৯৪৯ এর এপ্রিলে বম্বেতে অনুষ্ঠিত Unescoর সহযোগিতার্থে গঠিত ভারতের জাতীয় সংসদের সাংস্কৃতিক অধিবেশনে আমি এই প্রস্তাব আনি যে অচিরে জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হোক। কিন্তু শিক্ষা দপ্তর সচিব, যিনি পদাধিকার বলে এই কমিটির সভাপতি ছিলেন ও যে কমিটি পরে অচল হয়ে পড়ে আমায় সেই কমিটির সদস্য হওয়া ও আমার আনীত প্রস্তাবের অসামাঞ্জস্য সম্বন্ধে উল্লেখ করেন যেন শিক্ষা দপ্তরে কি করা হয় সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞ। প্রত্যুত্তরে বললাম, দুর্ভাগ্য-গ্রস্ত কমিটির ভেতরের কথা জানি বলেই প্রস্তাবটি এনেছিলাম, এবার এত বছরের মধ্যে যে কমিটি কোন কাজই করেনি তাকে মৃত বলে ধরে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত। কমিটি এখনো কার্যক্ষম আছে, শীঘ্র মিলিত হবে ও কাজে হাত দেবে, সচিবের এই আশ্বাসে প্রস্তাবটি প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু বছর অতিবাহিত হলেও কিছু শোনা যায়নি। অবশ্য এ ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণ ভুলে যাওয়া হয়নি, এ উল্লেখ লোকসভায় মাঝে মাঝে করা হোত। সাড়ম্বরে শুরু হলেও যেমন বহু কমিটি অবহেলায় বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যায় তেমনি জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার কমিটির ভাগ্যও বিড়ম্বিত ছিলো। অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিস্ক্রিয়তা ও বাগাড়ম্বর এই অকাল মৃত্যুর কারণ। জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কমিটির ক্ষেত্রে আরেকটি বিশেষ কারণ হোল একে সিন্ডারেল্লা করে তোলা হয়েছিল ও এমন এক আমলা-তন্ত্রের হাতে এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল যার এর সামাজিক সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিলোনা ও যার চোখ সামনে থাকার পরিবর্তে পেছনে ছিল। আমার ধারণা হোল, শিক্ষামন্ত্রী যতক্ষণ না একজন স্বাধীন গ্রন্থাগার উপদেষ্টা

যাঁর বৃত্তিমূলক জ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিশ্বাস আছে, নিয়োগ করছেন, ততক্ষণ গ্রন্থাগার ব্যাপারে কিছুই হবেনা।

০৬৯৩ নতুন অভিজ্ঞতা

হতাশায় বিরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। এ সময় বৃটিশ কাউন্সিলের গ্রেট বৃটেন পরিভ্রমণের আমন্ত্রণ ও জাতিসঙ্ঘের আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ সমিতিতে যোগ দেবার আমন্ত্রণ পশ্চিমের বহু দেশে গ্রন্থাগার পরিদর্শনের সুযোগ এনে দিয়েছিল। এতে করে গ্রন্থাগার আইনের তুলনামূলক অনুশীলন সম্ভব হোল। যা দেখেছি তা "Librarp tour 1948; Europe & America: Impressions and reflections" বই-এ লিপিবদ্ধ করেছি। এই নতুন অভিজ্ঞতা আমার কাছে নতুন করে শিক্ষাদানের কাজ করেছিল। ইহা আমার ১৯২৫-এর ইচ্ছাকে অর্থাৎ দেশব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্ভব করার জন্য আমাদের দেশে গ্রন্থাগার আইন প্রয়োজন—এই ইচ্ছাকে জোরালো করে তুললো। ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে সে ইচ্ছা আশায় রূপান্তরিত হল।

০৬৯৪ ছাপার অক্ষরে সঞ্চিত

স্যার মরিস বলেছিলেন, "আমরা যথাসাধ্য করেছি। আপনি বলছেন, জনসাধারণ সচেতন আছে ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থা তারা গ্রহণ করবে। কিন্তু সে শক্তি এখনো জাগেনি। আইনের খসড়া ও উন্নয়ন পরিকল্পনাটি প্রকাশিত করা হোক। এগুলো যদি আমরা ছাপার অক্ষরে সঞ্চিত রাখি কোনওদিন কেউ হয়তো আপনি যেখানে শেষ করেছেন সেখান থেকে শুরু করতে পারবে। তিনি হয়তো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারবেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এটি প্রকাশ করতে রাজী হলেন। বইটি, Library Delovepment Plan: Thirty year programme for India, with draft library bills for the Union and the constituent states নামে ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হোল। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ আইনের খসড়াটি পুনর্মুদ্রিত করেছিল ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় সদস্য ও রাজ্যগুলির আইনসভার সদস্যদের মধ্যে তা বিতরণ করেছিল। আশা করা যাক এর অন্ততঃ কিছুটা অংকুরিত হবে—ফল ফলবে।

০৭ সুযোগের সদ্ব্যবহার

গ্রন্থাগার আইনের বিষয় একমাত্র রাজ্য যে সক্রিয়তা গ্রহণ করেছিল, সে হোল মাদ্রাজ! মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদে ও অন্ধ্র গ্রন্থাগার পরিষদে বিশ বছরের অবিশ্রান্ত পরিশ্রম এর জমি তৈরী করেছিল। ১৯৪৬ সালে, আমার

পুত্র টি, আর, যোগেশ্বরের উপনয়ন উপলক্ষ্যে মাদ্রাজ গিয়েছিলাম। একদিন প্রাতঃভ্রমণে তিনামপেটে শিক্ষামন্ত্রী অবিনাশীলিঙগম চেট্টিয়ারের নাম ফলক দেখলাম। এটাও দৈবক্রমে। তাঁর সঙ্গে দেখা করা উচিত আমার কখনই মনে হয়নি। আমি তাঁকে আগেই চিনতাম। পরদিন তাঁর সাথে দেখা করলাম। তিনি খুব খুসী হলেন। তিনি বললেন, "আপনার যখন ক্ষমতা হোল তখন আপনি নিজের রাজ্য ছেড়ে চলে গেলেন, এ কি রকম।" আপনি এখানে থাকলে আমাদের পুরনো আশা আকাঙ্খা ও স্বপ্ন সত্যে পরিণত করতে পারতাম।

আমি বললাম, "পরামর্শের জন্য আমাকে সব সময়ই পেতেন।" গ্রন্থাগার আইনের খসড়াটিও তাঁকে দিলাম। এটাকে তিনি শিক্ষা অধিকর্তা এস, আর, ইউ সাবুরের কাছে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। এ বিষয় সাবুরের সঙ্গে আমাকে আলোচনা করতেও বললেন। সাবুর সব রকম সাহায্য করলেন। তিনি বললেন, "গ্রন্থাগার ব্যাপারে আমি কি জানি? আপনার প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি। সেই মত আমি মন্ত্রীমহাশয়ের কাছে লিখছি।"

০৭১ মাদ্রাজ গ্রন্থাগার ইতিহাস রচনা করলো

১৯৪৭ সালে, ফেব্রুয়ারী মাসে ত্রিবাঙ্কুর থেকে ফেরার পথে মাদ্রাজ হয়ে এলাম। অবিনাশীলিঙগম চেট্টিয়ারের সাথে দেখা করলাম। আইন সভায় বিলটি আনার জন্য খসড়াটি পরিবর্তিত করেছিলাম। তিনি যে পরিবর্তন করেছিলেন সে সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা করতে কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হল। তাঁর উদ্যোগেই মাদ্রাজ ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার ইতিহাস রচনা করলো। যে ক'জন মন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিলাম, তাঁর মধ্যে একমাত্র তাঁরই আইন সভায় বিল উপস্থাপিত করার মত দৃঢ় মনোভাব ছিল।

০৭২ বিলম্ব ও নৈরাশ্য

আইন বলবৎ ও কানুন কার্যকরী করার আগেই তাঁর মাদ্রাজ মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগের দরুণ বিলম্ব ও নৈরাশ্য সহনীয় করার জন্য বাল্মীকি ও রামলিঙগ স্বামীর মন্ত্র উচ্চারণ করা দরকার।

০৭৩ সব ভাল যার শেষ ভাল

১৯২৫ সালে আমার মনে এ কিলক সঞ্চালিত হয়েছিল। পচিশ বছর লেগেছিল একটি গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করতে। পুরো এক পুরুষ কেটে গেল। বোধহয় আমরা নশ্বর বলেই এতটা অধৈর্য। সময়ের মাত্রা ব্যক্তিবিশেষ থেকে জাতির ক্ষেত্রে ভিন্ন। মতিস্থিরতা, আশা ও প্রফুল্লতায় ভর করে সর্বসময় ও সর্বদিকে অক্লান্ত পরিশ্রম করা এবং জাতির আলস্য ও ব্যক্তিবিশেষের ত্বরার দূরত্ব কমানোর জন্য প্রার্থনাই এ ব্যবধান দূর করতে পারে। [সমাপ্ত]

গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় দাক্ষিণাত্যের দুটি রাজ্য

মাদ্রাজ ও কেরালা

মাদ্রাজ :

[গ্রন্থাগার আইনের পরিপ্রেক্ষণিকায় দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে ডক্টর রঙ্গনাথনের মতামত পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি মাদ্রাজের দৈনিক ইংরাজি 'হিন্দু' পত্রিকায় মাদ্রাজ রাজ্যে প্রবর্তিত গ্রন্থাগার আইন তথা সারা রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রকাশিত সম্পাদকীয় স্তম্ভ হতে এই নিবন্ধটি মুদ্রিত হোল।]

কিছুকাল আগে প্রকাশিত মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদের দ্বাত্রিংশৎ বার্ষিক কার্য বিবরণীটিতে প্রচুর চিন্তার খোরাক র'য়েছে। এই কার্য বিবরণীতে এমন সুন্দর একটি পারিসাংখ্যিক তালিকা আছে যাতে গত বছরের মাদ্রাজ গ্রন্থাগার আইনের একটি নির্ভুল কার্যক্রম পাওয়া যেতে পারে।

আমাদের দেশে বছর দশেক আগেও কোন সাধারণের জন্য গ্রন্থাগার ছিল না। কদাচিৎ কোন পাঠককে গ্রন্থাগার থেকে বই দেওয়া হত। মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদের ১৯২৮ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত যিনি সভাপতি ছিলেন তাঁর প্রশংসনীয় প্রচেষ্টাকে অশেষ ধন্যবাদ। কারণ, তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই মাদ্রাজ সর্বপ্রথম গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করে নতুন ইতিহাসের সূত্রপাত করেছে। এরই ফলে আজ আমরা তেরটি জেলায় সাধারণ গ্রন্থাগার গুলির উপযোগিতার ফল পাচ্ছি। লক্ষ্য করছি যে, সাধারণ মানুষ ক্রম-বর্দ্ধমান হারে গ্রন্থাগার ব্যবহারে এগিয়ে আসছে। বিবরণীতে দেখা যাচ্ছে যে এক বছরে প্রায় এক কোটি জন পাঠক গ্রন্থাগারে এসেছে তাদের অনুসন্ধিৎসার তাগিদে, আনন্দের আকাঙ্ক্ষায়, নতুন প্রেরণার জন্য। সাধারণ মানুষের মধ্যে কি পরিমাণ জ্ঞানস্পৃহা জেগেছে, তা' এর থেকেই বোঝা যায়।

এখন দেখা যাক্ সাধারণের জন্যে কত বই দেওয়া হ'য়েছে। পরিসংখ্যান তালিকার একটি স্তম্ভে বলা হয়েছে যে, কোটি পাঠকের মধ্যে মাত্র ৫০ লক্ষ বই দেওয়া হ'য়েছে। অর্থাৎ অর্দ্ধেক লোকই বই কাজে

লাগাতে পারছে না, দৈনিক খবরের কাগজ আর সাময়িক পত্র প'ড়েই এদের ক্ষান্ত হ'তে হ'চ্ছে। এই ভাবে পাঠক সাধারণের যে সমূহ ক্ষতি হ'চ্ছে গণতান্ত্রিক সরকারের উচিত তার নিজের এবং সাধারণের মঙ্গলের জন্য এর প্রতিকারের যোগ্য পন্থা অবলম্বন করা। কিন্তু প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, কেন এই গলদ ?

প্রথমতঃ, কর্তৃপক্ষ সম্ভবতঃ এই ক্ষতির ব্যাপারে ওয়াকিবহাল নন। যদি তাঁরা ওয়াকিবহাল হ'তেন তবে নিশ্চয়ই এই ক্ষতি পূরণের চেষ্টা করতেন। গ্রন্থাগারের কার্যচালনার মত বৃহৎ জনসেবা, যেখানে সাধারণের ১৭ লক্ষ টাকা নিয়োজিত, তা'তে বৃহৎ উৎপাদক কেন্দ্রের মতই পরিসংখ্যানের হিসেব-নিকেশ থাকা উচিত।

পরিসংখ্যানের সুবিধার জন্য মাদ্রাজের প্রথিতযশা গ্রন্থাগারিক ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথন 'লাইব্রেমেট্রি' নামে একটি ছক্ তৈরি করেছেন।

দ্বিতীয়তঃ, তালিকাটির অন্য অংশে প্রকৃত কারণ লুকিয়ে আছে। ৫৩৮টি গ্রন্থাগারের কার্য চালিত হয় ৮৪৮টি কর্মচারীকে নিয়ে। এদের সংখ্যার তুলনায় যোগ্যতা আরও শোচনীয়। ৮৪৮ জন কর্মচারীর মধ্যে ১৯ জন বেতনভুক্। তাও পুরোপুরি নয়। এই ২৮ জনের মধ্যে ১৯ জন অর্দ্ধবেতন ভুক্, অর্থাৎ এরা শুধু 'রোজ' মাফিক কাজ করে। সুতরাং অবশিষ্ট ৯ জন পুরো বেতনভুক্। এরা সকলেই ডিপ্লমাপ্রাপ্ত এবং পাঠকের অভিরুচি বিষয়ে অভিজ্ঞ। এমন কি এও দেখা যায় যে, তেরটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের মধ্যে মাত্র তিনটি গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ একজন বেতনভুক্ কিংবা অর্দ্ধবেতন-ভুক কর্মচারীকেও নিযুক্ত করেন না।

বেতনভুক কর্মচারী নিয়োগের এই সংখ্যাল্পতা থেকে তবে কি এটাই ধরে নিতে হবে যে এদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন কর্মচারী নেই ? না, মোটেই নয়। প্রায় ৬০০ জন গ্রন্থাগারিক এই প্রদেশেই র'য়েছে। তবে কেন তাদের আমরা সাধারণ গ্রন্থাগারে দেখতে পাচ্ছি না ? তাহ'লে, হয় তারা এই উপজীবিকা ত্যাগ ক'রেছে, নইলে গ্রন্থাগার-সংক্রান্ত কাজের জন্য অন্য কোথাও পাড়ি দিয়েছে। প্রাদেশিকগ্রন্থাগার পরিষদ কি শিক্ষার এই সমূহ ক্ষতির ব্যাপারে সম্যক্ অবহিত ? তবে কেন এই ক্ষতির পালা ?

প্রথমতঃ, গ্রন্থাগারিককে কোন দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে না। কোন কোন জেলায় গ্রন্থাগারের রেকর্ড, বাজেট এবং আয়-ব্যয়ের হিসেব পর্যন্ত গ্রন্থা-

গারিককে জানানো হয় না। কোথাও কোথাও আবার আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের সভাপতি নির্বিবাদে প্রভুত্ব করছেন। যদি তিনি অবসর প্রাপ্ত রাজকর্মচারী হন তবে আগে যেমন তিনি প্রত্যহ অফিসে ঢুঁ মারতেন তেমনি এখানেও আসতে আরম্ভ করেন। জীবনটা কাটালেন যে আমলাতন্ত্রিক অফিসে, সেখানকার মত এখানেও দেখা যায় সেই লালফিতের কারচুপি। বস্তুতঃ, সব জেলাতেই জেলার অধিকর্তা গ্রন্থাগারের কেরাণীদের কেড়ে নিয়ে নিজের কাজে লাগান। তিনি গ্রন্থাগারিককে যা ক্ষমতা দেন তা হিসাব রক্ষকের চেয়েও অনেক কম। এই পরিবেশে কোন আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন গ্রন্থাগারিকই বেশী দিন টিকতে পারে না। 'গ্রন্থাগার বর্জন কর' এই শ্লোগান এইভাবেই প্রদেশে প্রদেশে প্রচার হচ্ছে।

পক্ষান্তরে, অন্য দেশে কি ঘটছে? সেখানে গ্রন্থাগারের কর্তৃপক্ষ এবং গ্রন্থাগারিকের মধ্যে রয়েছে একটি সহজ-সুন্দর কার্যবিভাগের সম্পর্ক। গ্রন্থা-গারের কর্তৃপক্ষ সেখানে বৃহৎ পরিকল্পনা ও তার রূপায়ন, বাজেটে অনুমোদন এবং গ্রন্থ বৃদ্ধির ব্যাপারে নিজ ক্ষমতা সীমায়িত রেখেছে। অবশিষ্ট সব কাজই গ্রন্থাগারিককে করতে হয়, মায় গ্রন্থ নির্বাচন এবং ক্রয় পর্যন্ত। গ্রন্থাগারিক আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের সম্পাদকও বটে। সাধারণকে গ্রন্থাগারের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য গ্রন্থাগারিক স্বাধীনভাবে যে কোন কাজ করতে পারে।

বেতনভুক্ কর্মচারিদের সাধারণ গ্রন্থাগার ত্যাগ করার পেছনে আর একটি কারণ রয়েছে। কারণটি হচ্ছে অত্যল্প পারিশ্রমিক। পরিসংখ্যানের একটি স্তম্ভে বলা হচ্ছে যে, বাজেটের ২০% মাত্র সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মচারী ভোগ করছে। পরিষদ ১৯৫৪ সাল থেকে এবিষয়ে মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে আসছেন। তিনি এখন অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি ক'রেছেন।

এই ধরণের আর একটি গলদ্ হ'চ্ছে গ্রন্থাগার-কর ও প্রাদেশিক গ্রন্থাগারের দেওয়া গ্র্যান্টের ব্যবহার নিয়ে। প্রাদেশিক গ্রন্থাগার পরিষদ গৃহ নির্মাণের জন্য গ্রন্থাগার গুলিকে তাদের বার্ষিক আয়ের ৫০% দান করছে। আমাদের দেশে বর্তমানে কর যে ভাবে সংগ্রহ করা হ'চ্ছে ত'াতে এই কর সংগ্রহের ধারাকে জনসাধারণের আয়ের অপব্যবহার বলা যায়। গ্রন্থাগারের গৃহ-নির্মাণের জন্য বিত্তবান কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিষদ থেকেই গ্র্যান্ট দেওয়া উচিত।

মূল কথা হচ্ছে যে, সাধারণ মানুষের দেওয়া করকে গ্রন্থাগারের পরি-চালকবর্গ সন্তোষজনকভাবে ব্যবহার করতে পারছেন না। দশ বৎসরের

অধিককাল ধ'রে এইভাবে আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হ'চ্ছি। ১৯৫৭ সাল থেকে অভিজ্ঞ সমালোচকগণ দ্বারা সমালোচিত মাদ্রাজ গ্রন্থাগার পরিষদের বাৎসরিক বিবরণটি এই বিষয়ে আবেদন জানিয়ে আসছে।

এ বছরের কার্য-বিবরণীতে একটি আনন্দকর ও প্রতিশ্রুতিপূর্ণ সংবাদ র'য়েছে। এই সংবাদটিতে বলা হ'চ্ছে যে, মুখ্যমন্ত্রী সহৃদয় মনোভাব নিয়ে এ ব্যাপারে দৃষ্টিপাত করছেন। তিনি এই মর্মে সমিতির মুখপাত্রকেও আশ্বাস দিয়েছেন ব'লে প্রকাশ। শিক্ষামন্ত্রীও একথা স্বীকার করতে বাধ্য হ'য়েছেন যে, গ্রন্থাগার বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সমালোচক সংস্থা গঠন করা উচিত। এই সংস্থার কাজ হবে গ্রন্থাগারের কার্যাবলীর ভুল ধরিয়ে দেওয়া এবং সেই ভুল সংশোধন করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করা। প্রদেশবাসী এই ধরণের সংস্থার জন্য সাগ্রহে তাকিয়ে আছে। গ্রন্থাগারের জন্য তারা যে কর দিচ্ছে তা পুরোপুরিই উসুল ক'রে নিতে চায়।

[বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কর্তৃক অনূদিত]

কেরালা :

[কেরালা রাজ্যের বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে যুগান্তর পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধি কর্তৃক প্রেরিত ও সম্প্রতি যুগান্তরে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি তুলনামূলক পর্যালোচনার সুবিধার্থে মুদ্রিত হোল]

প্রায় প চিশ বছর আগে কেরলে যে লাইব্রেরী আন্দোলনের শুরু হয়েছিল সেই আন্দোলন আজ কেরলের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং আজ কেরলের এমন একটি গ্রাম নেই যেখানে একটি লাইব্রেরী নেই। কেরলের এই সুশক্ত লাইব্রেরী আন্দোলনের মূলে আছে কেরল লাইব্রেরী সঙ্ঘ। ২৫।৩০ বছর আগেও লাইব্রেরী আন্দোলনের ওপর লোকের একটুও আগ্রহ ছিলনা। দেশে শিক্ষার প্রসার ক্রমেই বেড়ে চলেছে অথচ তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে লাইব্রেরী বেড়ে উঠছেনা এটা কয়েকজন লোকের চোখে বিসদৃশ ঠেকল—তাই দেশে লাইব্রেরী আন্দেলনকে সুশক্তভাবে গড়ে তোলবার জন্য জনগণের মধ্যে পড়ার আগ্রহ বাড়িয়ে তোলার জন্য আরও অনেক লাইব্রেরী ও পাঠাগার তৈরী করার জন্য তাঁরা ত্রিবাঙ্কুর

লাইব্রেরী সঙ্ঘ বলে একটি সঙ্ঘ গড়ে তোলেন। তখন ৪৭টি মাত্র লাইব্রেরী এই সঙ্ঘের সদস্য ছিল। কেরলের প্রধান সহরগুলিতে এবং ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র গ্রামগুলিতেও একটি করে লাইব্রেরী গড়ে তোলা এই সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ছিল। অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে এই সঙ্ঘ অগ্রসর হতে থাকে এবং আজ কেরলের তিন হাজার লাইব্রেরী এই সঙ্ঘের সদস্য। এমনি একটি সুশক্ত লাইব্রেরী আন্দোলন কেরলে গড়ে উঠেছে বলেই কেরলে এই সময় বই বিক্রী হয় প্রচুর; সেই সময়—যখন এই লাইব্রেরীগুলি সরকারের নিকট থেকে গ্র্যান্ট পায়। সাধারণ মালায়ালী বই কেনার জন্য মাথাপিছু পাঁচ পয়সা খরচ করে, তার কারণ হয়তো দেশে এই সুশক্ত লাইব্রেরী আন্দোলন গড়ে ওঠার জন্য। এই লাইব্রেরী-গুলি জনগণের জানার ও পড়ার ক্ষিদে তেষ্টা মিটোয় বলে হয়তো ব্যক্তিগত-ভাবে বই কেনার আগ্রহ তাদের নেই। সারা ভারতবর্ষে যেখানে ৩০,০০০হাজার লাইব্রেরী আছে সেখানে ক্ষুদ্র কেরলে ৩০০০ লাইব্রেরী থাকাটা কম কথা নয়। ভারতের শতকরা দশভাগ লাইব্রেরী কেরলে আছে বল্লে একটু অবাক লাগে; কিন্তু শিক্ষার বিকাশের জন্য জনগণের মধ্যে বই পড়ার আগ্রহ যে জেগে উঠবে তা খুবই স্বাভাবিক এবং তার জন্য সুশক্ত একটি লাইব্রেরী আন্দোলনও গড়ে উঠবে তাও কিছু অস্বাভাবিক নয়।

লাইব্রেরীগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই বইএর সংখ্যা ৫০০০ হাজার বা তার কিছু বেশী। আগে কেরল সরকার এই লাইব্রেরীগুলিকে বছরে মাত্র ৪০০০ টাকার গ্র্যান্ট দিতেন। এখন সেই টাকা চার লক্ষে এসে দাঁড়িয়েছে কিন্তু এই টাকাও যথেষ্ট নয়। কারণ, কেরল সরকার শিক্ষার খাতে যে টাকা ব্যয় করেন তার দুশ' ভাগের একভাগ ব্যয় করেন এই লাইব্রেরীগুলির জন্যে। আজ কেরলে লাইব্রেরীগুলি যে ভাবে সংগঠিত হয়ে কাজ চালাচ্ছে তাতে তাদের টাকার দরকার অনেক। অন্ততঃ কেরল সরকার শিক্ষার খাতে যে টাকা ব্যয় করেন তার শতকরা দুভাগও যদি লাইব্রেরীগুলির পেছনে ব্যয় করেন তো বর্তমানে লাইব্রেরীগুলিকে টাকার অভাবে যে সব অসুবিধা ভোগ করতে হয় তা দূর হয়। কেরল লাইব্রেরী সঙ্ঘ তিন মাসের জন্য লাইব্রেরী ট্রেনিং দেওয়ার একটি কেন্দ্র খুলেছিলেন; কিন্তু প্রথম একদল ট্রেনিং পাওয়ার পর এই কেন্দ্র টাকার অভাবে সুষ্ঠুমতো পরিচালনা করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো এবং সেই কেন্দ্র তাঁরা বন্ধ করতে বাধ্য হলেন।

কেরলে লাইব্রেরী আন্দোলনের এই সফলতার মূলে আছে কেরল লাইব্রেরী

সংঘ। এই সঙ্ঘের চেষ্টার ফলেই কেরলে আজ লাইব্রেরী অন্দোলন এত বিরাট-ভাবে গড়ে উঠেছে। এই সঙ্ঘের কার্য্যাবলী কেরল সরকার সম্পূর্ণ অনুমোদন করেন এবং এই সঙ্ঘকে অনেকখানি স্বাধীনতা তাঁরা দিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কেরল লাইব্রেরী সংঘও একটি স্ব-নিয়ন্ত্রিত সংঘ যদিও এই সঙ্ঘের কার্য্য পরিচালনার ব্যাপারে সর্বশেষ হস্তক্ষেপ কেরল সরকারের।

এই সঙ্ঘের কাজ চালানোর জন্যে একটি কার্যনির্বাহক সমিতি আছে, এই সমিতির সদস্যরা প্রতি জেলা লাইব্রেরীর তিনজন প্রতিনিধি, পৃষ্ঠপোষক ও আজীবন সভ্যদের দুজন প্রতিনিধি। লাইব্রেরী আন্দোলনে উৎসাহী জনগণের দুজন প্রতিনিধি, দুজন সরকারের প্রতিনিধি এবং একজন কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত। অতি আধুনিক পদ্ধতিতে এবং জনগণের হিতার্থে লাইব্রেরীগুলিকে গঠিত করা, যেসব লাইব্রেরীগুলি ভালোভাবে কাজ করছে না সেগুলির আবার পুনর্গঠন করা এবং লাইব্রেরীর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন ধর্ম ও মতের লোকেদের মধ্যে একটি সৌহার্দ্য গড়ে তোলা এই লাইব্রেরী সঙ্ঘের উদ্দেশ্য। কেরল সরকার রাজ্যের লাইব্রেরীগুলিকে যে বার্ষিক সাহায্য করেন তা এই সঙ্ঘের সুপারিশ অনুযায়ী দেন। কেরল রাজ্যের সমস্ত লাইব্রেরীগুলির কাজকর্ম এই সংঘ নিয়ন্ত্রণ করে। এ ছাড়াও আর একটি ছোট সমিতি আছে—এই সমিতি কয়েকজন ইনস্পেক্টর এবং তালুক ইউনিয়নের সদস্যদের নিয়ে গঠিত। এদের কাজ হচ্ছে প্রত্যেক লাইব্রেরীর সঙ্গে নিয়মিত সংযোগ রাখা, লাইব্রেরী আন্দোলনে উৎসাহী জনগণের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখা, লাইব্রেরীগুলির উন্নতি অবনতি সম্বন্ধে অবহিত থাকা এবং টাকা পয়সা খরচের দিকে একটা নজর রাখা, লাইব্রেরীগুলির অভাব অভিযোগ শোনা এবং সে সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সংঘকে অবহিত করা।

লাইব্রেরীগুলি প্রতি বছর সরকারের কাছ থেকে যে সাহায্য পায় তা নতুন বই কেনবার জন্য খরচ করা হয়। মাসিক, সাপ্তাহিক ইত্যাদি কেনার জন্য, লাইব্রেরী ঘর ভাড়া দেওয়ার জন্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক খরচ মেটাবার জন্য লাইব্রেরীগুলিকে সাধারণতঃ চাঁদা এবং দানের ওপরই নির্ভর করতে হয়। একটি জিনিস লক্ষ্য করার বিষয় যে, অনেক লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীর কাজকর্ম যারা চালান তারা অনারারী হিসাবে কাজ করেন।

সমস্ত লাইব্রেরীর বই-এর হিসাব নিয়ে দেখা গেছে যে, প্রায় ৩৪ লক্ষের উপর বই আছে। অনেক লাইব্রেরীতে রেডিও আছে, বিশেষ করে গ্রামের লাইব্রেরীতে। কোনও কিছু সরকারী খবর জানার জন্যে জনগণ এই লাইব্রেরীর রেডিওর ওপর

নির্ভর করে। অনেক লাইব্রেরীর অধীনে স্পোর্টস ক্লাব, সংস্কৃতি পরিষদ, শিক্ষা দেওয়ার ক্লাস ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। অনেক লাইব্রেরীতে মেয়েদের এবং শিশুদের আলাদা বিভাগ আছে। লাইব্রেরীগুলি বেশীর ভাগ ভাড়া বাড়ীতেই আশ্রয় করে আছে। ১৯৫৯ সালে ৮০২টি লাইব্রেরী নিজেদেব বাড়ী করে এবং এ বিষয়ে সরকারের সাহায্য পায়। প্রত্যেক তালুকে স্থানীয় উপদেষ্টা ইউনিট হিসাবে লাইব্রেরী ইউনিয়ন গঠন করা হয়েছে যাতে এই ইউনিয়ন স্থানীয় লাইব্রেরী ও কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী সঙ্ঘের সঙ্গে একটা সংযোগ রেখে লাইব্রেরীগুলির কাজকর্মকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই ইউনিয়নের সদস্যেরা সকলেই বেতন না নিয়ে কাজ করেন। পয়সার অভাবে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী সঙ্ঘ এখন অবধি সর্বকেরল লাইব্রেরী ক্যাটালগ তৈরী করতে পারেনি। তবে সঙ্ঘের অধীনে বিখ্যাত শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি পুস্তক-উপদেষ্টা সমিতি গড়া হয়েছে। তাঁরা লাইব্রেরীতে কি ধরণের বই রাখা হবে না হবে তা নিয়ে উপদেশ দেন। লাইব্রেরী সঙ্ঘের একটি মাসিক পত্রিকা আছে তার নাম 'গ্রন্থলোকম্'। এই সঙ্ঘ এখন চেষ্টা করছেন রাজ্যের প্রধান প্রধান হাসপাতাল, জেলখানা এবং রেলওয়ে ষ্টেশনে একটা করে লাইব্রেরী যাতে খোলা যায়।

কম্যুনিস্ট সরকার শাসনে আসার পর লাইব্রেরী সঙ্ঘের কাজের মধ্যে নানা গোলমাল শুরু হয়। দলীয় রাজনীতি এই লাইব্রেরীগুলির মধ্যে কাজ করতে শুরু করলে পর এই সঙ্ঘের মধ্যে নানারকম গোলমাল শুরু হয়। কম্যুনিস্ট সরকার তখন নতুন একটি লাইব্রেরী বিল তৈরী করার জন্য শ্রীএস, আর, রঙ্গনাথনকে নিযুক্ত করেন। শ্রীরঙ্গনাথন যে লাইব্রেরী বিল তৈরী করেন তার একটি ড্রাফ্‌ট সম্প্রতি কেরল সরকার বার করেছেন। এই বিলে লাইব্রেরী-গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে শ্রীরঙ্গনাথন সরকারকে অপ্রতিহত ক্ষমতা দিয়েছেন। লাইব্রেরীগুলির যে স্বাধীনতা এতদিন ছিল তা অনেকাংশে খর্ব করা হয়েছে। বর্তমানে কেরল আইনসভায় এই নিয়ে অনেক প্রশ্নোত্তর হয়ে গেছে। কেরল লাইব্রেরী সঙ্ঘ এই বিলের অনেক ক্লজের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এ-বিল এখনও পাশ করা হয়নি তবে এতদিন ধরে লাইব্রেরীগুলি যে স্বাধীনতা ভোগ করে আসছিল তা হয়তো এই বিল দ্বারা কিছুটা খর্ব হবে মনে হয়।

দুটি জেলা গ্রন্থাগারের খবর

রহড়া ও জলপাইগুড়ি

রহড়া ঃ

এই বছরের প্রথম দিকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ইউ, এস, আই, এস-এর যুক্ত উদ্যোগে গোল পার্কে এক লাইব্রেরী সেমিনার হয়েছিল। প্রথম অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন শ্রী বি, এস, কেশবন। বাংলা দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত ছিলেন। অনেকে নিজ নিজ গ্রন্থাগারকে 'পাবলিক লাইব্রেরী' বলে দাবী করেছিলেন, কিন্তু সভাপতি মহাশয়ের জেরার মুখে তাঁদের দাবী টেঁকেনি। সেদিন ২৪ পরগণা জেলা গ্রন্থাগার (রহড়া)-এর কোন প্রতিনিধি সে সভায় ছিলেন না, থাকলে তাঁদের দাবী কিন্তু টিঁকে থাকতে পারত।

রহড়ার এই গ্রন্থাগারে শুধু যে চাঁদা লাগেনা তাই নয়, এখানে আপনি ইচ্ছেমত তাক থেকে বই বেছে নিতে পারেন, যেটা পাবলিক লাইব্রেরীর একটি পরিচয়। অবশ্য এই জেলা গ্রন্থাগার কোন আইনের দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত নয়। সরকার ইচ্ছে করলেই এগুলো বন্ধ করে দিতে পারেন। কিন্তু তাতে যদি এ পাবলিক লাইব্রেরীর মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়, তবে দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী, যাকে এশিয়ার আদর্শ বলে প্রচার করা হয়, সে গ্রন্থাগারকেও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করতে হয়।

এই গ্রন্থাগারের ভ্রাম্যমাণ সংস্থা, ব্যারাকপুর বারাসাত, বনগাঁ, ও বসিরহাট এই চারটি মহকুমায় প্রায় ১৬৪০ বর্গমাইল এলাকায় গ্রন্থযানের সাহায্য বই বিতরণ করা হয়। কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক কর্মীর অভাবে মাত্র ৬০০ বর্গমাইল এলাকা এর সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে।

গত বছরের হিসেব থেকে জানা যায় যে এখন পর্যন্ত ১৬৬৮ জন সভ্য ৪২,৫১১ বার বই পড়েছেন। আর ভ্রাম্যমাণ সংস্থা ৭৮ টি গ্রন্থাগারকে প্রায় ১০,৮০৯ বই বিতরণ করেছেন।

গ্রন্থাগারের পত্র-পত্রিকা, শিশু, মহিলা ও সাধারণ বিভাগ আছে। এছাড়া পাঠ্য পুস্তক বিভাগটি উল্লেখযোগ্য। এখানে বেলঘরিয়া থেকে ইছাপুর পর্যন্ত

বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রায় ২০০ জন ছাত্র ছাত্রী পাঠ্যপুস্তকের সুযোগ গ্রহণ করছেন।

শিক্ষা বিস্তারের জন্য এঁদের প্রচেষ্টা অভিনন্দন যোগ্য। গ্রন্থাগার থেকে ৫ মাইলের মধ্যে অবস্থিত (১) কিশমৎ-বন্দিপুর (২) প্যাতুলিয়া বন্দিপুর (৩) দোপেরিয়া (৪) ঈশ্বরপুর (৫) মোহনপুর (৬) রাবণপুর (৭) দেশবন্ধু কলোনী (৮) রুইয়া (৯) কর্ণমাধবপুর (১০) ভাঙ্গাদিঘিলা এই দশটি কেন্দ্রে বয়স্কদের সাক্ষর করার জন্য নৈশ বিদ্যালয় খোলা হয়েছে। সদ্যঃ সাক্ষররা যাতে বইএর অভাবে নিরক্ষর না হয়ে পড়েন সেদিকে যত্ন নেওয়া হয়।

(অজয় রঞ্জন চক্রবর্তী)

জলপাইগুড়ি :

পুরাতন পুলিস লাইনে বিগত ২৬শে জানুয়ারী ১৯৫৮ সালে জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগারের জন্মলগ্ন লেডি মিণ্টো বিল্ডিংএ ঘোষিত হইয়াছিল। সেই ক্ষুদ্র গ্রন্থাগার ধীরে ধীরে নিজস্ব অট্টালিকায় স্থানান্তরিত হইয়াছে। বর্তমানে নূতন গ্রন্থাগার ভবন এক একর জমির উপর নির্মিত হইয়াছে। ধার করা আসবাবাদি লইয়া তাহার প্রথম যাত্রা সুরু হইয়াছিল। প্রারম্ভে ৩৫০টি পুস্তক লইয়া আরম্ভ। বর্তমানে পুস্তক সংখ্যা বহুল পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে। বাংলা ৫৩১১, ইংরাজী—২০০০ ও হিন্দি—২৫০, মোট পুস্তক সংখ্যা ৭৫১১; ইহার মূল্য ৩৫ হাজার টাকা।

গ্রন্থাগারের ১৯৫৮-৫৯ সালের বিবিধ আয় হইল কশন মানি বাবদ ২২৭৭৲ টাকা। চাঁদা বাবদ ২৩৪৯৲ টাকা ও সরকারী বেসরকারী সাহায্য বাবদ ১৭,৫০০৲ টাকা। আয় মোট ২২,১২৬ টাকা। গ্রন্থাগারের বার্ষিক খরচ ১৫,০০০ টাকা। গৃহ নির্মাণ বাবদ সরকার হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছিল ১,৫৫,২৫০ টাকা। জেলাতে ১১২টি লাইব্রেরী বা পাঠাগার থাকা সত্ত্বেও মাত্র ২৭টি লাইব্রেরী জেলা গ্রন্থাগারের সদস্য ভুক্ত। জেলা গ্রন্থাগারটির একটি ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার রহিয়াছে। ভ্যানে মফঃস্বলের পাঠাগারসমূহে পুস্তক সরবরাহ করা হয়, একমাস পর বই ফেরৎ আনা হয়। বর্তমান জেলা গ্রন্থাগার ভবনে একটি পাঠকক্ষ, সংবাদপত্র বিভাগ, শিশু বিভাগ, মহিলা বিভাগ, অবসর প্রাপ্ত বৃদ্ধদের জন্য একটি বিভাগ রহিয়াছে। মোট ১০ জন কর্মী হোলটাইমের জন্য নিযুক্ত রহিয়াছে। জেলা গ্রন্থাগারের সদস্য সংখ্যা ২১০ জন। ইহার মধ্যে ৮ জন আজীবন সদস্যও আছেন। ছাত্র সদস্যদের সংখ্যা মাত্র ৩০—এই

জেলা গ্রন্থাগারটির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল গত বৎসর পর্যন্ত গ্রন্থাগারের কোন পুস্তক খোয়া যায় নাই। গ্রন্থাগারের মাসিক পাঠকের সংখ্যা শতকরা ৭০ জন। জলপাইগুড়ির মতন জেলা সহরে এই সংখ্যা এবং সদস্য সংখ্যা আদৌ প্রশংসনীয় নহে। বর্ত্তমানে গ্রন্থাগারে যে আসবাবপত্র রহিয়াছে তাহাও জেলা গ্রন্থাগারের পক্ষে পর্যাপ্ত নহে। এখনও প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্রের প্রয়োজন আছে বলিয়া অনুমিত হয়। জলপাইগুড়ি পৌরসভা বৎসরে ছয় শত টাকা কর হিসাবে গ্রহণ করেন এবং পৌরসভা জেলা গ্রন্থাগারকে এক শত টাকা দান করেন। পশ্চিমবঙ্গের জেলা গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলা গ্রন্থাগারটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে কিন্তু এতৎ সত্বেও জেলা গ্রন্থাগার-চেতনা সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে জাগরিত হয় নাই। সকল অভাব অভিযোগ সত্বেও আজ এই জেলা গ্রন্থাগারটি গৌরবের সহিত জনশিক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী হইয়া রহিয়াছে। (জলপাইগুড়ির সাপ্তাহিক 'বার্তা' পত্রিকা থেকে মুদ্রিত)

কলিকাতার গ্রন্থাগার কর্মীদের বৈঠক

গত ১৩ই নভেম্বর অপরাহ্ণে ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ভবনে পরিষদের আহ্বানে কলিকাতার বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিদের এক সভা হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত। সকলকে সাদর আবাহন জানিয়ে পরিষদ সম্পাদক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, আর্থিক অসচ্ছলতা ও সাংগঠনিক অভাব-অসুবিধার দরুণ কলিকাতা সহরের গ্রন্থাগারগুলি এক সংকটজনক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে। সরকারের অপর্যাপ্ত ও অনিয়মিত অর্থ সাহায্য ও পৌর প্রতিষ্ঠানের অর্থ সাহায্য দীর্ঘকাল যাবৎ অনাদায়ী থাকায় বহু গ্রন্থাগার বিশেষ করে ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলিতে এক অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সরকার অন্যান্য জেলাগুলিতে যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন ও ব্যয় বরাদ্দ করেছেন, অনুরূপ ব্যবস্থা সহর কলকাতাতেও হওয়া আবশ্যক এবং সেজন্যে সহরে কমপক্ষে চারটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থাকা প্রয়োজন। সহরে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন ও বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা-মূলক সম্পর্ক স্থাপনের জন্যে সভায় একটি কলিকাতা জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ গঠনের সিদ্ধান্ত করা হয়। সভায় প্রস্তাবিত পরিষদের সংবিধান প্রণয়ন ও প্রস্তুতি কার্যের জন্যে রাজ্য সভা সদস্য শ্রীহরেন্দ্রকুমার মজুমদারের সভাপতিত্বে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি এড্ হক কমিটি গঠিত হয়।

পরিষদ কথা

গ্রন্থাগার দিবস ও সপ্তাহ পালনের উদ্যোগ-আয়োজন

'বিনাচাঁদার গ্রন্থাগার চাই'—এই দাবীর ভিত্তিতে এ বছরের গ্রন্থাগার দিবস ও সপ্তাহ পালনের জন্য পরিষদ সারা পশ্চিম বঙ্গের গ্রন্থাগার কর্মী ও অনুরাগীদের অনুরোধ জানিয়েছে। পরিষদের উদ্যোগে মহাজাতি সদন হলে একটি কেন্দ্রীয় জনসভা ও বিভিন্ন অঞ্চলে জনসভার আয়োজন করা হচ্ছে।

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পরিষদের উদ্যোগে মহাজাতি সদনে তিনদিন ব্যাপী যে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে তার কার্যসূচী নিম্নে প্রদত্ত হোল:

১৯শে ডিসেম্বর: পরিষদের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনোৎসব
সন্ধ্যা ৬টা

২০শে ডিসেম্বর: বর্তমান বছরে সার্ট-লিব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞান-পত্র বিতরণ অনুষ্ঠান।
কেন্দ্রীয় জনসভা, সন্ধ্যা ৬টা।

২১শে ডিসেম্বর: স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সম্মেলন, সন্ধ্যা ৬টা।

গ্রন্থাগার দিবস পালন সংক্রান্ত খবরাখবরের জন্য পরিষদ কার্যালয়ে অবিলম্বে যোগাযোগ করতে পরিষদ সম্পাদক আবেদন জানিয়েছেন।

(ফোন: ৩৪—৭৩৫৫)

হুগলী জেলা গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সংযুক্ত উদ্যোগে গত ২০শে নভেম্বর শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরীতে হুগলী জেলার বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের গ্রন্থাগারগুলির নানাবিধ সমস্যা ও তার যথোচিত উপায় হিসাবে গ্রন্থাগার আইন অবিলম্বে বিধিবদ্ধ করার প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন। আগামী গ্রন্থাগার সপ্তাহে এই বিষয়টি জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য সভা, শোভাযাত্রা, প্রদর্শনী প্রভৃতি অনুষ্ঠানের জন্যে সভার একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে ছাত্রদের পঠন-পাঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থার কথাও বলা হয়েছে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীতে শিশু দিবস উদ্‌যাপন

শ্রীনেহরুর জন্মদিন ১৪ই নভেম্বর লাইব্রেরীর শিশু ও কিশোর বিভাগের উদ্যোগে শিশু দিবস পালন করা হয়। কলিকাতার সোভিয়েত সাংস্কৃতিক প্রাধিকারিক শ্রী এ, এন, কোমারোভ সভাপতিত্ব করেন এবং পূর্ব জার্মান সরকারের কলিকাতার কন্সাল প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। প্রারম্ভে সকলকে সাদর আহ্বান জানিয়ে লাইব্রেরীর সভাপতি শ্রীকমল বসু শিশু দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় কিশোরী শিল্পী সঙ্ঘের নটির পূজা অভিনয় বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল।

তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীতে শিশু দিবস অনুষ্ঠান

তালতলা পাবলিক লাইব্রেরীর উদ্যোগে গত ১৪ই নভেম্বর পাঠাগার ভবনে বিশ্ব শিশু-দিবস ও শ্রীনেহরুর জন্মদিবস পালন করা হয়। প্রভাতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় ও জাতীয় সংগীত গীত হয়। ঐ দিন সন্ধ্যায় কর্ম-সচিব শ্রীঅপূর্ব মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক শ্রীশিবশঙ্কর নাগ ও কার্যকরী সমিতির সভ্য শ্রীঅশ্বিনী পাল মহাশয়দের পরিচালনায় ও শ্রীবিজয়সিংহ নাহার মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কলিকাতা জিলা সমাজ শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী মহাশয় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ছোটদের মধ্যে সংগীত ও অন্যান্য বিষয়ে অংশ গ্রহণ করে শেফালী দে, মিনু ঘোষ, সবিতা চৌধুরী, শবরী চ্যাটার্জী, উত্তরা দত্ত, সুলেখা চৌধুরী, সোমা মুখার্জী, শিপ্রা দাস, রীতা চৌধুরী, আরতী দে, আলেয়া মুন্সী, জ্যোৎস্না দত্ত, আলোক চ্যাটার্জী, সুশীল শী, তনয় দত্ত, দীপেন্দুকুমার, অমর দত্ত, শুভেন্দুকুমার, অনিল দত্ত ও দীপঙ্কর দাস। সভাপতি ও প্রধান অতিথি মহাশয়দ্বয় 'শিশু দিবস' ও 'শ্রীনেহেরু' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। অতঃপর পাঠাগারের হবি সেণ্টারের কৃতী কর্মীদের পুরস্কার বিতরণ এবং জলযোগের পর অনুষ্ঠান শেষ হয়।

চব্বিশ পরগণা

বিষ্ণুপুর সার রমেশ লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

রাজারহাট বিষ্ণুপুর সার রমেশ লাইব্রেরীর পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে গত ১২ই ও ১৩ই নভেম্বর সমারোহের সহিত লাইব্রেরীর সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন সাহিত্যিক হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তা হিসাবে শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী ফুলরেণু গুহ উপস্থিত ছিলেন। দ্বিতীয় দিনে সভাপতিত্ব করেন শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়। শ্রীমতী রাণী ঘোষাল ও শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় যথাক্রমে প্রধান অতিথি ও বক্তা হিসাবে উপস্থিত থাকেন। শ্রীমতী আশা বন্দ্যোপাধ্যায় একান্নটি প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন।

শ্রীসৌম্যেন্দ্র ঠাকুর তাঁর ভাষণে উন্নত রুচি ও আধুনিক প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রন্থ নির্বাচনের প্রতি দৃষ্টি দেবার কথা বলেন। শ্রীমতী ফুলরেণু গুহ শিশুদের জন্যে স্বতন্ত্র ও উপযোগী ব্যবস্থার জন্যে বিশেষ প্রচেষ্টার উপদেশ দেন। পাঠাগারের সভাপতি শ্রীইন্দুভূষণ ভট্টাচার্য পাঠাগারের উন্নতির জন্যে স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেন। দ্বিতীয় দিনে একটি সাংগীতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ছিল। পাঠাগারের সদস্যরা 'ভাড়াটে চাই' নাটিকাটি অভিনয় করেন।

বর্ধমান ঃ

কৈতাড়া বাণী মন্দির। আদড়াহাটি

গ্রন্থাগারটি এবৎসর দশম বর্ষে পদার্পণ করেছে। গত ৩রা অক্টোবর গ্রন্থাগারের বার্ষিক সাধারণ সভায় সম্পাদক শ্রীঅমিয় কুমার রায় যে কার্য্যবিবরণী পাঠ করেন তাতে গ্রন্থাগারের নানা অভাব অসুবিধার কথা জানা যায়। সদস্য সংখ্যা এখন ৬১। তাছাড়া চাঁদা দিতে অক্ষম লোকেদের বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার থেকে বই সরবরাহ করা হয়, গ্রন্থাগারের যে মাটির দ্বিতল গৃহটির কাজ গত বছর আরম্ভ হয়। অর্থাভাবে তা অদ্যাবধি সম্পূর্ণ হয়নি। গ্রন্থাগারটিতে নানাবিধ অনুষ্ঠান ও সমাজ সেবার কাজ করা হয়ে থাকে। স্থানীয় জনসাধারণের সাহায্য ও অধিকতর সহযোগিতার জন্যে সম্পাদক মহাশয় আবেদন জানিয়েছেন।

দুর্গাপুর নডিহা যুব সঙ্ঘের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন

গত ৪ঠা অক্টোবর সঙ্ঘের নূতন গৃহের আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বারোদ্ঘাটন করেন নডিহা জুনিয়র হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীউমাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। তেরটি প্রদীপ জেলে ও সংখধ্বনির মধ্যে অনুষ্ঠান কার্য সূচীত হয়। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় জনজীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন। শ্রীকাশীনাথ মুখোপাধ্যায় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা ও ক্রমোন্নতির এক সুন্দর বিবরণ দান করেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনসাধারণ বিপুল উদ্দীপনার সহিত যোগদান করেন।

শ্রীখণ্ড চিত্তরঞ্জন পাঠমন্দিরের নবনির্মিত ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন

শ্রীখণ্ডের চিত্তরঞ্জন পাঠমন্দির কিছুকাল পূর্বে সরকারের পল্লী গ্রন্থাগার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সরকার ও জনসাধারণের অর্থে গ্রন্থাগারের মনোরম নিজস্ব একটি গৃহ নির্মিত হয়েছে। নভেম্বরের ৬ই তারিখে অপরাহ্নে গ্রামবাসীদের বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে গৃহটির আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন করেন শ্রীমন্মথ নাথ রায়। সভাপতি ও প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপক ত্রিপুরারী চক্রবর্তী। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের তরফ থেকে শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় সভায় বক্তৃতা করেন। উৎসবে সংগীত ও অভিনয় বিশেষ উপভোগ্য হয়।

বাঁকুড়া ঃ

মহেশপুর রামকৃষ্ণ পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা

গত ২রা নভেম্বর শ্রীনরেন্দ্রনাথ রক্ষিতের সভাপতিত্বে বিউর রামকৃষ্ণ পাঠাগারের বার্ষিক সাধারণ সভা ও পরবর্তী বছরের নূতন কার্যনির্বাহক সমিতির নির্বাচন হয়। সভায় পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীপাঁচুগোপাল রক্ষিত পাঠাগারের কার্যাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে পাঠাগারের ইতিহাস বিবৃত করেন। প্রধান অতিথি শ্রীঅবনীমোহন রায় পাঠাগারের উন্নতির জন্যে ১০১৲ টাকা দান করেন। গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন ও প্রসার সম্পর্কে সর্বশ্রী রবিলোচন গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রামগোপাল চক্রবর্তী, শম্ভুনাথ ঘোষাল ও সুশীলচন্দ্র খাঁ আলোচনা করেন।

মুর্শিদাবাদ ঃ

কান্দী রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি পাঠাগারে রামেন্দ্রসুন্দর স্মৃতি বার্ষিকী

গত ৩রা কার্তিক পাঠাগার প্রাঙ্গনে সন্ধ্যায় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর সপ্তনবতিতম জন্ম বার্ষিকী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়। পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ রায় সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর আচার্যদেবের রচনা থেকে পাঠ করেন। লোকসভা সদস্য শ্রীত্রিদিব চৌধুরী, কান্দী বান্ধব সম্পাদক শ্রীদেবেন্দ্রনারায়ণ রায় রামেন্দ্রসুন্দরের জীবন ও জীবন-দর্শন এবং তাঁর বহুমুখী প্রতিভার আলোচনা করেন। সভায় স্থানীয় শিল্পীগণ আবৃত্তি ও সংগীত পরিবেশন করেন।

বালিয়া পল্লীমঙ্গল সমিতির সাধারণ সভা

সম্প্রতি পাঠাগারের চতুর্বিংশতি সাধারণ সভায় আগামী ৩ বছরের জন্য পাঠাগারের নূতন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছে। শ্রীকালিদাস ঘোষ বিগত সময়ের কার্যবিবরণী ও আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ সভায় উপস্থাপিত করেন। সর্বশ্রী হরিদাস ঘোষ, দীনেন্দ্রনারায়ণ সিংহ ও বিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

মেদিনীপুর ঃ

তুষার স্মৃতি গ্রন্থ নিকেতন। শ্রীকৃষ্ণপুর। ব্যবত্তারহাট

গত ২৬শে অক্টোবর জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা উৎসব উপলক্ষে এক পাঠ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থপাঠ ও নানাধরণের গ্রন্থের প্রতি সকলকে আকৃষ্ট করার জন্যে সারাদিন ব্যাপী এই অনুষ্ঠান হয়। স্থানীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও বহু লোক এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

হাওড়া ঃ

নবাসন নেতাজী পাঠাগারে শিশু দিবস উদ্‌যাপন

গত ১৪ই নভেম্বর নবাসন, নেতাজী পাঠাগারে অসংখ্য শিশুর সীমাহীন স্ফূর্তি ও অজস্র আনন্দের মধ্যে দিয়ে প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহেরুর

এক সপ্ততিতম জন্মদিবস পালিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে শিশুদের মধ্যে "ক্রীড়া ও আবৃত্তি" প্রতিযোগিতা বেশ সাফল্যের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থ প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিশুদিগকে গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করিবার মানসে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা ও শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে গ্রন্থাগারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করেন পাঠাগারের গ্রন্থাগারিক শ্রীশঙ্করকুমার ভট্টাচার্য। প্রদর্শনী অন্তে এক সভার মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীসারদা ডাল। সভায় অংশগ্রহণ করেন শ্রীতারাপদ ঘোষ, শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীরতনকুমার নন্দী, শ্রীজয়দেব দাস, প্রভৃতি। সভাশেষে শিশুদের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়।

হুগলী ঃ

কোদালপুর জ্যোতিঃ সঙ্ঘে শিশু দিবস পালন

জাঙ্গিপাড়া উন্নয়ন ব্লকের আধিকারিক শ্রীপবিত্রকুমার সান্যালের সভাপতিত্বে গত ১৪ই নভেম্বর সঙ্ঘে বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে শিশু দিবস পালিত হয়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষাল। প্রায় তিনশতাধিক শিশু ও কিশোর অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করেন সভাপতি শ্রী সান্যাল। প্রধান অতিথির ভাষণের পর ছোটদের মিষ্টান্ন ও দুগ্ধ বিতরণ করা হয়।

বার্তা বিচিত্রা

উত্তর প্রদেশ গ্রন্থাগার সম্মেলন

আগামী ২৫শে ডিসেম্বর থেকে উত্তর প্রদেশ গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী এক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। গ্রন্থাগার বিদ্যার বিভিন্ন দিকের আলোচনা ও প্রবন্ধ পাঠ ছাড়া গ্রন্থগার আইন ও পরিষদের সাধারণ সভাও সম্মেলনের কার্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সার্ট-লিব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রথম তিনজন

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বিগত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ সমাপ্তি পরীক্ষায় যে তিনজন ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করেছেন :

১ম : **শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** ; বি,এস-সি পাশ ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দপ্তরে কাজ করেন।
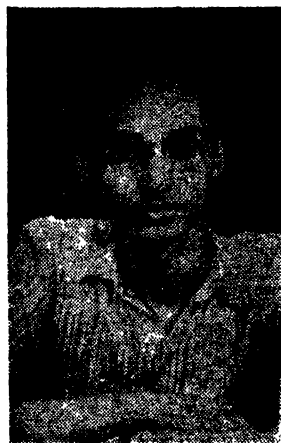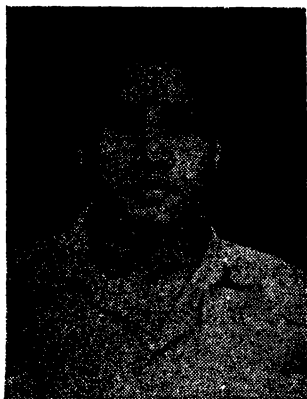
২য় : **শ্রীরবীন্দ্রনাথ গঁুই** ; এম, এ, পাশ ; বর্তমানে শিক্ষকতা করেন।

৩য় : **শ্রীচিত্তরঞ্জন ভট্টাচার্য** ; বি, এ, পাশ ; দমদম মতিঝিল কলেজ গ্রন্থাগারের সহ-গ্রন্থাগারিক।

পাটনা খুদাবক্স লাইব্রেরীর উন্নয়নে কেন্দ্রীয় সরকারের আগ্রহ

১৮২১ সালে প্রতিষ্ঠিত পাটনার বিখ্যাত খুদাবক্স লাইব্রেরীটি দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত, আরবী, ফরাসী, উর্দু ও হিন্দী পুঁথি ও গ্রন্থে সমৃদ্ধ। আইনজীবি, পন্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী স্বর্গতঃ খুদাবক্স এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্ত্তমানে বিহার সরকারের কর্তৃত্বাধীনে এটি পরিচালিত হয়। গ্রন্থাগারে বহু অমূল্য ও উৎকৃষ্ট তৈলচিত্রও আছে। আচার্য যদুনাথ সরকার প্রমুখ পন্ডিতগণ এই গ্রন্থগার নিয়মিত ব্যবহার করেছেন। খবরে প্রকাশ যে কেন্দ্রীয় সরকার জাতির এই মূল্যবান সম্পদকে রক্ষার জন্যে বিশেষ যত্ন নিচ্ছেন। উপযুক্ত গৃহ নির্মাণ ও পরিচালন ব্যবস্থার জন্যে সম্প্রতি মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর পাটনায় উপনীত হয়ে রাজ্য সরকারের সঙ্গে প্রারম্ভিক আলাপ আলোচনা করেছেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ পরীক্ষার ফলাফল

১৯৫৯ সালের ডিসেম্বর মাসে গৃহীত ও মার্চ মাসে প্রকাশিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ-লিব পরীক্ষার ফলাফল ঃ

গুণানুসারে

প্রথম শ্রেণী

১। বিজয়পদ মুখোপাধ্যায়
২। সুদেব চট্টোপাধ্যায়
৩। বিমলাচরণ সরকার
৪। বিধানগোবিন্দ অধিকারী
৫। সান্তনা সেনগুপ্ত
৬। সুদীপ্তি সেন

দ্বিতীয় শ্রেণী

১। মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়
২। বিশ্বজিৎকুমার বসু
৩। মুথিকা ঘোষ
৪। বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
নৈবেদ্য ঘোষাল
৬। কৃষ্ণা রায়
৭। কেশবচন্দ্র সেনগুপ্ত
৮। বিশ্বপতি চট্টোপাধ্যায়
৯। অঞ্জলি দাস
১০। সুনীলা দাশগুপ্ত

তৃতীয় শ্রেণী

১। নরেশচন্দ্র বসু
২। কিরণচন্দ্র বর্মণ
৩। শিবাণী দত্ত

১৯৬০ সালের আগষ্ট মাসে গৃহীত ও অক্টোবরে প্রকাশিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ-লিব পরীক্ষার ফলাফল ঃ

গুণানুসারে

প্রথম শ্রেণী

১। শিবশংকর মিত্র
মানস কুমার রায়
৩। রাজেন্দ্র সিং
৪। মঞ্জু বন্দ্যোপাধ্যায়
৫। জীমূত বাহন রায়
৬। ব্যোমকেশ মাইতি
৭। আরতি রায়
৮। মংগল প্রসাদ সিংহ
৯। অশোক নাথ মুখোপাধ্যায়
১০। হাউসলা প্রসাদ
১১। কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর
১২। প্রমোদ রঞ্জন চৌধুরী

দ্বিতীয় শ্রেণী

১। সুধীরচন্দ্র চৌধুরী
২। শ্যামসুন্দর
৩। সি, এস, পুষ্পবেনী
৪। কাত্তিকচন্দ্র সাহা
৫। প্রতিমা সেনগুপ্ত
৬। কান্তিভূষণ রায়
৭। ভারতী গুহ
৮। রথীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
৯। নির্মলেন্দু মুখোপাধ্যায়
১০। সলিল কুমার চৌধুরী
১১। বিজয়েন্দ্র প্রসাদ সিংহ
১২। সুনীল চন্দ্র সেন
১৩। রাম দুলার সিং
১৪। অরুণ লাল দে
১৫। অসীম কুমার মিত্র
১৬। অজিত বন্ধু চক্রবর্ত্তী
১৭। কল্পনা গঙ্গোপাধ্যায়
১৮। মৈত্রেয়ী দাসগুপ্ত

তৃতীয় শ্রেণী

১। সান্তনা রায়
২। দেবী গোপাল দত্ত
৩। ছায়া ঘোষ
৪। প্রণবেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়
৫। মহাদেব প্রসাদ
৬। শিবরঞ্জন ঘোষ
৭। ক্ষৌণীষ চন্দ্র বিশ্বাস
৮। নমিতা মিত্র
৯। বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

পঃ বঃ রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদে শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার

রাজ্যব্যাপী সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী সরকার পঃ বঙ্গের জেলায় জেলায় এক বা একাধিক কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ও পল্লী গ্রন্থাগার স্থাপন করেছেন। সর্বোপরি সারা রাজ্যের একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারও কিছুকাল আগে কলকাতার উত্তর প্রান্তে বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের এমারেল্ড বাওয়ার ভবনে স্থাপিত হয়েছে। গ্রন্থাগারিক ব্যতীত প্রায় সকল পদেই বহুপূর্বে লোক নিয়োগ কাজ সম্পন্ন হয়। এতদিন পরে বাকি ও শূন্য গ্রন্থাগারিকের পদটি পূরণ হোল। নিযুক্ত হলেন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের গ্রন্থাগারিক শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার।
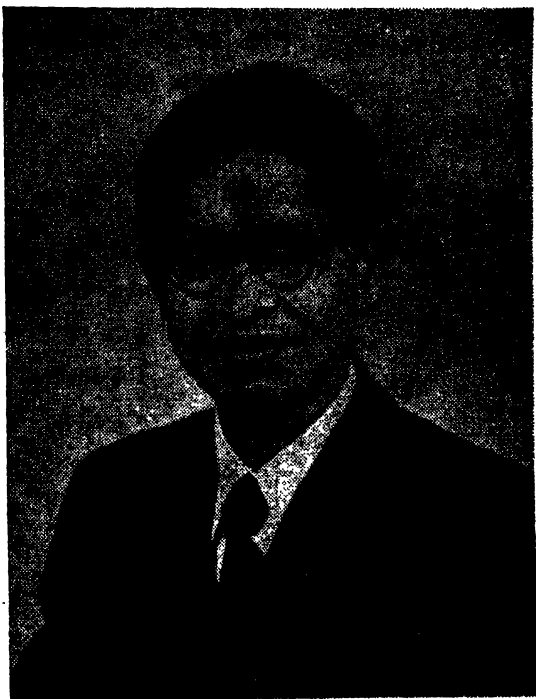
শ্রীযুক্ত সরকার একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। অর্থনীতিতে এম, এ পাশ করে তিনি পাবনার এডোয়ার্ড কলেজে কিছুকাল অধ্যাপনার কাজ করেন। পরে সরকারের পরিসংখ্যান দপ্তরে যোগদান করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণে বিশেষ যোগ্যতার সহিত তিনি উত্তীর্ণ হন। ১৯৫১ সালে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে প্রথম গ্রন্থাগারিক বৃত্তি গ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালে শ্রীযুক্ত সরকার সফর ও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেন। অর্থনৈতিক বিষয়াদির উপর তিনি গবেষণা ও বহু প্রবন্ধ রচনা করেছেন। অনেকগুলি ভাষা তাঁর জানা আছে। সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সংস্থাগুলির সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থগারিকের পদে তাঁর মত সুপণ্ডিত ও সুযোগ্য ব্যক্তি নিযুক্ত হওয়ায় সকলেই আনন্দিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত ডিপ-লিব পরীক্ষায় যে দু'জন একসঙ্গে প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থান অধিকার করেছেন

শ্রীশিবশঙ্কর মিত্র

শ্রীযুক্ত মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের অন্যতম সহগ্রন্থাগারিক। এক সময় তিনি যুগান্তর দলভুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্যে তিনি দীর্ঘকাল কারাজীবন যাপন করেন। লেখক ও শিশু সাহিত্যিক হিসাবে তাঁর নাম সুবিদিত। তাঁর 'সুন্দর বনের আর্জান সর্দার, বইটি বিলাতের একটি বিখ্যাত প্রকাশন প্রতিষ্ঠান ইংরাজিতে মুদ্রণ করছেন বলে প্রকাশ। তিনি এম-এ পাশ। বয়স তাঁর পঞ্চাশের ঊর্ধে। শ্রীযুক্ত মিত্র বংগীয় গ্রন্থাগার পরিষদের একজন প্রাক্তন ছাত্র।

সেন্ট্রাল গ্লাস এন্ড সিরামিক রিসার্চ ইনষ্টিটুটের গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত রায় ফরাসী ও জার্মান ভাষায় বহু বাংলা কবিতা ও রচনা অনুবাদ করেছেন। রুশ ভাষাতেও তাঁর যথেষ্ট দখল আছে। বি, এ, পাশ। বয়স তেত্রিশ। ইনিও পরিষদের একজন প্রাক্তন ছাত্র।
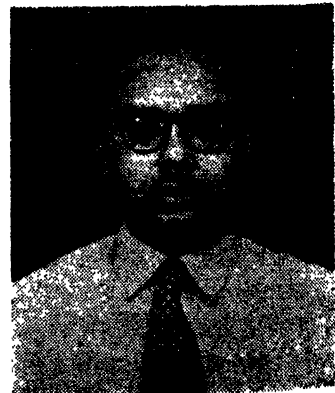
শ্রীমানস কুমার রায়

সম্পাদকীয়

২০শে ডিসেম্বর

আমাদের এবছরের গ্রন্থাগার সপ্তাহ এসে পড়ল, এখন আমাদের এক বছরের কাজের হিসাব নিকাশের দিন। যে লক্ষ্যে পৌঁছুবার উদ্দেশ্যে আমরা ১৯৫৯ সালের ডিসেম্বরে পদক্ষেপ সুরু ক'রেছিলাম আজ ভেবে দেখতে হবে যে লক্ষ্যের দিকে আমরা কতদূর এগোতে পেরেছি। মহামতি গোখলে একদিন বলেছিলেন, বাংলা আজ যা'ভাবে ভারত ভাবে তা' কাল। গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও আমাদের পূর্বসূরীরা আমাদের এ গৌরব নষ্ট হ'তে দেন নি'। ভারতবর্ষে সুপরিকল্পিত গ্রন্থাগারের আয়োজনের জন্য প্রথম যে আইনের পরিকল্পনা হ'য়েছিল—সে পরিকল্পনা বাঙ্গালীর—বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পূর্বতন সভাপতির। কিন্তু পরিকল্পনার ক্ষেত্রে প্রথম হ'লেও ঐ পরিকল্পনাকে কার্যকরী ক'রে তোলার ব্যাপারে আমরা আমাদের অগ্রগতি রক্ষা ক'রতে পারি নি'। এর মধ্যে মাদ্রাজ গ্রন্থাগার আইন চালু ক'রে ফেলেছে। ঐ আইনের সুযোগ আজ ভারতের তিনটে রাজ্য পূর্ণতঃ বা অংশতঃ ভোগ ক'রছে।

এ বছরের সুরুতে আমরা বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা সুরু ক'রেছিলাম। আমরা অনেক সভা সমিতিতে, অনেক আলোচনাচক্রে, অনেক প্রবন্ধে আমাদের আইনের প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা ক'রেছি। ইতিমধ্যে ভারত সরকারের গ্রন্থাগার উপদেষ্টা সমিতির রিপোর্ট প্রচারিত হওয়ায় আমাদের চেষ্টা অনেকখানি অনুকূল আবহাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। অল্প কিছুদিন হ'ল আমাদের কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ শ্রীমালী ঘোষণা ক'রেছেন যে রাজ্যে রাজ্যে গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করাবার আয়োজন হ'চ্ছে।

তবে কি আমাদের গতি শ্লথ করবার সময় এসেছে? উদ্দেশ্যের সিদ্ধি কি আমাদের করতলগত, আমরা কি আত্মসন্তুষ্টির সঙ্গে এবারের গ্রন্থাগার দিবসে আমাদের সাফল্যের কথা ব'লে রাজ্যব্যাপী সকলকে নিশ্চিন্ত হ'তে ব'লতে পারি?

না, সে সময় এখন আসে নি। রাজ্যব্যাপী বিনা-চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আলাদীনের প্রদীপের মত ছোঁয়ামাত্র কার্যকরী হতে পারবে না। গ্রন্থাগার আইন হয়ত একটা হবে, কিন্তু সে আইনের রূপ কেমন হবে তার কিছুই আমাদের জানা নেই। এমন কি এই আইনের লক্ষ্য যে সবলোকের জন্য বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার তাই আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পারিনি'। অনেকেই জানেন

আমাদের দেশে সবচেয়ে আগে যখন প্রস্তাব উঠেছিল পৌর প্রতিষ্ঠানগুলোকে শিক্ষা কর ধার্য ক'রে প্রাথমিক শিক্ষা বিতরণ করবার অধিকার দেওয়ার—তখন তদানীন্তন লাটসাহেব এই আইন সভার মতে ঐ আইন তোলবার অনুমতি দিয়েছিলেন যে যেসব পৌরসভা ঐ শিক্ষা কর ধার্য করবে তারা সরকারী সাহায্য ত' পাবেই না—উপরন্তু সরকারের তাদের হিসাব নিকাশ দেখতে যে লোক নিয়োগ করতে হবে তার জন্যে সরকারকে কিছু টাকা দিতে হবে। এই রকম অবস্থায় প্রস্তাবক ঐ আইন পাশ করতে চাননি'। আইন প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছিলেন। তাই আইন হ'লেই আমাদের সব পাওয়া হ'য়ে গেল না। যে আইন আমাদের সকলের গ্রন্থের সুযোগ এনে দিতে পারবে সেই আইন আমরা চাই। প্রস্তাবিত গ্রন্থাগার আইনের খসড়া আমরা কেউই দেখিনি'। তাই আইন সম্বন্ধে জনমত গ'ড়ে তোলার দায়িত্ব থেকে গ্রন্থাগার কর্মীরা আজও মুক্ত হ'তে পারেন না।

তারপরে আইন সত্যিই হবে ত'? উপদেষ্টা সমিতি সারাভারত ঘুরে যেটুকু সময়ের মধ্যে তাঁদের রিপোর্ট প্রকাশ ক'রেছিলেন তার তুলনায় আইনের কাঠামো তৈরী করতে কেন্দ্রীয় সরকারের খুব বেশী সময় লাগছে না কি? আইন হ'লে দাক্ষিণ্যের দান যে অধিকারের দাবীতে রূপান্তরিত হ'তে পারে, এই চিন্তাক্ষমতায় আসীনদের খানিকটা বিচলিত করেনি' তো?

গ্রন্থাগার আইনের কথা উঠলেই করের ভয় দেখানো হয়, বলা হয় নতুন কর ব'সবে। বলা হয় এই কর তারা দিয়ে যাবে বটে কিন্তু এর বদলে কিছু পাবে না। দৃষ্টান্ত দেখানো হয় শিক্ষা-কর দিচ্ছে আমাদের দেশের লোক অনেকদিন ধ'রে কিন্তু আজও কি পেয়েছে তারা সব বিনা পয়সায় পড়বার সুযোগ। শিক্ষার আইন যেমন আমাদের দেশের শিক্ষা সমস্যাকে মেটাতে পারে নি' গ্রন্থাগার আইনও তেমনি পারে না আমাদের গ্রন্থাগার সমস্যার সমাধান করতে।

'কিন্তু শিক্ষার আইনের এই ব্যর্থতায় আমাদের আজ আরও সজাগ হ'তে হবে। শিক্ষার আইন শিক্ষার ব্যর্থতার জন্যে দায়ী নয়—দায়ী ঐ আইনের ঠিক মত প্রয়োগের অভাব। আমাদের জনমতকে জাগ্রত ক'রতে হবে ঠিক মত গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ করার জন্যে—আমাদের জনমতকে জাগ্রত ক'রতে হবে এই আইন চালু করার ব্যাপারে যাতে কোন অনাচার না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য।

বলা বাহুল্য একাজ আমাদের আজও শেষ হয়নি'। এ কাজ চালিয়ে যাবার পুরানো সংকল্প আবার নতুন ক'রে গ্রহণ ক'রতে হবে আমাদের ২০শে ডিসেম্বরে।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

সাধারণ গ্রন্থাগারে অনুলেয়-সেবা

বনবিহারী মোদক

মানুষের মনে অনন্ত জিজ্ঞাসা। তথ্যে-ঠাসা নোট-বইটা হাতে থাকা সত্ত্বেও 'আবোল তাবোলে'র মেজদার ছোটভাইটি দারুণ খটকায় পড়েছিল—

"আঙুলেতে আটা দিলে কেন লাগে চট্‌চট্‌ ?
কাতুকুতু দিলে গরু কেন করে ছট্‌ফট্‌ ।
তেজপাতে তেজ কেন ? ঝাল কেন লংকায় ?
নাক কেন ডাকে আর পিলে কেন চমকায় ?"

অমন অমূল্য নোট বই আমাদের অনেকেরই নেই। কাজেই আমাদের মনের প্রশ্নগুলোর সঠিক জবাব পাওয়া খুবই মুস্কিল। ও-রকম নোট-বই থাকুক বা না থাকুক, পাবলিক লাইব্রেরীগুলোতে বইপত্তর কিন্তু নেহাত কম থাকে না। কাজেই নানারকম প্রশ্নের মীমাংসার জন্যে অনেকেই আসেন গ্রন্থাগারে।

প্রশ্ন ত' বহু রকমেরই হ'তে পারে। সাধারণ গ্রন্থাগারের সূত্রসন্ধান বিভাগ কি সব প্রশ্নেরই উত্তর দিতে নীতিগতভাবে বাধ্য ? উপরের উদ্ধৃতিটিতে যে-সব কথা জানতে চাওয়া হয়েছে, সে-রকম প্রশ্নের জবাব দেওয়া কি কোন গ্রন্থাগারকর্মীর পক্ষে সম্ভব ? স্পষ্টতঃই এর উত্তর—'না'। একমাত্র 'মুদ্রিত পুঁথিপত্রে প্রাপ্তব্য কোন তথ্য বা তত্ত্ব সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট প্রশ্নকেই বলে Reference question বা তথ্যানুসন্ধানের প্রশ্ন'। প্রত্যেক গ্রন্থাগারকর্মী সহৃদয়তার সংগে পাঠক-সাধারণের এই রকম সব প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে দিতে সাধ্যমত তৎপর হবেন। একেই বলা হয় Reference service বা 'অনুলয় সেবা'।

সুপরিচালিত বড় বড় গ্রন্থাগারগুলো রেফারেন্স সার্ভিসের আলাদা বিভাগ রাখেন। কিন্তু মফঃস্বলের মাঝারি ও ছোট সাধারণ গ্রন্থাগারগুলোর পক্ষে পৃথক একটি বিভাগ হিসেবে রেফারেন্স সার্ভিস চালানো কি সম্ভব? এমনিতেই ত' তাঁদের ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না, বাঁয়ে আনতে ডাইনে টান পড়ে। তাহলে কি তথ্যানুসন্ধানের এই সেবাটুকু থেকে তাঁদের পাঠক সমাজকে তাঁরা বঞ্চিতই রাখবেন?

এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে প্রথমেই জানতে হবে—রেফারেন্স সার্ভিসের জন্যে কি কি দরকার। পৃথক বিভাগ হিসেবে সুষ্ঠুভাবে অনুলয় সেবা চালাতে গেলে চার রকমের জিনিস দরকার:

১। পর্যাপ্ত তথ্যগ্রন্থাদি।

২। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখা সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা রাখেন এবং তথ্যাদির প্রাপ্তব্য সূত্র সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল—এ রকম ভূয়োদর্শী সেবাব্রতী কর্মী।

৩। হাতের কাছে কিছু সংখ্যক তথ্যগ্রন্থ সাজিয়ে রাখার সুবিধে-যুক্ত Information counter বা রেফারেন্স ডেস্ক।

৪। জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরা অবাধে এসে বসতে, প্রশ্ন করতে ও গ্রন্থাদি দেখতে পারেন—এমন একটি পৃথক নিরিবিলি কক্ষ।

আমাদের দেশের ছোটখাট লাইব্রেরীর পক্ষে এখনই এতটা আশা করা ভুল। সব কিছু জিনিসের ব্যবস্থা হলে তবেই অনুলয় সেবায় নামব—এ কথা ভেবে বসে থাকলে কোন দিনই আমরা পাঠকদের প্রয়োজন ও কৌতূহল মেটাতে পারব না। যতটুকু আমাদের সাধ্য, তাই নিয়েই কিভাবে তথ্যানুসন্ধানের কাজে পাঠক ও বিদ্যোৎসাহীদের আমরা সাহায্য করতে পারি—এটাই আমাদের ভেবে দেখতে হবে।

বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ধার দেওয়া হয় না—এমন কিছু সংখ্যক বই সব গ্রন্থাগারেই আলাদা করে রাখা হয়,—যেমন বহুমূল্য বা দুষ্প্রাপ্য বই, কোষগ্রন্থ ইত্যাদি। সব রকমের দু' চারখানা করে তথ্যগ্রন্থ সংগ্রহ করে এই সব পৃথক করে রাখা বইয়ের সংগে রাখতে পারলেই মোটামুটি কাজ চলবার মত একটি 'রেফারেন্স ষ্টক' গড়ে উঠবে। এই বিভাগের কোন বই-ই বাইরে ইস্যু করা যাবে না। অবশ্য তার প্রয়োজনও পড়বে না; কারণ সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়বার বই এগুলো] নয়, যার যে বিষয়টা বা যতটুকু দরকার, সেটুকু দেখে বা লিখে নিলেই কাজ মিটে যাবে।

ছোট বা মাঝারি আকারের সাধারণ গ্রন্থাগারে অনুলয় সেবার কাজ আরম্ভ করার পক্ষে পূর্বোল্লিখিত দরকারী উপকরণগুলোর অভাব খুব বড় বাধা হয় না। নিজেদের অন্যান্য কাজের সংগে এ কাজটিকেও হাতে নিতে সেবাব্রতী গ্রন্থাগার-কর্মীরা নিশ্চয়ই অসম্মত হবেন না। কারণ ঃ

১। বিভিন্ন তথ্যগ্রন্থ নড়াচড়ার ফলে গ্রন্থাগারকর্মীদের নিজেদের জ্ঞানের পরিধিও এতে সুনিশ্চিতভাবে বেড়ে চলবে।

২। ব্যাপকতর জন-সংযোগের ফলে গ্রন্থাগারের পঠন-পাঠনও এতে ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করবে।

শুধু এই কাজের জন্যে আলাদা কর্মী নিয়োগের ব্যয়-বাহুল্য এ ব্যবস্থায় প্রথমেই অন্ততঃ দরকার হবে না। সেই টাকাতে তথ্যগ্রন্থের সংগ্রহকে বরং সমৃদ্ধতর করা যাবে।

এইবার দেখা যাক—কি কি বই যোগাড় করতে পারলে প্রাথমিকভাবে কাজ সুরু করা যেতে পারে ঃ

১। অভিধান—

(ক) এক ভাষার অভিধান ঃ গ্রন্থাগার যত ছোটই হোক, এই জাতীয় দু' একখানি অভিধান তাকে রাখতেই হয়। আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজে ইংরেজী এবং বাংলা ভাষার অভিধানই সচরাচর প্রয়োজন পড়ে। সম্প্রতি হিন্দী ভাষার অভিধানও মাঝে মাঝে দরকারে লাগে। কাজেই, এই ভাষাগুলোর সেরা দু' একটি অভিধান রাখা নিতান্তই অপরিহার্য।

(খ) দ্বি-ভাষিক অভিধান ঃ ইংরেজী থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ইংরেজী, ইংরেজী থেকে হিন্দী এবং হিন্দী থেকে ইংরেজী—সাধারণ গ্রন্থাগারে এই কয়েকটি দ্বি-ভাষিক অভিধান রাখাই যথেষ্ট।

(গ) বিশেষ বিষয়ের অভিধান ঃ বিভিন্ন বিষয়ের অভিধান ইংরেজীভাষায় অনেক পাওয়া যায়। এর মধ্যে 'উদ্ধৃতি অভিধান' ও 'ভৌগোলিক অভিধান' প্রায়ই কাজে লাগে। বাংলায় এ ধরণের বই বিরল। পৌরাণিক অভিধান, ভৌগোলিক অভিধান প্রভৃতি যে দু একখানি Subject Dictionary বাংলায় বেরিয়েছে, বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলের গ্রন্থাগারগুলো তার পৃষ্ঠপোষকতা করলে ভাল হয়। এতে তাঁদের সংগ্রহও যেমন পূর্ণতর হবে, বাংলার প্রকাশকরাও তেমনি ঐ-সব ধরণের বই প্রকাশ করতে উৎসাহিত হবেন।

(ঘ) জীবনী অভিধান ঃ ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক থেকে উৎকৃষ্ট একটি

'জীবনীকোষে'র দাম অসামান্য। রেফারেন্স স্টকে জীবনী কোষের স্থান অপরিহার্য। অবশ্য ভারতীয় মনীষীদের জীবনের অথ্যনিষ্ট বিবরণ বিদেশে প্রকাশিত জীবনীগ্রন্থে খুব কমই মেলে। এ জন্যে দেশী সংস্থার প্রকাশিত জীবনীকোষ ও Who's who ধরণের এবং খুব সাম্প্রতিক সংস্করণের দু-একটি বই সাধারণ গ্রন্থাগারে অবশ্যই থাকা চাই।

২। পরিভাষাকোষ ঃ পারিভাষিক শব্দ নিয়ে আজকাল হামেশাই গোল বাধে। এজন্যে বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী প্রকাশন-সংস্থার পরিভাষা সংকলন অবশ্যই রেফারেন্স স্টকের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৩। বিশ্বকোষ উপযোগিতার বিচার করে দেখলে অন্ততঃ একখানি ভাল বিশ্বকোষ বা encyelopaedia গ্রন্থাগারে রাখা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সেরা বিশ্বকোষগুলি ছোটখাট লাইব্রেরীর ক্রয় ক্ষমতার বাইরে। কাজেই পিয়ার্স সাইক্লোপিডিয়া বা অনুরূপ ছোট এবং একখণ্ডের বিশ্বকোষ দিয়েই কাজ চালানো যেতে পারে। বিশ্বকোষ দু-রকমের ঃ—(১) সাধারণ বিশ্বকোষ ; (২) বিশেষ বিষয়ের বিশ্বকোষ।

৪। মানচিত্র ঃ—মানচিত্রও দু-রকমের। (১) ছোট স্কেলের মানচিত্রকে বলে এ্যাটলাস। এগুলো বইয়ের আকারে প্রকাশিত হয়। (২) বড় স্কেলের মানচিত্রকেই ম্যাপ বলে। ম্যাপ দেওয়ালে টাঙান হয়।

সমস্ত দেশের রাজনৈতিক ও প্রাকৃতিক মানচিত্র থাকলেই মোটামুটি কাজ চলে যায়। বিদেশে প্রকাশিত মানচিত্রের দাম প্রায়ই অত্যধিক। পেংগুইন, পকেট বুকস্ ইনকর্পোরেটেড প্রভৃতি সংস্থা যে সব কম দামের এ্যাটলাস প্রকাশ করে, অনন্যোপায় হলে সেগুলো কিনেও কাজ চালানো যায়।

৫। বর্ষপঞ্জী বা ইয়ার বুক ঃ বর্ষপঞ্জীও দু-রকমের—(১) সাধারণ বর্ষপঞ্জী ; (২) বিশেষ দেশের বর্ষপঞ্জী। জিজ্ঞাস্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত দিগদর্শন পাওয়ার পক্ষে বর্ষপঞ্জী বেশ উপযোগী। সাম্প্রতিক বিষয়গুলো এতে ভালই মেলে। বর্ষপঞ্জী কিন্তু সব সময়েই latest রাখতে হয়। পশ্চিমবাংলার মফঃস্বলের গ্রন্থাগারগুলো একাধিক নূতন বর্ষপঞ্জী রাখলে, নিয়োগ পরীক্ষা ও ইন্টারভিউ-ভীত তরুণ বেকার ছেলেদের আশীর্বাদ পাবেন।

৬। গ্রন্থপঞ্জী (Bibliography) এবং পাঠ্যতালিকা (Reading list) ঃ মনস্বী ও অধ্যবসায়ী পাঠকেরা প্রায়ই জানতে চান—কোন একটি বিশেষ বিষয়ে

কি কি বই আছে। এঁদের প্রশ্নকে তৃপ্ত করতে পারে একমাত্র গ্রন্থপঞ্জী। গ্রন্থপঞ্জী দু-রকমের ঃ (১) সাধারণ গ্রন্থপঞ্জী ; (২) বিশেষ বিষয়ের গ্রন্থপঞ্জী।

জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে প্রায়ই হয়ত এক একটি বিষয়ের বইয়ের তালিকা করতে হয়। এই তালিকাগুলির প্রতিলিপি রাখলে, এর থেকেই পরবর্তী সময়ের অনুসন্ধিৎসুদের আগ্রহ-মাফিক Reading list চাওয়া মাত্রই তৎপরতার সংগে সরবরাহ করা যায়।

৭। ডাইরেক্টরী ঃ হঠাৎ কোন দরকারে একজন হয়ত কোন কিছুর ঠিকানা প্রভৃতির হদিস পেতে চান। এক্ষেত্রে দরকার ডাইরেক্টরী। ডাইরেক্টরী চার রকমের হতে পারে ঃ (১) সিটি ডাইরেক্টরী ; (২) পেশাবিষয়ক ডাইরেক্টরী ; (৩) ট্রেড ডাইরেক্টরী ; (৪) প্রেস ডাইরেক্টরী।

৮। গেজেটিয়ার ঃ স্থান সম্বন্ধীয় এবং নৈসর্গিক বস্তু বিষয়ক সমস্ত জ্ঞাতব্য বিবরণ আমরা পেতে পারি গেজেটিয়ার থেকে। গেজেটিয়ার 'রেফারেন্স ষ্টকে'র অপরিহার্য গ্রন্থ।

৯। গাইড বুক ঃ গাইড বুকও স্থান বিষয়ক বই। ভ্রমণকারীদের দিকে নজর রেখে, তাঁদের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলোকেই এতে প্রাধান্য দেওয়া হয়। গেজেটিয়ান ও গাইডবুকের তফাতটা জেনে রাখা ভাল—(১) গেজেটিয়ার প্রায়ই বর্ণনানুক্রমিক গাইডবুক সাধারণতঃ তা নয়। (২) গেজেটিয়ারে সব স্থান ও নৈসর্গিক বস্তুরই বিবরণ থাকে ; গাইডবুকে থাকে প্রধানতঃ "দ্রষ্টব্য" গুলোর এবং পথ-ঘাট প্রভৃতির পরিচিতি।

১০। সাময়িক পত্রের প্রবন্ধের সংকলিত সূচী ও সার-সংগ্রহ ঃ বইয়ের আকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে পর্যন্ত, জ্ঞান বিজ্ঞানের শেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা-গুলো আজকাল সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠাতেই নিবদ্ধ থাকে। এক বিষয়ে ভাল কোন বই-ই হয়ত পাওয়া গেল না। কিন্তু সেই বিষয়ই মূল্যবান কয়েকটী প্রবন্ধ হয়ত নানা জায়গায় বেরিয়েছিল। পাঠক খোঁজ করলে, গ্রন্থাগারকর্মীরা এক্ষেত্রে কিভাবে তাঁকে সাহায্য করবেন ? বিশিষ্ট পত্রপত্রিকাগুলোয় প্রকাশিত প্রবন্ধাদি সূচী ও সার সংকলনই এখানে একমাত্র ভরসা।

ব্যাপারটি আয়াসসাধ্য। তবু প্রয়োজনের কথাটা ভেবে দেখলে, একটু খেটে এগুলো তৈরী করার খুবই সার্থকতা আছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে যিনি যে বিষয়ে আগ্রহশীল, সেই বিষয়টির সূচী ও abstract করার ভার তাঁর

উপর দিলে কাজটা আনন্দের মধ্যে দিয়েই এগুতে থাকবে। যিনি সাহিত্য রসিক সাহিত্য বিষয়ক নানা লেখার সূচী তৈরী ও সার-সঙ্কলনের কাজ নিশ্চয়ই তাঁর পক্ষে প্রীতিকর হবে। মনস্বী পাঠক পাঠিকারাও এতে উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হবেন।

১১। রিপোর্ট ও বুলেটিন : বিশেষজ্ঞগণের খ্যাতনামা সংস্থা বা গোষ্ঠির প্রতিবেদনগুলো মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিলরূপে সংরক্ষিত হওয়ার যোগ্য। কদাচিৎ এগুলো কাজে লাগে, কিন্তু যখন লাগে, তখন আর বিকল্প কোন গ্রন্থ দিয়েই এর প্রয়োজন মেটানো, যায় না। কাজেই অবহেলা করে এই ধরণের জিনিসগুলো নষ্ট করে ফেলা উচিত নয়।

১২। খবরের কাগজের কাটিং ও নির্ঘণ্টপত্র : একটু ধৈর্য নিয়ে কাজ করে গেলে অচিরেই অনুভব করা যাবে—নামমাত্র খরচে কত চমৎকার 'রেফারেন্স টুল' নিজেই তৈরী করে নেওয়া যায়। আজ যেটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী সাম্প্রতিক ঘটনা, কালই তার খুঁটিনাটিগুলো লোকে ভুলে যাবে। কাগজের কাটিং রেখে নির্ঘণ্টপত্রের মধ্যে সেটি অন্তর্ভুক্ত করে নিতে পারলেই, আগামী দিনের অনেক জিজ্ঞাসুর কৌতূহল শান্ত করা যাবে।

১৩। পাঁজি, টাইম-টেব্‌ল্‌, ট্রেড-ক্যাটালগ প্রভৃতি : প্রথমোক্ত জিনিস দুটির বহুল ব্যবহারের কথা সকলেই জানেন। দামও এগুলোর বেশী নয়; যদিও টাইম টেব্‌ল্‌টা বছরে দু-বার নতুন কিনতে হয়। বিক্রেতাদের ক্যাটালগেও অনেক সময় সংরক্ষণযোগ্য মূল্যবান জিনিস থাকে। কাজেই অল্প দামের এইসব জিনিস এক-আধখানা করে রাখা ভাল।

অনুলয় সেবায় প্রয়োগিক সাফল্যের জন্যে ইতি-কর্তব্য কি—এইবার আমরা সেই দিকটি নিয়ে আলোচনা করব। আগের আলোচনাটুকু থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে :

১। জিজ্ঞাসু প্রশ্নকারী
২। গ্রন্থাগারকর্মী
৩। তথ্যগ্রন্থাদি
৪। জ্ঞাতব্য প্রশ্ন

এই চারটি factor-এর পারস্পরিক অংশ নিয়েই সূত্র-সন্ধানের যা-কিছু কাজ। অতএব এ-কাজে সর্বাধিক সাফল্যের জন্যে এই চারটি প্রান্তের মধ্যে সুসমঞ্জস সম্পর্ক স্থাপন সর্বাগ্রে দরকার। একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে—

এই সম্পর্ক-সূত্রের মধ্যেও রয়েছে সুস্পষ্ট দুটি বিভাগ ঃ (ক) নৈর্ব্যক্তিক ; ও (খ) ব্যক্তিক। জ্ঞাতব্য প্রশ্ন ও তথ্যগ্রন্থাদির মধ্যে যে সম্পর্ক—সেটি নৈর্ব্যক্তিক। আর জিজ্ঞাসু প্রশ্নকারী ও গ্রন্থাগারকর্মীর মধ্যে যে সম্পর্ক—সেটি ব্যক্তিক। এর যে-কোন একটি সম্পর্ককে অবহেলা করলে সূত্র-সন্ধান সেবার কাজটি কিছুতেই ত্রুটিমুক্ত হতে পারবে না।

নৈর্ব্যক্তিক সম্পর্ক সুষ্ঠু হবে ঃ

১। জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন সুনির্দ্দিষ্ট (specific) রূপে এলে।

২। তথ্যগ্রন্থের সংগ্রহ সমৃদ্ধ থাকলে।

৩। বিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থসূচী ও নির্দ্দেশিকা থাকলে।

ব্যক্তিক সম্পর্ককে সার্থক করে তুলতে পারা সহজ নয়। অনুলয় সেবার ভারপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারকর্মীকে প্রাজ্ঞ হিসেবে সর্বসাধারণের সম্ভ্রম পাওয়ার যোগ্য হতেই হবে কিন্তু এই সম্ভ্রমবোধ যেন জিজ্ঞাসু জনসাধারণকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে থাকতে প্রণোদিত না করে। সহজে ও অবাধে কাছে আসতে পারা যায় এমন আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব (approachability) তাঁর অবশ্যই থাকা চাই। কাছে আসতে পারা বলতে শুধু প্রশ্নকর্তার দৈহিক উপস্থিতির সুবিধে দিতে বলছি না ; জিজ্ঞাসু ব্যক্তি, যতই দীন-হীন তিনি হোন না কেন, অনুলয় সেবকের সংগে আন্তরিক ও আত্মিক নৈকট্যবোধ যেন তিনি মনে মনে অনুভব করতে পারেন। এই বিষয়টির ওপর সাধ্যমত ও সর্বাংিক জোর দেওয়া দরকার। সাধারণ গ্রন্থাগারের কর্মী হিসেবে আমরা সবাই জানি—শুধু ঔদাসীন্য, কুণ্ঠা ও সঙ্কোচের জন্যেই আপামর জনগণের কী বিরাট একটি অংশ আমাদের গ্রন্থাগারগুলোতে আদৌ আসেন না। বই-পত্রের সম্ভার সাজিয়ে আমরা বসে থাকি ; আর মোট জনসংখ্যার অতি মুষ্টিমেয় একটি অংশকে গল্প-উপন্যাস আর সিনেমা-পত্রিকা পড়তে দেই !

উপযুক্ত চারটি factor-এর মধ্যে, 'জ্ঞাতব্য প্রশ্ন' সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা দরকার। প্রশ্ন তিন রকমের হতে পারে ঃ

১। তথ্য-সম্বন্ধীয় (fact-finding)

২। উৎস-সম্বন্ধীয় (material-finding)

২। গবেষণা-সংক্রান্ত

গবেষণা-সংক্রান্ত প্রশ্নের প্রতি যথোপযুক্ত সুবিচার করতে হলে তথ্য গ্রন্থাদির সংগ্রহ যতটা সমৃদ্ধ হওয়া দরকার, আমাদের দেশের মাঝারি ও ছোট

পাবলিক লাইব্রেরীগুলোর অধিকাংশেরই তা নেই। তাছাড়া, গবেষণার তথ্যানুসন্ধান দু-এক দিনেই শেষ হয়ে যায় না; গবেষকের পক্ষে দীর্ঘদিন ধরে গ্রন্থাগারের সংগে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হয়। এইসব কারণে গবেষণা-সংক্রান্ত প্রশ্নকে আমাদের আলোচনার মধ্যে না রাখাই ভাল।

তথ্য-বিষয়ক (fact-finding) প্রশ্নই অনুলয় সেবার সহজতম রূপ। সাধারণতঃ (ক) পরিসংখ্যান, (খ) নাম, (গ) সন-তারিখ, (ঘ) ঘটনা, (ঙ) বিবরণ—এইসব নিয়েই তথ্য-সম্বন্ধীয় প্রশ্ন। ভাল রেফারেন্স-বই দু-একখানি দেখেই এ-সব প্রশ্নের সঠিক সদুত্তর দেওয়া যায়।

সব প্রশ্নের জবাব কিন্তু এত সহজে মেলে না। অনেক বই-পত্তর ঘাঁটার পরও হয়ত পাওয়া গেল পরস্পরবিরোধী কোন তথ্য, হয়ত কোন উক্তি বা উদ্ধৃতির মূল উৎস খুঁজতে হল বা কোন তথ্যের তুলনামূলক বিচারের প্রয়োজন পড়ল। তাতে সময়ও লাগল অনেক বেশী। এগুলোই material-finding প্রশ্ন। Fact-finding প্রশ্নও material-finding প্রশ্নে দাঁড়াতে পারে।

তৎপরতার সংগে প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে হলে প্রশ্নটি সুনির্দিষ্ট (specific) হওয়া অত্যাবশ্যক। সেজন্যে, দরকার হলে, দক্ষ গ্রন্থাগারকর্মী অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তির সংগে কথা বলে তাঁর জিজ্ঞাস্য বিষয়টি ঠিক কি, সেটা সুস্পষ্টভাবে বুঝে নিতে চেষ্টা করবেন। এর জন্যে কিছু বেশী সময় ব্যয় করতে হল ভেবে অস্বস্তি বোধ করার কারণ নেই। প্রথমে সময় একটু বেশী লাগল বটে, কিন্তু কাজটি এতে সহজে ও সুশৃংখলভাবে শেষ করা যাবে। জিজ্ঞাসু পাঠকেরা অনেক সময়েই জানেন না, কি বই পড়তে হবে, কোন একটি দরকারী বই কি ভাবে খুঁজে পাওয়া যাবে এবং পাওয়া গেলেও কিভাবে বইখানি ব্যবহার করতে হবে। গ্রন্থাগারে সূচীকরণ ব্যবস্থা যতই নিখুঁত হোক না কেন, কুশলী রেফারেন্স লাইব্রেরীয়ানকে এই সব ক্ষেত্রেই গ্রন্থ ও জিজ্ঞাসুর মধ্যে যোগসূত্রতার কাজ করতে হবে। তিনিই হবেন অনুসন্ধিৎসুর মরমী পথপ্রদর্শক।

সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্যে রেফারেন্স-ডেস্কটা গ্রন্থসূচীর কাছেই স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। কোন প্রশ্নের পুরো জবাব দিতে হয়ত অনেকগুলো বই দেখতে হবে। হাতের কাছে ক্যাটালগ থাকলে তৎক্ষণাৎ বইগুলোর একটি তালিকা (Reading list) করে দেওয়া সম্ভব হয়। স্থানীয় অন্যান্য গ্রন্থাগারের গ্রন্থসূচী কাছে রাখতে পারলে আরও ভাল হয়। কারণ, প্রয়োজনীয় সব ক'খানি বই হয়ত নিজেদের গ্রন্থাগারে পাওয়া গেল না। সেক্ষেত্রে স্থানীয়

অন্য গ্রন্থাগার থেকে বই আনিয়ে দেওয়ার দরকার হতে পারে। এজন্যে গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। তাতে এক গ্রন্থাগারের অসম্পূর্ণতা অন্যের সংগ্রহ থেকে পূরণ করে নেওয়া চলে। খোঁজটা জেনে নিয়ে, পাঠক ইচ্ছা করলে নিজেও সেখানে গিয়ে দরকারী বইপত্র দেখে আসতে পারেন। শুধু এই-ই নয়, প্রয়োজন হলে বাইরে থেকেও তথ্য সংগ্রহ করে, যাতে অনুসন্ধিৎসু সুধীজনকে তৃপ্ত করা যায়—তার বন্দোবস্ত রাখাও গ্রন্থাগারের আদর্শ ও কর্তব্য হওয়া উচিত।

এইখানে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করতে হবে। রেফারেন্স সার্ভিসের কাজ সুরু করা হলে মাঝে মাঝে হয়ত দেখা যাবে—অত্যন্ত ভ্রান্ত, অজ্ঞতাপূর্ণ প্রশ্ন নিয়েও কোনও কোনও জিজ্ঞাসু ব্যক্তি উপস্থিত হচ্ছেন। গ্রন্থাগারকর্মী যদি এতে বিরক্তি ও অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেন, তাঁর কথাবার্তায় যদি প্রশ্নকর্তার প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ভাব প্রকাশ হয়ে পড়ে, আচরণে যদি তাঁর প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সামান্যতম কারণও প্রকট হয়ে যায়—শুধু অনুলয় সেবার নয়, সমগ্র গ্রন্থাগারটির আদর্শ ও প্রচেষ্টা তাহলে অচিরেই ধূলিসাৎ হতে সুরু করবে। আরও একটি বিষয়ে সাবধান হবার আছে। এমন কিছুসংখ্যক অনু-সন্ধিৎসুও হয়ত মিলবে—কোন কোন সাবজেক্ট সম্বন্ধে যাঁরা অত্যধিক ঔৎসুক্য ও আগ্রহ দেখাবেন। অনুলয় সেবক পরম যত্নে এ দের বই-পত্র দিলেন; পাঠ্য-তালিকাও তৈরী করে দিলেন; যে বইগুলো নেই, অনেক চেষ্টা-চরিত্তির করে সেগুলো বাইরে থেকে আনাবার বন্দোবস্তও করলেন। কিন্তু দিন কতক পরে সেই বইগুলো যখন এসে পেঁছুলো, সেই অতি-উৎসাহী জিজ্ঞাসু ব্যক্তিটির কোন পাত্তাই হয়ত পাওয়া গেল না তখন। বইগুলো একটিবার পাতা-উল্টেও দেখলেন না তিনি। বে-ফায়দা এতখানি সময়, পরিশ্রম, এমন কি কিছু অর্থও হয়ত ব্যয় হয়ে গেল। এতে হতাশা ও নিরুদ্যম আসবে না ত' কি? কিন্তু তা এলে ত' আমাদের চলবে না, সমস্ত কাজটাই যে তাতে ব্যর্থ হয়ে যাবে।

সর্বশেষে মনে রাখতে হবে, মানবিক দিকটাই অনুলয় সেবায় সবচেয়ে বড় বিচার্য। সুসমৃদ্ধ সংগ্রহ এবং আনাড়ী কর্মী থাকলে যা কাজ হয়, দক্ষ ও সেবাব্রতী সাহায্যকরী এবং সামান্যসংখ্যক তথ্যগ্রন্থ দিয়ে তার চেয়ে অনেক ভালো কাজ হতে পারে।

গ্রন্থাগার সংরক্ষণ প্রসঙ্গে

মীনেন্দ্রনাথ বসু
অধ্যাপক, নৃতত্ত্ব বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের ক্ষমতা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। সময়ের ব্যবধানে বিজ্ঞানীদিগের অবদান, গবেষণা, জ্ঞান বুদ্ধি মানুষকে নূতন হইতে নূতনতর পর্যায়ে উন্নীত করিয়া চলিয়াছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের বিভিন্ন চিন্তাধারার সুস্থ প্রকাশ আজ সমগ্র মানব জাতিকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছে। অন্যদিকে বিজ্ঞানের সুষ্ঠু প্রসার মানুষেরই আন্তরিক প্রচেষ্টায় সম্ভব হইয়াছে ও এখনও হইতেছে। বলিষ্ঠ মানসিক চিন্তাধারার স্বাধীন বিকাশ অবশ্য বিজ্ঞানীদিগের গবেষণা অব্যাহতভাবে চালাইয়া যাইবার সুযোগেই কার্যকরী হইয়াছে। বিজ্ঞানের প্রত্যেক অভিব্যক্তি প্রতিবারেই সমাজের জীবনী শক্তি নূতন করিয়া উজ্জীবিত করিয়া তোলে।

বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগ গভীরভাবে দিনে দিনে সাধারণ মানুষের চিন্তাবুদ্ধি আলোড়িত করিয়া তুলিতেছে। যন্ত্রসভ্যতার মানুষের কাছে বিজ্ঞান এক বিস্ময়কর স্রষ্টা। রোগাক্রান্ত মানুষের চোখে বিজ্ঞান কল্যাণময়ী শক্তির প্রতীক। অন্যদিকে বিজ্ঞান শিল্প ব্যবসায়ীদিগের জীবনে মূর্ত আশীর্বাদ। জ্ঞানী ব্যক্তির জ্ঞান অর্জনে ও বিতরণে শ্রেষ্ঠ বাহকও এই বিজ্ঞান। কিন্তু বিজ্ঞানের গুরুত্ব তাহার সুসংহত পদ্ধতির উপরেই সম্পূর্ণ-ভাবে নির্ভরশীল। প্রকৃতির সত্য অনুসন্ধানে এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিই মানুষের বোধশক্তির প্রধান অস্ত্র।

প্রকৃতির রাজ্যে মানুষের দৈনন্দিন জীবন সংগ্রামময়। জীবনের বাস্তব প্রয়োজনগুলির জন্য মানুষের অবিচ্ছিন্ন সংগ্রামের শেষ নাই। বিভিন্ন বাস্তব প্রয়োজনের চাপে সমাজের বিভিন্ন অবস্থায় মানুষ বিজ্ঞানের অনিবার্য সাহায্য লইতেছে। এই সঙ্গে বিজ্ঞানের—তাহার পদ্ধতি ও ব্যবহারিক প্রয়োগের উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের এই প্রয়োজন মিটাইতে জীব জগতের প্রত্যেকটী প্রাণীর মধ্যেই এক স্বাভাবিক প্রতিযোগিতা রহিয়াছে। ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র জীবাণু—যাহা অনেক সময় শুধু চোখে দেখা যায় না—বিচ্ছিন্নভাবে নগণ্য হইলেও সমষ্টিগতভাবে ভীষণ মারাত্মক। মানুষের সংগে জীবন সংগ্রামে ইহাদের প্রবল প্রতিযোগিতা। যখন মানুষের প্রাণশক্তির আধার বিবিধ শস্য অসংখ্য ক্ষুদ্র কীটপতংগের আক্রমণে নিঃশেষিত তখনই ইহা সত্য বলিয়া মনে হয়। সংখ্যাহীন পতংগের উপস্থিতি সকল সময়ই মানুষের সুস্থ জীবনের কল্যাণ বিরোধী শক্তি হিসাবে প্রাধান্য পায়। এই প্রসংগে পংগপাল, উইপোকা, মশা, উকুন, ইঁদুর ও বিভিন্ন ধরণের পোকামাকড়ের দৃষ্টান্তই যথেষ্ট। এই সকল প্রাণীর সমবেত কার্যকলাপ প্রবলভাবেই মানুষের স্বাভাবিক জীবন অসম্ভব করিয়া তোলে। কিন্তু এই সকল কীটপতংগ ও প্রাণীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ উপযুক্তভাবে সম্পূর্ণ হয় নাই।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে রসায়ন বিদ্যার প্রসার আজ মানুষকে আত্মরক্ষার কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করিতেছে। বিষাক্ত পদার্থের প্রয়োগে মারাত্মক কীটপতংগ ও প্রাণীর নিয়ন্ত্রণ ক্রমে ক্রমে সার্থক হইয়া উঠিতেছে। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে রোগোৎপাদক জীবাণুর রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ আশ্চর্য-ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই রাসায়নিক নিয়ন্ত্রণ প্রধানতঃ সালফোনামাইড্, পেনিসিলিন ও ডি, ডি, টীর সাহায্যে কার্যকরী করা হইয়াছে।

সমগ্র মানব জাতির নানাবিধ চিন্তাবুদ্ধির বিস্ময়কর অবদান আধুনিক মানব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নানাবিধ ভাষার সম্পদ—গদ্য-পদ্য, প্রবন্ধ, নাটক, উপন্যাস, বিজ্ঞান, সংগীত ও সুকুমার শিল্প আধুনিক মানব সভ্যতার মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। এই অমূল্য সম্পদের গৌরব মানুষ গ্রন্থাগারের সাহায্যে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। গ্রন্থাগার মানুষের জীবনে জ্ঞান-মন্দির। প্রয়োজনীয় লিখনের পুঞ্জীভূত প্রকাশই মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির অব্যাহত স্ফুরণের প্রামাণ্য সাক্ষী। কাগজ, গাছের পাতা (বিশেষ করিয়া তালপাতা) ইত্যাদিই এই সকল লিখনের ধারক। এই সকল লিখনের সংগ্রহ গ্রন্থাগারের কাঠের তৈরী তাক আলমারিতেই সাজানো থাকে। সাধারণত কাঠ, কাঁচ, লোহা, তামা, চামড়া, কাগজ, গাছের পাতা সকলই বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গঠনে নিত্য প্রয়োজনীয়।

গ্রন্থাগারের সংগৃহীত লিখনের উপযুক্ত যত্ন সকল সময়ই আবশ্যক। কারণ গ্রন্থাগারে কাঠ, চামড়া, কাগজ ইত্যাদি এমন বহু বস্তুর স্বাভাবিক ব্যবহার রহিয়াছে যাহার ক্ষয়ও অনিবার্য। এই ক্ষয় অনেক সময় প্রত্যক্ষভাবেই মানুষের

চিরকালের সম্পদ জ্ঞানবৃদ্ধির প্রকাশের প্রধান বাহক বিবিধ লিখনের সর্বনাশ নানা পথে অবশ্যম্ভাবী করিয়া তোলে। বিজ্ঞানের প্রয়োগ পদ্ধতিতে এই ক্ষয় সময়মত রোধ করিবার শুভ প্রচেষ্টা ও চিন্তাবিদদিগের গবেষণায় এই সঙ্গে দেখা দিয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে লিখনগুলির অস্তিত্ব বহুকালের জন্য নিরাপদ করিবার দায়িত্ব স্বভাবতই বিজ্ঞানীদিগের। এই কারণেই তাঁহারা আজ নানাবিধ রাসায়নিক বস্তুর প্রয়োগে ধ্বংসের হাত হইতে সকল লিখন বাঁচাইতে তৎপর হইয়াছেন।

বাংলা দেশে কাঠ, চামড়া, কাগজ ইত্যাদির তাড়াতাড়ি ক্ষয় হইবার কারণ তাহার জলবায়ু। এইখানকার জলবায়ুতে স্বাভাবিক ক্ষতিকারক জীবাণুর উপস্থিতি সকল সময় পাওয়া যায়। এই সকল জীবাণুর আক্রমণে বাংলা দেশের জীবন লিখনই যে শুধু ধ্বংস হইতে বসিয়াছে তাহা নয়, মানুষের সংগ্রামময় জীবনের অগ্রগতির ইতিহাস লিখন পর্যন্ত নষ্ট করিতে চলিয়াছে। এই কারণে গ্রন্থাগারের সংরক্ষণ আজ আশু প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। অসংখ্য স্বাভাবিক জীবাণুর মিলিত আক্রমণ হইতে সকল লিখন যথাযথভাবে রক্ষা করা যে এক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য তাহা বলা বাহুল্য।

এই সঙ্গে মানুষের জীবন লিখনগুলি যথাযথভাবে রক্ষা করিতে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাও গভীরভাবে বিজ্ঞানীদিগের গবেষণায় সাফল্যলাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। গ্রন্থাগারের বিবিধ উপাদানের ক্ষয় প্রধানতঃ দুইটী কারণে হয়ঃ—

(ক) **জলবায়ু**—তাপ ও আর্দ্রতার দ্রুত গুণগত অবস্থা পরিবর্তনের কারণেই নানাবিধ বস্তুর অবনতি অনিবার্য হইয়া উঠে। কাজেই শুকনো জায়গায় অপেক্ষাকৃত সমান তাপমাত্রার ব্যবধানে নানাবিধ বস্তু নিরাপদে রাখিবার জন্য কোন উপায় স্থির করা অবশ্য কর্তব্য। এই সঙ্গে তাপ ও আর্দ্রতার অবস্থা পরিবর্ত্তনজনিত ক্ষতির বিরুদ্ধে বস্তুগুলি রক্ষা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণশীল উপাদানগুলিও ব্যবহার করা একান্ত কর্তব্য।

(খ) **নানাবিধ কীট পতঙ্গ ও ছত্রক**—কাঠ, চামড়া, কাপড় ইত্যাদি তৈরী বস্তু ভীষণভাবে নষ্ট করে। এখন এই সকল বস্তু বাঁচাইতে হইলে অনেক সময় রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে উপযুক্ত পরিচর্যা অত্যাবশ্যক।

গ্রন্থাগারের বিবিধ উপাদানের সংরক্ষণে মোটামুটি দুই দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজনঃ

১। **পদ্ধতি**—বিভিন্ন বস্তুর উপাদানের গঠন নিশ্চিতভাবে প্রথমে ঠিক করিয়া লইতে হইবে।

২। **প্রয়োগ**—বিভিন্ন বস্তুর পরিবর্ত্তন অথবা অবনতির কারণ স্থির করিতে হইবে ও সেই সঙ্গে ক্ষতির কারণগুলি উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক সাহায্যে দূর করিতে হইবে।

কিন্তু সংরক্ষণের পথে স্বাভাবিক ক্ষতিকারক কারণগুলিও জানিবার প্রয়োজন। এই কারণগুলি যথা—**আলো, আর্দ্রতা, বায়ুমণ্ডলজনিত অবস্থা, ধুলা ও ময়লা, কীট-পতঙ্গ ও ক্ষুদ্র জীবাণু ও ছত্রক,** বিভিন্ন অবস্থায় কার্যকরী হয়।

উইপোকা, আরশোলা ও অন্যান্য নানারকমের পুস্তকনাশক কীট সকলের অপেক্ষা মারাত্মক শত্রু। ইহা ব্যতীত সিলভার ফিস্‌ ও ছিদ্রকারী বীট্‌ল প্রভৃতি বই পত্র নষ্ট করে। এই সকল পোকা রাত্রিতেই বেশী সক্রিয় ও ইহারা অন্ধকার জায়গাতে থাকিতে ভালবাসে। দিনের আলোর তীব্রতা ইহারা সহ্য করিতে পারে না। এমনকি তাহাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা পর্যন্ত দিনের আলোতে ব্যহত হয়। বন্ধ অন্ধকার ঘরেই এই সকল কীটপতঙ্গ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। আদ্র্ জলাবায়ু ও তাপমাত্রার ব্যতিক্রম ইহাদের জন্মবৃদ্ধির হার চূড়ান্ত-ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করে। কাঠ, কাগজ, কাপড় সিরিস অথবা অন্যান্য আঠা ইত্যাদি অতি সহজেই এই সকল কীটপতঙ্গের আক্রমণের বস্তু হইয়া পড়ে।

গ্রন্থাগারের জন্য নিম্নলিখিত প্রতিষেধক ও ক্ষতি নিবারণক্ষম উপায় অবলম্বন করা উচিত ঃ—

১। নিয়মিতভাবে বইপত্র পরিস্কার করা উচিত (কারণ ধুলাতেই পুস্তকনাশক কীটের জন্ম)।

২। কিছুক্ষণের জন্য মাঝে মাঝে বইপত্র রৌদ্রে দেওয়া উচিত। বেশীক্ষণ কোনমতেই রাখা চলিবে না, কারণ তাহা হইলে রৌদ্রের তাপে বইএর ক্ষতি হইবে। রৌদ্রেতে কীট পতঙ্গের শূক বাঁচিতে পারে না বলিয়া বইপত্র মাঝে মাঝে রৌদ্রে দেওয়া উচিত।

৩। বই রাখিবার তাকে অশোধিত ক্রীয়োজোট কেরোসিন তেলের সহিত মিশাইয়া পাতলা করিবার পর তুলি দিয়ে লাগান দরকার। ন্যাপ্‌থলিন, কর্পূরের গুড়া অথবা ডি, ডি, টীর গুড়া বইয়ের মধ্যে ছড়াইয়া দিলে কীটের জন্ম বন্ধ হয়। লেখকের তৈরী বচ্‌, লবঙ্গ, দারুচিনি ও গোলমরিচের গুড়া একত্রে সমান অংশে মিশাইয়া প্রয়োগ করিলে সফলতা লাভ করা যায়।

৪। পুস্তকনাশক কীট নষ্ট করিবার জন্য শুকনো নিমপাতা অথবা তামাক পাতা বইয়ের পাতার ভাঁজে ভাঁজে রাখা চলে।

৫। কীট পতঙ্গ বিনাশক ঔষধ পুস্তক সংরক্ষণে অত্যাবশ্যক।

৬। কীট পতঙ্গের আক্রমণ হইলে ধূম্রীকরণ (fumigatirn) একমাত্র উপায়। ধূম্রীকরণ নিম্নলিখিত যে কোন একটী রাসায়ণিক পদার্থের ব্যবহারে কার্যকরী করা যায়— ১। কার্বন-ডাইঅক্সাইড, ২। ফরম্যালডিহাইড্, ৩। থাইমল।

গ্রন্থাগার সুচারুরূপে চালাইতে ও বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে ইহার সংরক্ষণ প্রধান অঙ্গ হিসাবে দাঁড়ায়। বাংলায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত গ্রন্থাগারের সংখ্যা অগণিত। এই সংরক্ষণ বিজ্ঞানকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শিক্ষাকেন্দ্রে প্রচলিত করা হইয়াছে। এই বিজ্ঞান এখনও অজ্ঞাত অন্ধকার ভ্রূণের মধ্যে রহিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে এই সংরক্ষণ বিজ্ঞান লইয়া যথেষ্ট গবেষণা হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু আমাদের দেশে ইহা আমাদের গবেষণা ক্ষেত্রে অল্পই স্থান পাইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ব বিভাগে ইহার অগ্রজ হিসাবে গবেষণা ও তৎসহ শিক্ষার (মিউজিয়ম পদ্ধতি নামে) কাজ গত কয়েক বৎসর ধরিয়া চলিতেছে। আশুতোষ মিউজয়মেও সংরক্ষণ প্রণালী সম্বন্ধে গবেষণার কাজ ও ইহার শিক্ষার ব্যবস্থা সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই দুই পরীক্ষাগারে যে সকল তথ্য আবিস্কার হইয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া গ্রন্থাগার সংরক্ষণ সমস্যার সমাধান কিছুটা অগ্রসর হইয়াছে।

বিংশ শতাব্দীতে সমগ্র মানবজাতিকে বিভিন্ন সমস্যা হইতে মুক্ত করিয়া সহজ সুস্থ জীবনে কি করিয়া প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব তাহা লইয়া বিজ্ঞানীর গবেষণায় এক মহান ব্রতের লক্ষ্য চলিয়াছে। প্রকৃতির বিবিধ মারাত্মক কীট পতঙ্গের আক্রমণ হইতে মানুষের কৃষ্টি, খাদ্য ও সম্পদ রক্ষা করিতে বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা আজ অধিকতর তৎপর। আজিকার দিনে ডি, ডি, টী ও পেনিসিলিন মানুষের জীবনে স্বর্গীয় আশীর্বাদ স্বরূপ। এই দুই ঔষধের ব্যবহার মানুষকে যে কি পরিমাণে উপকার করিয়াছে তাহা বলা বাহুল্য। দিনে দিনে বিজ্ঞানীর আন্তরিক সাধনায় প্রকৃতির স্বাভাবিক সকল বিপদের মুখে মানুষের জীবন সুস্থ ও সুন্দর হইয়া উঠিবে—এই বিশ্বাসে মানব সমাজ বিংশ শতাব্দীতে আরও দৃঢ়ভাবে সংগঠিত হইতেছে।

(গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরীতে অনুষ্ঠিত সভায় লেখকের ভাষণ)

কলেজ লাইব্রেরীর লক্ষ্য

গণেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

ভূমিকা: আলোচ্য এই বিষয়টি কলেজ লাইব্রেরীর একটি মাত্র দিককে কেন্দ্র করে। কলেজ লাইব্রেরী সংক্রান্ত আলোচনার দিকগুলি সম্বন্ধে পরিষদ প্রচারিত সার্কুলারে ইঙ্গিত আছে; কিন্তু একটি বিশেষ দিকের উল্লেখ নেই—সে দিকটি হচ্ছে কলেজ লাইব্রেরীর লক্ষ্য। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশে বিষয় অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের গৃহীত কোন সংকলন নেই; কিন্তু থাকা একান্তই বাঞ্ছিত। কারণ, লক্ষ্য কি—এবং তার সার্থক রূপায়নের পথ কি—এ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট মান না থাকলে বর্তমান ব্যবস্থার মূল্যায়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করা সম্ভব নয়। লক্ষ্য কিভাবে স্থির হবে আলোচ্য বিষয় তারই মধ্যে সীমিত।

সংজ্ঞা: এই প্রসঙ্গে আলোচনার প্রথমেই কলেজ লাইব্রেরীর একটি সংজ্ঞা নির্ধারিত হওয়া দরকার। সেই উদ্দেশ্যে বলা যেতে পারে যে—কলেজের লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্যে কলেজ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কলেজের অন্যতম অঙ্গরূপে সংগঠিত এবং পরিচালিত লাইব্রেরীই কলেজ লাইব্রেরী।

কলেজের লক্ষ্য: কলেজ লাইব্রেরীর লক্ষ্য কি হবে—এই প্রশ্ন থেকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে কলেজের লক্ষ্য কি? কারণ কলেজের লক্ষ্যের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে কলেজ লাইব্রেরীর লক্ষ্য। কলেজের লক্ষ্য সম্বন্ধীয় নিজস্ব কোন সংকলন পশ্চিম বঙ্গের কোন কলেজের আছে কিনা আমার ঠিক জানা নেই; তবে অনেক কলেজেরই যে নেই—এ কথা সত্য। থাকুক আর নাই থাকুক প্রত্যেক কলেজই সাধারণভাবে কতগুলি লক্ষ্যকে মেনে নিয়েছে এবং নিজের নিজের কাজের মধ্যে দিয়ে সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার চেষ্টাই করে চলেছে। সেই সাধারণ লক্ষ্যগুলি মোটামুটিভাবে তিনটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত:

প্রথমত: চরম লক্ষ্য;
দ্বিতীয়ত: ছাত্র সম্বন্ধীয় করণীয়;
তৃতীয়ত: শিক্ষক সম্বন্ধীয় করণীয়।

লক্ষ্যগুলিকে মোটামুটি এইভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে:

চরম লক্ষ্য: প্রতিটি ছাত্র সমাজের একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তিতে পরিণত হবে অর্থাৎ সে হবে উদার দৃষ্টিভঙ্গী সম্পন্ন; মনোগত রুচিগত এবং নীতিগত সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হতে সক্ষম হবে, নীতি ও বুদ্ধির দিক থেকে এক উন্নত ধরণের জীবন যাপনে সক্ষম হবে; এবং মানসিক উৎকর্ষ সাধক সম্পদের অধিকারী হবে।

ছাত্র সম্বন্ধীয় করণীয় ঃ (১) ছাত্রদের জ্ঞান লাভে এবং জ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্য ও মূল্য বোধে সহায়তা করা ;

(২) উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সমস্ত ঐতিহ্যের পরিপূর্ণ উপলব্ধি এবং তারই ভিত্তিতে আত্মদর্শনের পথ সুগম করা—ঐ জ্ঞানকে বর্তমানের উপযোগী করণে সহায়তা করা—এবং উত্তর জীবনে অধিকতর জ্ঞান লাভের সমস্ত সম্ভাবনার সঙ্গে পরিচিত করা।

শিক্ষক সম্বন্ধীয় করণীয় ঃ এই লক্ষ্যগুলিকে পরিপূর্ণরূপে সার্থক করে তোলার শুভ প্রচেষ্টায় শিক্ষার ক্ষেত্রে নব নব চিন্তায় উৎসাহ দান এবং শিক্ষক মণ্ডলীকে যুগে যুগে শিক্ষার ক্রমবিকাশের সঙ্গে পরিচিত করে রাখা।

মূল লক্ষ্য ঃ এই লক্ষ্যগুলির মধ্যে থেকে এমন একটা মূল লক্ষ্য স্থির করা যেতে পারে যা প্রত্যক্ষভাবে লাইব্রেরীর লক্ষ্যগুলিকে প্রভাবান্বিত করবে। এই লক্ষ্যটিকে আমরা এইভাবে প্রকাশ করতে পারি ঃ

কলেজের লক্ষ্য হচ্ছে এই যে সে তার ছাত্র সমষ্টিকে এমনভাবে শিক্ষা দেবে যে তা যেন তার উত্তর জীবনে আত্ম শিক্ষার ধারা বজায় রাখতে পারে।

এই মূল লক্ষ্যটির সঙ্গে কলেজ লাইব্রেরীয়ানের যোগ প্রত্যক্ষ ; কারণ তাঁরই অনুসৃত নীতির উপর এই লক্ষ্যের সার্থকতা নির্ভরশীল। অপর পক্ষে কলেজ লাইব্রেরীর লক্ষ্যগুলি স্থির করার ব্যাপারে এই মূল লক্ষ্যের প্রভাব সব চেয়ে বেশী।

লক্ষ্যের দুই পর্যায় ঃ মূল লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কলেজ লাইব্রেরীর লক্ষ্য স্থির করতে হলে তা দুই পর্যায়ে সম্পূর্ণ হতে পারে। প্রথম পর্যায়ের লক্ষ্য স্থির হবে শিক্ষক ও পরিচালক মণ্ডলীর সঙ্গে পরামর্শ করে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষ্যগুলি স্থির হবে প্রথম পর্যায়ের উপর নির্ভর করে এবং কেবলমাত্র লাইব্রেরীয়ান ও তার অভিজ্ঞ কর্মীদের মধ্যে পরামর্শক্রমে। উভয় পর্যায়ের লক্ষ্যগুলিই দুইটি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হবে ঃ

(১) ছাত্র সম্বন্ধীয় ; (২) শিক্ষক সম্বন্ধীয়।

প্রথম পর্যায়ের লক্ষ্য ঃ প্রথম পর্যায়ের লক্ষ্যগুলিকে মোটামুটি এইভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে ঃ

ছাত্র সম্বন্ধীয় ঃ (১) কলেজ জীবনেই ছাত্রকে আত্মশিক্ষার অভ্যাস গড়ে তুলতে উৎসাহ দেওয়া এবং পরিণামে তাকে ঐ বিষয়ে সক্ষম করে তোলা।

(২) বিভিন্ন ধরণের বই যা উত্তর জীবনে তার ধী-শক্তির ক্রমবিকাশে সহায়তা করবে স্বীয় চেষ্টায় তাদের সঙ্গে পরিচিত হতে সক্ষম করে তোলা।

শিক্ষক সম্বন্ধীয়ঃ (১) যে সমস্ত বই শিক্ষাদানের ব্যাপারে সহায়ক হবে শিক্ষক মণ্ডলীর প্রত্যেককে স্বীয় চেষ্টায় তাদের সঙ্গে পরিচিত হতে সক্ষম করে তোলা ;

(২) প্রত্যেকেই যাতে আপন আপন ক্ষেত্রে এবং সমগ্রভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বাধুনিক ক্রমবিকাশের সাথে পরিচিত হতে পারেন তার ব্যবস্থা করা ;

(৩) কলেজের লক্ষ্য সাধনে ব্রতী শিক্ষক মণ্ডলীকে তাদের শিক্ষাদানের সকল রকম পদ্ধতি অনুসরণে সর্বতোভাবে সহায়তা করা।

দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষ্যঃ দ্বিতীয় পর্যায়ের লক্ষ্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে লাইব্রেরী সম্বন্ধীয় এবং তা সাধনের দায়িত্ব লাইব্রেরীয়ান এবং তার সহকর্মীদের। এগুলিকে মোটামুটি এইভাবে প্রকাশ করা যেতে পারেঃ

(১) লাইব্রেরী ক্যাটালগ্ বা অন্য কোন সূত্র থেকে যে বইয়ের সন্ধান পাওয়া গেল, গ্রন্থাগারে তার অবস্থান নির্ণয়ে প্রয়োজনবোধে ছাত্র বা শিক্ষক উভয়কেই ব্যক্তিগতভাবে সহায়তা করা ; উদ্দেশ্য ভবিষ্যতে ব্যক্তিগত সহায়তা ছাড়াই স্বীয় চেষ্টায় প্রয়োজনীয় বইয়ের অবস্থান নির্ণয়ে সক্ষম করে তোলা ;

(২) আত্মশিক্ষা ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে লাইব্রেরীর বৃহত্তর ভূমিকার সম্পূরক সকল রকম ব্যবস্থা অবলম্বন করা ; উদ্দেশ্য—প্রতিটি ছাত্র ও শিক্ষককে শিক্ষার ক্ষেত্রে লাইব্রেরীর বিশেষ ভূমিকা সম্বন্ধে অবহিত করে তোলা ;

(৩) প্রত্যেক ছাত্র ও শিক্ষক তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত বই যাতে অতি সহজে ব্যবহার করবার সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা ;

(৪) প্রত্যেক ছাত্র ও শিক্ষককে তার প্রয়োজনীয় বই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সরবরাহ করা ;

(সময়ের সর্বোচ্চ মান ধরা যেতে পারে ৫ মিঃ)

(৫) প্রত্যেক ছাত্র এবং শিক্ষকের যে কোন প্রয়োজনীয় বই—(যদি লাইব্রেরীতে না থাকে কিন্তু সংগ্রহ করা সম্ভব হয়)—সরবরাহ করা ;

সংগ্রহ করা সম্ভব না হলে অবস্থান সম্বন্ধে তথ্য সরবরাহ করা ;

(৬) প্রতিটি ছাত্র যাতে তার বই সম্বন্ধীয় প্রয়োজন সম্পর্কে বিষয় অভিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে পরামর্শ করতে পারে এবং পাঠ্য বিষয়ে পর্যাপ্ত সূত্রের সন্ধান পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা।

বিদ্যালয় গ্রন্থাগার প্রসঙ্গে

শ্রীদামচন্দ্র বেরা
প্রধান শিক্ষক, মহেশচন্দ্র সর্বার্থসাধক বিদ্যালয়, বৈষ্ণবচক

বিদ্যালয়ের শিক্ষা শুধু নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পঠন পাঠনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে। যদিও কোমলমতি বালক বালিকাগণ শিক্ষকবর্গের সহায়তায় ও পাঠ্য-পুস্তকের মাধ্যমে বাস্তব জীবনের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞান আহরণের জন্য বিদ্যালয়ে সমবেত হইয়া থাকে তথাপি তাহাদের মানসিক অনুসন্ধিৎসার রসদ জোগাইতে এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুগঠিত করিয়া তুলিতে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার যে প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের অপরিহার্য অঙ্গ এই সম্বন্ধে কোথাও বিন্দুমাত্র মতদ্বৈধের অবকাশ নাই। বিশ্বের সর্বত্রই বর্ত্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। নানারকম বুদ্ধি-বৃত্তি-সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রী বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেছে। ইহা অবিসংবাদিত সত্য যে সকল শিক্ষার্থীর পক্ষে সমান অনুকূল কোনও শিক্ষাদান পদ্ধতি শ্রেণীকক্ষে অনুধাবন করা সম্ভবপর হয় না। শিক্ষক মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত সাহায্য বুদ্ধিমান ছাত্র ছাত্রীর পক্ষে পর্যাপ্ত না হইতেও পারে; সুতরাং এই উভয় প্রকার ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাকে সম্পূর্ণ করিতে হইলে অন্য কোথাও হইতে সহায়তা একান্ত আবশ্যক। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারই উক্ত প্রকারের সাহায্য প্রদান করিতে সমর্থ। এতদ্ব্যতীত বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারেই বালক-বালিকাগণের পাঠাভ্যাস গঠিত হয় এবং গ্রন্থাগার সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করিতেও তাহারা এইস্থান হইতেই শিক্ষালাভ করে।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে আমাদের দেশের অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিও গ্রন্থাগার এবং পুস্তকের ব্যবহার সম্বন্ধে অবহিত নহেন। গ্রন্থাগারে এমন কতকগুলি রুচিবিগর্হিত ও নিয়মবিরোধী কার্য তাঁহারা করিয়া থাকেন যাহাতে এই বাণী মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট ও গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হয়। পুস্তক ব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের কদভ্যাসের চিহ্ন প্রত্যেক পাঠাগারের গ্রন্থে,—মলাট হইতে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় মুদ্রিত এবং যে কোন সদ্‌বিবেচক রুচিবান্‌ ব্যক্তিই উহা দেখিয়া লজ্জাবোধ করিবেন। কোমল বয়সে শিক্ষার্থীদিগকে বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সুষ্ঠু ব্যবহারের শিক্ষাদ্বারাই উক্ত কুঅভ্যাসসমূহ জাতীয় জীবন হইতে নিরসন

করা সম্ভবপর। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে ভাবীকালের সুনাগরিক গঠনকার্যে বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়িক গ্রন্থাগার তুল্যমূল্যমান বহন করে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে আমাদের সর্বব্যাপী দারিদ্র্য বশতঃ শিক্ষা খাতে অপরিহার্য ব্যয় সংকোচের ফলে স্বাধীনতা লাভের এক যুগ পরেও আজ পর্যন্ত আমরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এই একান্ত প্রয়োজনীয় অংশটির প্রতি যথোপযুক্ত গুরুত্ব আরোপ করিতে পারিতেছি না। তবে কোথাও কোথাও সরকার এবং বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যৌথ প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়িক গ্রন্থাগারের নবরূপায়ণ পরিকল্পনা কার্যকরী হইতে চলিয়াছে—ইহা আশা ও আনন্দের কথা।

বহু প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পর আমাদের বিদ্যালয়ে এই শুভ প্রচেষ্টা যতটুকু আংশিক সফলতা লাভ করিয়াছে তাহারই সংক্ষিপ্ত বিবরণ সুধীজন সমীপে পরিবেশন করিতেছি।

বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি পৃথক একতলা পাকা-বাড়ী। সহজেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় বিদ্যালয় সীমার অন্তর্গত এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে গৃহখানি অবস্থিত এবং নির্মাণ সৌষ্ঠবে যাহাতে উহা লক্ষ্যনীয় হয় সেইদিকেও যথাসাধ্য যত্ন নেওয়া হইয়াছে। পরিবেশটিকে স্নিগ্ধ ও মনোরম করিবার উদ্দেশ্যে গৃহপ্রাঙ্গণে একটি পুষ্পোদ্যান রচনা করা হইয়াছে। গ্রন্থাগারের প্রতীক স্বরূপে সম্মুখে দ্বারদেশের ঊর্ধ্বে দেওয়ালে নির্মিত রহিয়াছে কয়েকখানি কৃত্রিম পুস্তক, যাহাতে দর্শকের নিকট প্রথম দর্শনেই উহা গ্রন্থাগার বলিয়া প্রতিভাত হয়।

ঘরখানির তিনটি কক্ষ এবং সম্মুখে দেওয়াল ঘেরা গৃহান্তর্গত বারান্দা। দুই পার্শ্বে ৫০টি করিয়া আসনযুক্ত দুইখানি পাঠগৃহ। পাঠগৃহের একখানি ছাত্রদের জন্য। অপর গৃহের ৫০টি আসনের মধ্যে ৩০টি আসন ছাত্রী ও শিশুদের জন্য রক্ষিত, ২০টি আসন শিক্ষক, প্রাক্তন ছাত্র ও বিশিষ্ট আগন্তুক পাঠকদের জন্য নির্দিষ্ট। পুস্তক রাখার সুবিধার জন্য মধ্যস্থিত কক্ষটির উপরে চতুর্দিকে ব্যালকনি, এই কক্ষেই দ্বিতলে ও নীচে দরজাহীন খোলা আলমারীতে বিষয়ানুসারে বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তক সজ্জিত আছে। পাঠকবর্গের সহজ অবগতির জন্য প্রত্যেক আলমারীর শীর্ষে উহার মধ্যস্থিত পুস্তকের পরিচয়-জ্ঞাপক লিপি সন্নিবদ্ধ। আলোচ্য গ্রন্থাগারে open access system প্রবর্তিত হইয়াছে। পাঠকগণ নিজেরাই আলমারী হইতে পছন্দমত পুস্তক লইয়া নির্দিষ্ট কক্ষে বসিয়া নিঃশব্দে পাঠ করে এবং পাঠান্তে যথাস্থানে পুনরায়

উহা রাখিয়া দেয়। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী পাঠকক্ষমধ্যস্থ টেবিলে রক্ষিত একখানি খাতায় নিজ নিজ নাম, শ্রেণী ও অধীত পুস্তকের নাম লিখিয়া রাখে। গ্রন্থাগার এখন পর্যন্ত পাঠকক্ষরূপেই ব্যবহৃত হয়। এইস্থান হইতে কোনও পুস্তক পাঠার্থে বাহিরে দেওয়া হয় না। বিশেষ বিশেষ কারণে ছুটীর অত্যল্প সংখ্যক কয়েকটি দিন ব্যতীত রবিবার সমেত সকল দিনেই গ্রন্থাগার সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খোলা থাকে। সুযোগমত যে কোনও সময়ে পাঠকগণ গ্রন্থাগারে বসিয়া পড়াশুনা করিতে পারে। ছাত্রছাত্রীগণের পাঠাভ্যাস গঠন করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের নির্ধারিত কার্যতালিকার মধ্যে সপ্তাহে দুইটি ঘণ্টা গ্রন্থাগারে পাঠের জন্য নির্দিষ্ট আছে। এতদ্ব্যতীত কোনও শিক্ষক মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে তাঁহার পরিবর্তে অন্য কোন শিক্ষক মহাশয়কে শ্রেণীতে পাঠদানের জন্য প্রেরণ না করিয়া ছাত্র-ছাত্রীগণকে গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এইরূপ বাধ্যতামূলক পাঠব্যবস্থার ফলে প্রথমে পাঠে অনিচ্ছুক অনেক চঞ্চলস্বভাব বালককে ক্রমশঃ অধ্যয়নে অনুরক্ত হইতে দেখা গিয়াছে।

আলোচ্য গ্রন্থাগার পরিচালনায় যথাসম্ভব গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে। ছাত্রদের মধ্য হইতে গঠিত একটি প্রতিনিধিমূলক সভার উপর গ্রন্থাগার তত্ত্বাবধান, উহার নিয়মশৃঙ্খলা রক্ষা ও প্রয়োজনীয় নিয়মকানুন রচনার ভার ন্যস্ত আছে। বইগুলিকে নিয়মিত সাজাইয়া গুছাইয়া রাখিবার জন্য এক একটি আলমারীর দায়িত্ব এক একজন ছাত্রকে দেওয়া হইয়াছে। তাহারা দৈনিক একবার করিয়া আলমারীস্থ পুস্তকগুলি তালিকার সহিত মিলাইয়া সুন্দরভাবে সাজাইয়া গুছাইয়া রাখে। ইহা বলা বাহুল্য যে গ্রন্থাগার কর্মী ছাত্রবৃন্দ শিক্ষকমহাশয়গণের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সকল রকমের সহায়তালাভ করিয়া থাকে। একজন শিক্ষক মহাশয়ের উপর এতৎ-সম্পর্কীয় বিশেষ দায়িত্ব অর্পিত আছে।

এখন পর্যন্ত এই গ্রন্থাগারের জন্য কোন গ্রন্থাগারিক নাই। গতানুগতিক প্রথায় পাঠকবর্গকে পুস্তক আদানপ্রদানের জন্য যদিও প্রচলিত ব্যবস্থায় এখানে গ্রন্থাগারিকের প্রয়োজন হয় না, তথাপি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গ্রন্থাগারের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একজন গ্রন্থাগারিকের সাহায্য অনস্বীকার্য। বিষয়টি কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিয়াছি এবং আশা করি শীঘ্রই একজন গ্রন্থাগারিক নিয়োগ করা হইবে। গ্রন্থাগারের মধ্যকক্ষখানি

হইবে গ্রন্থাগারিকের কার্যালয়। সাধারণ গ্রন্থাগার হইতে বিদ্যালয়িক গ্রন্থাগারের আদর্শগত মৌলিক পার্থক্য বশতঃ আলোচ্য গ্রন্থাগারে পুস্তক নির্বাচনে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। তরল আনন্দদায়ক ডিটেকটিভ উপন্যাস জাতীয় পুস্তক, যাহা মানসিক উৎকর্ষ বিধানের পরিপন্থী, পক্ষান্তরে কিশোর চিত্তে বয়োধর্মের বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনা বহন করে, সেই সকল পুস্তক বিদ্যালয়িক গ্রন্থাগারের অযোগ্য বিবেচনায় পরিহার করা হইয়াছে।

বিদ্যালয়িক গ্রন্থাগারে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার যদিও বিশেষ বিতর্কের বিষয় এবং শিক্ষাবিদ পণ্ডিতগণ এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মত পোষণ করেন তথাপি এই বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে উদার মনোভাব অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহারা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটিকে এতদঞ্চলের সামাজিক প্রাণকেন্দ্ররূপে দেখিতে ইচ্ছা করেন। সুতরাং বিদ্যোৎসাহী পাঠানুরাগী স্থানীয় অধিবাসীদেব জন্য আলোচ্য গ্রন্থাগারের দ্বার উন্মুক্ত। তাঁহারা গ্রন্থাগারের বারান্দায় টেবিলে রক্ষিত সাময়িক পত্রপত্রিকা পাঠ করেন। এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণেরই মত স্বেচ্ছানুরূপে পুস্তক লইয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকেন এবং পাঠান্তে যথাস্থানে রাখিয়া দেন। কাহাকেও গৃহে পাঠের জন্য গ্রন্থাগার হইতে বাহিরে পুস্তক লইতে দেওয়া হয় না।

বর্তমান যুগে আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত দুর্নীতির কথা স্মরণ করিয়া অনেকেই হয়ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে open access system-এ পরিচালিত বিদ্যালয়িক গ্রন্থাগারের সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইতে পারেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়াছে যে ইহাতে তেমন কোন ভয়ের কারণ নাই। গণতন্ত্রের প্রধান শিক্ষা জাতির সম্পত্তির প্রতি ব্যক্তির মমত্ববোধ জাগ্রত করা। গ্রন্থাগার পরিচালনার দায়িত্ব ও কতকটা কর্তৃত্ব বিশেষতঃ গ্রন্থাগার ব্যবহারের স্বাধীন অধিকারলাভের ফলে ছাত্র-ছাত্রীগণ গ্রন্থাগারে প্রত্যেক পুস্তক ও প্রত্যেকটি আসবাবপত্র নিজের বলিয়া মনে করিতে শিখে। ফলে তাহারা কোনও অনিষ্টসাধন তো করেই না বরং উহা রক্ষার জন্য বিশেষ যত্নবান ও তৎপর হইয়া উঠে।

পরিষদ কথা

সূচীকরণ কার্যে ভারতীয় গ্রন্থকারের নাম সম্পর্কে আলোচনা সভা

আগামী বৎসরের মাঝামাঝি প্যারিসে আন্তর্জাতিক গ্রন্থাগার পরিষদ সঙ্ঘের উদ্যোগে সূচীকরণ কার্যের বিভিন্ন সমস্যা ও গ্রন্থকারের নামের কোন্ অংশটি প্রথমে লিখিত হওয়া বিধেয় সে সম্পর্কে নীতি নির্ধারণের জন্য এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। ভারতীয় গ্রন্থাগারের নাম সম্পর্কিত সমস্যা ও অন্যান্য বিষয়ে অনুরূপ নীতি নির্ধারণের উদ্দেশ্যে ভারতের বিশেষ গ্রন্থাগার পরিষদ (IASLIC) ডিসেম্বর ৩০ তারিখ থেকে তিনদিন ব্যাপী এক সম্মেলনের ব্যবস্থা করেছেন।

উপরিউক্ত বিষয়ে পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার কর্মী ও বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণের জন্যে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী ৪ঠা ডিসেম্বর পরিষদ কার্যালয়ে এক বৈঠকের আয়োজন করেন। সভাপতিত্ব করেন ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী।

প্রারম্ভিক ভাষণে শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বলেন যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান আজ সকল বিষয়কে standardise ও mechanise করতে চায়। গ্রন্থাগার সর্বজনের. সুতরাং গ্রন্থাগারের পদ্ধতি সর্বজনবোধ্য হওয়া প্রয়োজন—সেজন্যে যতদূর সম্ভব জটিলতা পরিহার করা দরকার। আন্তর্জাতিক গ্রন্থপঞ্জীতে ভারতকে এক মনে করা কঠিন। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলিতে Surname অর্থাৎ নামের শেষ অংশটিকে Starter শব্দ হিসাবে ব্যবহার করে। বাংলাদেশে নামের প্রথম অংশ অর্থাৎ forename-কে গ্রহণ করা হয়। নামের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্রীকরণ—সেজন্যে forename বাংলা গ্রন্থাগারের starter word হিসাবে ব্যবহৃত হওয়া উচিত। বাঙালীদের surname কম কিন্তু forename অনেক বেশী।

শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি বিবেচনা করার কথা বলেন। ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত বাঙগালী লেখকদের বই ক্যাটালগ করার সময় surname এবং মাতৃভাষায় লিখিত বই forename অনুযায়ী হওয়া উচিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

শ্রীফণিভূষণ রায় বাংগালী লেখকদের আদ্যনাম ব্যবহার করার অভিমত প্রকাশ করেন। জটিলতা এড়াবার জন্যে বাঙালী গ্রন্থকারের যে কোনও ভাষায় প্রকাশিত বইয়ের সূচীকরণ কার্যে তিনি আদ্যনাম ব্যবহারের সুপারিশ করেন। আন্তর্জাতিক গ্রন্থপঞ্জীর সুবিধার জন্যে জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেওয়া অনুচিত বলে তিনি মনে করেন।

শ্রীবিমলেন্দু মজুমদার বলেন বাঙালী লেখকদের নাম surname অনুযায়ী বিন্যাস করা সুবিধাজনক।

ডক্টর আদিত্য ওহদেদার বলেন প্রধানতঃ জাতি পরিচয়ের উদ্দেশ্যে সারা ভারতে এক ধরণের surname এর সৃষ্টি হয়। জাতিভেদ উঠে যাওয়ার সংগে ব্যক্তিগত নামটুকুই কেবল থাকছে। ইংরাজি শিক্ষার ফলে surname রাখার রেওয়াজ। আন্তর্জাতিক প্রথায় surname দিয়ে ক্যাটালগ করা হয় একথা ঠিক না—আন্তর্জাতিকতা কেবল পাশ্চাত্যেই সীমাবদ্ধ নয়—প্রাচ্যের অধিকাশ দেশেই surname-এর চলন নেই। এ দেশে forname অনুযায়ী সূচী প্রণয়ন করাই যুক্তিসংগত।

শ্রীসুনীল ঘোষ বলেন আদ্যনাম অনুযায়ী বইয়ের তালিকা হওয়া উচিত।

শ্রীতিনকড়ি দত্ত আদ্যনামকে শিরোনামা হিসাবে গ্রহণ করার উপদেশ দেন।

সভাপতি যতীন্দ্রবিমল চোধুরী বলেন যে আমাদের দেশে suname বলে কিছু আছে কিনা সন্দেহ। এদেশে অধিকাংশ অঞ্চলেই প্রথম নামটাই আসল নাম—এই নাম দিয়েই সূচী প্রস্তুত করা উচিত। তাছাড়া ঘোষচৌধুরী, সেনগুপ্ত, চক্রবর্তীবিশ্বাস প্রভৃতি যুগ্ম উপাধিগুলি দিয়ে সূচী তৈরী করতে গেলে অনেক cross-reference প্রস্তুতের দায়িত্ব ও জটিলতা দেখা দেবে। সম্প্রতি প্রকাশিত বাংলা জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীতে ব্যবহৃত আদ্যনামের কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হওয়াটা এর স্বপক্ষে অন্যতম যুক্তি হিসাবে তিনি উল্লেখ করেন।

বর্ধমান জেলার গ্রন্থাগার কর্মী সম্মেলন

গত ২৭শে নভেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও বর্ধমান জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্ত আহ্বানে জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হতে বহু কর্মী এই সম্মেলনে যোগদান

করেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীতিনকড়ি দত্ত এবং বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীব্রজকান্ত গুহ উপস্থিত ছিলেন।

জেলা সমাজশিক্ষা প্রাধিকারিক শ্রীগৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায় জেলার বর্তমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার তথ্যপূর্ণ পর্যালোচনা প্রসঙ্গে নানাবিধ বাধাবিঘ্ন ও অসুবিধার কথা বলেন। পরিষদ সম্পাদক বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় রাজ্যব্যাপী সুষ্ঠু ও সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতি ও সাফল্যের জন্যে গ্রন্থাগার আইনের আশু প্রয়োজনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করেন। সর্বশ্রী শশধর চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি ভট্টাচর্য, শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবেশ চক্রবর্তী, মৃত্যুঞ্জয় ধাড়া, নির্মল মুন্সী প্রভৃতি আলোচনা প্রসঙ্গে নানাবিধ সমস্যা ও তাহার প্রতিকার হিসাবে নিজ নিজ সুপারিশ ও মতামত ব্যক্ত করেন। সভাপতির ভাষণে শ্রীতিনকড়ি দত্ত জেলার গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে অধিকতর সংযোগ স্থাপন এবং গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্যে সরকার ও পৌরপ্রতিষ্ঠানগুলির পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্যের নৈতিক দায়িত্বের কথা বলেন।

পরিষদ কার্যালয়ে তৃতীয় যোজনায় গ্রন্থাগার সম্পর্কে কথিকা

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী যোজনায় গ্রন্থাগার সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের উদ্যোগ-আয়োজন এই বিষয়ে গত ১০ই ডিসেম্বর পরিষদ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক কথিকায় রাজ্য সরকারের সমাজ শিক্ষা বিভাগের উপ-প্রধান পরিদর্শক শ্রীমন্মথনাথ রায় বলেন যে তৃতীয় যোজনাকালে গ্রন্থাগার বাবদ সরকার প্রায় দুই কোটি টাকার বরাদ্দ করেছেন। তিনি সরকারের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত নীতি ও কার্যক্রমের এক সুন্দর বিবরণ দেন। তাঁর ভাষণে জানা যায় যে সরকার একশ'টি মহকুমা সহর এবং মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ও বিভিন্ন পঞ্চায়েত অঞ্চলে একটি করে গ্রন্থাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত করেছেন।

কাউন্সিলের দ্বিতীয় সভা

গত ১০ই ডিসেম্বর পরিষদের আগামী বছরের বাজেট বিবেচনা ও কার্যসূচী গ্রহণের জন্যে কাউন্সিলের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের বর্তমান কার্যাবলীর আলোচনা, আগামী গ্রন্থাগার দিবসের অনুষ্ঠান সূচী, রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন, পঞ্চদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন এবং বঙ্গীয় প্রকাশক সভার সহযোগিতায় প্রকাশক ও গ্রন্থাগারিকদের যুক্ত উদ্যোগে সভা ও প্রদর্শনী প্রভৃতি বিষয় সভায় আলোচিত হয়।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

গোবরা মৈত্রী সংঘ ভবনে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা

গত ১১ই ডিসেম্বর সংঘ ভবনে এতদঞ্চলের বিভিন্ন গ্রন্থাগার—নিশিকান্ত লাইব্রেরী, দি কালচার, ইউনাইটেড এথলেটিক ক্লাব, আদর্শ সংঘ, তিলজলা শিশু সংগঠনী প্রভৃতির কর্মীরা আঞ্চলিক ভিত্তিতে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা এবং গ্রন্থাগারগুলির অন্যান্য সমস্যাদির আলোচনার জন্যে এক বৈঠকে মিলিত হন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে শ্রীপ্রবীর রায়-চৌধুরী সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ভারতী পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস অনুষ্ঠান

গত ১০ই অগ্রহায়ণ পরিষদ ভবনে শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সভাপতিত্বে পরিষদের ৭১তম প্রতিষ্ঠা দিবস সাড়ম্বরে পালন করা হয়। কর্মসচিব শ্রীরাম-প্রসাদ চক্রবর্তী এক নাতিদীর্ঘ ভাষণে বলেন যে এইরূপ সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান-গুলিতে একাধারে নিরলস কর্মীর অভাব ও অন্যদিকে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণের দলাদলির জন্য এই প্রতিষ্ঠানগুলি চরম দুরবস্থার সম্মুখীন হইতে চলিয়াছে। পরে বিভিন্ন বক্তার হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা, কণ্ঠসংগীত, হাস্য কৌতুক, কবিতা পাঠ প্রভৃতি উপস্থিত সকলের আনন্দবর্ধন করে। সভাপতি মহাশয় গ্রন্থাগারের প্রয়োজন ও সামাজিক ভূমিকা সম্বন্ধে এক ভাষণ দেন। পরিশেষে সকলকে জলযোগে আপ্যায়িত করা হয়।"

বাগবাজার রিডিং লাইব্রেরীতে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী বক্তৃতামালা

রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাগবাজার রীডিং লাইব্রেরীর সাংস্কৃতিক শাখার উদ্যোগে রবীন্দ্র প্রতিভার বহুমুখী ধারার উপর বিভিন্ন বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। শ্রীরমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর বিজন বিহারী ভট্টাচার্য, ডক্টর রথীন্দ্র নাথ রায়, ডক্টর অজিত ঘোষ ও শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র যথাক্রমে 'রবীন্দ্র নাথের সংগীত, 'শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ', 'সমালোচক রবীন্দ্রনাথ', 'রবীন্দ্রনাথের নাটক ও 'রবীন্দ্রনাথের কবিসত্তা', বিষয় আলোচনা করেন। 'রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প ও চিঠিপত্র' এবং 'রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম' বিষয়ে আলোচনা করবেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ গাঙ্গোপাধ্যায় এবং শ্রীগোপাল হালদার।

চব্বিশ পরগণা

তারাগুণিয়া বীণাপাণি পাঠাগারে শিশু দিবস ও সমাজ শিক্ষা দিবস পালন

১৪ই নভেম্বর শিশু দিবস উপলক্ষে পাঠাগারের উদ্যোগে প্রত্যুষে শিশু ও কিশোরদের একটি প্রভাতফেরী গ্রাম পরিক্রম করে। অপরাহ্নে শ্রীপ্রমথনাথ নাগ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এক সভা হয়। ছোটদের নৃত্য, গীত, গল্পবলা, আবৃত্তি অত্যন্ত উপভোগ্য হয়।

গত ১লা ডিসেম্বর সমাজ শিক্ষা দিবস উপলক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশ্রী নারায়ণ প্রসাদ সুর, সন্ন্যাসী কুমার ঘোষ, জগন্নাথ দত্ত প্রভৃতি সমাজ শিক্ষা দিবসের তাৎপর্য্য ও তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বর্ধমান

পারহাট গ্রামে সমাজশিক্ষা দিবস উদ্‌যাপন

ভাতাড় থানার অন্তর্গত পারহাট বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রের উদ্যোগে ১লা ডিসেম্বর থেকে দু'দিন ব্যাপী এক অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন গ্রামের সহস্রাধিক অধিবাসী বিপুল উদ্দীপনার সহিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। উভয় দিনের অনুষ্ঠানে যাত্রা, গান, আবৃত্তি অভিনয়ে স্থানীয় কুশলী শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন এবং বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা ভাষণ দান করেন।

মাখনলাল পাঠাগারে শিশুদিবস ও সমাজশিক্ষা দিবস পালন

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগারে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও ১৪ই নভেম্বর সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিশ্ব শিশু দিবস উদ্‌যাপিত হয়। প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠানে শ্রীমতী সরসীবালা দে ও শ্রীমতী মায়া দেব যথাক্রমে সভানেত্রী ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। উপস্থিত বিভিন্ন ব্যক্তি শিশু দিবস সম্পর্কে ভাষণ দেন। অপরাহ্নে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান হয়।

সমাজ শিক্ষা দিবস উপলক্ষে ১লা ডিসেম্বর পাঠাগার ভবনে এক সভা ও বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাতে স্থানীয় আপামর জনসাধারণ বিপুল উৎসাহের সহিত যোগদান করে।

মেদিনীপুর

রঞ্জিতপুর রামনারায়ণ পাঠাগারে সমাজ শিক্ষা দিবস উদ্‌যাপন

নিখিল ভারত সমাজ শিক্ষা দিবস উপলক্ষ্যে ঝাড়গ্রাম মহকুমায় সাঁকরাইল থানার অন্তর্গত রঞ্জিতপুর রামনারায়ণ গ্রামীণ পাঠাগারে ৬ই এবং ৭ই ডিসেম্বর দুইদিনব্যাপী কার্যসূচীর বিভিন্ন উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভানেত্রীত্ব করেন অতিরিক্ত জেলা সমাজ শিক্ষা অধিকারিক শ্রীযুক্তা সুধাময়ী দত্ত, প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন জগন্নাথ সাহু। পাঠাগারের সভ্যগণ গ্রামবাসীদের উৎসাহিত করে নিজ নিজ গ্রাম সাফাই কাজ, রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতি সমাজ সেবার কাজে অংশ নেন।

স্থানীয় নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ উক্ত কার্যসূচীতে কবিতা আবৃত্তি এবং গানে অংশ গ্রহণ করেন, সম্পাদক শ্রীসত্যেন ষড়ংগী সম্পাদকীয় বিবরণী পাঠ করেন। পুস্তক সংগ্রহ সপ্তাহে প্রদত্ত পুস্তক এবং দাতার নাম গ্রন্থাগারিক শ্রীঅমর ষড়ংগী কর্তৃক পঠিত হয়।

হুগলী

হুগলী সাহিত্য মন্দিরে রবীন্দ্রশতবার্ষিকী উৎসব বক্তৃতামালা

হুগলী সাহিত্য মন্দির "রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী" উৎসব পালনের এক বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। গত বৈশাখ মাসে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিবস উপলক্ষে পাঠাগারে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছিল। আগামী মাঘ মাসে রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব পালন করা হইবে। তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে "রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্য" সম্বন্ধে এক বিশেষ চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হইতেছে। এবং অন্তবর্তীকালীন সময়ে এক বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত সভাগুলিতে বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও অধ্যাপক রবীন্দ্র জীবন ও সাহিত্যের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বক্তৃতা করেছেন।

গ্রন্থ সমালোচনা

Ajitkumar Mukherjee : Book selection and systematic bibliography. Calcutta, World Press, 1960. 106 p,

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য গ্রন্থাগারিক শ্রদ্ধেয় শ্রীঅজিত কুমার মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে এখানি দ্বিতীয় পুস্তক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্যতম শিক্ষক হিসাবে তিনি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের নির্দিষ্ট পাঠক্রম অনুযায়ী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের যথোপযুক্ত পুস্তকের অভাব অনুভব করেছেন। এই গ্রন্থখানির প্রকাশ এই অভাব পূরণের বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা। এজন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষার্থীগণ তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ।

পুস্তক নির্বাচন এবং গ্রন্থপঞ্জী এই দুটি বিভিন্ন বিষয় এই গ্রন্থের আলোচ্য বস্তু এবং প্রতিটি বিষয় নিয়ে দুখন্ডে তিনটি করে মোট ছটি পরিচ্ছেদ এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জী পুস্তক নির্বাচনের জন্য অপরিহার্য। সেজন্য পুস্তক নির্বাচন এবং গ্রন্থপঞ্জী এই দুটি বিষয়কে একত্রিত করার ফলে গ্রন্থকার যে সমালোচনার আশঙ্কা করেছেন তা অমূলক কারণ প্রথম খন্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পুস্তক নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থপঞ্জীর উদাহরণ সহ উল্লেখ করে ("Book Selection Tools") দ্বিতীয় খন্ডে এ সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ বিশদ আলোচনা করায় পুস্তকের উপযোগিতা বৃদ্ধিই পেয়েছে।

পুস্তক নির্বাচনতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি Druryর Book selection, Haines এর Living with books এবং McColvin এর Theory of book selection for public libraries, ক্লাসিক পর্যায়ের এই তিনখানি গ্রন্থের মূল বক্তব্যগুলি স্বল্প পরিসরের মধ্যে সহজভাবে উপস্থিত করেছেন। পুস্তক নির্বাচনের গুরুত্ব এবং নির্বাচন রীতি সম্বন্ধে এই পরিচ্ছেদটি সুলিখিত। তৃতীয় পরিচ্ছেদে পুস্তক নির্বাচনের ব্যবহারিক পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। গ্রেটবৃটেন এবং আমেরিকার উল্লেখযোগ্য পুস্তক প্রকাশক এবং ভারতবর্ষের পুস্তক ব্যবসায় সম্বন্ধে তথ্য সম্বলিত এই পরিচ্ছেদটি অত্যন্ত মূল্যবান। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষাদান কালে ব্যবহারিক জীবনের এই অতি প্রয়োজনীয় বিষয়টি সাধারণতঃ অবহেলিত হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থপঞ্জী সঙ্কলনের পদ্ধতি এবং ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ভারত ও গ্রেট বৃটেনের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর সম্বন্ধে আলোচনা হয়েছে।

পুস্তক খানিতে কয়েকটি অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হল :

পৃঃ ৪৬ Bookman's Mannual এর ৮ম সংস্করণ ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয়েছে।

পৃঃ ৪৮ Indian National Bibliography প্রকাশক National Library নয়। অবশ্য ৭৮ পৃষ্ঠায় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর উদাহরণ এবং ৯৬ পৃষ্ঠায় এর বিশদ আলোচনা প্রসঙ্গে সঠিক প্রকাশকের নাম Central Reference Library বলে উল্লিখিত হয়েছে।

পৃঃ ৪৮ Cumulative Book Index প্রসঙ্গে উল্লিখিত বক্তব্য "which changes into the 'United States Catalogue' with the last monthly cumulation" সঠিক নয়। United States Catalog এর চতুর্থ এবং শেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৮ সালে। ১৯২৮ সালে ১লা জানুয়ারীতে মুদ্রিত অবস্থায় প্রাপ্ত আমেরিকান পুস্তক এবং আমেরিকান সংস্করণ সহ বৃটিশ এবং কানাডার পুস্তকের এটি একটি তালিকা। প্রকৃতপক্ষে Cumulative Book Index হল United States Catalog এর পূর্ববর্তী এবং চতুর্থ সংস্করণের নিয়মিত সংযোজন (supplement)।

পৃঃ ৫০ "Reference Books" নির্বাচনের সহায়ক হিসাবে দুটি উল্লেখ-যোগ্য পুস্তকের নাম বাদ পড়েছে ঃ

(১) Murphey, R. W. : How and where to look it up. N. Y., McGraw-Hill, 1958.

(২) Garde, P. K. : Directory of reference books published in Asia. Paris, Unesco, 1956.

পৃঃ ৫৪ "Music" নির্বাচন প্রসঙ্গে B. N. B. প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পঞ্জী British Catalogue of Music এর নাম উল্লেখযোগ্য। এটি বাদ পড়েছে।

পৃঃ ৫৫ ভারতীয় প্রকাশনসমূহ নির্বাচন প্রসঙ্গে Bibliography of Scientific Publications of South & South East Asiaর নাম অপ্রয়োজনীয়। কারণ এটি বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাদির পঞ্জী। এটি Unescoর সহযোগিতায় Insdoc প্রকাশ করেন।

পৃঃ ৬১ "Engineering & Technology" পুস্তক সমূহের প্রকাশক হিসাবে British Standards Institution এর সঙ্গে Indian Standards Institution এর নাম উল্লিখিত হতে পারে।

পৃঃ ৭৭ "National bibliography" তালিকা হিসাবে A. L. A. প্রকাশিত Current National Bibliographies এর ১৯৪২ সালের সংস্করণের উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৫৫ সালে Library of Congress কর্তৃক এটির

পরিবর্ধিত সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এখানে এবং Bibliography of bibliographies প্রসঙ্গে Unesco প্রকাশিত "Bibliographical services throughout the world" শীর্ষক রিপোর্টগুলির উল্লেখ করা চলে।

পৃঃ ৮১ "Subject & Author Bibliography" প্রসঙ্গে উল্লিখিত Cannons এর Bibliography of Library Economy উত্তর কালে (১৯৩৪ থেকে) Library Literature নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

৮২ পৃঃ Author Bibliography প্রসঙ্গে Jagadish Sharan Sarma সংকলিত Gandhi bibliographyর ন্যায় দু এক খানি ভারতীয় প্রকাশনের নাম উল্লেখ করা চলে।

ভারতীয় প্রকাশনসমূহ নির্বাচনের জন্য একটি পৃথক তালিকা (৫৪-৫৭পৃঃ) সংকলনের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। কিন্তু পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে এই জাতীয় আরও অনেক পুস্তক এবং পত্রপত্রিকার নাম আছে। ফলে পাঠকদের মনে কিছু বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। "Book Reviewing Tools" এর তালিকায় (৩৪-৪৫ পৃঃ) অনেক ভারতীয় পত্র পত্রিকার নাম করা হয়েছে আবার ভারতীয় প্রকাশন প্রসঙ্গে (৫৬ পৃঃ) তাদের কয়েকটির নাম পুনরুল্লেখ করে আরো কয়েকখানি পত্র পত্রিকার নাম দেওয়া হয়েছে। Survey of Indiaর মানচিত্রের তালিকা এবং Govt. of Indiaর প্রকাশন তালিকার নাম অন্যান্য দেশের সঙ্গে (যথাক্রমে ৫২ এ' ৫৩ পৃষ্ঠায়) উল্লিখিত হয়েছে কিন্তু পুনরায় ভারতীয় প্রকাশন সমূহের জন্য পৃথক তালিকায় Govt. of Indiaর প্রকাশন নির্বাচনের সহায়ক হিসাবে I. N. B.র নাম উল্লেখ (৫৪ পৃঃ) এবং ভারতীয় পত্রপত্রিকা নির্বাচনের সহায়তার জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তকগুলির নাম (৫৭ পৃঃ) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ভারতীয় প্রকাশন নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রাক্ I. N. B. কালের পুস্তকাদির জন্য বিভিন্ন রাজ্য সরকারের Quarterly Catalogue এর নাম উল্লেখযোগ্য।

এই কয়েকটি অসঙ্গতি ব্যতীত তথ্য এবং তত্ত্বের সুসমঞ্জস সমাবেশের জন্য পুস্তকখানির ব্যবহারিক উপযোগিতা অনস্বীকার্য। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ছাত্র ছাত্রীদের এবং গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

মুখবন্ধে লেখকের বক্তব্যের সঙ্গে সুর মিলিয়ে আমরাও প্রকাশককে সাধুবাদ জানাই। সীমাবদ্ধ পাঠক সংখ্যার উপযোগী পুস্তক প্রকাশ করতে অনেক প্রকাশকই নারাজ কিন্তু এঁরা গ্রন্থাগার বিজ্ঞান সম্বন্ধে তিনখানি পুস্তক প্রকাশ করেছেন। অরুণকান্তি দাশগুপ্ত

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারের দায়িত্ব

আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের সংখ্যা বাড়াবার দিকে যতখানি দৃষ্টি দেওয়া হ'চ্ছে, গ্রন্থাগারগুলো যাতে পাঠকদের ব্যবহারিক জীবনে সাহায্য ক'রতে পারে সেদিকে তত দৃষ্টি দেওয়া হ'চ্ছে না। পাড়ায় পাড়ায় প্রধানতঃ জনশিক্ষায় সাহায্য করার উদ্দেশ্যেই চাঁদা দেওয়া গ্রন্থাগার গ'ড়ে তোলা হয়। এ সব গ্রন্থাগারের সভ্যদের অনেকেই দৈনন্দিন কাজের পর একটু হাল্কা বই প'ড়ে চিত্ত বিনোদন করতে চান। সুতরাং এই জাতীয় গ্রন্থাগারের লক্ষ্য শিক্ষা বিতরণ থেকে চ'লে যায় অবসর বিনোদনের সাহায্য করার দিকে। যে সব গ্রন্থাগার চালাবার জন্যে চাঁদার দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না সে সব গ্রন্থাগারেও সংগৃহীত বইয়ের বার আনা গল্প-উপন্যাসের বই হয়। অবশ্য গ্রন্থ-নির্বাচনের নীতির দিক দিয়ে দেখতে গেলে চাহিদার উপর ভিত্তি ক'রে যে গ্রন্থাগারগুলো হাল্কা সাহিত্য সংগ্রহ ক'রে চ'লেছে তাদের দোষ দেওয়া যায় না। গ্রন্থাগার স্বাধীন পড়াশুনার জায়গা। গ্রন্থাগারিকের এমন কোন অধিকার নেই যে তিনি পাঠকের পড়ার বিষয়কে নিয়ন্ত্রিত ক'রবেন। সুতরাং স্রোতের জলে গা ভাসিয়ে গ্রন্থাগারিক যদি তাঁর গ্রন্থ সংগ্রহ করেন তাতে নিয়মের দিক থেকে বলবার খুব বেশী কিছু হয়ত নেই।

কিন্তু আমাদের ভেবে দেখতে হবে জাতিগঠনে গ্রন্থাগারের দায়িত্ব আছে কিনা। আমাদের ভেবে দেখতে হবে বয়স্কদের চিত্ত বিনোদনে শুধু নয়, তাদের জীবন যুদ্ধে সাহায্য করার কাজে গ্রন্থাগারের কর্তব্য আছে কিনা। তা' যদি থাকে তবে গ্রন্থাগারিককে স্রোতের জলে গা ভাসিয়ে বর্তমান রুচির যোগানদার মাত্র হ'য়ে থাকলে চলবে না। তাকে নূতন রুচির সৃষ্টি ক'রতে হবে। ভবিষ্যতে কর্মঠ জাতি যাতে গ'ড়ে উঠতে পারে তার জন্যে শিক্ষার বন্দোবস্ত ক'রতে হবে। হাল্কা গল্পের চাটনি কর্মক্লিষ্ট জীবনকে খানিকটা সরস করতে পারে ঠিকই—কিন্তু ঐ চাটনিকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে কোন জাতিই বেঁচে থাকতে পারে না বা পুষ্টিলাভ করতে পারে না।

ভাল রুচি বলতে আমরা সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয় মাত্রের প্রতি অনুরাগই বুঝছি না। যে জ্ঞান মানুষের আত্মার উন্নতির সহায়ক হ'তে পারে, যে জ্ঞান তাকে তার প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজনকে ভালবাসতে ও বুঝতে সাহায্য ক'রতে পারে কিংবা যে জ্ঞান তার ঐহিক উন্নতির পথে সহায়ক হ'তে পারে সেই জ্ঞানের প্রতি অনুরাগকেই আমরা ভাল রুচি ব'লছি।

গল্প-উপন্যাসের মধ্য দিয়ে মানুষ যে সামাজিক মানুষ হ'য়ে গ'ড়ে উঠতে পারে—দেশের অনেক সমস্যাকে বেশ ভাল ভাবে বুঝতে পারে, সে কথা কেউই অস্বীকার করবে না। কিন্তু গল্প উপন্যাস পড়ার একটা হাল্কা দিকও আছে—আর অনেক সময়ই এই হাল্কা দিকটা কাজের দিকটাকে ছাপিয়ে চ'লে যায়। তাই গল্প উপন্যাস পড়ার মধ্য দিয়ে জাতি গঠনের কাজ কতটুকু হচ্ছে, তা' ঠিক ঠিক বোঝা যায় না।

আজ আমাদের দেশে পাঠকদের রুচি পরিবর্তন করতে হ'লে তাদের এমন সব বই পাইয়ে দিতে হবে যা তাদের জীবনের দৈনন্দিন সমস্যা মেটাতে পারে। জীবিকা সমস্যা, প্রয়োজন মত টাকা রোজগারের সমস্যাই আজ সব মানুষের, সব পরিবারের প্রধান সমস্যা। এই সমস্যা মেটাবার দুটো পথ আছে। প্রথম পথ হ'চ্ছে যে যে-কাজ করছে, সেই কাজেই আরও উন্নতি ক'রে বেশী রোজগার করা। আর দ্বিতীয় পথ হচ্ছে নিজের প্রতিদিনের কাজ ক'রে অবসর সময়ে কোন কাজ করা। প্রথম পথ ধ'রতে হ'লে নিজের নিজের বৃত্তিতে আরও বেশী দক্ষতা অর্জন ক'রতে হয়।

মানুষ ইচ্ছায় নয়, অনেক সময় অবস্থার চাপে প'ড়েই যে কোন বৃত্তি গ্রহণ করে। মাঝামাঝি ভাবে সে ঐ বৃত্তি অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যায়। কিন্তু তার আসক্তি থাকে—মন থাকে অন্য দিকে। অবসর পেলে, সুযোগ সুবিধা পেলে, কিংবা উপযুক্ত উপদেশ পেলে সে আপনার ভাললাগা বিষয়ে খানিকটা কাজ করতে পারে এবং ঐ কাজ ক'রে কিছু উপার্জনও করতে পারে। এই সব লোকদের পড়াশুনার সাহায্য করা গ্রন্থাগারের বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ব।

আমাদের দেশের মানুষদের পড়ার ধারাকে পরিবর্তন করার দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনে সাফল্য লাভ ক'রতে হলে মানুষকে বুঝিয়ে দিতে হবে জীবন সংগ্রামে সাফল্যলাভ ক'রতে হলে গ্রন্থের প্রয়োজন আছে। বিলাতের গ্রন্থাগার আন্দোলনের সাফল্যের পথে Mechanics Institute এর লাইব্রেরীগুলোর অবদান কম নয়। অন্য দেশের গ্রন্থ-ব্যবহারের পরিসংখ্যান নিলে দেখা যায় পাঠকেরা ক্রমান্বয়েই হাল্কা বই থেকে কাজের বই পড়ার দিকে ঝোঁক দিচ্ছে। আমাদের গ্রন্থাগার গুলোও এদিকে দৃষ্টি দিন এই আমাদের নিবেদন।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পৌষ ১৩৬৭

বাংলা দেশে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের মূল্যায়ন

প্রবীর রায়চৌধুরী

ভূমিকা

আদর্শ গ্রন্থাগারের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান বলে যা ঘোষণা করা হয়েছে তা হ'ল প্রশস্ত ভবন, অনুকূল আবহাওয়া, প্রয়োজনীয় পাঠ্যসামগ্রী আর সুশিক্ষিত আত্মমর্যাদা সম্পন্ন বৃত্তি কুশলী কর্মিদল। এই আদর্শ গ্রন্থাগারের রূপায়ণে বৃত্তিকুশলী কর্মীদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে কুশলী কর্মীরা গ্রন্থাগারের চরিত্র পাল্টে দিতে পারে। এই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হ'ল বাংলাদেশের যে দুটি প্রতিষ্ঠান (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ) বর্তমানে গ্রন্থাগার কর্মীদের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে কুশলী করতে সচেষ্ট আছেন তাঁদের প্রার্থী নির্বাচন পদ্ধতি, পাঠ্যতালিকা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির পর্যালোচনার মাধ্যমে কয়েকটি বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। পূর্বসূরীদের নীরবতা ভাঙার দুঃসাহস নিয়ে এই প্রবন্ধ লেখা।

যদিও প্রবন্ধের বিষয়বস্তু একান্তভাবে বাংলাদেশের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণদান সম্পর্কে সীমাবদ্ধ, তথাপি পটভূমিকা হিসাবে ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণদান সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলা দরকার। বর্তমান যুগে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের জন্মদাতা মেলভিল ডিউই সাহেব ১৮৮৭ সালে যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম গ্রন্থাগার বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তার ২৪ বছর পরে ডিউইর ছাত্র বরডেনের (W. A. Borden) সহায়তায় বরোদার মহারাজার প্রেরণায় ১৯১১ সালে বরোদায় ভারতের প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্কুল স্থাপিত হয়। তার কয়েক বছর পরে মার্কিন গ্রন্থাগারিক ডিকিনসনের (A. Dickinson) সাহায্যে ১৯১৫ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্কুল স্থাপিত হয়। ক্রমে ১৯৫৭ সালের মধ্যে গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের ৯টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গ্রন্থাগারবিজ্ঞানের ডিপ্লোমা ও ১২টি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক (কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সহ) সার্টিফিকেট

দান শুরু হয়। বর্তমানে একমাত্র দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী দান করেন। কলিকাতা, বারাণসী ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীদানে উদ্যোগী হয়েছেন। কিন্তু এইসব প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে ন্যূনতম যোগ্যতা, পাঠ্যতালিকা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, সময় তালিকা ইত্যাদির মধ্যে না আছে কোন সামঞ্জস্য না আছে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। আমাদের দেশে চার যুগ আগে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণদান শুরু হয়েছে, কিন্তু আজও পর্যন্ত হয়নি কোন মূল্যায়ন। দেশের বর্তমান অবস্থায় কত বৃত্তি-কুশলী, আধা-বৃত্তি কুশলী কর্মী দরকার—আগামী দিনেই বা কত দরকার—আর সর্বোপরি বৃত্তি কুশলী হয়ে এই কর্মীরা সাধারণ, বিশেষ ও শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার সমূহে নিজেদের কে কি ভাবে নিয়োজিত করেছেন – কতটা সাফল্য ও কতটা ব্যর্থ হয়েছেন এই কার্যক্রমে—তার কোন সমীক্ষাই হয়নি আমাদের দেশে। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির ভাষায় বলতে গেলে "Although four decades have passed since the first Indian University instituted first training class in the country, there has been no organised attempt at assessment of our training programme. There have been no surveys, no statistical studies, no assessment of the training courses and their adequacy, no study of the teaching materials and its use by the students, or of the educational qualifications of the entrants. There have been no seminars and no special conferences on training of Librarians. Similarly, an examination of our library periodicals also reveals that this is the most neglected of the topics. That is why, unlike in other countries,library education in India has not made much headway."

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠান সমূহের পাঠ্য তালিকা, সময় ইত্যাদির মধ্যে এই পার্থক্য কত ব্যাপক তা নীচের তথ্যপূর্ণ তালিকাটির দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝা যাবে। এই তালিকাটি উপস্থিত করা হচ্ছে এই জন্য যে উচ্চশিক্ষার অন্যান্য বিভাগের ন্যায় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষারও যে প্রমানীকরণ (Standardization) হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এই অসঙ্গতির মূল কারণ হ'ল বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণের যথাযথ নিয়ন্ত্রণের অভাব। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে "Unlike other subjects, there is no uniform practice among the universites for control of the librarianship course of the eight universities, four do not have any agency for construction and revision of syllabus, conduct of examination, etc."

. Subjects and instruction periods in seven Universities giving the Diploma course in Librarianship.

Name of Subject	1 Periods (1 hr.) per session	2 Periods (50 mts) per week	3 Periods (45 mts.) per week	4 Periods (1 hr.) per session	5 Periods (40 mts.) per session	6 Periods (45 mts) per session	7 Periods (1 hr.) per week
Classification Theory.	30	3	2 } 120	2 } 120	40	64	1
Classification Practice.	20	3	3	3	90	84	1
Cataloguing Theory.	30	3	2 } 70	2 } 70	35	64	1
Cataloguing Practice.	30	2	3	3	115	84	1
Bibliography.	30		(a) 2	(a) 2	3	40	
Reference Work.	30	20	11 } 70	11 } 70	(b) 100	(c) 150	1, Plus 1 Practical
Book Selection.	20						
Organisation and Administration.	30						
Organisation.		2	2	70	100	32	1, Plus 1 Practical
Administration.		2	2	70	60	16	1, Plus 1 Practical
Cultural History of India.						16	
General Knowledge.	30					16	
Preservation of books and records	20					40	
Evaluation and development of writing, books and libraries.							
Language.	30						

(a) Includes book selection. Includes literature course and practical reference periods.

(b) Includes 40 practical periods. (c) Includes 90 practical periods.

(Ref. Report of Advisory Committee for Libraries, 1959 P. 92)

পটভূমিকা হিসেবে এই কথাগুলি বলা হল এই জন্যে যে আগামী দিনে আমরা ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যে নব রূপায়ণ চাইছি তা অনেকটা পরিমাণে ব্যাহত হবে যদি না সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পাঠ্য-তালিকা, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ও সংগতি না আনতে পারি। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টে এই অবস্থা সম্পর্কে অত্যন্ত ভাসা ভাসা আলোচনা করা হয়েছে আর কয়েকটি সাধারণ সুপারিশও করা হয়েছে। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ থেকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট কোর্সের জন্যে একটি পাঠ্যতালিকা প্রকাশ করেছিলেন। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে তা অনেকটা অপ্রাসঙ্গিক ও পুরানো হলেও অনেক ক্ষেত্রে তাও কার্যকরী করার চেষ্টা হয়নি। সম্প্রতি ডাঃ রঙ্গনাথন দিল্লী গ্রন্থাগার পরিষদের মুখপত্র Library Herald-এ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট কোর্সের জন্যে একটি পাঠ্য তালিকা প্রকাশ করেছেন। অনেক আধুনিক তথ্য ও তত্ত্ব তাতে সংগৃহীত হয়েছে—যদিও এর কয়েকটি বিষয় আলোচনা সাপেক্ষ ও বিতর্কমূলক। এই পরিস্থিতিতে মনে হয় ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক ও গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের প্রতিনিধিদের নিয়ে ভারতের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি, পাঠ্যতালিকা, সময়, ন্যূনতম যোগ্যতা এবং বৃত্তিকুশলী কর্মীদের চাহিদা নির্ণয়ের জন্যে একটি অনুসন্ধান কমিটি গঠিত হওয়া উচিত। এই কমিটি ভবিষ্যতের জন্যে নানা সুপারিশও করবেন। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টেও বলা হয়েছে "In India, the traditional subjects constituting professional education have remained in the curriculum unchanged for too long. What is required is a complete reorganisation of the syllabus in the light of the present day needs of Librarianship. For this purpose, an expert committee consisting of professional Librarians should be set up".

পরিবর্তিত অবস্থায় দেশের প্রয়োজনে শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পাঠ্য-তালিকার কি গুরুতর পরিবর্তন প্রয়োজন তা জানা যাবে সম্প্রতি প্রকাশিত বিলেতের গ্রন্থাগার পরিষদের বিভিন্ন পরীক্ষার নতুন পাঠ্য তালিকার মধ্যে। (Library Association Record)।

গ্রন্থাগারিক শিক্ষণে সরকারী উদ্যোগ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৩য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালীন সময়ে রাজ্যের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বহুমুখী এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই

পরিকল্পনার মধ্যে অন্যতম হ'ল রাজ্যের গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষার জন্যে একটি শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন। এই শিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হবে নাকি আরও অধিক সংখ্যায় গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষা দেওয়া। এই প্রসঙ্গে এখন প্রশ্ন হ'ল :

(১) পশ্চিমবঙ্গে ২টি প্রতিষ্ঠান (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণদান করছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে মাষ্টার ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তনেও অগ্রণী হয়েছেন। এই অবস্থায় আরও একটি তৃতীয় শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা কি ?

(২) ২টি প্রতিষ্ঠান হ'তে ইতিমধ্যে যারা শিক্ষালাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে কতজন এই বৃত্তিতে আছেন ? কি পদমর্যাদা ও বেতন তাঁরা পাচ্ছেন ? বর্তমানে ও আগামী দিনে বৃত্তিকুশলী ও আধা-বৃত্তি কুশলী কর্মীদের কি চাহিদা আছে বা হতে পারে ? এই দুইটি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানের মান কিরূপ ? এ সম্পর্কে কোন সমীক্ষা কি করা হয়েছে ?

(৩) যদি ধরেও নেওয়া হয় যে আরও অধিক কর্মী আমাদের প্রয়োজন তা' হলেও এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে (যাঁরা ইতিমধ্যে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাদানে খানিকটা ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন) অর্থ ও লোকবল দিয়ে সাহায্য করাই কি উচিত নয় ? আরও একটি প্রতিষ্ঠান খোলা কি অর্থবল, লোকবল, সময় ও কর্মক্ষমতার অপচয় নয় ?

গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টেও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষা দান বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে এবং আধা বৃত্তিকুশলীদের শিক্ষাদান রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের হাতে দিতে সুপারিশ করেছেন। এই অবস্থায় রাজ্য সরকারের পক্ষ হতে আরও একটি শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের কি সার্থকতা থাকতে পারে ? আশা করি রাজ্য সরকারের শিক্ষা বিভাগ এই প্রশ্নগুলি যথোচিতভাবে বিবেচনা করবেন।

বাংলা দেশে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ

বাংলা দেশে গ্রন্থগারিক শিক্ষণ ১৯৩৫ সালে শুরু হয়। তৎকালীন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিক খান বাহাদুর আসাদুল্লা খাঁন ভারত সরকারের সহায়তায় বাংলা দেশে সর্ব প্রথম গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ কেন্দ্রের পত্তন করেন। ১৯৪৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা ক্লাসের প্রবর্তনের সাথে সাথে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর ক্লাস বন্ধ করে

দেওয়া হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯৩৪ সালে হুগলী জেলা গ্রন্থাগার পরিষদের সহায়তায় বাঁশবেড়িয়ায় প্রথম শিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করে। শ্রীপ্রমীল চন্দ্র বসু এই শিক্ষণ শিবিরের দায়িত্বে ছিলেন। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হতে "গ্রীষ্মকালীন" ক্লাসের উদ্বোধন করা হয়। এই গ্রীষ্মকালীন ক্লাসের পরিচালক ছিলেন ডঃ নীহার রঞ্জন রায়। প্রথম বছরে ছাত্র সংখ্যা ছিল ২০ জন এবং মোট ১২৫ ঘন্টা ক্লাস নেওয়া হ'ত। প্রথম হতে এখন পর্যন্ত পরিষদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ কেন্দ্রে ছাত্র সংখ্যা, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও সময়ের বেশ কিছু পরিবর্ত্তন হয়েছে। বর্ত্তমানে প্রতি বছর পরিষদের ৩টি বিভাগ হ'তে প্রায় ১৫০ জন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২টি বিভাগ হতে প্রায় ৯০—১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী যথাক্রমে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য শিক্ষালাভ করেন। এই যে ব্যাপক হারে ছাত্র-ছাত্রী প্রতি বছর শিক্ষালাভ করেন এর পিছনে কি কোন সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা আছে? চাহিদার সাথে সরবরাহের কোন সংগতি আছে? প্রাক স্বাধীন যুগে এবং স্বাধীনতার কয়েক বছর পরেও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভের আগ্রহটা খুব বেশী তীব্র ছিল না। যাঁরা শিক্ষালাভ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে একটা অংশ এই বৃত্তি গ্রহণ করেন নি। কিন্তু গত ৬।৭ বছরের চিত্র অন্য রকম। ইদানিং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে যেন হিড়িক লেগেছে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার ও শিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন হয়ত অন্যতম কারণ। কিন্তু মূল কারণ অর্থনৈতিক। দেশের ক্রমবর্দ্ধমান অর্থনৈতিক চাপ এবং জীবিকার্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্র ক্রমে সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে বলেই যে এই বৃত্তির প্রতি হঠাৎ অনেকের আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে তা বলাই বাহুল্য। পঃ বঃ সরকারের অর্থ সাহায্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ডিপ্লোমা ক্লাসের ২টি বিভাগ খুলেছেন। কারণ সরকার রাজ্যব্যাপী এক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য সুদক্ষ কর্মী বাহিনী চান। ভাল কথা। কিন্তু কত কর্মী দরকার? বৃত্তিকুশলী? আধা বৃত্তিকুশলী? কি আথিক ও সামাজিক মর্যাদা তাদের দেওয়া হবে? সকলের জন্যই কি প্রয়োজনীয় চাকুরী আছে?

স্বাভাবিক ভাবেই এই প্রশ্নগুলি এসে পড়ে। আমার বক্তব্য হ'ল গ্রন্থাগার পরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারের যুক্ত উদ্যোগে কর্মীর চাহিদা ও সরবরাহ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ও পর্যালোচনা হওয়া দরকার। এ না হ'লে, চাহিদার তুলনায় সরবরাহ বেশী হলে, নিয়োগ কর্ত্তারা সস্তায়

মাথা কিনতে সমর্থ হবেন। এ প্রচেষ্টা কিছু কিছু দেখাও যাচ্ছে। অভিজ্ঞ করে তোলার নামে বেশ কিছুদিন বিনা মাইনেতে খাটিয়ে নেওয়া থেকে সুরু করে সর্বনিম্ন বেতনের হার দেওয়ার চেষ্টা করা সবই সস্তায় মাথা কেনার আর এক দিক। এই বিষয়ে সতর্ক হবার সময় এসেছে।

এবারে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়া যাক। প্রারম্ভেই বলে নেওয়া প্রয়োজন পাশ্চাত্যের দেশগুলির সাথে আমাদের দেশের পাঠ্যতালিকা, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতি ইত্যাদির যথেষ্ট পার্থক্য আছে। এই নিয়ে প্রতিনিয়ত যথেষ্ট তথ্য ও তত্ত্ব পরিবেশিত হচ্ছে। এই নিয়ে পরীক্ষা নীরিক্ষাও কম চলছে না। শিক্ষার এই মৌলিক উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার দুঃসাহস আমার নেই— আর প্রবন্ধের আওতার মধ্যেও তা পড়ে না। শুধু আমাদের বর্তমান পাঠ্য-তালিকা ও শিক্ষাদান পদ্ধতির ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে আলোচনাই আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গোড়ায় গলদ

কি বিশ্ববিদ্যালয়—কি পরিষদ—উভয়েরই শিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে প্রথমেই বলতে হয় যে গ্রন্থাগারিকতার বিকাশ এবং সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে বিশেষ কিছুই বলা হয় না। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় গ্রন্থাগার ও গ্রন্থগারিকতার বিকাশ এবং সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছুই শিখিনা। গ্রন্থাগারিকতা কেবল যে কোলন ও ডেসিমেলের চুল চেরা বিচার কিম্বা এ. এ. কোড ও এ. এল. এ. কোডের পার্থক্য নির্ণয়ের কৌশল নয় একথা অনুভব করেন এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম। এই বৃত্তিতে এখন দুটো প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। একদল শুধু 'টেকনিক্যাল" কথা বলেন (যদিও তা অসম্পূর্ণ ও ত্রুটিপূর্ণ), তাঁদের কাছে গ্রন্থাগারিকতার সামাজিক ও দার্শনিক ভিত্তির কোন মূল্য নেই। আর একদল অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ হলেও গ্রন্থগারিকতার সামাজিক ও দার্শনিক ভিত্তি সম্পর্কে অনেক কথা বলেন, কিন্তু দ্রুত পরিবর্তনশীল গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে নিজেদের ওয়াকিবহাল করার চেষ্টা করেন না বা চেষ্টা করার প্রয়োজন বোধ করেন না। উভয়দের নিয়েই বিপদ। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনষ্টিট্যুট অব্ লাইব্রেরী সায়েন্স কর্তৃক প্রবর্তিত নূতন পাঠ্য তালিকায় 'সাধারণ গ্রন্থাগার

ও জাতীয় অগ্রগতি (জেলা গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষাদানের জন্য)—এই বিষয়টি সম্পর্কে যথোচিত নজর দেওয়া হয়েছে ।

আমাদের দেশের শিক্ষাদানের পটভূমিকাটা সম্পূর্ণ বাংলাদেশের মাটিতে বিলিতি চেরি গাছ লাগানোর মত। ইউরোপীয় ভাষায় লিখিত বইয়ের বর্গীকরণ সূচীকরণ ও সূত্রানুসন্ধান (রেফারেন্স ওয়ার্ক) বিষয়ে অনেক কিছু বলা হলেও ভারতীয় ভাষায় লিখিত বইএর বর্গীকরণ, সূচীকরণ ও সূত্রানুসন্ধান সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছুই শিখিনা। বিলেতের গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে কিছু হয়ত বলা হয় (এ সম্পর্কে আরও বিস্তৃতভাবে বলা উচিত এবং আরও বেশী জানা দরকার), কিন্তু আমাদের দেশের আইন প্রণয়নের চেষ্টা ও আবশ্যকতা এবং যে দুটি রাজ্যে আইন প্রবর্তন করা হয়েছে তার সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে আমরা ক'জন জানি। সয়াজীরাও ও মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়ের কর্মতৎপরতা অনেক গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে কুশলী কর্মীর কাছে অজ্ঞাত। হেড্‌কার, ডাবলডের নাম আমরা চটপট বলতে পারি, কিন্তু বাংলা ভাষায় লিখিত "গ্রন্থকার নামা" (প্রমীল চন্দ্র বসু) ও "দশমিক বর্গীকরণ" (প্রভাত মুখোপাধ্যায়) আমরা ক'জন হাতে নেড়ে দেখেছি ? রঙ্গনাথনের মৌলিক অবদান সম্পর্কে আমরা কতটা জানি ? আমাদের দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনে পাশ্চাত্ত্যের দান অনস্বীকার্য। আমরা নিশ্চয়ই তাদের কাছ থেকে শিখব। কিন্তু নিজের দেশের জ্ঞাতব্য কি কিছু নেই ?

গ্রন্থাগারিকতা একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা। শুধু বক্তৃতার মাধ্যমে যেমন ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং শেখা যায়না, তেমনি অহরহ বক্তৃতা শুনে এবং রাশি রাশি নোট নিয়েও গ্রন্থাগারিকতা আয়ত্ব করা যায় না। তাই হাতে কলমে কাজের উপর এখানে বেশ খানিকটা প্রাধান্য দেওয়া উচিত—যা আদৌ দেওয়া হয় না। একটি গ্রন্থাগার কি ভাবে কাজ করে—তার বর্গীকরণ, সূচীকরণ ও তথ্যানুসন্ধানের সমস্যা,—তার সংগঠন, পরিচালনা ও কর্মীর সমস্যা সম্পর্কে আমাদের কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা বা হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া হয় না। তাই কোন গ্রন্থাগারে প্রথম নিয়োগে আনকোরা কর্মীরা হকচকিয়ে যান। এদিকে মোড় ফেরান দরকার। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টেও বলা হয়েছে ' Practice work, so essential in a field such as Librarianship, is confined chiefly to classification and cataloguing".

সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্স সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনার আগে জানা দরকার এই দুটি কোর্সের উদ্দেশ্য কি আর পার্থক্য কোথায়। যদিও এই দুটি কোর্সের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষার মানের মধ্যে যথেষ্ট তফাৎ রয়েছে (পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা ও আন্ডার গ্রাজুয়েট সার্টিফিকেট) তবু এই দুটি কোর্সের পাঠ্য তালিকা, শিক্ষাদান পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করা কষ্টকর। এই সম্পর্কে দুটি প্রবণতা দেখা যাচ্ছে: সার্টিফিকেটে 'সব কিছু' বা 'অনেক কিছু' পড়িয়ে দেওয়ার ঝোঁক আর অন্যদিকে ডিপ্লোমার গতানুগতিক বিষয় বস্তু ও শিক্ষাদান পদ্ধতির বাইরে যাওয়ার অনিচ্ছা। দুটি দৃষ্টি ভঙ্গীরই পরিবর্তন হওয়া দরকার।

গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের তিন পর্যায়

ডঃ রঙ্গনাথন তাঁর Library Personality and Library Bill : West Bengal নামক গ্রন্থে আগামী দিনে পঃ বাংলায় আইনানুগ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হ'লে যে কর্মী বাহিনীর প্রয়োজন হ'বে (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের গ্রন্থাগার ও বিশেষ গ্রন্থাগার সমূহ ব্যতীত) তার হিসাব এই ভাবে করেছেন:

Professional Librarians	300
Semi-Professionals	2500
Clericals	700
Artisans	600
Unskilled	2300
Total	6 400

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষার সমস্যা বলতে গেলে এই বৃত্তিকুশলী ও আধা বৃত্তিকুশলীদের শিক্ষণদানের সমস্যা বুঝায়। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টে গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষণদানের সমস্যাকে ৩টি ভাগে ভাগ করেছেন। (১) আধা বৃত্তি কুশলী (Semi-Professionals) (২) বৃত্তি কুশলী (Professionals—Basic course) (৩) উচ্চতর শিক্ষা (Advanced course)। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি আধা বৃত্তিকুশলীদের জন্য সার্টিফিকেট কোর্স, বৃত্তি কুশলীদের জন্য স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স এবং উচ্চতর শিক্ষার জন্য স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্সের সুপারিশ করেছেন। স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্স ভারতবর্ষে একমাত্র দিল্লীতে আছে। পরিতাপের বিষয় গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণদানে অন্যতম অগ্রণী প্রদেশ হয়েও আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে স্নাতকোত্তর

ডিগ্রী কোর্সের প্রবর্তন হয়নি। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি আরও সুপারিশ করেছেন যে আধা-বৃত্তিকুশলীদের শিক্ষাদানের দায়িত্ব থাকা উচিত রাজ্যের গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহের হাতে, আর যেখানে রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ নেই সেখানে রাজ্য গ্রন্থাগারিকের হাতে এই দায়িত্ব থাকা উচিত। বৃত্তিকুশলীদের শিক্ষা (স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্স) বা উচ্চতর শিক্ষার (স্নাতকোত্তর ডিগ্রী কোর্সের) দায়িত্ব থাকা উচিত বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের হাতে। ভাল কথা। কিন্তু সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স ও মাষ্টার ডিগ্রী কোর্সে ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা, সিলেবাস, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে উপদেষ্টা কমিটি নির্দিষ্ট কিছু সুপারিশ করেননি। যাও করেছেন তাও ভাসা ভাসা ও অনেকক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির এই সুপারিশ সমূহের মধ্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে যা গ্রন্থাগার কর্মীদের জানা প্রয়োজন : আধা বৃত্তি কুশলী (Semi-Professionals)—"We suggest that such a course of study may have the following syllabus :—

A. Elementary Library Organisation and methods—The object is to give the trainee an understanding of how libraries are governed and administered and the activities which they perform. The course will include the organisation of public library system in the state and in India, and its objectives ; various types of libraries ; routines relating to building library stocks, including acquisition of books, periodicals etc. ; maintenance of records ; physical arrangement of books ; organisation of circulation service.

B. Introduction to classification and cataloguing.—The objective is to give instruction in the main tools which libraries employ to organise their book stocks, the practical aspects of classification, including its main parts and their relationships, the construction of two main types of catalogues, thir functions and filing rules.

C. Elementary reading guidance and bibliography. The objective is to enable the library worker to obtain information from libraries through various tools at an elementary level and to answer simple inquiries. It will also include the construction

and use of different reading lists, and bibliographies, book displays and posters, the value and use of different types of reference books as source of information, elements of historical bibliography.

ডিপ্লোমা কোর্সের উদ্দেশ্য সম্পর্কে উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে :

"1. To provide comprehensive training in general librarianship and to prepare the students for advanced work in librarianship in the second year.

2. To emphasise the teaching of the basic principles underlying techniques and skills of librarianship, in addition to description of routine practices, etc.

3. To acquaint the students with the social, educational, communicational role of the library in modern society.

4. To give the students adequate bibliographical control of literature, at least in one department of Knowledge, with particular reference to Indian materials."

মনে হয় সার্টিফিকেট কোর্স ও ডিপ্লোমা কোর্সের উদ্দেশ্যের পার্থক্য সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যাঁরা শিক্ষণ দান করেন তাঁদের ধারণা স্বচ্ছ নয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ পড়ে অপ্রয়োজনীয় বিষয় যুক্ত হয়েছে বা তার উপর চাপ দেওয়া হয়েছে এবং সিলেবাসের ক্ষেত্রে অনেক সময় সীমা লঙ্ঘিত হয়েছে। ডিপ্লোমা কোর্সের ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা গ্রাজুয়েট ছাড়াও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে সার্টিফিকেট থাকা প্রয়োজন। এতে ডিপ্লোমা কোর্সের মান আরও উচ্চতর করা সম্ভব হবে এবং একটা ন্যূনতম মানের উপর ভিত্তি করে অগ্রসর হওয়া যাবে।

উপরের এই কয়েকটি সাধারণ মন্তব্য করে এবার কয়েকটি বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক্—

ভর্তি সম্পর্কে

আদর্শ গ্রন্থাগারিকের কি কি গুণ থাকা উচিত তা বলতে গিয়ে অনেক গ্রন্থাগারিক যে রাশি রাশি গুণাবলীর কথা বলেছেন সে সম্পর্কে কৌতুক করে জনৈক বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক (Mr. Stanley Jast) বলেছেন "এতগুণ

কোন একজন মানুষের মধ্যে কোন মতেই থাকা সম্ভব নয়"। সত্যিই তাই, তবে গ্রন্থাগার কর্মী হিসেবে সাফল্য লাভ করতে হ'লে বই, পাঠক, আইন-শৃঙ্খলা ও সংগঠনের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকা উচিত। এই গুণাবলীর কিছু ব্যক্তিগত, আর অনেক কিছু লাইব্রেরী স্কুলের মাধ্যমে অর্জন করা যায়। তাই প্রার্থী নির্বাচনে কিছুটা সতর্কতা অনাবশ্যক হবেনা। অন্যথায় বিপদ আছে। একটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মীকে জানি পাঠক তথ্যানুসন্ধান করলেই তিনি আঙ্গুল দিয়ে ক্যাটালগ ক্যাবিনেট দেখিয়ে দেন। কোথায় গেল লাইব্রেরী স্কুলের "সামাজিক আদর্শ" বা Aids to Readers"-এর গালভরা কথা। বোঝা যাচ্ছে প্রার্থী নির্বাচনে যথেষ্ট সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কিভাবে? গ্রন্থাগার পরিষদ ২ বছর আগে পর্যন্ত ইন্টারভ্যুর মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করতেন। বর্তমানে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকাল ইনষ্টিট্যুটের সাহায্যে মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষার মাধ্যমে একটি তালিকা তৈরী করেন এবং তারপর ইন্টারভ্যুর মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করেন। বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারভ্যুর মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচন করেন। ইন্টারভ্যুর মাধ্যমে প্রার্থী নির্বাচনে যথেষ্ট বিপদ আছে। ব্যক্তিগত পরিচয়, সম্পর্ক, সুপারিশ ইত্যাদি অনেক সময় প্রার্থী নির্বাচনকে প্রভাবান্বিত করে। ডিপ্লোমা কোর্সে অনেক সময় গ্রন্থাগারে নিযুক্ত কর্মীরাও সীট পান না। এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য যাঁরা বিভিন্ন গ্রন্থাগারে কাজ করছেন তাঁদের জন্য সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্সে অন্তত ৭৫% সীট থাকা উচিত। কারণ এঁদের মানসিক গঠনের সাথে গ্রন্থাগারিক বৃত্তি খাপ খাক বা না খাক এঁরা ইতিমধ্যে বৃত্তি হিসেবে গ্রন্থাগারিকতা গ্রহণ করেছেন। সুতরাং প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্তৃক প্রেরিত এই প্রার্থীদের আগে শিক্ষিত করে তোলা প্রয়োজন। অবশ্য বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থাগারের জন্য বিভিন্ন হারে সীটের বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। এ ছাড়া শতকরা ২৫% সীট এবং শতকরা ৭৫% এর কোটা পূরণ না হলে বাকী সীট নবাগতদের জন্য দেওয়া দরকার। প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে প্রেরিত প্রার্থীদের জন্য ইন্টারভ্যু বা লিখিত পরীক্ষার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। ভর্তি সম্পর্কে আর একটি কথা বলা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ফর্মে "রেকমেন্ডসনের" নিয়ম আছে। এর কি অর্থ জানিনা। প্রার্থীর যদি ন্যূনতম যোগ্যতা থাকে আর কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত হন বা লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভ্যুতে উত্তীর্ণ হন তবে তাঁকে নির্বাচিত করা যেতে পারে। গণতান্ত্রিক দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় সিনেট ও সিন্ডিকেটের সদস্য বা মন্ত্রী মহোদয়ের স্বাক্ষর না হলে আবেদন পত্র

গ্রাহ্য হবে না এটা কোন ধরণের গণতান্ত্রিক পন্থা? এর অবিলম্বে অবসান হওয়া প্রয়োজন।

পাঠ্যতালিকা ও শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রসঙ্গে

	সার্টিফিকেট		ডিপ্লোমা
বর্গীকরণ (তত্ত্বগত)	১০০		৭৫
,, (ব্যবহারিক)	১০০		৭৫
সূচীকরণ (তত্ত্বগত)	১০০		৭৫
,, (ব্যবহারিক)	১০০		৭৫
গ্রন্থাগার সংগঠন, পরিচালনা ইত্যাদি (পুস্তক সংরক্ষণ সহ)	১০০		১০০
সূত্রানুসন্ধান ও পুস্তক নির্বাচন	১০০	সূত্রানুসন্ধান	১০০
গ্রন্থবিদ্যা	১০০	গ্রন্থবিদ্যা ও পুস্তক নির্বাচন	১০০
ভাষা	×		১০০
সাধারণ জ্ঞান	×		১০০

বর্গীকরণ

সার্টিফিকেট কোর্সে বর্গীকরণের তত্ত্বগত ও দার্শনিক দিকের উপর বিশেষ চাপ না দিয়ে সাধারণ ভাবে বর্গীকরণের উদ্দেশ্য এবং দশমিক বর্গীকরণের তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিকের উপর বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। বর্গীকৃত বই সাজাবার পদ্ধতিও সার্টিফিকেট কোর্সে শেখান উচিত। ডিপ্লোমা কোর্সে বর্গীকরণের তত্ত্বগত ও দার্শনিক দিক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। ডিপ্লোমা কোর্সে ডিউই, কাটার, ব্রাউন, রঙ্গনাথন, ব্লিস, লাইব্রেরী অব কংগ্রেস এবং ইউ, ডি, সি, এতগুলি স্কীম শেখানোর বিশেষ সার্থকতা দেখিনা। প্রস্তাবিত মাষ্টার ডিগ্রী কোর্সে এই সমস্ত পরিকল্পনাগুলির তুলনামূলক পাঠ ও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। ডিপ্লোমা কোর্সের জন্য ডেসিম্যাল, কোলন এবং ইউ ডি সি স্কীম পাঠ্য বিষয় হওয়া উচিত। কোলন ও ইউ ডি সি বিশেষ জোর দিয়ে আমাদের পড়ান হয় না। কোলন স্কীম উত্তর ভারতের অনেক গ্রন্থাগারে এবং ইউ ডি সি স্কীম বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অসংখ্য গ্রন্থাগারে প্রয়োগ করা হয়েছে। এই দুটি সিন্থেটিক স্কীম নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে

ব্যাপক গবেষণা চলছে। কিন্তু এই স্কীম দুটির তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে আমরা বিশেষ কোন ধারণা পাই না। ডিপ্লোমা কোর্সে বর্গীকরণের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে আরও ব্যাপক চর্চা হওয়া প্রয়োজন। মেরিল কোডের বিভিন্ন ধারাসমূহ সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের বিস্তৃত ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। সার্টিফিকেট কোর্সে ডিপ্লোমা কোর্সের ন্যায় বর্গীকরণের ব্যবহারিক ও তত্ত্বগত দিক সম্পর্কে ১০০ নম্বরের ২টি পেপার হওয়া প্রয়োজন। ডিপ্লোমা কোর্সে বর্গীকরণে ডঃ রঙ্গনাথনের মৌলিক অবদানসমূহ এবং "ডকুমেণ্টেসন ও ডেপথ্ ক্লাসিফিকেসন", "চেইন ইণ্ডেক্সিং" সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে যথোচিত নজর দেওয়া হয় না।

সূচীকরণ

সার্টিফিকেট কোর্সে সূচীকরণ বিষয়ে এ. এ. কোড এবং এ. এল. এ. কোড—এই দুটি কোড দুটি বিভাগে শেখান হয়। একটি হওয়া বাঞ্ছনীয়। ডিপ্লোমার সূচীকরণের তত্ত্বগত দিকে কয়েকটি বিষয়ের উপর বিশেষ নজর দেওয়া উচিত। এইসব বিষয় হ'ল সূচীকরণ কোড গঠনের মূল নীতি ও পদ্ধতি সমূহ, বিভিন্ন সূচীকরণ কোডের (এ. এ. এবং এ. এল. এ) তুলনামূলক আলোচনা, ভারতীয় ও এশিয়াবাসীদের নামের সমস্যা এবং সর্বোপরি ক্লাসিফায়েড ক্যাটালগ গঠনের মূল নীতি ও পদ্ধতিসমূহ। ক্লাসিফায়েড ক্যাটালগ বৈজ্ঞানিক ও বিশেষ গ্রন্থাগারের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এই বিষয় সম্পর্কে কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা ছাত্র-ছাত্রীরা পান না। সূচীকরণের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে আমার দু' একটি বক্তব্য আছে। অনুসন্ধানে দেখা যায় এটি এমন একটি বিষয় যা নিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষার সময় সবচেয়ে বেশী চিন্তিত হয়ে পড়েন। বিভিন্ন বইয়ের নানা ধরণের সমস্যা উপস্থিত করে আরও অধিক অনুশীলন ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে করান উচিত। কোডের বিভিন্ন ধারাগুলি সম্পর্কে উদাহরণ দিয়ে ব্যাখ্যা করা উচিত। ক্লাসিফায়েড ক্যাটালগ গঠন প্রণালী আর পত্র-পত্রিকার প্রবন্ধসমূহ ইনডেক্স্ করার পদ্ধতিও শেখানো দরকার। বর্গীকরণ, সূচীকরণ ও সূত্র সন্ধানের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে "টিউটোরিয়াল ওয়ার্ক" হওয়া প্রয়োজন। আর একটি কথা। এ. এ. কোড বা এ এল. এ. কোড এই দুটিই হ'ল "অথর হেডিং" নির্বাচন করা সম্পর্কে নির্দেশ। সূচীকরণের অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে (অর্থাৎ পাঙ্কচুয়েশন, স্পেসিং, নোট, এনোটেশন ইত্যাদি)

বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থে (নরিস, শার্প, টেলর, ফেলোস্, হিচলার) ঘাঁটলে দেখা যাবে "স্টাইলের" ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের পার্থক্য আছে। আমার ধারনা "স্টাইলের" ক্ষেত্রে এই পার্থক্য সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্সের শিক্ষক ও পরীক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রতিভাত হচ্ছে। আলোচনার মাধ্যমে এই সমস্যাটির সমাধান হওয়া প্রয়োজন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনার ও সম্মেলনে বর্গীকরণ ও সূচীকরণ বিষয়ে নূতন নূতন ধ্যান-ধারণা সমূহ ব্যক্ত হচ্ছে। কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষণ পদ্ধতি এই পরিবর্তনের সাথে সংগতি রেখে চলতে পারছে না। ইউরোপ আমেরিকার মত আমাদের দেশে এখনও বর্গীকরণ-সূচীকরণের কেন্দ্রীকরণ সুরু হয়নি। তাই বর্গীকরণ-সূচীকরণ বিষয়ে কোন অংশে কম জোর দিলে চলবেনা। ডিপ্লোমা ক্লাসে বিষয় তালিকা (Subject heading) প্রয়োগের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা ও হাতে কলমে কাজ শেখান দরকার। ডিপ্লোমা উত্তীর্ণ অনেক ছাত্র-ছাত্রীকে লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের এবং সিয়ার্সের বিষয় তালিকা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করতে দেখেছি। কার্ড ফাইলিং-এর নিয়মাবলী সার্টিফিকেট কোর্সেই শেখান দরকার। ডিপ্লোমা কোর্সেও সূচীকরণের তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে ১০০ নম্বরের ২টি পেপার হওয়া প্রয়োজন। শেষ কথা হ'ল বর্গীকরণ ও সূচীকরণের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণার জন্য কলিকাতার কয়েকটি বড় গ্রন্থাগারে ছাত্র-ছাত্রীদের কম পক্ষে ১৫ দিন কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। এই কাজ বাধ্যতামূলক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

বর্গীকরণ ও সূচীকরণ সম্পর্কে গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে "So far as classification is concerned, the course should provide for a detailed study of one system of classification, while giving the structure, functions and limitations of the other. In cataloguing, more time should be devoted to general principles of descriptive cataloguing, and of relating these to the rules. Further, new developments in this field, as embodied in later codes which make provision for cataloguing wider variety of library materials, need to be introduced. Finally, a balanced training should be given in descriptive and subject cataloguing."

সূত্রানুসন্ধান

সূত্রানুসন্ধান (রেফারেন্স ওয়ার্ক), পুস্তক নির্বাচন ও গ্রন্থবিদ্যা— এই তিনটি বিষয় আমাদের শিক্ষণ ব্যবস্থায় অপেক্ষাকৃত অবহেলিত, যদিও সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্সের সূত্রানুসন্ধান বিষয়টির উপর গত ৩।৪ বছর অধিকতর নজর দেওয়া হয়েছে। ডিপ্লোমা কোর্সে পুস্তক নির্বাচন বিষয়টি গ্রন্থবিদ্যার (বিবলিওগ্রাফি) সঙ্গে যুক্ত। মনে হয় ডিপ্লোমা কোর্সে সার্টিফিকেট কোর্সের ন্যায় পুস্তক নির্বাচন বিষয়টি সূত্রানুসন্ধান বিষয়টির সঙ্গে যুক্ত হওয়া উচিত। সূত্রানুসন্ধান বিষয়টির দুটি দিক আছে। তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক দিক। সার্টিফিকেট কোর্সে সূত্রানুসন্ধানের তত্ত্বগত দিকে অনাবশ্যক জোর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। ডিপ্লোমা কোর্সের সূত্রানুসন্ধান বিষয়টির ব্যবহারিক দিকে সাধারণত প্রচলিত রেফারেন্স বই (Conventional Reference tools) সম্পর্কেই বলা হয়। সূত্রানুসন্ধান কাজটি বর্তমানে সব ধরণের গ্রন্থাগারেই অল্পবিস্তর হয়ে থাকে। তাই এই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা ছাত্র-ছাত্রীদের থাকা দরকার। কিন্তু কি সার্টিফিকেট—কি ডিপ্লোমা কোর্সে ছাত্র-ছাত্রীরা রেফারেন্স বই ঘাটার বিশেষ সুযোগ পান না। শিক্ষার্থীরা রেফারেন্স বইয়ের গুণাগুণ বিচার করতে পারেন না। রেফারেন্স বই সম্পর্কে যা ধারণা দেওয়া হয়, তা প্রধানত প্রচলিত রেফারেন্স বই সম্পর্কে। বিভিন্ন বিষয়ে যে সব প্রামাণ্য রেফারেন্স বই আছে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বিশেষ ধারণা জন্মায় না। সূত্রানুসন্ধানের প্রশ্নগুলি ২টি গ্রুপে ভাগ করা উচিত। (১) যে সব প্রশ্ন প্রচলিত রেফারেন্স বই থেকে উত্তর দেওয়া যায় এবং (২) যে সব প্রশ্ন বিভিন্ন বিষয়ের উপর এবং যা উত্তর দিতে অনেক সময় ব্যাপক অনুসন্ধান ও এমন কি গবেষণা পর্যন্ত করার প্রয়োজন হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের এই সব প্রশ্নের তালিকা (সহজ হতে ক্রমান্বয়ে জটিল) তৈরী করে দেওয়া উচিত এবং বিভিন্ন রেফারেন্স বইয়ের সাহায্যে প্রশ্নগুলির সমাধান বের করতে নির্দেশ দেওয়া প্রয়োজন। ভারতীয় রেফারেন্স বই সম্পর্কে বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। রেফারেন্সের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে এইভাবে নজর দিতে হবেঃ (১) কিছু প্রামাণ্য রেফারেন্স বই-এর মূল্যায়ন ছাত্রদের নিজের ভাষায় করতে হবে—অবশ্য তাদের মূল্যায়ন করার পদ্ধতি জানিয়ে দিতে হবে, (২) কিছু প্রচলিত রেফারেন্স বই থেকে বিশেষ অংশ তুলে দিয়ে জানতে চাওয়া হবে কোন ধরণের বই থেকে তা দেওয়া হয়েছে এবং সেই বইয়ের মূল্যায়ন করতে বলা হবে। (৩) বিশেষ একটি বিষয়ের উপর কি কি প্রামাণ্য রেফারেন্স বই আছে তা জানতে

চাওয়া হবে (৪) বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নের উত্তরের সূত্রসমূহ জানতে চাওয়া হবে। (৫) ভারতবর্ষে প্রকাশিত বিভিন্ন ভাষায় প্রামাণ্য রেফারেন্স বই-এর (প্রচলিত ও বিষয়ের উপর) তালিকা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন করতে বলা হবে।

পুস্তক নির্বাচনের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে অধিকতর নজর দেওয়া প্রয়োজন। পুস্তক নির্বাচনের প্রামাণ্য পুস্তকসমূহ সম্পর্কে ছাত্রদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। বিশেষ করে ভারতীয় পুস্তক ও পত্রপত্রিকা নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় পুস্তকসমূহ সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা হওয়া বাঞ্ছনীয়। বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থসূচী সম্পর্কে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। পুস্তক নির্বাচন ও সূত্রানুসন্ধান সম্পর্কে গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টে বলা হয়েছে "Book selection and Reference should constitute as one course giving instruction in (a) various methods and techniques for guiding readers in selection of materials, knowledge of general reference material and (b) detailed survey of authoritative books and bibliographical resources in one of the selected subject fields of the students' choice; such as Indian literature, natural science, humanities or social sciences."

গ্রন্থবিদ্যা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা কোর্সে বোধহয় সবচেয়ে অবহেলিত বিষয় হ'ল গ্রন্থবিদ্যা, যদিও এটি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্যতম মূল বিষয়। সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্সের প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে তা মূলতঃ ঐতিহাসিক গ্রন্থবিদ্যা (Historical Bibliography)কে কেন্দ্র করে। Systematic Bibliography এবং Analytical Bibliography সম্পর্কে ছাত্রদের কোন ধারণা জন্মিয়ে দেওয়া হয় না। গ্রন্থসূচী প্রণয়নের পদ্ধতি আমরা শিখি না। ডিপ্লোমা কোর্সে এই সব বিষয় পড়ানো দরকার। ডিপ্লোমা কোর্সে গ্রন্থবিদ্যা বিষয়টি মূলতঃ কাগজ, টাইপ, ছাপাখানার কাজ, ছাপার ইতিহাস ইত্যাদির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এমন কি Historical Bibliographyর দুটি প্রধান বিষয়ঃ চিত্রণ ও গ্রন্থন সম্পর্কেও বিশেষ নজর দেওয়া হয় না। ক্লাসিক ও পুরানো বই সম্পাদনার রীতি ও নীতি, বিভিন্ন ধরণের গ্রন্থপঞ্জী গঠনের প্রণালী, প্রামাণ্য গ্রন্থপঞ্জী সমূহের তুলনামূলক পাঠ এইসব বিষয় সম্পর্কে ক্লাসে বিশেষ কিছু উল্লেখ করা হয় না। গ্রন্থবিদ্যা পাঠ করেও আমরা কাগজের সাইজ, টাইপ, ছাপা, চিত্রণ ও গ্রন্থন সম্পর্কে বিশেষ

কিছু বলতে পারি না—এ থেকেই বুঝা যাবে আমাদের গ্রন্থবিদ্যা পাঠ কতটা অসম্পূর্ণ। গ্রন্থবিদ্যা সম্পর্কে গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির 'রিপোর্টে' যা বলা হয়েছে তা অনুধাবনযোগ্য :

"We feel that bibliography should form a separate course, and should comprise modern methods of book production, binding and care af books ; contemporary book publishing and book selling, modern processes of reproducing documents, generally, the course on bibliography should be strengthened with the explicit object of stimulating organised bibliographical activity in the country, which is the need of the hour." কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা কোর্সে গ্রন্থবিদ্যা বিষয়ে "Documentary Production"র ন্যায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে কিছুই ছাত্রদের জানানো হয় না। গ্রন্থবিদ্যাপাঠে এই সব অসম্পূর্ণতা ও অসঙ্গতি অবিলম্বে দূর হওয়া প্রয়োজন।

সাধারণ জ্ঞান—সাধারণ জ্ঞান বিষয়টি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়, যদিও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা কোর্সে এই বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ডিপ্লোমা কোর্সে সাধরণ জ্ঞান ও ভাষা—এই দুইটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটি যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তা হল "If the above subjects, which constitute the core of librarianship, are strengthened as suggested above, there will be no time left for inflating the course by introducing other subjects. Thus we do not consider it necessary or desirable to introduce teaching of a foreign language, or a course of general knwledge, as has been done in some places in the country."

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ জ্ঞান বিষয়টি যে ভাবে পড়ান হয় সে সম্পর্কে আপত্তির যথেষ্ট কারণ আছে। গত কয়েক বছরের প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করলেই বিষয়টি বোধগম্য হবে। ইয়াগো চরিত্রটি কোথায় আছে? ডিনামাইট কে আবিষ্কার করেছেন? ম্যাক্সিম গোর্কি কার ছদ্মনাম? রকেট কি? ইফেল টাওয়ার কোথায়? এই সব প্রশ্নের উত্তর মুখস্ত করে পরীক্ষার খাতায় লিখলে

হয়ত নম্বর ওঠে, ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া সহজ হয়, কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের বুদ্ধি ও প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। তা ছাড়া গ্রন্থাগারিকতার অর্থ এই নয় যে সর্বধরণের প্রশ্নের সব উত্তর গ্রন্থাগারিক জেনে বসে থাকবেন—তা সম্ভব নয়। গ্রন্থাগারিককে জানতে হবে এই ধরণের প্রশ্নের উত্তর কোথায় পাওয়া যায়। সাধারণ জ্ঞানের বিষয়টি যদি ডিপ্লোমা কোর্সে রাখতেই হয় তবে তার বিষয়বস্তু ও শিক্ষাদান পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন। এই বিষয়টিতে প্রধানতঃ বিভিন্ন বিষয়ের উপর মূল বই ও তার বিষয়বস্তু এবং বিশিষ্ট লেখকদের সম্পর্কে আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা সমীচীন। আগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সার্টিফিকেট কোর্সে সাধারণ জ্ঞান বিষয়টিকে এই ভাবে পড়ান হ'ত। দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, ললিতকলা, সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে মৌলিক অবদান এবং এই সব বিষয়ের বিশিষ্ট লেখকদের সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা—এই হওয়া উচিত সাধারণ জ্ঞান বিষয়টির পাঠ্য বস্তু। প্রস্তাবিত মাষ্টার ডিগ্রী কোর্সে সাধারণ জ্ঞান বিষয়টি না রেখে তার পরিবর্তে যে কোন একটি সাহিত্য অথবা বিষয় সম্পর্কে বিস্তৃত অধ্যয়ন ও অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টেও এই সম্পর্কে বলা হয়েছে "Advanced literature…in one of the main fields of a specific subject within the field of science and technology, social sciences, or humanities ; or literature for children, adolescents and adult students"

ভাষা—অধিক সংখ্যক ভাষা জানা নিঃসন্দেহে গ্রন্থাগারিকের পক্ষে একটি অতিরিক্ত গুণ। বিশেষ গ্রন্থাগারের কর্মীদের বিদেশী ভাষা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন। কিন্তু ডিপ্লোমা কোর্সে ভাষা শিক্ষা দানের পদ্ধতি এই গুণ অর্জন করতে বিশেষ সহায়তা করে বলে মনে হয় না। কলিকাতায় বিভিন্ন বিদেশী দূতাবাস ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ভাষা শিক্ষা দানের উচ্চতর মান সৃষ্টি করেছেন। এরপর এই ধরণের ত্রুটিপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পদ্ধতিতে ভাষা শিক্ষা দানের কি সার্থকতা থাকতে পারে? ডিপ্লোমাতে ভাষা বিষয়টি হয়ত প্রথম বিভাগে পাশ করার পক্ষে বিশেষ সহায়ক, কিন্তু সত্যিকারের ভাষা জানার পক্ষে বিশেষ সহায়ক নয়। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন—হয় আধুনিক পদ্ধতিতে বিশেষ যত্ন সহকারে ভাষা শিক্ষার বন্দোবস্ত করা হোক, নয়ত বর্তমান পদ্ধতিতে শিক্ষা দান বন্ধ রাখা হোক।

পরীক্ষা পদ্ধতি ও ছাত্রদের কার্যধারা

আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতির অন্যতম মূল দুর্বলতা হ'ল পরীক্ষা পদ্ধতির। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরীক্ষা অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। বিশেষ করে নবপ্রবর্তিত পদ্ধতিতে পরীক্ষা সম্পর্কে যথেষ্ট আপত্তি আছে। বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা কোর্সে এক বা একাধিক বিষয়ে পরীক্ষায় ফেল করে বা পরীক্ষা না দিয়েও একজন প্রার্থী ডিপ্লোমা পরীক্ষায় পাশ করতে পারেন যদি ন্যূনতম এগ্রিগেট নম্বর তাঁর থাকে। ১৯৫৮ সালের আগষ্ট মাসের পরীক্ষায় গ্রন্থাগার সংগঠন ও পরিচালনার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরীক্ষা না দিয়েও পাঁচজন প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ১৯৪৬—৫৫ এই কয় বছরে যে কজন সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশী ছাত্র-ছাত্রী প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন গত চার বছরে। সংশ্লিষ্ট তালিকাটি বিশ্লেষণ করলে বিষয়টি বোধগম্য হবে। পুরানো পদ্ধতিতে পরীক্ষার সময় একটি ছাত্রকে প্রতিটি বিষয় পাশ করতে এবং ন্যূনতম এগ্রিগেট নম্বর রাখতে হত। সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য শতকরা ৬৬% নম্বর পেতে হত। বর্তমানে প্রথম শ্রেণীর জন্য প্রয়োজন শতকরা ৬০% নম্বর। ডিপ্লোমা পরীক্ষার এই নিম্নমান গ্রন্থাগার কর্মী মাত্রেরই উৎকণ্ঠার কারণ। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির ভাষায় বলতে গেলে 'The methods of evaluation of student work tend to be as narrow, restricted and hidebound as the teaching methods. The sole reliance is on examinations. There is a general tendency to ask either specific questions in disregard of the syllabus, or from limited portion of it or ask set questions and observe poor standards in making answer books. The percentage of pass mark is also generally low, and sometimes it is necessary to pass only in the aggregate without passing in any particular subject or group of subjects. Thus it may happen that a student may obtain his diploma and be placed even in the second class, though he may have actually failed in some of the library subjects proper. We feel that in order to pass the examination every student must get a subject minimum together with a higher percentage in the aggregate" এই সুপারিশ গ্রন্থাগার কর্মী মাত্রেই সমর্থন করবেন। আর একটি কথা। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরীক্ষা একটি বৃত্তিমূলক পরীক্ষা।

এই ধরণের বৃত্তিমূলক পরীক্ষার তৃতীয় শ্রেণী রাখার কোন সার্থকতা নেই। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীই শুধু রাখা বাঞ্ছনীয়। সার্টিফিকেট কোর্সের পরীক্ষার একটি ন্যূনতম মান আছে। এই মান আরও উচ্চতর করার দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা কোর্সের শিক্ষকদের মধ্যে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষক রয়েছেন। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা কোর্স বিভাগে এত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন শিক্ষকমণ্ডলী আছেন কিনা সন্দেহ। দুটি বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার: (ক) অনেক সময় বিষয়কে অত্যধিক তত্ত্বগত করার ঝোঁক দেখা যায় ব্যবহারিক দিকে কম নজর দিয়ে এবং (২) অনেক সময় ক্লাসে 'নোট' দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এর ফলে ব্যাপক ও গভীর পাঠে আগ্রহ কমে যায়। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্টেও বলা হয়েছে ' Students in library classes, as other students in India, depend almost exclusively on lecture notes, and wide or deep reading is particularly neglected.······The committee recommends that the expert committee we have suggested earlier for the reorganisation of the syllabus should also assess the teaching methods used in the library classes and give concrete suggestions on the use of new and more effective methods to raise the quality and the character of the new diploma programme''

উপসংহার

বিভিন্ন ধরণের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এই দুটি প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণ দানের যে ঐতিহ্য সৃষ্টি করেছেন তার জন্য আমরা সকলেই এই দুটি প্রতিষ্ঠানের নিকট কৃতজ্ঞ। যে প্রতিকূলতার মধ্যে এই দুটি প্রতিষ্ঠানকে কাজ করতে হচ্ছে তা হ'ল: (১) সর্বসময়ের শিক্ষকের অভাব (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ২ জন সর্বসময়ের শিক্ষক আছেন), (২) প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব, (৩) স্থানের অভাব, (৪) গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগে উপযোগী গ্রন্থাগারের অভাব, (৫) সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা ও সংযোগের অভাব এবং সর্বোপরি (৬) মান নিরূপণের (Standardisation) অভাব। এই সব প্রতিকূলতা দূর করতে পারলে বাংলা দেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষণদান আদর্শ পর্যায়ে উন্নীত হবে।

সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমা কোর্সের পরীক্ষার ফলাফলের বিশ্লেষণ

	সার্টিফিকেট কোর্স					ডিপ্লোমা কোর্স				
	১	২	৩/৩ক	৪/৪ক	৫	১	২	৩/৩ক	৪/৪ক	৫
১৯৩৭	২০	১৮	২	৫	১১					
১৯৩৮	২৫	২২	২	২০						
১৯৩৯	৩২	২৮	৩	৭	১৮					
১৯৪০	২৫	১৫								
১৯৪১		২০								
১৯৪২	শিক্ষাদান বন্ধ ছিল									
১৯৪৩		১৬								
১৯৪৪		১৪								
১৯৪৫		৫								
১৯৪৬		১০				৮	৮		৮	
১৯৪৭		৭				১৩	১২	৪	৮	
১৯৪৮		১১				১৬	১০		১০	
১৯৪৯		১৭				২০	১৬	২	১৪	
১৯৫০		১০				১৪	৮	২	৬	
১৯৫১		১৮	৩	১৫		১৫	৪		৪	
১৯৫২		২৫	৩	২২		১৪	৭	২	৫	
১৯৫৩		৪৩				২৪	৬		৬	
১৯৫৪	৬৭	৪৭				২৫	১৫	১	১৪	
১৯৫৫	৯১	৫৯	৫	৫৪		৩০	১৩	২	১১	
১৯৫৬	৯৫	৫৮	৭	৫১		৪৮ ৩	৪৫ ৩	৫ ১	২৩	১৭ ২
১৯৫৭	১১৯	৮৪	৩	৮১		২২ ৮	২১ ৮	৬ ৩	১০ ৩	৫ ২
১৯৫৮	১৫২	৮৩	৫	৭৮		৩৬ ৭	৩৬ ৭	৫ ১	২১ ২	১০ ৪
১৯৫৯	১২০	৬২	৩	৫৯		৬২ ১৯	৫৪ ১৯	১৯ ৬	২৭ ১০	৮ ৩
১৯৬০	১৪৩	১০০	৯	৯১		৪৩	৩৯	১২	১৮	৯

(পরীক্ষার ফল এখনও বেরোয়নি)

১ : পরীক্ষার্থীর সংখ্যা

২ : উত্তীর্ণের সংখ্যা

৩ : ডিষ্টিংসন প্রাপ্তের সংখ্যা (সার্ট ১৯৩৮, ১৯৪০—১৯৬০ ;
ডিপ লিব ১৯৪৬—১৯৫৫)

৩ক : প্রথম শ্রেণী (সার্ট লিব ১৯৩৭, ১৯৩৯ ; ডিপ লিব ১৯৫৫—১৯৬০)

৪ : পাশ (সার্ট লিব ১৯৩৮, ১৯৪০—১৯৬০ ; ডিপ লিব ১৯৪৬—১৯৫৫)

৪ক : দ্বিতীয় শ্রেণী (সার্ট লিব ১৯৩৭, ১৯৩৯ ; ডিপ লিব ১৯৫৫—১৯৬০)

৫ : তৃতীয় শ্রেণী (সার্ট লিব ১৯৩৭, ১৯৩৯ ; ডিপ লিব ১৯৫৬—১৯৬০)

পূর্ব ইউরোপের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

আজকের যুগের শিক্ষাধারা পর্যালোচনা করলে গ্রন্থাগারের অপরিহার্যতা সম্বন্ধে দ্বিমতের কোন অবকাশই থাকে না। গ্রন্থাগার দেশের শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি সব কিছুকেই এগিয়ে নিয়ে যায় পূর্ণতার পথে।

বিভিন্ন দেশের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আলোচনা করে আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে গভীরতর করতে হবে। যদিও সব দেশের গ্রন্থাগার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য আজও আমাদের হস্তগত হয় নি, তবুও গত আঠার মাসের মধ্যে পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী—প্রভৃতি দেশে গ্রন্থাগারের যে সংস্কার ও অগ্রগতি হয়েছে, তা আলোচনা করলে আমাদেরও কিছু উপকার হ'তে পারে।

পোল্যাণ্ড

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পোল্যাণ্ডের 'সেণ্ট্রাল ডিরেক্টরেট অব লাইব্রেরী'। ১৯৫১ সালে তার নতুন করে সংস্কার সাধন করা হয় আর সমগ্র দেশের গ্রন্থাগারগুলির যাবতীয় দায়িত্বও এরই ওপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য ব্যতীত এই ধরণের গ্রন্থাগারের পক্ষে কোন উন্নতি সম্ভব নয়। তাই Poznan City Library এবং Warsaw school of Economic Planning Library যে উন্নতি করেছে, পোল্যাণ্ডের উন্নতি সেই অনুপাতে অনেক কম।

পোল্যাণ্ডে প্রায় ৬,৫০০ পাবলিক লাইব্রেরী আছে, এছাড়াও গ্রাম্য এলাকার উন্নয়নের জন্য আছে আরো ২২,০০০ লাইব্রেরী সেগুলি প্রায় ২৫ কোটি মানুষের উপকার সাধন করছে। আর প্রয়োজনানুযায়ী সরকারী সাহায্য পায় না বলে এই ধরণের পাঠাগার গুলিকে সাহায্য করবার জন্য কতকগুলি 'সহায়ক গ্রন্থাগার' বা 'Friends of the Libraries' গঠন করেছে। এই ধরণের গ্রন্থাগারগুলি সর্বশ্রেণীর পাঠকের জন্য উন্মুক্ত থাকে না। বড় পাঠাগার গুলিকে নানা বিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শ দানই এগুলির মূল উদ্দেশ্য।

কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতার অভাবে পোল্যাণ্ডের গ্রন্থাগার ভবনগুলির অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গত পনের বছরের মধ্যে খুব সামান্য কয়েকটি ভবনই গ্রন্থাগারের জন্য নির্মিত হয়েছে। পোল্যাণ্ডের এমন অনেক বিস্তৃত এলাকা আছে যেখানে লোক সংখ্যা লক্ষাধিক, কিন্তু তাদের জন্য

কোন গ্রন্থাগার স্থাপন আজও সম্ভব হয় নি। তবে আশার কথা এই যে গত পাঁচ বছরের মধ্যে ঐ সব গ্রাম্য এলাকায় Lending Section সমেত গ্রন্থাগার খোলা হয়েছে। শহর এলাকায় আরো বড় গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে এবং গ্রাম্য এলাকায় গ্রন্থাগারের সুবিধাদানের জন্য ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সুযোগ্য এবং দায়িত্বশীল লোকের অভাবেও অনেক সময় গ্রন্থাগারগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১৯৫৪ পর্যন্ত পাবলিক লাইব্রেরীর বই কেনার দায়িত্ব ছিল কেন্দ্রীভূত এবং তার ফলে গ্রন্থাগারিকরা বই নির্বাচন সম্বন্ধে তাঁদের দায়িত্ব এড়াতে পারতেন। কোন এলাকায় কোন্ শ্রেণীর লোকের বাস—কি ধরণের বই হতে তারা সত্যিই শিক্ষালাভ করবে, বা কোন বই তাদের উপকার করবে—এই ব্যাপারগুলির প্রতি দৃষ্টি রেখে পুস্তক তালিকা প্রস্তুত করা গ্রন্থাগারিকেরই কর্তব্য। কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা হয় না। মার্কসবাদ বা লেনিনবাদ সম্বন্ধীয় বা অল্ডাস হাক্সলীর বই পাঠাগারে রাখা হয়েছে, অথচ অনেক সময়ই তার মর্মগ্রহণ করবার মত পাঠক দেখা যায় না। পোলিশ গ্রন্থাগারগুলির আজ সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন সুশিক্ষিত গ্রন্থাগারিকের। Jarocin এ নতুন গ্রন্থাগারিক-শিক্ষা ভবন খোলা হয়েছে, তার পাঠকাল ২ বছর। ১৯৪৯ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে এখান থেকে ৬,০০০ গ্রন্থাগারিক স্নাতক উপাধি লাভ করেছেন। Gdynia Public Library প্রত্যেক মাসের যে কোন একটি বুধবারে প্রধানতঃ বিবাহিতা স্ত্রীলোকদের একটি সভার আহ্বান করে এবং পুস্তক তালিকা প্রণয়ন করে।

চেকোশ্লোভাকিয়া

১৯৫৯ সালের জুন মাসে চেক্ ন্যাশনাল এসেম্বলীতে একটি প্রস্তাব আনা হয়েছিল Library law প্রণয়ন করার জন্য, যার ফলে চেক-গ্রন্থাগার পদ্ধতিতে একতা স্থাপন করা যাবে। দীর্ঘদিনের চেষ্টার পর চেকোশ্লোভাক কম্যুনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় পরিষদের সমর্থনে এটি সম্ভবপর হয়েছে। এই নীতিটিতে বলা হয়েছে Leninist Principle. বিশ্ববিদ্যালয়, কারিগরী শিক্ষা, জনগণের পাঠাগার, ব্যবসায় সংক্রান্ত পাঠাগার—ইত্যাদি সর্বশ্রেণীর পাঠাগারে একরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই ছিল এই আইনের উদ্দেশ্য। এই আইন সমস্ত গ্রাম্য ও শহর এলাকায় বুর্জোয়া মনোবৃত্তি এবং অতিরিক্ত কম্যুনিষ্ট প্রপাগাণ্ডা—উভয়ই নিবারণ করেছে। Ministry of Culture-এর অধীনে সর্বশ্রেণীর ৬০,০০০

গ্রন্থাগারকে একত্রিত করা হয়েছে এবং দেশে সোস্যালিষ্ট এডুকেশন ও যে একটি প্রয়োজনীয় বিষয়, তা বোঝানো হয়েছে এই গ্রন্থাগারের মাধ্যমে।

বিখ্যাত চেকোশ্লোভাক পত্রিকা "Kinhovnika"-তে এই আইন সম্বন্ধীয় প্রতিটি খুঁটিনাটি এবং গ্রন্থাগারিকের দায়িত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন রচনা প্রকাশিত হ'ত। যেখানে ১৩ কোটি লোকের বাস, সেখানে চেকোশ্লোভাকিয়ায় কোটি প্রতি মাত্র ৯০০ করে পাবলিক লাইব্রেরী আছে। পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য অনেক জায়গার মতো চেক্ গ্রন্থাগারেও সর্বসাধারণের প্রবেশানুমতি ছিল না, এবং বিশেষ বিশেষ নির্বাচিত পুস্তকগুলি পাঠকদের জন্য উন্মুক্ত তাকে সজ্জিত রাখা হ'ত। প্রাগ সিটি লাইব্রেরীই সর্বপ্রথম সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার দান করে এবং প্রমাণ করে যে পুস্তক নির্বাচনের ভারও ঐ পাঠকদের উপর দিলেই উপকৃত হওয়া যায়। কিন্তু যে সকল স্থানে বুর্জোয়া মনোবৃত্তি প্রাধান্য পেয়েছে, সেই সকল স্থানে এই নীতি গ্রহণীয় হয় নি, অত্যন্ত শোচনীয় রূপে ব্যর্থ হয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় আজ যা সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন তা হচ্ছে সুদক্ষ গ্রন্থাগারিক।

বুলগেরিয়া

১৯৫৯ সালের ২৪শে ডিসেম্বর বুলগেরিয়ার Nationai Council-এ প্রথম প্রস্তাব করা হয় ঐ স্থানের গ্রন্থাগার পদ্ধতির সংস্কার ও সেগুলিকে যুগোপযোগী করে তোলা অবশ্য প্রয়োজন। বুলগেরিয়ার জনশিক্ষা দপ্তর ও ঐ স্থানের কম্যুনিষ্ট পার্টি সমবেত প্রচেষ্টায় এই বিষয়ে আবশ্যকীয় সমস্ত পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছে এবং গ্রন্থাগার গুলিকে ঐক্যবদ্ধ করেছে ৭১ জন গ্রন্থাগারিক এবং ট্রেড ইউনিয়ন ও জনশিক্ষা দপ্তরের কিছু সংখ্যক প্রতিনিধি দ্বারা গঠিত কমিটির সাহায্যে। এই গ্রন্থাগার গুলির মধ্যে গোর্কি সিটি লাইব্রেরী, সিটি জুভেনাইল লাইব্রেরী ইত্যাদি কয়েকটির কাজ অত্যন্ত সুন্দরভাবে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। ১৯৫২ সালের ইতিহাস দেখতে গেলে দেখা যায় বুলগেরিয়ার কোন পাঠাগারে তিন হাজারের অধিক সংখ্যক পুস্তক ছিল না। কিন্তু ১৯৫৯ সালেই দেখা গেল ঐ স্থানের গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রায় ৪৫৫৭ এবং পুস্তক সংখ্যা সাত কোটির উপরে। এই স্থানের গ্রন্থাগারগুলি এখন বিভিন্ন শ্রমিক ও কৃষক সংস্থায় বই যোগান দিচ্ছে; পাইওনীয়ার শিবির, শিক্ষাব্রতীদের শিবির সৈনিকদের ছাউনি, কলকারখানা, বিদ্যালয়—সর্বত্রই পুস্তক সরবরাহ করছে। শুধু পোষ্টার

লাগিয়ে যে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা বোঝানো হচ্ছে, তা নয়, বেতারের সাহায্যেও সর্বত্র এই তথ্য প্রচারিত হচ্ছে। সমাজে সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হ'লে তাকে গ্রন্থাগারের সদস্য হতেই হবে—এই বিশ্বাস আজ বুলগেরিয়ার প্রতিটি মানুষের মনে বদ্ধমূল।

বর্তমানে বুলগেরিয়ায় এগারশত বিশেষভাবে শিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক আছেন। সোফিয়ায় যে রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারিক সংস্থা আছে, তার ব্যবস্থাপনায় দুই বছরের পাঠসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে এবং পরিচালকবর্গ শীঘ্রই ঐ সময় সম্প্রসারিত করে তিন বছর করবেন বলে আশা করেন। এই সময়ের মধ্যে পাঠেচ্ছুকদের নানা বিষয়ে নিয়মিত জ্ঞান লাভ করতে হবে। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে—মার্কসবাদ, লেনিনবাদ, বস্তুতান্ত্রিকতা, রাজনীতি, অর্থনীতি, রাশিয়ান ভাষা, পুস্তক বিন্যাস পদ্ধতি প্রভৃতি। এর সঙ্গে কিছু সময় থাকবে হাতে কলমে কাজ শেখার জন্য।

হাঙ্গেরী

হাঙ্গেরীর গ্রন্থাগার সংযুক্তিকরণ সুন্দর রূপেই সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে এখানে আঠার হাজার পাবলিক লাইব্রেরী প্রায় দশ কোটি লোকের সেবা করছে। বর্তমান ত্রৈ-বার্ষিক পরিকল্পনা সভার সম্মুখে এই সম্মিলিত গ্রন্থাগার ৭০ টি সমস্যা উপস্থাপিত করেছে। ১৯৬১ হ'তে ১৯৭৫—এই পনের বৎসর ব্যাপী যে পরিকল্পনা করা হয়েছে হাঙ্গেরীর লাইব্রেরী সম্বন্ধে, তার সাহায্যে সমস্ত রকম 'বুর্জোয়া' মনোভাব দমন করা হবে। বর্তমান হাঙ্গেরীতে গ্রন্থাগার গুলিই জনশিক্ষা দপ্তরের স্থান অধিকার করেছে।

হাঙ্গেরীতে শহরে ১৭ টি এবং গ্রাম্য এলাকায় ৩৮০০ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে এবং পুস্তক সংখ্যা প্রায় সার্ধ তিনকোটি। গ্রাম্য গ্রন্থাগারগুলি স্থানীয় জাতীয় কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত হয়; যদিও ইউরোপের সর্বত্র তা হয় না। পুস্তক সরবরাহের কাজটাও কেন্দ্রীয় কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত হয়।

হাঙ্গেরী দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে তার পূর্ণতার পথে। এবং এই পূর্ণতার জন্য যা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন, তা হচ্ছে নরনারী নির্বিশেষে শিক্ষা, আর গ্রন্থাগার সেই শিক্ষার অন্যতম বাহক। তাই হাঙ্গেরীর প্রাণ-কেন্দ্র হয়ে উঠেছে তার গ্রন্থাগারগুলি।

[Library Association Records (U. K.) পত্রিকায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন শ্রীমতী বিজলী রায়]

পরিষদ কথা

গ্রন্থাগার পত্রিকার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ সাহায্য

ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের দপ্তর থেকে সম্প্রতি বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রকাশিত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার সাহায্যকল্পে দুই হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। ইদানিং আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ পরিষদের বহু কাজ বিশেষ করে প্রকাশন বিভাগের কাজ নিয়তই ব্যাহত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সাহায্য পরিষদের আর্থিক সংকট কিছুটা লাঘব করবে।

২৪ পরগণা জেলার গ্রন্থাগার কর্মীদের সভা

গত ১৮ই ডিসেম্বর বিদ্যানগর জেলা গ্রন্থাগার ভবনে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ২৪ পরগণা গ্রন্থাগার সমিতির যুক্ত উদ্যোগে আহূত এক সভায় জেলার ৪০টি গ্রন্থাগারের প্রতিনিধি ১৬ জন সমাজশিক্ষা সংগঠক এবং গ্রন্থাগার অনুরাগী বহু ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী শ্রীমন্মথ নাথ হাজরা। জেলা সমাজশিক্ষা প্রাধিকারিক শ্রীঅনাদি নাথ সিংহ সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির আদর্শ ও কার্যধারার আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সম্প্রসারণ এবং পাঠ্য উপকরণের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ ও সকলকে ঐ দিনটি সাধ্যমত পালনের ব্যবস্থা করার জন্যে আবেদন জানান। তিনি বলেন যে উন্নত মানের পঠনপাঠন ও ভারসাম্য পাঠরুচি সৃষ্টির জন্যে গ্রন্থাগার কর্মীদের সচেষ্ট হওয়া দরকার। শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আসন্ন রবীন্দ্র শতবার্ষিক উৎসব পালনের সম্ভাব্য কার্যসূচী সম্পর্কে আলোচনা করেন। উপস্থিত প্রতিনিধি ও অন্যান্যদের মধ্যে শ্রীসরোজ হাজরা, শ্রীআশীষ সেন, শ্রীবিনয় চট্টোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্র কুমার বসু প্রভৃতি বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন।

পরিষদ কার্যালয়ে বাংলা গ্রন্থ প্রকাশন সম্পর্কে কথিকা

হজুরিমল লেনের পরিষদ কার্যালয়ে প্রতি ইংরাজি মাসের দ্বিতীয় শনিবার অপরাহ্ণে গ্রন্থাগার বিষয়ক বক্তৃতা অথবা আলোচনা সভার আয়োজন হয়ে থাকে।

গত ১৪ই জানুয়ারীর অনুষ্ঠানে সাম্প্রতিক বাংলা গ্রন্থ প্রকাশন সম্পর্কে বক্তৃতা করেন শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর তথ্যবহুল ভাষণে সর্বভারতীয় গ্রন্থ প্রকাশনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা গ্রন্থের মান ও বিষয় বৈচিত্র্যের এক সুন্দর বিবরণ দান করেন। বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি ও উৎকর্ষ সাধনের জন্যে বিভিন্ন বিষয়ে বাংলায় গ্রন্থ প্রকাশ ও পাঠের জন্যে অবিলম্বে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদান, পরীক্ষাগ্রহণ প্রভৃতি উপায়গুলি অনুসৃত হওয়া প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। সর্বসাধারণের মধ্যে পাঠস্পৃহা বৃদ্ধি এবং পঠনপাঠনে উন্নতমান ও ভারসাম্য অবস্থা সৃষ্টির কাজে গ্রন্থাগার কর্মীদের সচেষ্ট হবার প্রয়োজন বিবৃত করেন।

বর্ধমান সহরে গ্রন্থাগার উন্নয়নে পৌরসভার আগ্রহ

গত ২৭শে নভেম্বর বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীতিনকড়ি দত্ত ও সম্পাদক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় বর্ধমান মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের সহিত এক সাক্ষাৎকারে সহরের গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়নে মিউনিসিপ্যালিটিকে যত্ন নেবার জন্যে আবেদন জানান। গ্রন্থাগারগুলিকে শীঘ্রই যথাসম্ভব সাহায্য-দান ও জেলা গ্রন্থাগারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবেন বলে চেয়ারম্যান তাঁদের প্রতিশ্রুতি দেন।

পরিষদের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলনোৎসব

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের এক পুনর্মিলনোৎসব গত ১৯শে ডিসেম্বর মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন শ্রী বি, এস, কেশবন এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডক্টর সুকুমার সেন। উৎসবে প্রায় সাড়ে তিন শ' ছাত্রছাত্রী যোগদান করেন। এতদ্‌উপলক্ষে গঠিত একটি প্রস্তুতি সমিতির ব্যবস্থাপনায় যথারীতি গান বাজনা, জলযোগ ছাড়াও একটি স্মরণীপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রন্থাগার দিবস সংবাদ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রচারিত কার্যসূচী অনুযায়ী ২০শে ডিসেম্বর তারিখটি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গ্রন্থাগার দিবস এবং ঐদিন হতে সপ্তাহকাল গ্রন্থাগার সপ্তাহ হিসাবে উদ্‌যাপিত হয়। এ বৎসর ঐদিনে বেরুবাড়ী দিবস উপলক্ষে হরতাল অনুষ্ঠিত হওয়ায় গ্রন্থাগার দিবসের কার্যসূচী যথেষ্ট ব্যাহত হয়। গ্রন্থাগার সপ্তাহে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সভা, প্রদর্শনী, প্রভাতফেরী ইত্যাদি যে-সব অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া গেছে তা সংক্ষেপে প্রকাশ করা হোল :

মহাজাতি সদনে কেন্দ্রীয় সভা

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে মহাজাতি সদনে অপরাহ্ণে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন বিধান সভার অধ্যক্ষ শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কর। পরিষদ সম্পাদক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য প্রসঙ্গে বাংলা দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের উৎপত্তি ক্রমবিকাশ ও তার বর্তমান সামাজিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার যে আদর্শ গ্রন্থাগার আইনের খসড়া প্রণয়ন করছেন তা প্রচারিত হওয়ার পূর্বে মতামত গ্রহণের জন্যে বিভিন্ন রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদগুলির নিকট প্রেরিত হওয়া উচিত।

সভাপতি শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র কর বলেন যে গ্রন্থাগার আইনের আশু প্রয়োজন আছে ; কেন্দ্রীয় সরকার যে খসড়াই প্রস্তুত করুন না কেন, রাজ্য বিধান সভার সে খসড়া সুবিধা অনুযায়ী অদলবদলের সুযোগ অবশ্যই থাকবে। গ্রন্থাগার আন্দোলনকে জনপ্রিয় করে তোলার কাজে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নিরবচ্ছিন্ন উদ্যমকে তিনি প্রশংসা করেন। অন্যত্র জরুরী কাজ থাকায় শ্রী কর পশ্চিমবঙ্গের প্রধান সমাজশিক্ষা গ্রন্থাগারিক শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়কে সভাকার্য পরিচালনের ভার ন্যস্ত করে সভা ত্যাগ করেন।

শ্রীনিখিল রঞ্জন রায় পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সম্প্রসারণে ও পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাধীনে কর্মতৎপরতার সঙ্গে অন্যান্য রাজ্যের কর্মতৎপরতার এক তুলনমূলক পর্যালোচনা করে বলেন যে পশ্চিম

বঙ্গে গ্রন্থাগার উন্নয়নের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। গ্রন্থাগার আইনের গুরুত্ব উপলব্ধি করে তিনি সরকারী ও বেসরকারী প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট সকলের এবিষয়ে চিন্তার আদান প্রদান ও আলোচনার জন্যে অনতিবিলম্বে কয়েকটি বৈঠক আয়োজনের সুপারিশ করেন।

শ্রীরায়ের ভাষণের পূর্বে পরিষদের বিগত গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের সমাপ্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞান পত্র বিতরণ করেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কন্ট্রোলার শ্রীঅরুণ রায়।

রাজ্যব্যাপী সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় সরকারী প্রচেষ্টাকে অভিনন্দন জানিয়ে রাজ্য সরকারের নিকট সারা রাজ্যে আপামর জনসাধারণের জন্যে বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্তনের অনুরোধ জানিয়ে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

২১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পরিষদের উদ্যোগে মহাজাতি সদনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রন্থাগার কর্মীদের এক সভা হয়। পৌরোহিত্য করেন ডক্টর গৌরীনাথ শাস্ত্রী। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তা আলোচনা করেন।

অন্যান্য অনুষ্ঠানের খবর

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও বিভিন্ন গ্রন্থাগার কর্তৃক গ্রন্থাগার দিবস ও সপ্তাহ পরিষদ প্রেরিত কার্যসূচী অনুযায়ী সভা, প্রদর্শনী, প্রভাত ফেরী অর্থ সংগ্রহের মধ্যে দিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। দুঃখের বিষয় অধিকাংশ অনুষ্ঠানেরই কোনও বিবরণ পাওয়া যায় নি। যে অনুষ্ঠানগুলির বিস্তারিত সংবাদ পাওয়া গেছে সেগুলি সংক্ষেপে প্রকাশ করা হোল:

বরাহনগর পিপ্‌লস লাইব্রেরী

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ২০শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় লাইব্রেরীর উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীঅসিতবরণ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। পাঠাগার সম্পাদক শ্রীবীরেশ্বর মৈত্র প্রারম্ভিক ভাষণে গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। প্রধান বক্তা শ্রীতিনকড়ি ঘোষ সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

বেলগড়িয়া সুধা স্মৃতি পল্লী পাঠাগার

২৫শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে পাঠাগার ভবনে একটি সভা হয়। পৌরহিত্য করেন শ্রীঅজিত কুমার লাহিড়ী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন, শ্রীপ্রবোধানন্দ দাশ। 'আলোকেরই ঝর্ণা ধারায় ধুইয়ে দাও'—এই সংগীতটি প্রারম্ভে গীত হয়। শ্রীঅমল কুমার ঘোষ গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য প্রসঙ্গে সর্বজনকে গ্রন্থাগার-মনা করে তোলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। সর্বশ্রী সুনীল কুমার বিশ্বাস, গোরাচাঁদ গঙ্গোপাধ্যায় মহম্মদ আবুল কাশেম প্রভৃতি তাঁদের ভাষণে পাঠস্পৃহা ও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশের গুরুত্ব বিবৃত করেন। শ্রীসুবলচন্দ্র মণ্ডল প্রধান অতিথি ও সভাপতি তাঁদের ভাষণে গ্রন্থাগারের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন।

ঐদিন সকালে পাঠাগারের কর্মীরা পোষ্টার নিয়ে বিভিন্ন ধ্বনি করে একটি মনোরম শোভাযাত্রায় গ্রাম পরিক্রমা করেন।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার

২০শে ডিসেম্বর অপরাহ্নে গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পাঠাগার ভবনে শেখ মহম্মদ আয়ুব আলির পরিচালনায় এক বিচিত্রানুষ্ঠান ও পরে শ্রীমতী অনিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভানেত্রীত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়, শ্রীমতী রেখা দত্ত প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীশিবসাধন চট্টোপাধ্যায় গ্রন্থাগার দিবসের তাৎপর্য ও বাংলা দেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করেন। শ্রীবাসুদেব চট্টোপাধ্যায় রাজ্য সরকার গ্রন্থাগার সংক্রান্ত কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভায় সরকারকে রাজ্যব্যাপী নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনের অনুরোধ জানিয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মহেশপুর রামকৃষ্ণ পাঠাগার

প্রতি বৎসরের মত এই বৎসরও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নির্দেশানুসারে বাঁকুড়া জিলার ইন্দাস থানার অন্তর্গত মহেশপুর গ্রামের রামকৃষ্ণ পাঠাগারে ২০শে ডিসেম্বর তারিখে "গ্রন্থাগার দিবস" বিপুল উৎসাহের সহিত প্রতিপালিত হয়। সন্ধ্যায় স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পাঠাগারের সাহায্যদাতা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ রক্ষিত মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক সভার আয়োজন করা হয়। সমাজ

জীবনে পাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে স্থানীয় শ্রীপাঁচু গোপাল রক্ষিত মহাশয় বক্তৃতা করেন। সর্বশ্রী রবিলোচন গুপ্ত, রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গে অবিলম্বে "গ্রন্থাগার আইন" বিধিবদ্ধ করার দাবী জানিয়ে সভায় একটী প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পুরুলিয়া রবীন্দ্র পরিষদ

রবীন্দ্র পরিষদের উদ্যোগে ২১শে ডিসেম্বর স্থানীয় জগদীশ মেমোরিয়াল হলে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন জেলা সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক শ্রীকামিনীকুমার নাথ। প্রধান বক্তা ছিলেন জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীঅজয়কুমার রায়। তিনি 'পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভাপতি ছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের সম্পাদক শ্রীঅশোক চৌধুরী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

কল্যানবগ্রাম আশুতোষ গ্রন্থাগার

২০শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে অপরাহ্ণে গ্রন্থাগার প্রাঙ্গনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ গ্রন্থাগার থেকে কি উপকার পেতে পারে তা ব্যাখ্যা করেন শ্রীবিজয়কুমার ভট্টাচার্য। শ্রীবাসুদেব চক্রবর্তী আশুতোষ গ্রন্থাগারের ইতিবৃত্ত ও কর্মতৎপরতার বিবরণ দান করেন। শ্রীশ্যামসুন্দর ভট্টাচার্য বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিবৃত্ত আলোচনা প্রসঙ্গে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উল্লেখ করেন। সভাপতি মহাশয় তাঁর ভাষণে আপামর মানুষের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের প্রয়োজনে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসার কামনা করেন।

এতদ্উপলক্ষে গ্রন্থাগার ভবনে এক গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। ঐদিন রাত্রে বড়শুল বিজ্ঞান মন্দিরের কর্তৃপক্ষ শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন।

সুভাষ স্মৃতি পাঠাগার। হৈঁড়্যা। মেদিনীপুর।

২২শে ডিসেম্বর প্রদর্শনী, পুস্তক ও অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি কর্মসূচীর মাধ্যমে এখানে গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। অপরাহ্ণে বিশিষ্ট গান্ধীবাদী নেতা শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কাঁথি মহকুমা কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীবসন্তকুমার দাস ও শ্রীঅতুলচন্দ্র মিশ্র প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। উপস্থিত অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বশ্রী ঈশ্বরচন্দ্র প্রামাণিক, কার্তিকচন্দ্র মান্না, ভোলানাথ দেবনাথ প্রভৃতি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

এড়গোদায় গ্রন্থাগার সপ্তাহ পালন

এড়গোদা (মেদিনীপুর) আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের উদ্যোগে এ বৎসর সপ্তাহ ব্যাপী (২০শে ডিসেম্বর হইতে ২৬শে ডিসেম্বর) গ্রন্থাগার দিবস পালনের আয়োজন করা হয়, এই উপলক্ষ্যে এড়গোদায় ২টী এবং আস্তাপাড়া, রাজপাড়া, তেঁতুলিয়া, পড়িহাটী ও গুইআড়া গ্রামে একটি করিয়া জনসভার আয়োজন করা হয়। প্রত্যেকটি সভায় গ্রামের বহু লোক যোগদান করেন। প্রত্যেক গ্রাম হইতেই সক্রিয় সহযোগিতা পাওয়া যায়। নিত্যানন্দ বিদ্যায়তনের বিভিন্ন কর্মিগণ অনুষ্ঠানগুলিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

২০শে ডিসেম্বর এড়গোদা আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ভবনে শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মাহাতো মহাশয়ের সভাপতিত্বে গ্রন্থাগার সপ্তাহের উদ্বোধন অনুষ্ঠান হয়। শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ মহাশয়ের গ্রন্থাগার সম্পর্কে তথ্যপূর্ণ ভাষণ সকলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করে।

২১শে ডিসেম্বর আস্তাপাড়ায় (শাখা গ্রন্থাগার) শ্রীপ্রমথনাথ মাহাতো মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়, শ্রীমনিলাল চক্রবর্তী, শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ, শ্রীমৃগাঙ্কভূষণ ভট্টাচার্য আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

২২শে ডিসেম্বর রাজপাড়ায় (শাখা গ্রন্থাগার) শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মাহাতো মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রন্থাগার সম্বন্ধে আলোচনায় শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ, শ্রীমনিলাল চক্রবর্তী, শ্রীসুশীলকুমার আচার্য অংশ গ্রহণ করেন।

২৩শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় নিত্যানন্দ বিদ্যায়তন ভবনে সেবায়তন স্নাতকোত্তর শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি দে মহাশয়ের সভাপতিত্বে

এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। বিদ্যায়তনের রেক্টর মহাশয় এখানকার আঞ্চলিক গ্রন্থাগার সম্পর্কে তাঁহার পরিকল্পনা ও ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী সম্পর্কে আলোচনা করেন। সন্নিকটবর্তী বহু গ্রাম হইতে সেদিন সভায় বহুলোক সমাগম হইয়াছিল। সভাপতি তাঁহার মনোজ্ঞ ভাষণে গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেন। এই সভায় শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ, শ্রীকমলেশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমণিলাল চক্রবর্তী আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। বিদ্যায়তনের ছাত্রী শ্রীমতী মানকোমণি ঝুমু সাঁওতালী ভাষায় স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ করে।

২৪শে ডিসেম্বর তেঁতুলিয়ায় (শাখা গ্রন্থাগার) শ্রীউমেশচন্দ্র গিরি মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন শ্রীমণিলাল চক্রবর্তী শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ।

২৫শে ডিসেম্বর পড়িহাটা সাধারণ পাঠাগারে শ্রীকালিপদ শতপতী মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় শ্রীকমলেশ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমণিলাল চক্রবর্তী, শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থ, নিত্যানন্দ বিদ্যায়তনের রেক্টর শ্রীঅনিল মোহন গুপ্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

২৬শে ডিসেম্বর গুইআড়া গ্রামে (শাখা গ্রন্থাগার) শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় শ্রীমণিলাল চক্রবর্তী, শ্রীপঞ্চানন, রায় কাব্যতীর্থ, শ্রীরাধানারায়ণ পুরকায়স্থ, সর্বশেষ নিত্যানন্দ বিদ্যায়তনের রেক্টর শ্রীঅনিল মোহন গুপ্ত আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

ভাণ্ডুড় আনন্দময়ী সাধারণ পাঠাগার ॥ হাওড়া

গ্রন্থাগার সপ্তাহ উপলক্ষে ২৪শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পাঠাগারে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীগোকুলচন্দ্র শীল। গ্রন্থাগার দিবস ও গ্রন্থাগার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন। পাঠাগারের অসমাপ্ত গৃহ সম্পূর্ণ করার জন্যে সভায় অর্থ সাহায্যের আবেদন জানালে অনেকেই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবে সরকারকে বিনা চাঁদায় গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ শ্রেণী নির্বিশেষে সকলকে দেবার জন্যে অনুরোধ জানান হয়। সভায় বহু জন সমাগম হয়েছিল।

উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী

২৪শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার সপ্তাহ উপলক্ষে গ্রন্থাগার ভবনে এক সভা হয়। রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের প্রধান পরিদর্শক শ্রীতামস রঞ্জন রায় সভাপতিত্ব করেন। সর্বশ্রী বীরেন্দ্রনাথ খাঁ, ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীনিবাস চট্টোপাধ্যায়, তারক বন্দ্যোপাধ্যায়. প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত কয়েকটি বাংলা প্রাচীন গ্রন্থ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর কিছু ইংরাজী পুস্তক এবং রবীন্দ্রনাথের কয়েকখানি বইয়ের প্রথম সংস্করণ প্রভৃতি গ্রন্থের এক প্রদর্শনী এতদ্‌উপলক্ষে আয়োজিত হয়েছিল।

কুলতেঘরী সাধারণ পাঠাগার॥ তারকেশ্বর

গত ২৫শে ডিসেম্বর কুলতেঘরী সাধারণ পাঠাগার কর্তৃক গ্রন্থাগার দিবস উদ্‌যাপিত হয়। জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য প্রাচীর পত্র লইয়া এক প্রভাত ফেরী গ্রাম পরিভ্রমণ করিয়া পাঠাগার প্রাঙ্গণে সভাস্থলে আসিয়া মিলিত হয়। পাঠাগারের সভাপতি শ্রীদিবাকর দত্তের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। শ্রীসনৎ কুমার মুখোপাধ্যায় পাঠাগারের আশু প্রয়োজনীয় একটি আলমারী নির্মাণের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন করিলে সভায় উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের পক্ষ হইতে ৫০৲ টাকা চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া যায়। অতঃপর সভাপতি মহাশয় কর্তৃক আনীত এক প্রস্তাবে এতদঞ্চলে অনুন্নত শ্রেণীর মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য মাসিক ১২ নয়া পয়সা চাঁদায় যাহাতে পাঠাগার হইতে পুস্তক দেওয়া যায় তজ্জন্য আবেদন করা হয়। গ্রন্থাগার আইন অবিলম্বে বিধিবদ্ধ করার জন্যে সভায় অপর এক প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

শ্রীরামপুর পাবলিক লাইব্রেরী

২২শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে লাইব্রেরী ভবনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীরাখালচন্দ্র চক্রবর্তীবিশ্বাস। সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ—

"এই সভা মনে করিতেছে যে, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে সার্বজনীন সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার স্থাপনা এবং তাহার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য অনতিবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উপযোগী একটি গ্রন্থাগার আইন প্রণয়ন একান্ত প্রয়োজন।

এই সভা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট দাবী করিতেছে যে এই গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করা হউক।"

বেনেপুকুর লাইব্রেরী এণ্ড রিডিং ক্লাব। কলিকাতা

লাইব্রেরীর উদ্যোগে ২৪শে ডিসেম্বর এক জনসভায় পৌরোহিত্য করেন শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বৈদ্যশাস্ত্রী। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন সাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। কর্মসূচীতে ছোটদের অনুষ্ঠানে দুই শতাধিক শিশু ও কিশোর যোগদান করে। তাদের সংগীত, আবৃত্তি প্রভৃতি সকলের প্রশংসায় অভিনন্দিত হয়। স্বরচিত একটি গল্প পাঠ করে শ্রীযোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত সংক্ষেপে গ্রন্থাগারের সামাজিক ভূমিকা বিবৃত করেন। আদর্শ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার রূপ বিশ্লেষণ করে শ্রীঅরুণকান্তি দাশগুপ্ত গ্রন্থাগার আইনের আশু প্রবর্তনের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। শ্রীসুশীলকুমার দে লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে ধন্যবাদ দান প্রসঙ্গে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। এতদ্ উপলক্ষে হস্তলিখিত পত্রিকা ও প্রাচীর পত্র সমন্বিত এক সুন্দর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়।

গোপীনাথ লাইব্রেরী। উল্টাডাঙ্গা। কলিকাতা

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ২৫শে ডিসেম্বর প্রাতে ৮ ঘটিকায় নানারূপ পোষ্টার সহ সুন্দর একটি মিছিল এলাকার (উল্টাডাঙ্গা) সমস্ত রাস্তা পরিক্রমা করে। গ্রন্থাগারের সম্পাদক শ্রীমতিলাল পাল "পথ সভায়" গ্রন্থাগার সপ্তাহের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। গ্রন্থাগার সপ্তাহ উপলক্ষে দশ নয়া পয়সার কুপনে কর্মীরা অর্থ সংগ্রহ করেন। সন্ধ্যা সাড়ে ছয় ঘটিকায় গ্রন্থাগার কক্ষে একটি আলোচনা সভা হয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সম্পাদক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গাববেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগার। ২৪ পরগণা

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গাববেড়িয়া গ্রামে বিপুল উদ্দীপনার সহিত দুইদিন ব্যাপী এক কার্যসূচীর মাধ্যমে গ্রন্থাগার সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়।

২০শে ডিসেম্বর প্রত্যুষে গ্রন্থাগারের কর্মীরা প্রাচীরপত্র সহ মিছিল করে পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি পরিক্রমা করেন। ঐদিন অপরাহ্নে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২২শে

ডিসেম্বর শ্রীদীনেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। শ্রীজ্যোতির্ময় মণ্ডল সমাজ জীবনে গ্রন্থাগারের প্রয়োজন সম্পর্কে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। সভায় বহু জনসমাগম হয়েছিল।

ময়েজ ওন লাইব্রেরী। কনকশালী। হুগলী

গত ২৫শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে পাঠাগার কক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়। সভাপতি তাঁহার ভাষণে গ্রন্থাগার আইন সম্পর্কে বিশেষ জোর দেন। অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে নিজ এলাকায় অর্থ সংগ্রহের অভিযান চালান হয় এবং বিশেষ সাড়া পাওয়া যায়। এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে সভাপতি শ্রীবিভূতি ভূষণ স্মৃতিতীর্থ নিজের সমস্ত কর্মসূচী বাতিল করিয়া এই অভিযানে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। নিজ এলাকায় এবং শহরের বিভিন্ন অংশে পোষ্টারের সাহায্যে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করার চেষ্টা হয়। অত্যন্ত সাধারণ পরিবেশের মধ্যেও ঐদিন পাঠাগার সংলগ্ন কক্ষে একটী শিশু বিভাগের উদ্বোধন করা হয়।

বাণী নিকেতন লাইব্রেরী। খলিয়া। হাওড়া

গ্রন্থাগার দিবস উপলক্ষে ২৫শে ডিসেম্বর প্রত্যুষে পাঠাগারের কর্মীরা প্রাচীরপত্র সহ এক প্রভাত ফেরী বাহির করেন। অপরাহ্নে শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক শ্রীরতিকান্ত চক্রবর্তী গ্রন্থাগার দিবস পালনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে সর্বজনের উপযোগী বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। শ্রীবলাইচাঁদ চক্রবর্তী ও শ্রীউত্থানপদ কোলে পাঠাগারের উন্নতি কল্পে গ্রামবাসীদের সর্বাধিক সাহায্য ও সহযোগিতার জন্যে আবেদন করেন।

জেলা গ্রন্থাগার। তমলুক

তমলুক জেলা গ্রন্থাগারে ২০শে ডিসেম্বর হতে সপ্তাহব্যাপী এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে গ্রন্থাগার সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়। এতদ্‌ উপলক্ষে আয়োজিত পুস্তক, পত্রপত্রিকা ও চিত্র প্রদর্শনীতে প্রতিদিন বহু জনসমাগম হোত।

জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্যের উপস্থিতিতে নারায়ণ দীঘি সাধারণ পাঠাগার, শ্রীকৃষ্ণপুর তুষারস্মৃতি গ্রন্থ নিকেতন ও চৈতন্যপুর শহীদ পাঠাগারে সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীভট্টাচার্য দেশবিদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের পর্যালোচনা করেন এবং এদেশে সরকারী উদ্যমের বিবরণ দান করে তার প্রতি সর্বসাধারণের দায়িত্বের উল্লেখ করেন। সর্বসাধারণকে গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারমুখী করে তোলার জন্যে জেলা গ্রন্থাগার কর্তৃক বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি পাঠ-শিবিরের আয়োজন গ্রামবাসীদের বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

রামনারায়ণ পাঠাগার। রোহিণী। মেদিনীপুর

পাঠাগারের কর্মীরা ২০শে ডিসেম্বর থেকে সপ্তাহকালব্যাপী বিভিন্ন অঞ্চলে নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সর্বসাধারণকে গ্রন্থাগার সম্পর্কে সচেতন করার জন্যে এক অভিনব কার্যসূচী প্রতিপালন করেন। চার্ট, পোষ্টার প্রভৃতির সাহায্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় স্থানীয় জ্ঞাতব্য বিষয় প্রচার করেন। গ্রন্থাগারিক শ্রীঅমর ষড়ংগী স্থানীয় হাটে ও অন্যান্য জন সমাবেশে বক্তৃতা করেন। শ্রীসৌরীন ষড়ংগী ও শ্রীধীরেন গিরি অনুষ্ঠান সূচীকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে সহায়তা করেন।

বার্তা বিচিত্রা

সূচীলেখ প্রণয়নে ভারতীয় নাম সম্পর্কে সর্বভারতীয় সম্মেলন

আন্তর্জাতিক সূচীলেখ কার্যে ভারতীয় গ্রন্থকারের নাম লিপিবদ্ধ করার নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার সংস্থা ও তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র (IASLIC) গত ৩০শে ডিসেম্বর হতে তিনদিনব্যাপী এক সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আয়োজন করেন। উদ্বোধন করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ডঃ ত্রিগুণা সেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সুবোধ মিত্র। প্রারম্ভিক অধিবেশনে শ্রীবি. এস. কেশবন ও বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক ডঃ সি. পি. শুক্লা ভাষণ দান করেন। ডঃ শুক্লা সম্মেলন কার্য পরিচালন করেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হতে প্রায় দুইশত প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন।

আলোচনার সুবিধার্থে প্রতিনিধিগণ ভাষার ভিত্তিতে চারটি দলে বিভক্ত হয়ে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করেন। সমাপ্তি অধিবেশনে বিভিন্ন দলের সুপারিশের ভিত্তিতে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টরের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দিন সন্ধ্যায় প্রতিনিধিদের চা-পানে আপ্যায়িত করা হয়।

আগামী বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও ইস্টারের ছুটিতে (৩১শে মার্চ, ১লা মে) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। সদস্যদের নিকট হতে প্রাপ্ত সম্মেলন সম্পর্কে মতামত ও পরামর্শ পরিষদের কার্য নির্বাহক সমিতি সাদরে বিবেচনা করবেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা দপ্তর জানিয়েছেন যে আসন্ন সম্মেলনে ডিষ্ট্রিক্ট লাইব্রেরী ও রুরাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকগণকে সরকার যোগদানের অনুমতি দিয়েছেন এবং স্বীয় contingency fund থেকে তাঁরা যাতায়াত ও অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করতে পারবেন।

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ প্রসঙ্গে

রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পৃষ্ঠপটের পরিবর্তন ও শিক্ষার ক্রমোন্নয়নের ফলে ইদানীং এদেশে গ্রন্থাগারের সামাজিক চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেজন্য পেশা হিসাবে গ্রন্থাগারিকতাও কিছুটা সামাজিক স্বীকৃতি ও মর্যাদা অর্জন করেছে। জ্ঞানরাজ্যের গোলক ধাঁধায় মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দেবার দায়িত্ব হচ্ছে গ্রন্থাগারিকের। তাঁকে তাই জানতে হয় তাবৎ কলাকৌশল। হাতুড়ে ডাক্তার দিয়ে যেমন ডিসপেনসারী চলে না, তেমনি আনাড়ী লোক দিয়ে গ্রন্থাগার চালানোও যায় না। একথার উপলব্ধি গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের গোড়া পত্তন করেছে।

গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণের আদি ও ইতিহাস এবং বর্তমানে এদেশে শিক্ষণ ব্যবস্থার বিস্তারিত আলোচনা করেছেন পত্রিকার এই সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধকার। প্রবন্ধটি একদিকে গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ ব্যবস্থার ভালমন্দ প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত, অন্যদিকে গ্রন্থাগারিক বৃত্তি তথা ক্রমবর্দ্ধমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ভবিষ্যতের সঙ্গেও সম্বন্ধযুক্ত।

গ্রন্থাগারিকতা শিক্ষণ গ্রহণের জন্যে আজকাল যে হিড়িক লাগার অবস্থা ঘটেছে তার কারণ অনেকাংশে দেশের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক দুর্বিপাক। জীবিকার সব রাস্তাই যখন জনাকীর্ণ তখন বিভ্রান্ত মানুষ কিছুটা প্রশস্ত পথের সন্ধান করে। আপাতদৃষ্টিতে গ্রন্থাগারিক বৃত্তির পথটা প্রশস্ত মনে হয়। কিন্তু যে হারে শিক্ষণ দান করা হচ্ছে সে হারে শিক্ষণপ্রাপ্তের চাহিদা নেই। এমতাবস্থায় পশ্চিম বঙ্গ সরকারের স্বতন্ত্র একটি স্থায়ী শিক্ষণ ব্যবস্থার আসন্ন উদ্যোগ অনেকেরই মনে উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। এর স্বপক্ষে যুক্তি হিসাবে সরকারী মুখপাত্ররা বলেন যে তৃতীয় যোজনাকালে রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পিত সম্প্রসারণের ফলে যে কুশলী কর্মিদলের প্রয়োজন ঘটবে তারই জন্যে এই নতুন শিক্ষণ ব্যবস্থার উদ্যোগ।

নীতির দিক থেকে সরকারী উদ্যমের ঔচিত্যের প্রসঙ্গ না তুলে প্রবন্ধটিতে কয়েকটি সংগত প্রশ্ন করা হয়েছে। প্রথমতঃ এতাবৎকাল যে দুটি প্রতিষ্ঠান

কুশলী কর্মী যুগিয়ে এসেছে তারা অর্থাৎ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষণপ্রাপ্ত লোক সৃষ্টি করতে কি অক্ষম হয়েছে ? দ্বিতীয়তঃ এই প্রচেষ্টার ফলে অর্থ, শ্রম ও উদ্যমের দ্বিত্ব ও অপচয় কি একটি সামাজিক ক্ষতি নয় ? তৃতীয়তঃ সরকার কি কোনও সমীক্ষা করে দেখেছেন যে শিক্ষণপ্রাপ্ত কতজন ব্যক্তির গ্রন্থাগারিক বৃত্তিতে কর্ম-সংস্থান হয়নি ?

কুশলী ব্যক্তির সংখ্যা চাহিদাকে অতিক্রম করলে বর্তমান অবস্থা অনুযায়ী টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাবে তাদের মূল্য হ্রাস পাওয়াই স্বাভাবিক। কর্মী ও কর্ম-সংস্থানের মধ্যে ভারসাম্য না থাকলে যে অবাঞ্ছিত অবস্থার উদ্ভব হবে সেটা বৃত্তির দিক থেকে ক্ষতিতো বটেই, সমাজের পক্ষেও সেটা অশুভই হবে।

শিক্ষণ সম্পর্কিত দ্বিতীয় ও প্রধান যে বিষয়টি বিস্তারিত ভাবে উল্লিখিত প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে তা মূলতঃ বিশ্ববিদ্যালয় ও কিছুটা পরিষদের শিক্ষণ ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত।

যে সামাজিক পটভূমিতে তেইশ বছর আগে বাংলা দেশে গ্রন্থাগারিক বৃত্তি শিক্ষণ ব্যবস্থার গোড়াপত্তন ঘটেছিল তা অনেকাংশেই এখন বদলে গেছে। কিন্তু শিক্ষণের ধাঁচ ও ধারা মূলতঃ একই রয়ে গেছে।

আমাদের শিক্ষণ ব্যবস্থা মূলতঃ গ্রন্থাশ্রয়ী এবং তার ব্যবহারিক দিকটা নগণ্য বলে প্রয়োগের সময় তা অসম্পূর্ণ ও অকেজো প্রতিপন্ন হয়। এদেশের সমস্যা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্ক তার ক্ষীণ। পাঠ্যক্রমে আশু প্রয়োজনীয় বিষয় অন্তর্ভুক্ত না হয়ে অনাবশ্যক বিষয়বস্তুর গুরুত্ব হয়ে থাকে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রকৃতপক্ষে একটি প্রায়োগিক বিদ্যা। হাতে কলমে কাজ শেখার যথোপযোগী ব্যবস্থা না থাকায় আমাদের শিক্ষণ পরিপূর্ণতা লাভ করে না। অধীত বিদ্যার অনুশীলন শুধু কার্ড লেখা আর ডিউই'র বই দেখতে শেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তত্ত্বমূলক পাঠের সঙ্গে হাতে কলমে কাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকা একান্ত দরকার। রেফারেন্স বই দেখতে শেখা থেকে আরম্ভ করে রবার ষ্ট্যাম্প ও লেবেল মারা প্রভৃতি খুঁটিনাটি কাজ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা জন্মিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন উপেক্ষণীয় নয়। বৃহৎ লাইব্রেরীর সমস্যা ও প্রয়োজনের পৃষ্ঠপটে বিষয় পরিবেষণ ও উদাহরণ দর্শানো হয়। ফলে নতুন শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন একটি ছোট গ্রন্থাগারে নিযুক্ত হলে হালে পানি পান না, খুঁজে পান না অধীত বিদ্যার সঙ্গে কাজের সঙ্গতি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা বিসদৃশ ব্যাপার হোল তার পরীক্ষার নিয়ম কানুন। মুখ্য বিষয়ে অবতীর্ণ না হয়েও বা 'পাশ মার্ক' না পেয়েও গৌণ বিষয়ে অধিক মার্কের জোরে ভালভাবে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। অন্যান্য বৃত্তিতে যেখানে লোকের চাহিদা আছে সেখানে পরীক্ষায় শৈথিল্য নেই অথচ আলোচ্য এই বৃত্তিতে লোকের চাহিদা কম হওয়া সত্ত্বেও পরীক্ষার শৈথিল্যের ফলে শিক্ষণ-প্রাপ্তের সংখ্যা বৃদ্ধিত পাচ্ছেই উপরন্তু গুণগত মান তাদের নেমে যাচ্ছে! এই বিষাক্ত আবর্তে পড়ে আজ গ্রন্থাগারিক বৃত্তি এক সংকটজনক পরিস্থিতির অভিমুখে চলেছে।

তা' ছাড়া গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের উচ্চতম পর্যায়ের শিক্ষা প্রবর্তনের নৈতিক দায়িত্বও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবহেলা ক'রছেন। এতে গ্রন্থাগারিকদের সামাজিক সম্মান লাভের পথে আশানুরূপ অগ্রগতি হচ্ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ যে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে ডিপ্লোমা শিক্ষণ ব্যবস্থার যথোচিত সংস্কার কার্যে তাঁরা অনতিবিলম্বে যত্নবান্ হোন।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

মাঘ ১৩৬৭

গ্রন্থাগার বিধান

সোহন সিং

শিক্ষা মন্ত্রণালয়, নয়াদিল্লী

সাধারণ লোকের কৃষ্টিগত প্রগতির ক্ষেত্রে গত শতকের যে দুটি সামাজিক ক্রমোন্নয়ন সবচেয়ে বেশী কার্যকর হয়েছে তা' হ'ল সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং সাধারণ গ্রন্থাগার। একটি অপরটির সহায়ক। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যতীত সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের পূর্ণ সদ্ব্যবহার হয় না, আবার সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি বাদ দিলে প্রাথমিক শিক্ষার মহীরুহ অংকুরেই বাধাপ্রাপ্ত হয়।

যে-সব দেশ আধুনিক যুগের জগৎ সভায় যথাযোগ্য আসন অর্জনে যত্নবান, তাঁরা সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মূল্য উপলব্ধি করছেন বটে, কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির ভূমিকা সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ সচেতন নন।

এই অবস্থায়, গ্রন্থাগার উন্নয়নকামী সংস্থাগুলির প্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত—দেশের বিধানে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত আইন-কানুন যাতে বিধিবদ্ধ হয়, তার চেষ্টা করা। ফলে, দ্বিবিধ উপকার হবে। প্রথমত; সাধারণ লোকের কৃষ্টিগত মানোন্নয়ন প্রচেষ্টার একটি অংগীকার থাকবে। দ্বিতীয়ত; ইতিহাসগত পেছিয়ে পড়া দেশগুলি নিজেদের ফাঁক ভরাটের চেষ্টায় সমাজ সেবামূলক

---

* দক্ষিণ এশিয়ার গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পে নয়া দিল্লীতে ১৯৬০ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কো আঞ্চলিক সম্মেলনের আলোচনা ভিত্তি প্রবন্ধ। অনুবাদ করেছেন শ্রীগোলোকেন্দু ঘোষ।

কাজগুলিকে দুর্বল রেখে অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার জন্য সমস্ত সম্পদ নিয়োজিত করার একটা ঝোঁক দেখায় ; সেই ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বিধান সরকার ও জনসাধারণকে এই ক্ষীণ দৃষ্টির হাত থেকে পরিত্রাণ দেবে।

গ্রন্থাগার বিধানের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল ঃ

(ক) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলি সম্পর্কে সরকারী দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা।

(খ) গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের গঠনতন্ত্র ও কর্তব্য লিপিবদ্ধ থাকবে। গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ বলতে বুঝাবে—যে মন্ডলী গ্রন্থাগারের নীতি নির্ধারণ করবে এবং যে মণ্ডলী সেই নীতি পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

(গ) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির জন্য যে সমস্ত সংস্থান থাকবে, তার ভিতর গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের যথাযথ অধিকার থাকবে— এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জরুরী বিষয় হল অর্থ।

(ঘ) সাধারণ গ্রন্থাগার প্রণালী (public library system) কি হবে তা রূপরেখায় লিখিত থাকবে, কিন্তু তা হবে সুস্পষ্ট।

(ঙ) সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির পরিচালনার ব্যাপারে সাধারণের প্রতিনিধিত্বের অবকাশ এতে থাকবে।

অবশ্যই গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বিধিসমূহের মধ্যে আরও অনেক বিষয় বিধিবদ্ধ থাকবে, কিন্তু সেসবই উল্লিখিত পাঁচটি উদ্দেশ্যের পরিপূরক হবে। উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে বিশেষ করে (খ) গ্রন্থাগার কর্তৃত্ব এবং (গ) গ্রন্থাগারের অর্থসংস্থান—এই দুটি বিষয় গ্রন্থাগার সম্পর্কিত বিধিসমূহের মূল অংশ হবে। এই দুটির সুনিশ্চয়তার উপর গ্রন্থাগার বিধানের সাফল্য নির্ভর করবে।

গ্রন্থাগার বিধানের পাঁচটি উদ্দেশ্যের প্রত্যেকটি সম্পর্কে আমরা এখন সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব।

(ক) গ্রন্থাগার এবং সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে সরকারের কি কি দায়িত্ব থাকবে তা নিম্নলিখিত বিবেচনার পরে লিপিবদ্ধ হবে ঃ

(৵০) আধুনিক সরকারের তহবিলে দাবীদারদের সংখ্যা এত বেশী এবং চাপও এত বেশী সৃষ্টি করা হয়, বিশেষ করে যে সরকার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে নিযুক্ত তার ক্ষেত্রে, যে সরকার হয়ত গ্রন্থাগার বিধানের ন্যূনতম দাবী মেটাতে প্রলুব্ধ হবে এবং যে আদর্শ থেকে বিধানের উদ্ভব সরকার সে আদর্শ ভুলে

যাবে। সরকার যাতে ছায়াকে কায়া বিভ্রম থেকে পরিত্রাণ পায় সেইজন্যে গ্রন্থাগার বিধানে সরকারি দায়িত্বগুলি স্পষ্টতঃ লিপিবন্ধ থাকবে।

(৵০) আজকের জগতে সরকারের গ্রন্থাগার সম্পর্কিত দায়িত্ব শুধু সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেই চুকে যায় না। এমন অনেক সরকার আছে যারা সাধারণের জন্য গ্রন্থাগারের দায়িত্ব মানে না ; কিন্তু তবুও তারা তাদের নিজস্ব বিভাগীয় গ্রন্থাগার বা অধীনস্থ বৈজ্ঞানিক বা অন্য সংস্থানগুলির জন্যে গ্রন্থাগারের ব্যবস্থা করে। প্রশ্ন ওঠে যে, একটিমাত্র গ্রন্থাগার বিধানের মধ্যেই সমস্ত প্রকার গ্রন্থাগার পরিচালনায় সরকারী দায়িত্বের কথা লিপিবন্ধ থাকবে, নাকি গ্রন্থাগার বিধি শুধু সাধারণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেই সীমাবন্ধ থাকবে। চেকোশ্লো-ভেকিয়ায় গ্রন্থাগার বিধান এই বিষয়ে সর্বাত্মক। সম্ভবত, নয়া-গণতন্ত্র দেশগুলিতে এই ধরণের গ্রন্থাগার বিধিই প্রচলিত। অবশ্য এ রকম সর্বাত্মক বিধির পক্ষে বলার মত অনেক কিছু আছে। এই দুই প্রকারের গ্রন্থাগার বিধির বিশদ আলোচনার মধ্যে না গিয়েও বলা যায়, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির পক্ষে সীমাবন্ধ গ্রন্থাগার বিধিই সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত হবে। সীমাবন্ধ গ্রন্থাগার বিধি বলতে শুধুমাত্র সাধারণ গ্রন্থাগারের পক্ষে যা প্রযোজ্য তাই বুঝতে হবে।

আমরা ধরে নিচ্ছি যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তাবে, স্থানীয় সংস্থার উপর নয়। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যে প্রথা প্রচলিত আছে, এই প্রথা অবশ্য তার বিরোধী। প্রথমত, ইদানীংকার গ্রন্থাগার পরিকল্পনা ক্রমে ক্রমে বৃহত্তর অঞ্চলকে এক একটি এককরূপে গণ্য করার পক্ষপাতী। অবশ্যই স্থানীয় গ্রন্থাগারগুলি যে এতে স্বয়ংসম্পূর্ণতা হারাবে তা নয়। পাশ্চাত্যে অনেক স্থানীয় গ্রন্থাগার সংস্থার গৌরবান্বিত ঐতিহ্য আছে। সেখানে ক্ষুদ্রতর এককগুলির সহযোগিতার ফলে বৃহত্তর এককের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু যে-সব দেশে এই প্রথমবার গ্রন্থাগারের সাংগঠনিক উন্নতি হচ্ছে, সে-সব দেশে বৃহত্তর একক দিয়ে শুরু করা ভাল। এমন কি পাশ্চাত্যেও এখন স্থানীয় গ্রন্থাগার সংস্থাগুলিও আর্থিক সাহায্যের জন্য রাষ্ট্রীয় সরকারের দিকে সোৎসাহে চেয়ে থাকতে শিখেছে।

(১০) আধুনিককালের সমাজ-বিন্যাসে গ্রন্থাগার-গত বৃত্তির বেশ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এবং এই বৃত্তির একটি কাঠামো দাঁড় করানর জন্য একটি বিচক্ষণ নীতি অনুসরণ করা দরকার। ক্ষমতাসম্পন্ন প্রার্থীদের উপযুক্ত সম্ভাবনা দিতে হবে ; বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী প্রার্থীদের এই জীবিকায় সন্তুষ্টি সাধন করতে হবে।

(খ) গ্রন্থাগার কর্তৃত্বের ধাঁচ কি হবে, তার বিচারে তিনটি প্রশ্ন বিবেচনা করা চাই। কি ধরণের সংগঠন হবে? গ্রন্থাগারগুলি কি একটি পৃথক সরকারী বিভাগে সন্নিবিষ্ট হবে, অথবা সরকারের বর্তমান কোন একটি বিভাগে সংশ্লিষ্ট হবে, হলে, কোন বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হবে? গ্রন্থাগার কর্তৃত্বের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার গঠনতন্ত্র কি হবে এবং কাজই বা কি হবে?

সরকারের কোন একটি বর্তমান বিভাগের অধীনে সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত কাজকর্মের দায়িত্ব জুড়ে দেওয়া হবে সবচেয়ে সরল ধাঁচ। কিন্তু সাধারণ গ্রন্থাগারগুলির স্বাতন্ত্রের একটা ঐতিহ্য আছে; অন্তত বাহ্যতঃ তাই মনে হয় এবং এই ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরও প্রয়োজন আছে। সুতরাং গ্রন্থাগার সম্পর্কিত সরকারী বিভাগের নামকরণ শুরু করা যাক—গ্রন্থাগার অধিকার (Directorate); এই অধিকারের পক্ষে যথাযথ হবে গ্রন্থাগার পরিষদ এর (Council) সমর্থন লাভ করা। এই পরিষদে গ্রন্থাগার পরিচালকেরা এবং গ্রন্থাগার-সুযোগ গ্রহণকারী বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠকের প্রতিনিধিরা তাদের সমন্বিত চিন্তার দ্বারা কার্যকরী পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, গ্রন্থাগার পরিষদ শুধু পরামর্শদাতা সংস্থা হবে না তাদের হাতে কার্যকরী ক্ষমতাও দেওয়া হবে। বড় কঠিন সমস্যা। যদি পরিষদে সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কিত প্রত্যেক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব থাকে, তাহলে পরিষদ আকারে বেশ বড় হবে এবং বড় আকারের কোন সংস্থা কার্যকরী ক্ষমতার উপযুক্ত নয় বলাই ভাল। আবার অন্যদিকে কার্যকরী ক্ষমতা বাদ দিয়ে যদি পরিষদকে কেবল পরামর্শদাতা সংস্থায় পরিণত করি, তাহলে বাম হাতে দিয়ে ডান হাত দিয়ে কেড়ে নেবার সামিল হয়।

সরকারী শাসনতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রন্থাগার পরিষদ শুধু পরামর্শই দেবে, গ্রন্থাগার নিয়ন্ত্রণে (Administration) তার নাক গলান ঠিক নয়। কিন্তু যাঁরা গ্রন্থাগারগুলিতে কাজ করেছেন, তাঁরা প্রায়ই সখেদে লক্ষ্য করে থাকবেন যে, জরুরীত্বের যূপকাষ্ঠে গ্রন্থাগারের স্বার্থ বলি দেওয়া হচ্ছে, তখন তাঁদের পক্ষে সরকারী বিভাগ বা অধিকার (Directorate) বাদ দিয়ে আর কারুর হাতে গ্রন্থাগার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আসুক—এ দাবী করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

পরিষদ এর মধ্য থেকেই একটি ছোট আকারের অথচ ঘন-সন্নিবিষ্ট (compact) সংস্থা গঠনের দ্বারা এর সমাধান হতে পারে বলে মনে হয়, এই সংস্থাই হবে পরিষদের কার্যকরী বাহু। গ্রন্থাগার কর্তৃত্বের যে ধাঁচটি

প্রস্তাব করতে চাই তাতে থাকছে তিনটি অংগ—পরামর্শদাতা গ্রন্থাগার পরিষদ, তা থেকে উদ্ভূত কার্যকরী সংস্থা যে তৃতীয় অংগ গ্রন্থাগার অধিকারের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করবে।

অধিকার এবং সরকারের মধ্যে আদর্শ যোগসূত্র স্থাপন হতে পারে যদি সরকারের একটি পৃথক গ্রন্থাগার বিভাগ থাকে। যাহোক সাধারণত কোন একটি বিভাগের সংগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিক্ষা বিভাগের সংগে গ্রন্থাগারের অধিকার গ্রথিত থাকে। যুক্তি ও যথাসাধ্য সিদ্ধান্তের উপর যদি প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তাহলে সংস্কৃতি বিভাগেই গ্রন্থাগার অধিকার-এর স্বাভাবিকভাবে স্থান দেওয়া উচিত বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কিত কিছু কাজকর্মের সংগে।

পরামর্শদাতা গ্রন্থাগার পরিষদের শীর্ষে যথাযথরূপেই থাকবেন মন্ত্রী মহাশয়, যাঁর বিভাগে অধিকারের স্থান। পরিষদে প্রতিনিধি থাকবেন বিভিন্ন বিভাগ থেকে যাঁরা সাধারণ গ্রন্থাগারে উৎসাহী যেমন সমাজ উন্নয়ন (community development) বিভাগ, গ্রন্থাগার নিয়ন্ত্রণে (administration) সংশ্লিষ্ট উচ্চ কর্মকারীবৃন্দ, বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ, গ্রন্থাগার এককের নিচের ধাপ আইন-সভাগুলি এবং অবশ্যই গ্রন্থাগার সেবায় উৎসর্গীকৃত প্রখ্যাত কতিপয় ব্যক্তি। আমার বর্তমান নিবন্ধের তত্ত্ব অনুযায়ী কার্যকরী পর্ষদ (Board) থেকেই গ্রন্থাগার নীতিগুলি চূড়ান্তভাবে উদ্ভূত হবে এবং অধিকার পর্ষদের সম্পাদকরূপে কাজ করবে এবং একজন কয়েক বছরের অভিজ্ঞ বৃত্তিধারী গ্রন্থাগারিক এর মাথায় থাকবেন; তাঁর হাতে যথোপযুক্ত কর্মক্ষমতা দেওয়া থাকবে।

(গ) গ্রন্থাগারের আর্থিক সংগতির কথাটা আমরা গ্রন্থাগার কর্তৃত্বের সংগে যুক্তভাবে বলেছি যে গ্রন্থাগার বিধির মূল অংশ হবে। গ্রন্থাগারের আর্থিক নিশ্চয়তা ও স্থায়ী ও দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করতে হবে—অনিশ্চিত বাৎসরিক তহবিলের জন্য সংগ্রামের উপর নির্ভর করলে চলবে না। দুভাবে আর্থিক সংগতির ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা যেতে পারে (/০) বিশেষ গ্রন্থাগার কর; (৵০) শিক্ষা বাজেটের একটি অংশ সংরক্ষণ (গ্রন্থাগারগুলি শিক্ষা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ধরে নিয়ে)। প্রথমোক্তটি যুগ ও প্রচলন অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য এবং আমাদের মতে দুটির মধ্যে ভাল অবশ্য যদি এর সংগে সাধারণ রাজস্ব থেকে আরও টাকা বরাদ্দ করা হয়। এই বরাদ্দর দরকার আছে কারণ অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে বিশেষ গ্রন্থাগার কর থেকে প্রাপ্ত

টাকাটা প্রায়ই অপর্যাপ্ত হয় ; অবশ্য গ্রন্থাগার পরিচালনায় সর্বন্যূন প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে এটি খুব চমৎকার ব্যবস্থা। দ্বিতীয় পদ্ধতির দ্বারা সমস্যার সমাধান এক ধাপেই করা যেতে পারে।

(ঘ) গ্রন্থাগারের কাঠামো বিভিন্ন দেশে স্বভাবতই বিভিন্ন রকমের হবে। কিন্তু এমন কতকগুলি নীতি আছে যেগুলি গ্রন্থাগার জগতের চোখে বিশেষ সম্মানার্হ। সংক্ষেপে সেগুলি এখানে বিবৃত করছি ঃ

(৵০) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো অনুযায়ী গ্রন্থাগারের কাঠামো হবে। বিশেষ করে যে সব দেশ গ্রন্থাগারের উন্নয়নকে দেশের উন্নয়নের অংশ হিসাবে দেখে, সেই সব দেশে উন্নয়নের জন্য শাসনতান্ত্রিক কাঠামো যেভাবে হবে গ্রন্থাগার প্রণালীও (system) সেইভাবে হবে।

(৶০) গ্রামাঞ্চলগুলিতে গ্রন্থাগার-সুবিধা সহর থেকে দেওয়া হবে এবং সহর-গ্রাম সমন্বিত এককের উপর গ্রন্থাগার-পরিচালনা গড়ে তুলতে হবে।

(৷০) বড় বড় গ্রন্থাগারগুলিতে বিশেষ বিষয় সমূহের জন্য ব্যবস্থা থাকবে এবং অন্যান্য দেশের ন্যাশনাল লাইব্রেরীর সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকবে।

(।০) সম্ভবমত জাতীয় গ্রন্থাগারগুলি (সাধারণ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি) পারস্পরিক সহযোগিতায় আবদ্ধ থাকবে।

(ঙ) সমাজ-নীতির একটা বলিষ্ঠ সূত্র হল এই যে যাঁরা সেবা পাচ্ছেন, তাঁদেরও বক্তব্য শুনতে হবে। অবশ্য এই নীতি প্রয়োগে ক্ষেত্র বিশেষে অসুবিধা হতে পারে বিশেষ করে যে ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারটি সাধারণের পক্ষে খুবই প্রযুক্তি-গত (technical)। এ থেকে মনে হয় যে বহু পরিচিত গ্রন্থাগার কমিটিতে থেকে সাধারণ লোকের গ্রন্থাগারের সঙ্গে যোগসূত্র গড়ে তোলা উচিত ; গ্রন্থাগার কমিটিতে পঠন-পাঠনে উন্নতি বিষয়ে আগ্রহশীল এমন সকল উৎসাহী ব্যক্তিই থাকছেন। বলা বাহুল্য, গ্রন্থাগার কাঠামোর প্রতি ধাপে নিজস্ব গ্রন্থাগার কমিটি থাকবে। ভারতে পঞ্চায়েৎ, ব্লক, জেলা, রাষ্ট্র ও কেন্দ্রে নিজ নিজ গ্রন্থাগার কমিটি থাকবে।

গ্রন্থাগার কমিটির কাজ কি হবে, তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাও থাকা দরকার যাতে একদিকে যাদের স্বার্থ কমিটি রক্ষা করছে, তাদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারে, অন্যদিকে গ্রন্থাগারিকের আত্মমর্যাদায় ও তাঁর বৃত্তিগত দক্ষতায় কোন বাধার সৃষ্টি না করে।

ভারতের জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীর জন্য সূচী নির্মাণ

বিনয় সেনগুপ্ত

সহ গ্রন্থাগারিক, জাতীয় গ্রন্থাগার, কলিকাতা

সূচনা ঃ

আজকের পৃথিবীতে জাতি, উপজাতি, সম্প্রদায় এবং রাজনৈতিক বা ভাষাগত কোন সংস্থাই বিচ্ছিন্নভাবে বাঁচতে পারে না। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাষ্ট্রিক বা ভাষাভিত্তিক সবরকমের প্রতিষ্ঠানই কৃষ্টি বিনিময় এবং সভ্য জীবনের সর্বতোমুখী প্রগতির জন্যে পরস্পরের ওপর নির্ভর করতে বাধ্য। আর একথা সর্ববিদিত যে পৃথিবীতে সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রতিদিনের ক্রম-প্রসার এবং প্রকৃতিবিজ্ঞান, প্রযুক্তি বিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান, সাহিত্য, কলা ইত্যাদি মানুষের জানবার সকল ক্ষেত্রেই দ্রুত অগ্রগতি সম্বন্ধে তথ্য-প্রচারের মাধ্যম হল—বই, সাময়িকী, মানচিত্র, রৈখিক তথ্য-তালিকা ইত্যাদি নানান লিপি সম্ভার। যে দেশেই প্রথম প্রচারিত হোক না কেন, কারুকৃৎ এবং বিজ্ঞান কর্মীরা তাঁদের বৈশেষিক অধ্যয়নের সংগে জড়িত সব রকমের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, তত্ত্ব-আলোচনার সংগেই সংশ্লিষ্ট থাকে। গ্রন্থাগারের কাজ হল এই সব লিপি-সম্ভারের সংগঠন ও পরিবেশন এবং এই অর্থে গ্রন্থাগারকে তথ্য-প্রচারের অন্যতম বাহন বলা যেতে পারে। এই তথ্য-প্রচার—যাকে অতি আধুনিক শব্দ বৈচিত্র্যে Information Retrieval বা 'তথ্য সমুদ্ধার' বলা হয়—তা নিয়ে একটি সাধারণ আদর্শ-রীতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এই তথ্য সমুদ্ধারের কর্মপরিধি জাতি, রাষ্ট্র বা ভাষার গন্ডীর মধ্যে সীমিত থাকা সংগত নয়। পৃথিবীর পরিচিত ভাষাগুলিতে প্রকাশিত প্রত্যেকটি বই এবং লৈখিক সম্ভারের স্থান নির্ণয় এবং ঐ সব ভাষায় কি কি প্রকাশন রয়েছে তার সন্ধানের উদ্দেশ্যে নানা সংসাধনী (tools) উদ্ভাবন করা হয়েছে। বড় বড় জাতীয় গ্রন্থাগারগুলির গ্রন্থতালিকা ও গ্রন্থপঞ্জী এইসব সংসাধনীর অন্যতম। এই সংসাধনীগুলিকে

Journal of the Indian Library Association পত্রিকার গত সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তী।

ব্যাপক ও কার্যকরী করে তুলতে হলে এগুলির একটি সুসংহত প্রকার থাকা চাই এবং আন্তর্জাতিক বা সর্বজন স্বীকৃত গ্রন্থালেখ্য-সূচকের ওপর এর ভিত্তি থাকা একান্ত প্রয়োজন। তথ্য সমুদ্ধার ও কৃষ্টিবিনিময়ের স্বার্থে গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এই রকম একটি গ্রন্থ-সূচকের ওপর নির্ভরশীল। আন্তর্জাতিক বা সার্বজনীন গ্রন্থালেখ্য-সূচক নিয়ে গত পাঁচ দশক ধরে আলোচনা চলছে এবং সম্প্রতি কতকগুলি মীমাংসিতসূত্রে তা বাস্তবরূপ নিচ্ছে। বিভিন্ন জাতীয় সংস্থার সাধারণ সমর্থনের সাহায্যে এ ধরণের একটি গ্রন্থসূচক নির্ণয়ের ব্যাপারে বিশেষজ্ঞেরা মাথা ঘামাচ্ছেন। যেখানে আন্তর্জাতিক ঐক্যমতে পেঁছন সম্ভব এমন কতকগুলি ক্ষেত্রও নির্দিষ্ট হয়েছে। এ সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক গ্রন্থালেখ্যসূচক নিয়ে যে কোন কার্যকরী অনুশীলনেই সর্বাগ্রে বিভিন্ন জাতীয় সংস্থার মধ্যে সরাসরি আলোচনার প্রয়োজন এবং বিভিন্ন ধরণের জাতীয় গ্রন্থসূচককে ভিত্তি করে সেটা গড়ে তোলা দরকার। এখানে যে পূর্ব স্বীকৃতিটি রয়ে গেল তা হচ্ছে, যেসব দেশে এই ধরণের কোন জাতীয় সূচকের অস্তিত্ব নেই, সেখানে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যেসব পরস্পরবিরোধী রীতি চালু রয়েছে সেগুলির মধ্যে সংহতি আনতে হবে।

দুঃখের বিষয় যে পরস্পরবিরোধী নিয়মগুলিকে একটি সাধারণ আদর্শে পুনর্গঠন এবং এ নিয়ে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে ভারতবর্ষে কোন সুলিখিত এবং ব্যাপক গ্রন্থসূচক নেই। জাতীয় গ্রন্থ-সূচকের অন্যতম আদর্শ হওয়া উচিত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক এই দুই স্তরে সংগতিসাধন। জাতীয় পর্যায়ে সংগতির মূল ধারণা হল বিভিন্ন আঞ্চলিক রীতির সংহতি এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এর অর্থ হল বিভিন্ন দেশে প্রচলিত বিধিগুলির সমন্বয়।

জাতীয় পর্যায়ে সংগতির কথা বলতে গিয়ে ভারতবর্ষকে নানান ধরণের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগোষ্ঠী—যাদের প্রত্যেকেরই বিশিষ্ট রীতি-প্রথা-ঐতিহ্য রয়েছে —এদের নিয়ে গড়ে ওঠা একটি সংমিশ্র জাতি হিসেবে কল্পনা করতে হবে। এখানে পরস্পর বিরোধী রীতিনীতি ও তথ্য প্রচারের মাধ্যমগুলিকে প্রমিত (standardise) করতে গিয়ে প্রতিটি গোষ্ঠীসত্তাকে তার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা, সাহিত্যকৃতি প্রভৃতি দিক থেকে স্বতন্ত্রভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং তারপর পরস্পর বিরোধী রীতিগুলিকে সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একটি সর্বভারতীয় ছাঁদে ঢেলে সাজাকে হবে।

স্বাধীনতার আগে অবশ্য ভারতে গ্রন্থাগারগুলি—শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের,

সরকারী বিভাগের এবং এমন কি সভ্যদের চাঁদার ওপর নির্ভরশীল তথাকথিত জন গ্রন্থাগারগুলির অধিকাংশেই ইংরাজী এবং অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় লেখা বই থাকত। ভারতীয় প্রকাশনের যা মুষ্টিমেয় সংগ্রহ ছিল তাতে অধ্যয়নের অত্যন্ত সীমিত ক্ষেত্রেরই পরিপুষ্টি হত।

এই কারণে গ্রন্থাগারের সংগ্রহগুলিকে হয় ইংগ-ভাষাভাষী দেশগুলিতে প্রচলিত নয় ব্রিটিশ মিউজিয়ম বা লাইব্রেরী অব কংগ্রেসে অনুসৃত রীতিতে বিন্যস্ত করা হত। এমনকি ইউরোপীয় বা দেশীয় ভাষায় রচিত ভারতীয় প্রকাশনগুলির বিন্যাসের ক্ষেত্রেও ভারতীয় বিদ্বৎ সমাজ ও পাঠক সম্প্রদায়ের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি না রেখেই পাশ্চাত্যের পাঠকের সুবিধার জন্যে রচিত বিদেশী সূচকের অন্ধ অনুসরণ করা হত।

উত্তর-স্বাধীনতা পর্বে অবশ্য অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটেছে। প্রত্যেক রাজ্যেই গ্রন্থাগার আন্দোলন এমন একটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে চলেছে যার ফলে সারা দেশে সাধারণ এবং রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের জাল-বুনে তোলা সহজ হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া অধ্যয়নের নানা ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাষাগুলিতে যে ক্রমবর্দ্ধমান মুদ্রণ চলেছে তাকে আয়ত্ত করার ভার তো গ্রন্থাগারগুলির ওপরেই বর্তাচ্ছে। হিন্দী বাংলা, মারাঠী ইত্যাদি ভাষা এবং প্রকাশন স্থল নির্বিশেষেই বিজ্ঞানকর্মী এবং প্রয়োগবিৎগণ তাঁদের অনুশীলনের বিষয়বস্তুর ওপর যাবতীয় লেখ-সম্ভার সম্পর্কে তথ্য জানতে চান। শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কোন রাজ্যই নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলে মনে করতে পারেনা। বস্তুতঃ সাহিত্য এবং শিল্পকলার ব্যাপারে পারস্পরিক প্রভাবের কোন একটি অংশ বা অঞ্চলের সংস্কৃতি বিকাশের ব্যাখ্যা করতে হলে অন্যান্য অঞ্চলেরও কৃষ্টিপ্রসারের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ ধারণা থাকা দরকার। ভারতের অভিজ্ঞাত ভাষাগুলির বিরাট লেখ-সম্ভার কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ একমাত্র সুসংবদ্ধ কেন্দ্রীয় গ্রন্থালেখ্য বা গ্রন্থপঞ্জীর দ্বারাই সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে একটি সঠিক গ্রন্থালেখ্য সূচকের প্রয়োজন এবং এর দ্বারা পুস্তক পরিগ্রহণের মধ্যেও খানিকটা সংগতি রক্ষা করা যাবে। অবশ্য প্রত্যেক ভাষা-অঞ্চলের জন্য আঞ্চলিক গ্রন্থসূচক বিবর্তিত করা যেতে পারে। কিন্তু এ ধরণের আঞ্চলিক সূচকসৃষ্টির প্রধান লক্ষ্য হবে বিরোধী মতগুলির সমন্বয় সাধন। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে স্থানীয় পার্থক্যগুলি রাখার অবকাশ যেন থাকে। তাহলেও অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি সুসংগত কার্যপ্রণালী তৈরী করে নেওয়া প্রয়োজন।

গ্রন্থ-সূচকের লক্ষ্য এবং গঠন-নীতি :

প্রস্তাবিত জাতীয় সূচকটি প্রথমতঃ এমন একটি সংগতিপূর্ণ বিধানসমষ্টি হবে যা প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষা এবং ইউরোপীয় ভাষায় রচিত গ্রন্থসম্ভারে সমৃদ্ধ গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে গ্রন্থালেখ্য প্রণয়নে কাজে লাগবে। এই সূচককে ভিত্তি করেই বিশেষ বিশেষ আখ্যা (title) এবং লেখকনামা নির্ণয়ের জন্য গ্রন্থতালিকা এবং গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়ন করা চলবে। আর এর সাহায্যেই কোন বিশেষ গ্রন্থাগারের সংগ্রহ-নির্বিশেষেই ভারতীয় সকল রকমের পুস্তক ও লেখসম্ভারের তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হবে। কেন্দ্রীয় গ্রন্থালেখ্য ও গ্রন্থপঞ্জীর মাধ্যমে গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে পুস্তকের আদান-প্রদানেরও ভিত্তি হবে এই সূচক। কাজেই জাতীয় গ্রন্থসূচক প্রভৃতির সহায়ক হবে। কারণ সাধারণ মাননির্ধারণ ছাড়া কেন্দ্রীয় গ্রন্থপঞ্জী বা গ্রন্থালেখ্য—যেখানে আঞ্চলিক গ্রন্থপঞ্জী থেকে সরাসরি অন্তর্ভুক্তির সুযোগ রয়েছে—সেখানে যোগ্যতা বা সংযমের সম্ভাবনা থাকেনা। প্রামাণ্য পরিগ্রহণ তালিকাগুলির কেন্দ্রীয় গ্রন্থতালিকায় অন্তর্ভুক্তির সময় অযথা পুনরাবৃত্তি অবশ্যই পরিহার করতে হবে। কার্যক্রমের মূলনীতিগুলি এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যাতে করে গ্রন্থতালিকার থাকা এবং গঠন-এর কার্যক্রমে সংগতি বর্ধনের উপযোগী হয়।

গ্রন্থসূচকের ব্যক্তিগত ও ভৌগলিক আখ্যায় বিবেচ্য গ্রন্থালেখ্য :

জাতীয় গ্রন্থ-সূচক উদ্ভাবনে আমাদের প্রথমেই এমন একটি গ্রন্থালেখ্যের কথা বিবেচনা করতে হবে যার জন্যে সুসংগত এবং গ্রথিত কতকগুলি বিধি নির্ণয় করা যেতে পারে যেগুলির সাহায্যে ভারতীয় ভাষাগুলির সব রকম প্রকাশনকেই তালিকাভুক্ত করা যায়।

যদি গ্রন্থতালিকার প্রাথমিক গঠনপর্যায়ে শ্রেণীবিন্যাস করা হয় এমন একটি বর্গীকরণ অনুসারে যাতে কেবলমাত্র আঙ্কিক সংকেতই ব্যবহৃত হয় তাহলে ভাষা এবং অক্ষরের জটিলতা অংশতঃ পরিহার করা যেতে পারে। কিন্তু বর্গীকৃত গ্রন্থালেখ্য হলেই চলবেনা। এই বর্গীকৃত গ্রন্থালেখ্যের অপর একটি বর্ণানুক্রমিক নির্ঘন্ট প্রস্তুত করতে হবে। সুতরাং শ্রেণীবিন্যস্ত গ্রন্থ তালিকা থেকে বর্ণানুক্রমকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া যায়না। আর যখনই আমরা কোন সুসংহত ও বর্গীকৃত গ্রন্থালেখ্য বা গ্রন্থপঞ্জীর নির্ঘন্ট প্রস্তুত করতে বসি ভাষা ও অক্ষরের জটিলতা তখনই মাথা তুলে দাঁড়ায়। গ্রন্থকার গ্রন্থালেখ্য বা আভিধানিক

গ্রন্থালেখ্যের গঠনের সংগে বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস বিশিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। সংমিশ্র আভিধানিক (ভারতে প্রকাশিত ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষায় রচিত) গ্রন্থতালিকার জন্য জাতীয় গ্রন্থসূচক প্রস্তুত করতে হলে নানা কৌশল ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে আমাদের অবশ্যই ভাষাগত পার্থক্যগুলিকে অতিক্রম করতে হবে। বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থকার ও পুস্তক নামায় আমরা রোম্যান বা দেবনাগরী ধরণের কোন একটি সাধারণ হরফ ব্যবহার করতে পারি এবং সমস্ত শিরোনামার গ্রন্থকার, আখ্যা ইত্যাদি সেই অনুযায়ী বর্ণসমীকরণ করতে পারি। যেসব সংমিশ্র তালিকার ইংরাজী নাম ও আখ্যা অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে সে সব ক্ষেত্রে রোম্যান হরফ ব্যবহার করা অনেক বেশী কার্যোপযোগী। কিন্তু যেখানে গ্রন্থতালিকার সংলেখন অভিজ্ঞাত দেশীয় ভাষাগুলির সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত শব্দের ওপর নির্ভরশীল—যেমন বর্ণানুক্রমিক বিষয়বিন্যাসগত বা আভিধানিক তালিকা—সেখানে কোন মীমাংসায় পৌঁছন এবং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে প্রযোজ্য কোন জাতীয় সূচক উদ্ভাবন সম্ভব নয়। সুতরাং জাতীয় গ্রন্থালেখ্য সূচক প্রণয়ন করতে গিয়ে আমরা কেবলমাত্র বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থকার ও পুস্তক-নামার বিষয়ই বিবেচনা করব এবং ঐগুলির অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত আদর্শ-রীতি নির্ধারণ করব।

ব্যক্তিগত এবং ভৌগোলিক অভিধা:

একথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থতালিকায় শিরোনামাগুলি যদি ব্যক্তিগত এবং ভৌগোলিক অভিধা নিয়ে গঠিত হয় তাহলে সেগুলোকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আদর্শ ছাঁচে ফেলা চলে। কোন বিশেষ বর্ণ (বা অক্ষর) নিরপেক্ষ না হলেও অনেক নামই সংশ্লিষ্ট ভাষা থেকে স্বতন্ত্র হতে পারে। এই সব অভিধা যা ভাষা, উপভাষা এবং বৈদেশিক অভিযোজনগত নানা রূপ নিতে পারে—সেগুলির বিচারপ্রসংগে কতকগুলি আলোচনাসূত্র এবং মূলনীতির ব্যাপারে ঐকমত্যে আসা যেতে পারে। সুসংহত গ্রন্থতালিকায় ভাষা ও উপভাষার প্রকারভেদে গ্রন্থকারের মূল নাম নিয়ে যে সমস্ত সমস্যা দেখা যায়, বর্ণসমীকরণের সাহায্যে তার সহজেই সমাধান হতে পারে। দেশীয় ভাষায় পরিগৃহীত নামটির যে প্রকার তার বৈদেশিক শব্দানুকার অথবা পাশ্চাত্য-ভাষান্তর বা ইংরেজীকরণের ক্ষেত্রে কিছুটা মীমাংসায় আসা যেতে পারে যদি

শব্দগুলির উক্ত অভিযোজন, রূপান্তরকরণ এবং ইংরেজীকরণে ধ্বনিসাম্য সত্ত্বেও বানানগত পার্থক্য থাকে।

এসব ক্ষেত্রে গ্রন্থ-সূচকের দিক থেকে বানানের আদর্শপ্রকার নিরূপণের স্বপক্ষে যথেষ্ট সমর্থন থাকবে। ভারতীয় ও ইউরোপীয় ভাষায় সর্ববিধ প্রকাশনের সংমিশ্র গ্রন্থতালিকায় একটি সুনির্দিষ্ট এবং সুসংগত নীতি অবলম্বন করা যেতে পারে। সেটা হল, স্থানীয় বা মূল নামরূপকেই বৈদেশিক শব্দানুকার বা ইংরেজীকরণের থেকে অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার। তবে যদি রোম্যান বা অপর কোন সাধারণ হরফ ব্যবহার করা যায় তা হলে স্থানীয় বা আদি নামের (দেশীয় ভাষায় নামের প্রকার) বর্ণসমীকরণ অবশ্য প্রয়োজন।

ব্যক্তিগত নামের ক্ষেত্রে একটি সাধারণ সূত্র নিরূপণ সম্পর্কে ওপরে যা বলা হল তা ছাড়াও আঞ্চলিক প্রয়োগহেতু বৈভিন্ন্য ও নামান্তর্গত শব্দগুলির পর্যায়ক্রম নিয়েও আমাদের বিবেচনা করতে হবে। তবে এ সমস্যার কোন সঠিক সমাধানে পেঁছিন বড় কঠিন। প্রত্যেক ভাষা অঞ্চল ও সংস্কৃতি-গোষ্ঠীতে যে সব নামের উদ্ভব সেগুলির প্রয়োগ প্রণালী সম্পর্কে একটি সর্বভারতীয়-ভিত্তিক মীমাংসায় আসার চেষ্টা করা যেতে পারে। বিভিন্ন অঞ্চলে নামের প্রাথমিক শব্দাংশগুলি, বিশেষ করে উপাধিগুলির একটি বিস্তৃত তালিকা রচনার চেষ্টা সূচক প্রণেতারা করতে পারেন। মাতৃভাষায় লিখনভঙ্গি, বৈদেশিক অনুকৃতি এবং রূপান্তরের জন্য তুলনামূলক তালিকা প্রণয়ন করতে হবে।

ব্যক্তিনামের সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলতে থাকাকালীন বিভিন্ন ভাষা-অঞ্চলে নামের ধরণ-ধারণ সমীক্ষার পর একটি সাধারণ নীতি নির্ধারণ করে জাতীয় গ্রন্থ সূচকের কাজ সুরু হতে পারে। এটা লক্ষ্য করলে কৌতুহল জাগে যে ভারতের অধিকাংশ ভাষা অঞ্চলেই সরল বা যৌগিক কতকগুলি শব্দ, উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এইগুলিকে প্রারম্ভিক শব্দ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এর থেকে একটি স্যধারণ নিয়ম নির্দেশ করা যায় ঃ—

কোন ভারতীয় নামের কি ধরণের গঠন বা কোন পর্যায়ে তার অন্তর্ভুক্তি হবে, সে কথা নির্ণয়ের সময় নামীর নিজের ভাষায় প্রচলিত রীতির অনুসরণ করা উচিত।

উপাধিধারী ব্যক্তির নামের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে সাধারণ নিয়মটি হবে ঃ যেখানে প্রারম্ভিক নামের শেষে ঔপাধি হিসেবে ব্যবহৃত এক বা একাধিক

শব্দ থাকে সেখানে (গ্রন্থপঞ্জীর অক্ষরে সমীকৃত) নামধারীর নিজস্ব ভাষায় উপাধির যা আকার তাই হবে পরিগ্রহণ যোগ্য শব্দ।

দুই বা তার বেশী শব্দ দিয়ে তৈরী যৌগিক ঔপাধি শব্দগুলি একক শব্দ হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে, তা সে যুগ্মভাবেই লেখা হোক কিংবা সংযোগ চিহ্নসহ বা সংযোগ চিহ্ন ছাড়াই আলাদাভাবে লেখা হোক।

অবশ্য পাশ্চাত্য অনুকৃতি অথবা রোমান হরফে লেখা বইএ নামের উদ্ধৃতির বর্ণান্তরের সময় এর ব্যক্তিক্রম ঘটতে পারে এবং যদি ইউরোপীয় ভাষায় প্রকাশনগুলিকে একটি স্বতন্ত্র অনুক্রমে সাজান হয়ে থাকে তাহলে ঐ সব নাম দেশীয় ভাষায় রূপান্তরিত করা ঠিক নয়।

মিঃ সেমুর লুবেস্কী তাঁর "Code of Cataloguing Rules : Author and Title Entry (1960)" বইএর খসড়ায় বলেছেন,—"অবশ্য যদি নামধারী স্বয়ং পাশ্চাত্য ভাষাতেও রচনা করে থাকেন এবং প্রায়শঃ খানিকটা রোমক আকারে তাঁর নাম ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে এই ধরণের আকারটিই পরিগ্রহণ-যোগ্য হবে ঃ

Tagore, Rabindranath. (Thakura, Rabindranath নয়)"

অবশ্য সুসংহত গ্রন্থালেখ্য বা গ্রন্থপঞ্জীর জন্য বৈদেশিক অনুকৃতি বা রূপান্তর করণের চেয়ে আদি মাতৃভাষার শব্দের যে প্রকাশভংগী সেদিকেই আমাদের জাতিগত পক্ষপাত রয়েছে। ভারতীয় জাতীয় গ্রন্থপঞ্জীতে (INDIAN NATIONAL BIBLIOGRAPHY) মোটামুটি এই নীতির অনুসরণ করা হয়েছে।

সর্বভারতীয় এবং সম্ভবতঃ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ব্যবহার্য একটি সমধর্মী ভাষার অবগুণ্ঠনে ভৌগোলিক নামগুলির প্রয়োগ সম্বন্ধে এর পর চিন্তা করতে হবে। আমাদের দেখতে হবে যে যদি Bombay অথবা Munbai, Calcutta বা Kalkatta বা Kalikata ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করতে হয়, তাহলে আমরা আন্তর্জাতিক ব্যবহারে প্রেসিডেন্সী শহরগুলির যেমনটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে তা উল্লেখ করতে পারি এবং অন্যান্য শহরের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক গৃহীত ও বিহিত প্রকারগুলি ব্যবহার করতে পারি। যে সব প্রকারের সর্বাধিক চল সর্বসম্মতিক্রমে সেগুলিও গ্রহণ করা যেতে পারে। এই সম্পর্কে উপযুক্ত নজীর উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

যৌথ সংস্থা :

গ্রন্থসূচক ইংরেজী এবং ভারতীয় ভাষায় রচনা করে যৌথ সংস্থাগুলিরও অনুরূপ অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা থাকা উচিত। সর্বপ্রথম মিঃ সেমুর লুবেস্কীর ড্রাফ্‌ট্‌ কোডের খসড়া অনুসরণে অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত একটি সাধারণ নিয়ম স্থির করা যেতে পারে : "গ্রন্থতালিকায় যৌথসংস্থাগুলি সন্নিবেশ হয়ে সেই নামে, যে নামে তাঁরা শীর্ষনামায় মুদ্রণে বা অন্য যে কোন লিখিতভাবে তাঁদের রচনার মধ্যে পরিচিতি লাভ করেছেন। আর এই নামটি লেখা হবে তাঁদের ব্যবহৃত ভাষায় ও আকারে এবং বিকল্প কোন আকার থাকলে তারও উল্লেখ করতে হবে।

কিন্তু যদি একাধিক ভাষায় লিখিত রচনার মধ্যে যৌথ-সংস্থার নাম দেখা যায়, তা হলে নামের সরকারী দস্তুরটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। যদি সরকারী দপ্তরে ইংরাজী সহ একাধিক ভাষায় নামটি প্রকাশিত হয়ে থাকে তাহলে ভারতে সরকারী কার্যে ব্যবহৃত ভাষায় অথবা তার অনুগামী ইংরাজী ভাষায় নামটির যে প্রকার তাই পরিগ্রহণ করতে হবে। যে সব প্রকার ব্যবহার করা হলনা তার উল্লেখ রাখা যেতে পারে। যেমন,

ভারতবর্ষ : লোকসভা (প্রসংগক্রমে) ভারতবর্ষ : হাউস অফ দি পিপ্‌ল

ভারতবর্ষ : রাজ্যসভা (প্রসংগক্রমে) ভারতবর্ষ : কাউন্সিল অফ্‌ ষ্টেট্‌স্‌

অনুবাদ সাহিত্য

আগেই বলা হয়েছে নানা ভাষার লিখনসম্ভারে গড়ে ওঠা গ্রন্থাগারের জন্যই জাতীয় গ্রন্থসূচকের প্রয়োজন। যে কার্যকরী নিয়মটির ইতিপূর্বেই আভাষ দেওয়া হয়েছে তা হল গ্রন্থকারনামা (ব্যক্তিগত বা যৌথ) লিখতে হবে নামের মাতৃভাষায় যে-রূপ তাতে এবং রচনার আখ্যা মূল আখ্যা অনুযায়ী সন্নিবিষ্ট হবে। এর থেকেই বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত কোন মৌলিক গ্রন্থের কথা এসে পড়ে। কাজের সুবিধার জন্য গ্রন্থসূচকে এরকম নিয়ম করা দরকার যাতে করে সমস্ত মূল আখ্যা এবং তাদের অনুবাদ এক সংগে গ্রথিত করা যায়। মূল আখ্যার পরে অনূদিত আখ্যার উল্লেখই নিরাপদ বলে মনে হয়।

উদাহরণ স্বরূপ : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "শেষের কবিতা" উপন্যাসের কৃপালনীকৃত অনুবাদের (অনূদিত আখ্যা : Farewell My Friend.) অন্তর্ভুক্তি হবে মূল লেখকনামার পর তৃতীয় বন্ধনিতে ইংরাজী অক্ষরে লেখা, ["Sesher kabita" আখ্যায় এবং সবশেষে অনূদিত আখ্যাটি দেওয়া হবে।

এই কারণে এটা প্রয়োজন যে অনেকক্ষেত্রেই অনুবাদের বিভিন্ন প্রকারভেদ থাকতে পারে এবং সেগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করলে নামগুলি বিভ্রম্ভ হয়ে পড়বে।

জাতীয় গ্রন্থ-সূচকে আদর্শ বর্ণ-সমীকরণের (Transliteration) তালিকা থাকা দরকার। এ ছাড়াও তাতে গ্রন্থালেখ্য প্রণয়নের ব্যবহার্য শব্দগুলির সংজ্ঞাসহ সবকটি ভারতীয় ভাষায় একটি আভিধানিক সংগ্রহ থাকা উচিত।

জাতীয় গ্রন্থ-সূচকের পক্ষে এই মূলনীতিগুলি অনুসরণ করা একান্ত প্রয়োজন।

গ্রন্থাগারিকের নিষ্ঠা

নারায়ণচন্দ্র চক্রবর্তী

গ্রন্থাগারিক, কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রালয়

গ্রন্থাগার শ্রাবণ, ১৩৬৭ সংখ্যায় সতীশচন্দ্র গুহঠাকুরতার (১২৯৪-১৩৬৭ বঙ্গাব্দ) তিরোধান সংবাদে বড়ই দুঃখ অনুভব করছি। সতীশবাবুর বয়স হয়েছিল, বার্ধক্যের চরম পরিণতি মৃত্যু, এতে সাধারণত দুঃখ করবার কিছু নেই, এক্ষেত্রে দুঃখ হয় সতীশবাবুর সুদীর্ঘকালের প্রাণপণ সাধনা বহুলাংশে ব্যর্থ হতে চলেছে মনে করে।

১৯৫৭ সালে এলাহবাদে সাক্ষাৎ। ইতিপূর্বে হয়তো ভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে বা নিখিল ভারত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে কোথাও দেখা হয়ে থাকবে, সে বিষয়ে উল্লেখ করলেন সতীশবাবু। বয়স একটু না হলে এমন আপনভোলা নীরব, বহুলাংশে-ব্যর্থকাম, জীবন সন্ধ্যায় উপনীত আদর্শবাদীর সজল নিঃস্প্রভ দৃষ্টির গভীরে যে দীপ্তি ও আকুতি সঞ্চিত থাকে তার সন্ধান মেলা ভার। ইতিপূর্ব্বে সাক্ষাতের কথা তেমন কিছু মনে না থাকলেও সামান্য আলাপের পর দীর্ঘ জীবনভর নিষ্ঠা ও সাধনার প্রতীক এমন একজন নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাবান গ্রন্থাগারিককে দেখে মন বিশ্বাস ও ভক্তিতে ভরে উঠল। বিরাট ব্যক্তিত্বে

সমুদ্রের গভীরতা ও বিস্তার আরোপ করা হয়। অসাধারণরূপে অনুপ্রাণীত আদর্শবাদী সাধারণ মানুষকে বোধহয় সাধারণের মধ্যে প্রবাহিত যুগযুগান্তের পবিত্রতা ও প্রেরণার প্রতীক গঙ্গা নদীর সঙ্গে তুলনা করা চলে। কাশীধামে চিরপবিত্র গঙ্গার প্রবাহের ন্যায় অকলুষ জীবনধারা ছিল সতীশবাবুর। এমন উদার আপনভোলা একনিষ্ঠ ব্যক্তি কদাচিৎ দেখা যায়।

সতীশবাবুর সহজ সরল আদর্শদীপ্ত জীবন একান্তভাবে গ্রন্থাগারিকের কর্ম্মে ও ভারতে নতুন বর্গীকরণ পদ্ধতি ও গ্রন্থপঞ্জী প্রণয়নের শুভ স্বপ্নে কেটেছে। একাকী গবেষণার ফলে ১৯৩২ সালে তিনি 'প্রাচ্যবর্গীকরণ পদ্ধতি' প্রকাশিত করেন। ইহাই আধুনিককালে ভারতবাসীকৃত প্রথম উল্লেখযোগ্য মৌলিক গ্রন্থবর্গীকরণ পদ্ধতি। সুপণ্ডিত অধ্যক্ষ গোপিনাথ কবিরাজ মহাশয় 'সরস্বতীভবন' গবেষণামূলক গ্রন্থমালায় সতীশবাবুর 'প্রাচ্যবর্গীকরণ পদ্ধতি' অন্তর্ভুক্ত করেন এবং ভূমিকায় সতীশবাবুর কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং তাঁকে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিষয়ে 'Pioneer' বলে বর্ণনা করেন।

এর পরে সতীশবাবু আর এক নতুন প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। সকল বিষয়ে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার কাজে সহায়তার জন্য এদেশে ইংরেজী ও প্রাদেশিক জাষাসমূহে লেখা পুস্তক ও সাময়িক পত্রাদিতে ছাপা প্রবন্ধাদির বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জী নিয়মিতভাবে প্রকাশের মহান পরিকল্পনায় তিনি মেতে উঠলেন। ভারতীয় পঞ্জী পরিষদ (Indian Bbliographical Sociey) প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও এই সঙ্গে সুরু করলেন তিনি। অন্যান্য দশজন 'বুদ্ধিমানের' ন্যায় অপরের প্রতিক্রিয়া বা সাহায্যের অপেক্ষায় তিনি বসে রইলেন না। ১৯৩৬ সালে INDIANA নামে এক Biblographical সাময়িকপত্রের প্রথম সংখ্যা প্রকাশ করলেন। Modern Review-এতে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে সুধীবৃন্দ সতীশবাবুকে উৎসাহ ও অভিনন্দন জানালেন। প্রথম ভারতীয় বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রণয়নের ন্যায় প্রথম ভারতীয় সাময়িক সাহিত্যের পঞ্জী (bibliography of current Indian literature) পত্রিকা প্রবর্তনের গৌরব ও সতীশচন্দ্রের প্রাপ্য। INDIANA-এতে শুধু ইংরেজী নয়, ভারতীয় অন্যান্য প্রধান প্রধান ভাষায় সাময়িক (দৈনিক বাদ দিয়ে) পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির ও পঞ্জী বা সূচি প্রণয়ন করা হয়। এই কাজে তিনি সর্ব্বস্ব পণ করে ব্রতী হন। বহু পরিশ্রম ও স্বীয় অর্থ ব্যয়ে ১৯৩৬ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে ১২ খণ্ড INDIANA প্রকাশ

করেন। সহকর্ম্মী বা সাহায্য তাঁর সামান্যই মিলেছে। সেদিন সতীশবাবুর নিষ্ঠার বিষয় প্রথিতযশা রবীন্দ্র-জীবনী-রচয়িতা শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের নিকট উল্লেখ করাতে তিনি বললেন যে সতীশবাবু নিজের সর্ব্বস্ব দিয়ে, এমন কি স্ত্রীর গহনা পর্যন্ত বিক্রয় করে এসব কাজ করতেন।

তাঁর জীবন দীপ নিভিবার সামান্য কিছুদিন পূর্ব্বে যখন তাঁকে দেখলাম তখন তাঁর উৎসাহের ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে এসেছে বটে কিন্তু জীবনের নির্ব্বাচিত আদর্শ ও কর্ম্মের প্রতি বিন্দুমাত্র হ্রাস হয়নি। INDIANA, প্রাচ্যবর্গীকরণ পদ্ধতি, তাঁর পরিকল্পিত Indian Bibliographical Society, Indian Library Association এবং ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলন ইত্যাদি বিষয় অসাধারণ আগ্রহের সঙ্গে আলোচনা করলেন। সমগ্র জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে, যথাসর্ব্বস্ব খুইয়ে যাঁর মান, যশ, ঐশ্বর্য কিছুই মিললো না, তাঁর পক্ষে নির্ব্বাচিত আদর্শের ও কর্মের প্রতি শেষ পর্যন্ত এত আস্থা ও আগ্রহ রক্ষা করা অসাধারণ নিষ্ঠা ও চরিত্রবলের পরিচায়ক। ভারতীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনে সতীশচন্দ্রের অবদানের মূল্য ও তাঁর উপযুক্ত স্থান নির্ণয়ের সময় হয়েছে।

শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার ঘোষ শ্রাবণ সংখ্যা 'গ্রন্থাগারে' সতীশবাবুর অসমাপ্ত মহৎ কর্ম্মের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। প্রাচ্যবর্গীকরণ পদ্ধতি, INDIANA, Indian Bibliographical Society স্থাপনের প্রস্তাব গবেষণা ও আলোচনার যোগ্য বিষয়। এই অসাধারণ নীরব কর্ম্মীর অপ্রকাশিত লেখা কিছু থাকলে তা সংগ্রহ করা ও অসমাপ্ত কার্য্যের সূত্র ধরে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে গবেষণা একান্ত প্রয়োজন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে তাঁর সুদীর্ঘ কর্ম্মজীবনের সকল স্থানে সতীশচন্দ্র বিদ্যোৎসাহীতা, বৈষ্ণবসুলভ বিনয়, ত্যাগ সর্ব্বোপরি স্বীয় নির্ব্বাচিত গ্রন্থাগারিকের কর্ম্মে নিষ্ঠার দ্বারা বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করেছেন। তাঁর নির্দেশিত পথে গবেষণা ও তাঁর স্মৃতিরক্ষার দায়িত্ব আমাদের। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুযোগ্য কর্মীদের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকর্ষণ করছি।

সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগার

সংস্কৃত কলেজের আকর্ষণীয় বিভাগ ইহার মূল্যবান বর্ধিষ্ণু গ্রন্থাগারটি। অন্যান্য কলেজ হইতে ইহার বৈশিষ্ট্য ইহা শুধু ছাত্র ও অধ্যাপকদের পুস্তক সরবরাহ করে না, এই কলেজের উল্লেখযোগ্য দুই বিভাগ 'গবেষণা ও 'প্রকাশন'-এর কার্যে সর্বপ্রকার সাহায্য করিয়া থাকে। বহু দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্রিকাদির সংরক্ষণ বাংলা তথা ভারতের মধ্যে এ গ্রন্থাগারকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়াছে। বহু মূল্যবান অপ্রকাশিত পুঁথি সংগ্রহ, বিশ্বের দরবারে এ গ্রন্থাগারকে একটি বিশিষ্ট আসন দান করিয়াছে।

সংস্কৃত কলেজ গ্রন্থাগারের উল্লেখযোগ্য অংগটি হইতেছে—পুঁথি বিভাগ। নিয়মিত পুঁথি সংগ্রহ, পুঁথিগুলির বৈজ্ঞানিক মতে বিন্যাস ও সংরক্ষণের বন্দোবস্ত, দুষ্পাঠ্য অক্ষরগুলির আধুনিক লিপিতে রূপান্তর, এবং ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগ-এর মাধ্যমে প্রতিটি পুঁথির বিবরণ প্রচার এই পুঁথি বিভাগের কার্যের অন্তর্গত। এ বৎসর অনেক নূতন পুঁথি সংগ্রহ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে মূল্যবান পুঁথিগুলি সম্বন্ধে গবেষণা করা হইতেছে। নূতনভাবে পুঁথি সংরক্ষণের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত বৎসর ৩,৫৮১ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। উহাতে ১,২০০ পুঁথি উপযুক্তভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে। আমাদের প্রতিলিপিকারগণ আলোচ্য বৎসরে অনেক পুঁথির নূতনভাবে প্রতিলিপি করিয়াছেন। এইগুলির সকলই দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান। গবেষকরা এবং প্রকাশন বিভাগ হইতে বিশেষভাবে উপকৃত হওয়ায় প্রতিলিপিকারদের ঐ সুকঠিন কার্য বহুল প্রয়োজনীয়তার দাবি রাখে। বর্ণাত্মক সূচীকরণ এযাবং ২১৭৪ খানি পুঁথির সূচী সংকলন কার্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এই নবতম বর্ণাত্মক-সূচী সংকলন আজ সারা বিশ্বের কাছে এই কলেজের সুগৃহীত পুঁথিগুলির সংবাদ জানাইবার গৌরব অর্জন করিয়াছে। গবেষণা পত্রিকা 'আওয়ার হেরিটেজ'-এ ইহার ক্রম প্রকাশন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

গবেষকদের প্রয়োজনে এই গ্রন্থাগার ভারতের তথা অন্যান্য দেশের গ্রন্থাগার হইতে প্রয়োজনীয় পুস্তক ও পুঁথি-পত্রিকাদি সংগ্রহ করিয়া সাহায্য করিয়া

আসিতেছে। এই সাহায্য করণে আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি, প্রেসিডেন্সী কলেজ, বিলাতের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, ফ্রান্সের বিব্লিওথেক ন্যাশনেল, বারাণসী সংস্কৃত বিদ্যালয় প্রভৃতির অসংকোচ সহযোগিতা প্রকারান্তরে এই গ্রন্থাগারের সৌহার্দ্য পরিধিকেই বিস্তৃত করিতেছে। বহু ক্ষেত্রেই আমরা পুঁথি-পুস্তিকাদির মাইক্রোফিল্ম করাইয়া আনিতেছি। ইহাতে নিয়মিত মূল্যবান এবং দুষ্প্রাপ্য সংগ্রহমালার কলেবর বৃদ্ধিই পাইতেছে।

আমাদের পুস্তক-সংখ্যা এই বৎসরে ১,৫০৭ বর্ধিত হইয়াছে। এই সংগ্রহ বাৎসরিক ৫,০০০ টাকা ব্যয়-বরাদ্দ হইতে করা হইয়াছে। গত বৎসর হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রন্থাগারের জন্য বাৎসরিক ৩,০০০ টাকার উপর আরও ২,০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়া এই ৫,০০০ টাকা ধার্য করিয়াছেন। ইহা ভিন্ন পুঁথি-পুস্তকের মাইক্রোফিল্ম ও ফটোস্ট্যাট খাতে বার্ষিক ৫০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। গত বৎসর ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন-এর ১২,০০০ টাকা পুস্তকক্রয় খাতে, ৯,০০০ হাজার টাকা গ্রন্থাগার পরিবর্ধন খাতে এবং পৌনঃপুনিক সাহায্য ৫,০০০ টাকা—মোট ২৬,০০০ টাকা পাওয়া গিয়াছে।

এই বৎসর শ্রীভাগবত শাস্ত্রী মহাশয়ের মূল্যবান গ্রন্থাগারটির একটি বড় অংশের কলেজ লাইব্রেরীর অন্তর্ভুক্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সংগ্রহের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার গ্রন্থাগারকে স্পেশাল গ্রান্ট হিসাবে ৫,০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত আমেরিকান হুইট লোন মারফত এই বৎসর ৬২ খানি প্রয়োজনীয় পুস্তক দান হিসাবে গ্রন্থাগারে আসিয়াছে। কলেজের পক্ষ থেকে এই সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়। দান পর্যায়ে এই প্রসঙ্গে শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয়ের পৌত্র শ্রীবলাইচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁহার এককালীন ৮৯ খানি পুস্তক প্রদান—এ গ্রন্থাগারের সহিত তাঁহার আন্তরিকতার বন্ধনকে সুদৃঢ় করিয়াছে তাহা ছাড়া, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রীমনসুখরায় মুরু, পীতাম্বর ঝাঁ, ইউ এস আই এস, নারায়ণ গোয়েংকা, মহানন্দ ঠাকুর, ডাঃ জি এন সরকার, গ্রন্থাগারিক বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যক্ষ গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় প্রভৃতির নিকট হইতে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদি দান হিসাবে এই গ্রন্থাগার লাভ করিয়াছে।

এই গ্রন্থাগারের আরও নূতন শেলফ তৈরীর জন্য এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৯,০০০ হাজার টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। বুক-স্ট্যান্ড বাবত ২,৫০০

টাকার মধ্যে এই বৎসর ৫০০ টাকা আমরা পাইয়াছি। উক্ত টাকায় ইতিমধ্যেই ২,৫০০টি বুক-স্ট্যাণ্ড ক্রয় করা হইয়াছে।

এই গ্রন্থাগারে আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গ্রন্থাগারকার্য সমাধানের বিবিধ যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয়। তাহাদের মধ্যে পুঁথি-পুস্তকাদি সংরক্ষণের জন্য প্যারাডিক্লোরোবেনজিন চেম্বার এবং থাইমল চেম্বার. পুঁথির অস্পষ্ট অক্ষর সহজ পঠনের জন্য অ্যালট্রা-ভায়োলেট ল্যাম্প, মাইক্রোফিল্ম পঠনের জন্য মাইক্রোফিল্ম রীডার প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাহিরের বহু গবেষকও নিয়মিত আমাদের এই মাইক্রোফিল্ম রিডারএর সহায়তায় তাঁহাদের গবেষণা-কার্য করিয়া উপকৃত হইতেছেন।

এই গ্রন্থাগারে এই বৎসর সরকার আরও তিনজন অতিরিক্ত সর্টার নিয়োগের ব্যবস্থা করিয়া বিশেষ সাহায্য করিয়াছে। গ্রন্থাগার কর্মীদের রদ-বদল এবং নূতন নিয়োগও এই বৎসরের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। সেকেন্ড লাইব্রেরিয়ান শ্রীঅমিয়ভূষণ রায় মহাশয় পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটেরিয়েট লাইব্রেরিতে স্থানান্তরিত হইলে ঐ স্থানে সহ গ্রন্থাগারিক শ্রীশচীন্দ্রনাথ দে, এম এ, এল এল বি মহাশয়ের পদোন্নতি হয় এবং তাঁহার স্থলে সূচীকরণ বিভাগের শ্রীমতী জল্পনা গাঙ্গুলী, বি এ, ডিপ লিব নিযুক্ত হন। ঐ বিভাগের শ্রীঅমিতাভ বসু পশ্চিমবঙ্গ স্টেট লাইব্রেরিতে চলিয়া গেলে উহার স্থলে শ্রীরঞ্জিত মুখার্জি, বি এ এবং শ্রীমতী জল্পনা গাঙ্গুলীর শূন্যস্থলে শ্রীমতী অঞ্জু পাল নিযুক্ত হন। অপর দিকে ডেসক্রিপটিভ ক্যাটালগার শ্রীউপেন্দ্র সাংখ্যতীর্থ এবং শ্রীনরেন্দ্র বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের স্থলে শ্রীজগদীশ তর্কতীর্থ এবং শ্রীবিরাজমোহন তর্কতীর্থ মহাশয় নিযুক্ত হন। পুঁথি-লিপিকার শ্রীহরিনারায়ণ বেদতীর্থ এবং শ্রীননীগোপাল তর্কতীর্থের স্থলে যথাক্রমে শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য ও শ্রীঅনুকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য যোগদান করেন। শ্রীগঙ্গানারায়ণ ভট্টাচার্য পূর্বে সূচীকার (ক্যাটালগার) হিসাবে কার্য করিতেছিলেন; বর্তমানে শ্রীননীগোপাল তর্কতীর্থ প্রকাশন বিভাগের সহ-সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই বৎসর গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে শ্রীশচীন্দ্রনাথ দে মহাশয়ের এম এ (ইতিহাস) ও ল পরীক্ষায়, শ্রীমতী জল্পনা গাঙ্গুলীর ডিপ লিব পরীক্ষায় এবং শ্রীবিজনবিহারী ভট্টাচার্য ও শ্রীরঞ্জিত মুখার্জির সার্টিফিকেট অব লাইব্রেরিয়ানসিপ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়া বিশেষ গৌরবের সংবাদ।

এই গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগার-বিশেষজ্ঞ ডাঃ রঙ্গনাথনের কোলন ক্লাসিফিকেশন পদ্ধতি হিসাবে পুস্তক বর্গীকরণও একটি বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। এই পদ্ধতি ভারতীয় ভাষার, বিশেষতঃ সংস্কৃত পুস্তকের বর্গীকরণে বিশেষ সহায়ক। এই প্রসঙ্গে আমাদের ক্যাটালগিং ডিপার্টমেন্টএর কর্মীদের কার্যধারা প্রশংসনীয়।

কলেজের গবেষণা-পত্রিকা 'আওয়ার হেরিটেজ'-এর পরিবর্তে আমরা ভারতীয় ও বিদেশী পত্রিকা পাইয়া থাকি।

কলেজ প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে গত দুই বৎসর ধরিয়া এই গ্রন্থাগারের পুঁথি-পুস্তকাদি ও পরিচালন পদ্ধতির অতি উচ্চাঙ্গের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। ইহা সর্বসাধারণের প্রশংসা অর্জনে গৌরবান্বিত হয়।

এই গ্রন্থাগারের যেটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় তাহা হইতেছে ইহার সুদৃশ্য এবং সুব্যবস্থাসম্পন্ন মনোহর পাঠগৃহ (রিডিং রুম)। প্রতিদিন এবং রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন (বিশেষ ক'টি ছুটি ব্যতীত) সকাল ৭ ঘটিকা হইতে রাত্র ৯ ঘটিকা পর্যন্ত এই পাঠগৃহ পাঠকদের জন্য খোলা থাকে। এত দীর্ঘ সময় ব্যাপিয়া বৎসরের এত অধিক দিন সমানভাবে পাঠগৃহ ব্যবহারের সুযোগদান এই গ্রন্থাগারকে একটি বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছে। অসংখ্য ছাত্র, অধ্যাপক ও গবেষক এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া উপকৃত হইতেছেন। ইহার মধ্যস্থিত 'রিসার্চ অ্যানেক্স'টিও পাঠগৃহের একটি বৈশিষ্ট্য। বর্তমান বর্ষে আমাদের পুস্তক লেনদেনের সংখ্যা: বাড়িতে দেওয়া ৮,০৩৫ এবং গ্রন্থাগারে ব্যবহারের জন্য দেওয়া ৯০,৮২৮।

সরকারের আর্থিক সাহায্য, হিতাকাঙ্ক্ষিগণের সহৃদয়তা, ছাত্র অধ্যাপকবৃন্দের সহযোগিতা, গ্রন্থাগার কর্মীদের আন্তরিক সক্রিয়তা এবং শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা এই গ্রন্থাগারকে আজ যেভাবে ক্রম উন্নতির স্তরে উন্নীত করিতেছে, আশা করা যায় অচিরেই ইহা ভারত তথা পৃথিবীর মধ্যে একটি গৌরবময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতীক হইয়া উঠিবে।

[সংস্কৃত কলেজ সাময়িকী হইতে মুদ্রিত]

চিঠিপত্র

'রুরাল লাইব্রেরী'র কর্মীদের দুরবস্থা

গ্রন্থাগার কর্মিগণ যে ভাবে জীবন যাপন করেন তাহা অদ্যাতক 'গ্রন্থাগারে' আলোচিত হয় নাই বলিয়াই আমার ধারণা। আমার বক্তব্য বিষয় গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত বা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত গ্রন্থাগারিকের সম্বন্ধে নহে। সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের গ্রন্থাগারিকদের বিষয় লইয়াই আমি সংক্ষেপে আলোচনা করিতে ইচ্ছুক।

প্রথমতঃ সাধারণ গ্রন্থাগার। এই সাধারণ গ্রন্থাগার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলি সাধারণ দান বা চাঁদার উপর পরিচালিত। এই সকল গ্রন্থাগারের কর্মিগণ যৎসামান্যই বেতন পাইয়া থাকেন এবং যাহা পান তাহাকে 'অনারারী' সার্ভিস বলিলেও চলে। দ্বিতীয় শ্রেণীর সাধারণ গ্রন্থাগার হইতেছে গভর্ণমেণ্টের সাহায্যপ্রাপ্ত গ্রন্থাগার। গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের 'Rural Library Scheme'এর মধ্যে এই সকল গ্রন্থাগার পড়ে। এই সকল গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকের বেতন ঠিকা মাসিক ৭৫৲ টাকা এবং পিয়নের বেতন ঠিকা মাসিক ৪০৲ টাকা মাত্র। উক্ত বেতনের উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহাদিগকে সংসার প্রতিপালন করিতে হয় এবং কর্মস্থানে সকলপ্রকার নিজ সাংসারিক চিন্তা ত্যাগ করতঃ সর্বসাধারণের পিপাসা মিটাইবার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকিতে হয়। বহরমপুর শিক্ষণ কেন্দ্রে বসিয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে গ্রন্থাগারিকের কর্ম বড়ই কঠিন। তাঁহাকে সর্বদা প্রফুল্ল মনে কাজ করিতে হইবে এবং তাঁহার মুখে সর্বদার জন্য হাসি লাগিয়াই থাকিবে। আমার ১৬ বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমি নিজে তাহা মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছি যে ঐ দুইটি গুণ যদি গ্রন্থাগারিকের না থাকে তবে তাঁহাকে যথেষ্ট কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কিন্তু সাংসারিক অভাব অনটনের মধ্য দিয়া উক্ত গুণ দুইটি গ্রন্থাগারিকের মধ্যে থাকা সম্ভব কিনা তাহা সুধীবৃন্দের সুবিবেচনার বিষয়। যে সকল লাইব্রেরী মহামান্য গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের 'Rural Library Scheme' গ্রহণ করিয়াছে সেই সকল লাইব্রেরীতে যদি নিজস্ব তহবিল না থাকে তবে লাইব্রেরীর কর্মিগণ ৫।৬ মাস অন্তর

বেতন পাইয়া থাকেন। কারণ, গ্র্যাণ্টের টাকা বৎসরে ২।৩ কিস্তীতে দেওয়া হয়। এইত গেল তাঁহাদের কথা, এখন তাঁহাদের সন্তান সন্ততির শিক্ষার আলোচনা করা প্রয়োজন।

বর্তমান যুগে গভর্ণমেণ্ট পরিচালিত প্রায় সকল বিভাগেই কর্মীদের সন্তান সন্ততিদের শিক্ষার জন্য সাহায্যদানের ব্যবস্থা হইয়াছে এবং ক্রমশঃ হইতেছে, এমনকি কোন কোন বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানেও উক্ত ব্যবস্থা চালু রহিয়াছে। কিন্তু গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠানের কর্মিগণের সন্তান সন্ততির শিক্ষার জন্য অদ্যাতক সেইরূপ কোন ব্যবস্থাই মঞ্জুর হয় নাই। এমন কি যাঁহারা স্কুল লাইব্রেরীতে সামান্য বেতনে চাকুরী করেন তাঁহাদের সন্তান সন্ততিকেও শিক্ষকের ওয়ার্ড মধ্যে গ্রহণ করা হয় না। ফলে প্রাইমারী ও সেকেণ্ডারী সকল শিক্ষকদের সন্তান সন্ততিগণ বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করিবার সুযোগ পাইতেছে অথচ স্বল্প বেতনভোগী গ্রন্থাগারিকের সন্তানগণ সে সুযোগ হইতে বঞ্চিত। সুতরাং গ্রন্থাগারিক সম্প্রদায় শিক্ষা বিভাগে উপেক্ষিত নয় কি ?

বর্তমানে মাননীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বাঙ্গালার গ্রন্থাগারগুলির উন্নয়নকল্পে যথেষ্ট মনোনিবেশ করিয়াছেন ইহা অতীব আনন্দের বিষয় সন্দেহ নাই কিন্তু আমার অনুরোধ শুধু ভাণ্ডারের উন্নতি সাধন করিলেই চলিবে না সেই সঙ্গে ভাণ্ডারীকেও উন্নতির পথে অগ্রসর করিতে হইবে। সকল শ্রেণীর গ্রন্থাগার কর্মিগণের সন্তান সন্ততিগণ যাহাতে শিক্ষক মহাশয়দের সন্তান সন্ততির ন্যায় বিনা বেতনে স্কুল কলেজে অধ্যয়ন করিবার সুযোগ সুবিধা পায় তাহার বিধি ব্যবস্থা হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং গ্রন্থাগার কর্মিগণ যাহাতে গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের প্রদত্ত মহার্ঘ ভাতার অংশ হইতে বঞ্চিত না হয় সে বিষয়েও সুধীগণের সুবিবেচনা করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি।

রবীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

গ্রন্থাগারিক, লালগোলা এম, এন, একাডেমী (পাবলিক) লাইব্রেরী

দ্বিতীয় পত্র

আমি……সাধারণ পাঠাগারের (রুরাল) গ্রন্থাগারিক। আজ ছয় সাত মাস যাবত আমরা বেতন (মোট ৭৫৲) পাই নাই। লেখালেখি করিয়া যদিও পাওয়া যায় তাহাও আংশিকভাবে এবং যদি contingency fund-এ কিছু থাকে। কেরোসিনের অভাবে অনেক সময় রাত্রির কাজ বন্ধ থাকে। D.S.E.O.-কে

সাক্ষাতে ও চিঠির দ্বারা ঊর্ধ্বতন অফিস হইতে আমার বেতন যাহাতে যথাসময়ে পাই তাহার ব্যবস্থা নিজেই করিবার জন্য অনুমতি চাহিয়াছি। কিন্তু তিনি অদ্যাবধি কোনও উত্তর দেন নাই। কাজেই আমার পারিবারিক অবস্থা কি হইতে পারে তাহা উপলব্ধি করুন।

যতদূর জানি পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য স্থানের 'রুরাল লাইব্রেরীর কর্মিগণের একই অবস্থা। তাঁহাদের এইরূপ নানা সমস্যার সমাধান, বেতন ও পদমর্যাদার উন্নতি ও স্বীকৃতি, শিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা ও সংযুক্ত প্রচেষ্টার জন্য রুরাল লাইব্রেরীর কর্মিগণের একটি সম্মেলনে মিলিত হওয়া আশু প্রয়োজন। উক্ত কর্মীদের একটি নিজস্ব কেন্দ্রীয় সংঘ গঠনের প্রশ্ন প্রস্তাবিত সম্মেলনে বিবেচিত হইতে পারে।

গ্রন্থাগার কর্মিগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রচারিত 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার মাধ্যমে বিষয়টি সকলের গোচরে আনিলে উপকৃত হইব।

বিনীত—

জনৈক গ্রন্থাগারিক

পঞ্চদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

বিষ্ণুপুর সাধারণ গ্রন্থাগারের আমন্ত্রণে আগামী ৩১শে মার্চ ও ১লা এপ্রিল বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) অনুষ্ঠিত হবে। মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়।

সম্মেলন সংক্রান্ত খবরাখবরের জন্য পরিষদ কার্যালয় অবিলম্বে যোগাযোগ করুণ।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা

খিদিরপুর ইসলামিয়া লাইব্রেরীর নিজস্ব গৃহ নির্মাণের উদ্যোগ

নানামুখী কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইসলামিয়া লাইব্রেরী ইদানীং যথেষ্ঠ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কিন্তু স্থানাভাবের ফলে লাইব্রেরীর বহু কাজ ব্যাহত হয়। সেজন্যে লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ নিজস্ব গৃহ নির্মাণকার্যে উদ্যোগী হয়েছেন। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এতদুদ্দেশ্যে একখণ্ড জমি পাওয়া গেছে। প্রবীণ ইঞ্জিনীয়ার শ্রীপান্নালাল ঘোষ বিনা পারিশ্রমিকে তত্ত্বাবধানকার্যে সম্মত হয়েছেন। গত প্রজাতন্ত্র দিবসে স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিকল্পিত গৃহের আনুষ্ঠানিকভাবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

কাশীপুর ইনষ্টিট্যুটের পুনর্গঠন

নব নির্বাচিত পরিচালক সমিতির তত্ত্বাবধানে গত ৩১শে ডিসেম্বর গ্রন্থাগারের প্রথম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্পাদকের বিবরণীতে ঘোষণা করা হয় যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ৩৫ বছরের পুরাতন এই গ্রন্থাগারের পুনরুজ্জীবনের জন্যে এক হাজার টাকা দান করেছেন। স্বামী শান্তিনাথানন্দ সভাপতির ভাষণে নূতন কার্যোদ্যোগের বিশেষ প্রশংসা করেন।

চব্বিশ পরগণা

বজবজ রমাপ্রসাদ স্মৃতি পাঠাগারে প্রতিযোগিতা

আসন্ন রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে পাঠাগারে চার দিনের এক অনুষ্ঠান সূচী গৃহীত হয়েছে। তাতে আবৃত্তি, সংগীত ও প্রবন্ধ প্রতি-যোগিতার এক বিশেষ ব্যবস্থা হয়েছে। নাম পাঠাবার শেষ তারিখ ১০ই বৈশাখ, বিস্তারিত খবরাখবর সম্পাদকের কাছ থেকে জানা যাবে। এছাড়া বক্তৃতা ও নৃত্যনাট্যের ব্যবস্থাও অনুষ্ঠান সূচীতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নদীয়া

চাকদহ বিবেকানন্দ সংঘের বার্ষিক সভা ও উৎসব

গত ৫ই ফেব্রুয়ারী সংঘের বার্ষিক সভা ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বিগত বর্ষের কার্যবিবরণী উপস্থাপিত করে সম্পাদক শ্রীজীবন কৃষ্ণ পাল সংঘের পরিচালনায় পল্লীর বিভিন্ন সংগঠনমূলক কার্যের উল্লেখ করেন। স্থানীয় ও বহিরাগত শিল্পীদের সংগীতে ও সংঘের ছোট ছোট সভ্যসভ্যাদের অনুষ্ঠিত নাচ ও হাস্যকৌতুকে উৎসবটি সুষ্টুভাবে সম্পন্ন হয়। পরবর্তী দিনে সংঘের সংস্কৃতি বিভাগের সচিব শ্রীরথীন করের পরিচালনায় ক্ষুধা নাটকটী অভিনীত হয়।

পুরুলিয়া

বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দির। গড়জয়পুর

গত ২৩শে জানুয়ারী স্থানীয় বিদ্যাসুন্দর সাহিত্য মন্দিরের পাঠকক্ষে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া নেতাজী জন্মদিবস পালন করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বক্তা নেতাজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেন। সভাপতি শ্রীযুক্ত রঘুনন্দন সিংহদেও তাঁহার ভাষণে আজাদহিন্দ ফৌজ সম্বন্ধে আলোকপাত করেন। গত ২৬শে জানুয়ারী সাহিত্য মন্দির প্রাঙ্গণে পতাকা উত্তোলন ও এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় গ্রামবাসীদের দেশোন্নয়নে সহযোগিতা করিতে আহ্বান জানাইয়া বিভিন্ন বক্তা বক্তৃতা করেন।

হরিপদ সাহিত্য মন্দিরে আলোচনাসভা

গত ৫ই ডিসেম্বর হরিপদ সাহিত্য মন্দিরের উদ্যোগে এক আলোচনা বৈঠক হয়। কলিকাতার ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশান সার্ভিসের ডাইরেক্টার অফ লাইব্রেরী সার্ভিসেস শ্রীমতী রুথ সি ক্রুগার "গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা" শীর্ষক বিষয়ে এক বক্তৃতা দেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীমতী ক্রুগার আমেরিকার গ্রন্থাগার আন্দোলন এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনে গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

জেলার ও সহরের বিভিন্ন গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগদান করেন এবং শ্রীঅজয়কুমার রায়, শ্রীসুবোধ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীমতী বীণা চ্যাটার্জী, শ্রীঅশোক চৌধুরী প্রভৃতি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।

আলোচনা বৈঠকের পূর্বে ইউনাইটেড ষ্টেটস ইনফরমেশান সার্ভিসের অডিও-ভিস্যুয়াল বিভাগের সৌজন্যে আমেরিকার একটি কাউণ্টী গ্রন্থাগার পরিচালনা সম্পর্কিত ফিল্ম প্রদর্শিত হয়।

বর্ধমান

সুদপুর রামকৃষ্ণ পাঠাগারের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন

গত ২৫শে অগ্রহায়ণ রামকৃষ্ণ পাঠাগারের নবনির্মিত গৃহের আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়। উদ্বোধন করেন জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীক্ষিতিশ রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। অতিরিক্ত জেলা শাসক শ্রীসুধীন্দু চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক নরহরি কবিরাজ। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র সিংহ তাঁর নাতিদীর্ঘ ভাষণে পাঠাগারটির ইতিবৃত্ত ও কর্মতৎপরতার এক সুন্দর বিবরণ দান করেন। পাঠাগারের সম্পর্কে শ্রীহরেমোহন সিংহ পাঠাগারের কার্যবিবরণ ও হিসাব নিকাশ উপস্থাপিত করেন। তাতে জানা যায় যে পাঠাগারের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৭৫ ও পুস্তক সংখ্যা ১০৪৫। বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ও ছোটদের একটি বিভাগ পাঠাগার কর্তৃক পবিচালিত হয়ে থাকে।

জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগার ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন

জামালপুর জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লকের অধীন "জাড়গ্রাম মাখনলাল পাঠাগাবের" আর একটি নূতন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন গত ২৬শে জানুয়ারী শ্রীযুক্ত দাশরথি তা, এম, এল, এ, মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জামালপুর থানা সমাজ কল্যাণ রূপায়ণ সমিতির সভানেত্রী শ্রীমতী শক্তি প্রতিভা দেবী প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন। বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে শ্রীযুক্ত তা ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তৎপরে তিনি এই পাঠাগারটিকে সরকারের গ্রন্থাগার সম্প্রসারণ পরিকল্পনায় পল্লীপাঠাগার রূপে নির্বাচিত করায় কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। এই পাঠাগারটি ১৯২১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাঃ কুমুদনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীকনককান্তি সিংহ রায়, শ্রীসিদ্ধেশ্বর দত্ত এবং প্রধান অতিথি এইরূপ পল্লীপাঠাগারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বক্তৃতা দান করেন।

বীরভূম

সিয়ান শ্রীদুর্গা সাধারণ পাঠাগারে গ্রন্থাগার দিবস অনুষ্ঠান

গত ২০শে ডিসেম্বর শ্রীনিকেতন ব্লকের উন্নয়ন আধিকারিক ও গ্রন্থাগারের সভাপতি শ্রীতারকচন্দ্র ধরের পৌরোহিত্যে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐদিন গ্রন্থাগারের কর্মীরা গ্রাম পর্যটন করে অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য সংগ্রহ করেন এবং গ্রামবাসীদের গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে বাড়ী বাড়ী গিয়ে সকলের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। সম্প্রতি পাঠাগারের সম্পাদক নিবারণচন্দ্র মণ্ডল লোকান্তরিত হওয়ায় কর্মসূচীর কিছুটা পরিবর্তন করা হয়।

মেদিনীপুর

রাজনগর দেশবন্ধু পাঠাগারে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জন্মবার্ষিকী উৎসব

গত ৫ই নভেম্বর হইতে রাজনগর রাম নারায়ণ তরুণ সংঘ পরিচালিত দেশবন্ধু পাঠাগারে সপ্তদশ দিবসব্যাপী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জন্মোৎসব পালিত হয়। এতদুপলক্ষে ক্রীড়ানুষ্ঠান, আবৃত্তি প্রতিযোগিতা, ব্রতচারী নৃত্য ও নাট্যাভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। শেষ দিবস ২১শে নভেম্বর আয়োজিত এক বিরাট জনসভায় পৌরোহিত্য করেন উপমন্ত্রী শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র মহান্তি। উক্ত সভায় অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র মাইতি, মোহনপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে, শ্রীযুত আশুতোষ মহাপাত্র শ্রীযুত শিবপ্রসাদ আচার্য ও অধ্যাপক শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ রথ ভাষণে অংশ গ্রহণ করেন।

রামনগর ইউনিয়ন সাধারণ পাঠাগারে বার্ষিক সভা

গত ২৫শে জানুয়ারী স্থানীয় পার্বতীপুর পতিত পাবনী উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবে জেলা শাসক শ্রীবিনয় ভূষণ মণ্ডলকে পাঠাগারের পক্ষ থেকে এক মানপত্র দেওয়া হয় এবং পাঠাগারটীকে একটি 'গ্রামীণ গ্রন্থাগারে' পরিণত করার জন্যে আবেদন জানানো হয়। বিগত প্রজাতন্ত্র দিবসে পাঠাগারের কর্তৃপক্ষ প্রভাত ফেরী, পতাকা উত্তোলন ও বার্ষিক সভা ও উৎসবের আয়োজন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে গ্রামবাসীরা বিপুল উৎসাহের সহিত যোগদান করেন।

বার্তা বিচিত্রা

ডিপ-লিব পরীক্ষার ফলাফল

গত ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা-ইন-লাইব্রেরীয়ানসিপ পরীক্ষার ফলাফল নিম্নে প্রকাশিত হইল। এবারের পরীক্ষার লক্ষনীয় বিষয় হইল যে কোন প্রার্থী প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন নাই।

দ্বিতীয় বিভাগ (গুণানুসারে)

কৃষ্ণকান্ত ঘোষ, অসীমা পাল, প্রশান্ত কুমার চক্রবর্তী, সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নাগেশ্বর সিং, অনিন্দ্য কুমার সেন, অচিন্ত্য কুমার দেব, প্রীতিময়ী চট্টোপাধ্যায়, হিরন্ময় সান্যাল, অববুদ্ধ রায়, বিমলচন্দ্র রায়চৌধুরী, সমীরকুমার রায়চৌধুরী, অপর্ণা বসু, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, অরবিন্দ কুমার ঘোষ, শচীন্দ্রনাথ দে, সন্দীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, সুশীলকুমার রায়চৌধুরী, পরিতোষ দাঁ, বীনা দত্ত, সবিতা সেনগুপ্ত, মানসী মজুমদার, অজিত কুমার পারিয়া, শোভা মজুমদার, (গঙ্গোপাধ্যায়) আরতি বিশ্বাস।

তৃতীয় বিভাগ (গুণানুসারে)

শঙ্করমোহন বসু, সুনীল শেখর সেনগুপ্ত, দীপ্তি বসু, নির্ম্মলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

সিউড়িতে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিবির

বীরভূম জেলা গ্রন্থাগার পর্ষদের উদ্যোগে গত ৩০শে জানুয়ারী থেকে একমাস কালীন দ্বিতীয় শিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরকার্য পরিচালনা করেন জেলা গ্রন্থাগারিক শ্রীনির্মল চৌধুরী। ২৪ জন শিক্ষার্থী শিবিরে যোগদান করেছিলেন, তন্মধ্যে ১১ জন এসেছিলেন বিভিন্ন 'রুরাল লাইব্রেরী' থেকে। দৈনিক চৌদ্দ ঘণ্টা ক্লাস হোত। প্রায়োগিক ও তত্ত্বগত শিক্ষণ ছাড়াও সংশ্লিষ্ট বিষয়াদির উপর দৈনিক সন্ধ্যায় একটি করে বক্তৃতার ব্যবস্থা ছিল। বক্তৃতায় যাঁরা যোগদান করেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমন্মথ রায়, শ্রীবিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ কালিগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশান্তি ভট্টাচার্য, শ্রীকামাখ্যা প্রসাদ চোঙদার অন্যতম।

ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন—এই বিষয়ের উপর পরিষদ সম্প্রতি এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছেন। প্রবন্ধটি ইংরাজীতে অনধিক দশ হাজার শব্দের মধ্যে লিখতে হবে। আগামী ৩০শে জুনের মধ্যে পরিষদের রামকৃষ্ণ মিশন গোলপার্ক কার্যালয়ে প্রেরণ ক'রতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ লাইব্রেরী এসোশিয়েসন

১৯৬০ সালের অক্টোবরের ইউনেস্কোর আঞ্চলিক সেমিনারে দক্ষিণ এশিয়ার গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের এসোশিয়েসন গঠণের সুপারিশ করা হয়। ইতিমধ্যেই আলিগড়, দিল্লী, কাশী ও পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকগণ অগ্রসর হয়ে সুপারিশটিকে কার্যকরী করে তুলবার চেষ্টা করছেন। আলিগড় মৌলানা আজাদ লাইব্রেরীতে বর্ত্তমানে এসোসিয়েশনের অফিস খোলার ব্যবস্থা হয়েছে।

গ্রন্থাগার বনাম গ্রন্থাগার পরিষদ

ইংলণ্ডে গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলীর ফলে ইংলণ্ডের লেখক সম্প্রদায়ের আথিক আয়ের উপর নাকি আঘাত পেয়েছে। তাই তাঁরা একটি বিল গত ৯ই ডিসেম্বর পার্লামেণ্টে তুলেন। তাঁদের মূল বক্তব্য হচ্ছে—গ্রন্থাগার পরিষদের কার্যাবলীর দরুন গ্রন্থ বিক্রয় কমে গেছে ফলে সাধারণ লোক এখন গ্রন্থের ব্যক্তিগত সংগ্রহের ব্যাপারে তত আগ্রহশীল নয়। পরিণামে লেখক সম্প্রদায়ের গ্রন্থ বাবদ রয়ালটির পরিমান প্রচুর পরিমানে কমে গেছে।

এই বিলের প্রতিবাদ অবশ্য গ্রন্থাগার পরিষদ ৬ই ডিসেম্বর তারিখের প্রেস কনফারেন্সে জানিয়েছেন। পরিষদ অবশ্য একথা স্বীকার করেন লেখক ও প্রকাশক যাতে আথিক দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত না হ'ন সে ব্যবস্থা করা দরকার।

সম্পাদকীয়

সরকারী গ্রন্থাগার কর্মীদের দুরবস্থা

পশ্চিম বঙ্গ সরকারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে এবারকার বক্তব্য নিবেদন করছি। আসন্ন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে ডিস্ট্রিক্ট ও রুরাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকদের যোগদান ও যাতায়াতের খরচ রাজ্য সরকার অনুমোদন করেছেন। এই মঞ্জুরিকরণের দ্বারা সরকার গ্রন্থাগার সম্মেলনের প্রতি আনুষ্ঠানিকভাবে গুরুত্ব দানতো করলেনই, উপরন্তু সম্মেলনে সরকারী কর্মীদের যোগদান ও যাতায়াতের খরচ অনুমোদন করে তাঁদের যথোচিত স্বীকৃতিও দান করলেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে রাজ্য সরকারের কোন কোন বিভাগীয় কর্মিগণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকটি গ্রন্থাগারের কর্মিগণ অনুরূপ সুযোগ বহুদিন ধরেই পেয়ে আসছেন। ডিস্ট্রিক্ট ও রুরাল লাইব্রেরীর কর্মীদের ইতিপূর্বে যোগদানের অনুমতি কোনও কোনও ক্ষেত্রে দিতে দেখা গেছে, কিন্তু সকলকে যোগদানের অনুমতি ও খরচ মঞ্জুর সরকার এই প্রথম করলেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন সারা পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার কর্মী ও অনুরাগীদের নিছক একটি বাৎসরিক পুনর্মিলন নয়। বিভিন্ন অঞ্চল হতে আগত কর্মীদের মিলিত চিন্তা পরিষদের কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়তা করে। গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের নানাবিধ অভাব-অভিযোগ এবং দৈনন্দিন কাজে উদ্ভূত আশু সমস্যা ও প্রয়োজনের ভিত্তিতে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ ঘটে। রাজ্যব্যাপী ক্রমবর্ধমান গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপায়ণের অনুকূলে এই সম্মেলনের যথেষ্ঠ তাৎপর্য আছে। গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটিও তাঁদের রিপোর্টে গ্রন্থাগার সম্মেলনের আবশ্যকতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সম্মেলন কার্যে রাজ্য সরকারের এই সহযোগিতায় তাই সকলেই আনন্দিত হয়েছেন।

কিন্তু যাঁদের সরকার এই মর্যাদা ও স্বীকৃতি দিলেন তাঁদের প্রধান অংশ অর্থাৎ রুরাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকরা যে কি দুঃসহ জীবন যাপন করছেন তার সামান্য পরিচয় পত্রিকার এই সংখ্যায় প্রকাশিত চিঠি দুটি থেকে মেলে। পরিষদ কার্যালয়ে প্রায়শই আমরা এরূপ করুণ চিঠি পেয়ে থাকি। যথাস্থানে আবেদন-অনুরোধও অনেক করা হয়েছে, কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি।

রুরাল লাইব্রেরীর গ্রন্থাগারিকরা বেতন পান খুবই অল্প। তার উপর তাঁদের বেতন যদি মাসের পর মাস বাকি থাকে তাহলে কর্মীদের মনোবল অটুট থাকা কিরূপে সম্ভব এবং কাজের সন্তোষজনক মানের প্রত্যাশাই বা কিভাবে করা যায়? রুরাল লাইব্রেরীগুলির পরিচালনভার স্থানীয় সমিতির উপর ন্যস্ত থাকে, এবং বেতনভুক্ত কর্মীদের খরচ সরকারী কোষাগার থেকেই আসে। সরকারী অর্থ দীর্ঘকাল অনাদায়ী থাকায় রুরাল লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ কর্মচারীদের যথা সময়ে বেতন দিতে সক্ষম হন না। কিন্তু এরূপ ঘটনাতো সরকারের অন্যান্য বিভাগগুলিতে দেখা যায় না—জেলা গ্রন্থাগারের কর্মিগণও নির্দিষ্ট সময়েই বেতন পান। সময় বিশেষে রুরাল লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষ তাঁদের সাধারণ ফান্ড থেকে বেতন দিয়ে দিতে পারেন—সর্বক্ষেত্রে তাঁরা তা করেন না—কিন্তু বারো মাস এরূপ অব্যবস্থা চলবেই বা কেন? মানবিক দিক থেকেও অন্ততঃ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের এবিষয়ে অবিলম্বে নজর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এটা প্রশাসনিক একটি বিরাট গলদের জন্যেই ঘটে।

এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বক্তব্য হোল যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সরকার গ্রন্থাগার সম্প্রসারণের যে কার্যসূচী গ্রহণ করেছেন তা বহুলাংশে নির্ভর করছে যাঁরা সেই পরিকল্পনাকে সার্থকভাবে রূপায়ণ করবেন অর্থাৎ কর্মিবৃন্দের উপর। কিন্তু অতুষ্ট ও অতৃপ্ত কর্মীদের দিয়ে কখনও ঈপ্সিত কাজ আশা করা যায় না। চরম সন্তোষ বিধান ঠিক এই সময়টীতে সম্ভব নাও হতে পারে—কিন্তু জীবিকা ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাবার অবকাশ থাকা উচিত। গাড়ীর ভাল চালক না থাকলে যেমন বিপদ ঘটতে পারে তেমনি উপযুক্ত কর্মীর অভাবে যে কোনও পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে। বেকার সমস্যার দিনে যে কোনও বেতন ও চুক্তিতে লোক নিয়োগ সম্ভব। কিন্তু তাতে আশানুরূপ কাজও পাওয়া যায় না অথচ অর্থব্যয় ঘটে চলে।

সম্প্রতি একাধিক জেলা গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিক পদত্যাগ করেছেন। একাধিক জেলা গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের পদ শূন্য রয়েছে। চাকুরির দৃঢ়তা ও বেতন হার দীর্ঘকাল যাবৎ অনিশ্চিত ও অনির্ধারিত থাকাই যে তার প্রধান কারণ তাতে সন্দেহ নেই। কাজেই বিলম্ব করার ফলে অবস্থার চরম অবনতি ঘটার পূর্বে জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগার কর্মীদের যথোচিত বেতন হার নির্ধারণের জন্যে সরকারকে অনুরোধ করি।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

ফাল্গুন ১৩৬৭

পঞ্চদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের আলোচ্য মূল প্রবন্ধ

আমাদের লক্ষ্য

ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত মানুষের পূর্ণতম বিকাশের ভিত্তিতে সমস্ত সমাজকে প্রতিষ্ঠিত করা যে কোন সামাজিক সংগঠনের লক্ষ্য। গ্রন্থাগার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলে গ্রন্থাগারের লক্ষ্যও একই।

এই লক্ষ্যের সামাজিক প্রয়োজনীয়তা

যে কোন গৃহকে শক্ত করে গড়ে তুলতে হলে যেমন উপযুক্ত উপাদানের প্রয়োজন ঘটে, সভ্যতার ইমারতকে ঠিক মত গড়ে তুলতে সেই ভাবেই পূর্ণ বিকশিত মানুষের প্রয়োজন হয়।

ইতিহাসের নানা পুঞ্জীভূত সমস্যার মধ্য দিয়ে মানব সমাজ এগিয়ে চলেছে। তার ক্রমবর্দ্ধমান জন সংখ্যার কাছে প্রাকৃতিক সম্পদ ক্রমেই অপ্রচুর হয়ে পড়ছে। নূতন সম্পদের সৃষ্টির জন্য গবেষণার প্রয়োজন ঘটছে।

সমাজের মানুষকে গণতন্ত্রের পক্ষে সর্বরকমে উপযোগী করতে হলে তার মনকে পারিপার্শ্বিক অযৌক্তিক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা দরকার। মনের এই মুক্তি সম্ভব হতে পারে চিন্তা এবং বুদ্ধিকে জাগিয়ে তুলে এবং সুস্থ রেখে।

অক্ষরাশ্রয়ী শিক্ষার মাধ্যমে যে জ্ঞান আমরা লাভ করে থাকি তাকে সঞ্জীবিত রাখতে হলে শিক্ষায়তনের বাইরে এসেও নিয়মিত অনুশীলন করা দরকার।

ব্যক্তিগত জীবনের অবকাশকে সার্থক ভাবে ব্যবহার করতে হলে উপযুক্ত পরিমাণ মনের খোরাকের দরকার।

এই সমস্ত কর্ত্তব্য একমাত্র গ্রন্থাগারই পালন করতে পারে। কাজেই সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে তার মানুষকে পরিপূর্ণ করে তুলতেই হবে। চিন্তায়, বুদ্ধিতে, অসম্পূর্ণ মানুষ সমাজের অগ্রগতিকে ব্যাহত করবে। আমাদের দেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির বিভিন্ন অংশে এর স্বীকৃতি আছে।

ব্যক্তিগত মানুষের বিকাশে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

গ্রন্থাগার মূলত এই ব্যক্তিগত মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সহায়ক। বর্তমান সমাজে গ্রন্থাগারের সহায়তা ছাড়া ব্যক্তিগত মানুষকে তার নিজের রুচি এবং শক্তিমত পূর্ণ বিকশিত হতে দেওয়া সম্ভব নয়। জনশিক্ষা বিতরণের জন্য সমস্ত উপায়ই শুধু মোটা মাপের মানুষকেই সৃষ্টি করতে পারে, তার বেশী আর কিছু নয়।

গ্রন্থাগারের ঐতিহাসিক রূপ

মানবসমাজের আহৃত জ্ঞানকে সাধ্যমত সমবণ্টনের উপায় হিসাবেই গ্রন্থাগারের জন্ম। এই আহৃত জ্ঞান আর তার প্রকাশিতরূপের ভাণ্ডার, স্থান-কাল-পাত্র হিসাবে অল্পাধিক বিভিন্ন হতে পারে। গ্রন্থাগার সেই দিক দিয়ে এক বিশেষ সামাজিক অবস্থার সৃষ্টি। কিন্তু মনোজগতে নানা ধরণের আলোড়নের সৃষ্টি করে সেই স্থান-কাল-পাত্রের সীমানাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা গ্রন্থাগারের মধ্যেই নিহিত আছে। গ্রন্থাগার তাই এক বিশেষ সমাজের সৃষ্টিও বটে, কিন্তু এক উন্নততর সমাজের স্রষ্টাও বটে। গ্রন্থাগারের ঐতিহাসিক কর্তব্য শুধু সমকালীন সমাজ মনকে তৃপ্ত করার মধ্যেই নিহিত নয়। সেই সমাজের মানুষের মনের অসম্পূর্ণতাকে দূর করে আগামী যুগের মানবমনকে জাগ্রত করে তোলাও তার কর্তব্যের মধ্যে।

গ্রন্থাগারের বিবর্তনের পথ

উপরের লক্ষ্যকে সামনে রেখে, স্থান-কাল-পাত্রের কথা চিন্তা করে, গ্রন্থাগারকে প্রয়োজনীয় রূপে বিবর্তিত করে তোলা গ্রন্থাগার সম্বন্ধে চিন্তাশীল

ব্যক্তিদের অবশ্য কর্ত্তব্য। গ্রন্থাগার সামাজিক সংগঠন বলে যে কোন সমাজ বা যুগের প্রভাবই তার আকৃতি এবং প্রকৃতিকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু সমস্ত সাময়িক প্রভাবের ঊর্দ্ধে গ্রন্থাগারের যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনের রূপ এবং বিবর্তনের পথের ইঙ্গিত বর্তমান থাকে তাকে ঠিক মত উপলব্ধি করে সংগঠনকে ঠিক পথে পরিচালিত করা এ পথের কর্মীদের অবশ্য কর্তব্য।

স্বল্পশিক্ষিতের দেশে গ্রন্থাগারের সংজ্ঞা

শব্দার্থের দিক দিয়ে গ্রন্থাগার গ্রন্থের অর্থাৎ প্রধানত মুদ্রিত পুস্তকের সংগঠন মাত্র। কিন্তু আমাদের দেশে, যেখানে ভয়াবহ আকারের নিরক্ষরতার জন্য গ্রন্থ এখনও অধিকাংশের মনকে স্পর্শ করতে পারে না সেখানে গ্রন্থাগারকে এই সংকীর্ণ গ্রন্থকেন্দ্রিকতার মধ্যে আবদ্ধ রাখা কাজের নয়। নামের অর্থমাত্রকে প্রাধান্য দিয়ে সমস্ত সংগঠনটির সামাজিক বিবর্তনকে প্রতিহত করা একেবারেই যুক্তিসহ নয়।

অনেকে গ্রন্থাগারের শব্দার্থকেই প্রাধান্য দিয়ে বলে থাকেন যে উপযুক্ত পরিমাণ শিক্ষিতের সৃষ্টি হওয়ার পর জনসাধারণ গ্রন্থ ব্যবহারে সক্ষম হ'লে তখনই গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রকৃত উন্নতির চিন্তা করা সম্ভব এবং স্বাভাবিক। কিন্তু সে উক্তিও যুক্তিসহ নয়। ভারতের মত নিরক্ষরজনবহুল দেশে শুধুমাত্র প্রচলিত শিক্ষায়তনের সাহায্যে বিশাল নিরক্ষর জনতাকে শিক্ষিত করে তোলা সম্ভব নয়। এই বছরের আদম সুমারিতে জানা গেছে যে বর্তমান সরকারের শিক্ষা বিতরণের সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গে যেখানে জন সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৩২ জন করে সেখানে সাক্ষর লোকের সংখ্যা বেড়েছে শতকরা ৮ জন করে মাত্র। কাজেই নিরক্ষর সাধারণের সংখ্যা এখনও বাড়বার দিকেই কমবার দিকে নয়।

গ্রন্থাগারকে তাই প্রচলিত শিক্ষায়তনগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং অন্য কর্মধারার সঙ্গে নিরক্ষর সাধারণের উপযোগী কর্মধারা গ্রহণ করে তাঁদের স্বশিক্ষার পথে আকর্ষণ করতে হবে। একমাত্র সেই পথেই দেশের শিক্ষা সংস্কৃতির বুনিয়াদ শক্ত হতে পারে এবং তার উপায় হিসাবে গ্রন্থাগারের বুনিয়াদও শক্ত হবে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার জগৎ

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার জগৎকে যদি বিশ্লেষণ করা যায় তবে দেখা যাবে যে এই গ্রন্থাগার জগতে বর্তমানে মোটামুটি ৪টি শক্তি কাজ করছে। গ্রন্থাগার ব্যবস্থার উন্নতির পথ খুঁজে বার করতে হলে এই ৪টি শক্তির কাজের একটি মোটামুটি হিসাব করা দরকার। এই ৪টি শক্তি যথাক্রমে সরকার, মিউনিসিপ্যালিটিগুলি, জনপরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ।

(ক) সরকারি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা।

সরকারি ব্যবস্থায় সমস্ত দেশের উপযোগী গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর উপর দাঁড় করানোর চেষ্টাও করা হয়েছে। Library Advisory Committeeর রিপোর্ট ও এই বিষয়ে দৃষ্টি পড়ার সাক্ষ্য দেয়। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে এই কাঠামোটি যে রূপ পেয়েছে তা নীচে দেওয়া হলো:
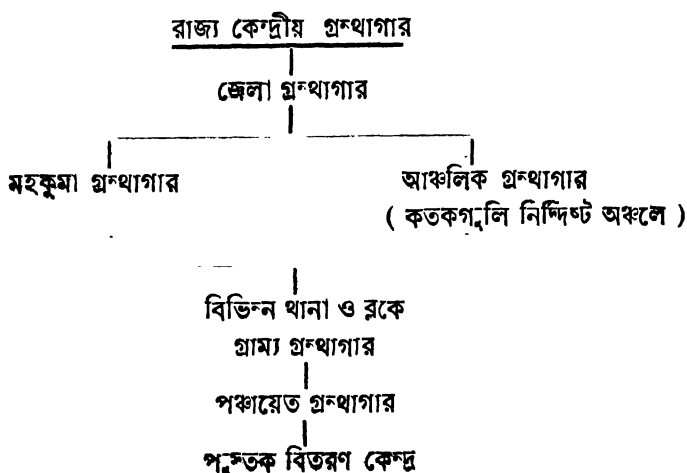
সমস্ত ব্যবস্থাটি রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার হতে পরিচালিত হবে। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার পরিচালিত হবে ১জন ডিরেকটার, ১জন গ্রন্থাগারিক, ৪ জন সহকারী গ্রন্থাগারিক, ১০ জন গ্রন্থাগার-সহকারী ও কিছু কেরাণী ও অন্যান্য কর্মী নিয়ে। আগামী এপ্রিল মাস হতে এই গ্রন্থাগারটি

চালু হবার কথা। এই গ্রন্থাগারটির জন্য প্রাথমিক ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে নিম্ন মত :

(ক) বই পত্র............১,৫০,০০০ টাকা (প্রাথমিক)
(খ) আসবাব পত্র.........১,০০,০০০ ,, ,,
(গ) গ্রন্থযান......... ...২৫,০০০

বাংলা দেশের তিনটি বড় জেলা—বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চব্বিশ-পরগণার মধ্যে প্রথম দুটিতে দুটি করে জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। চব্বিশ-পরগণায় স্থাপিত হয়েছে তিনটি। জেলা গ্রন্থাগারগুলির কাজ চালান ১ জন গ্রন্থাগারিক, ২ জন গ্রন্থাগার-সহকারী, ২ জন সহায়ক (attendant) ১ জন করে গ্রন্থযানের ড্রাইভার, ঝাড়ুদার, দারোয়ান, পাহারাদার, পিয়ন ও দপ্তরী। এইগুলির প্রাথমিক ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে নিম্ন মত :

(ক)	বাড়ী	...	...	৭৮,০০০	টাকা
(খ)	বই পত্র	...	...	১২,০০০	,, (প্রাথমিক)
(গ)	আসবাব পত্র	...	...	১৫,০০০	,, ,,
(ঘ)	গ্রন্থযান	...	...	২৫,০০০	,,
			মোট	১,৩০,০০০	,,

বই পত্রের জন্য বাৎসরিক খরচ ধরা হয়েছে ৩,০০০ টাকা ও অন্যান্য খাতে ৪,০০০ টাকা। একটি জেলা গ্রন্থাগারের মোট পরিচালন খরচা ধরা হয়েছে ১৮,০০০ টাকা। জেলাগ্রন্থাগারগুলির খরচ যোগানো, তদারক করা এবং হিসাবপত্র দেখার কাজ সরকারের উপরে ন্যস্ত। কিন্তু জেলা গ্রন্থাগারগুলির পরিচালন ভার জেলা গ্রন্থাগার পরিষদগুলির উপরই ন্যস্ত।

সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ২৪টি এলাকায় বুনিয়াদি শিক্ষা, সমাজ শিক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে শিক্ষাউন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে ২৪টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। এই লাইব্রেরিগুলি চালান ১ জন করে গ্রন্থাগারিক ও একজন করে সাইকেল পিয়ন। এর ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে নিম্ন মত :

(ক)	বাড়ী	...	...	২৫,০০০	টাকা
(খ)	বই পত্র	...	..	৮,০০০	,, (প্রাথমিক)
(গ)	আসবাবপত্র	...	...	৮,০০০	,, ,,
			মোট	৪১,০০০	,, ,,

বিভিন্ন খাতে এর মাসিক খরচ ধরা হয়েছে ৪০ টাকা করে।

ঐ আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলির নীচে ১২০টি শাখা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। এগুলি সেচ্ছাসেবীকর্মীদের দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং এরা বই বা আসবাবপত্র পায় কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে। এর মাসিক ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে ১০ টাকা করে।

বাণীপুর আর কালিম্পংএ আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের মতই দুটি প্রতিষ্ঠান সরকার স্থাপিত করেছেন শিক্ষার উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সহায়তা করবার জন্য।

জেলাগ্রন্থাগারের নীচেই বিভিন্ন থানা এলাকায় কমপক্ষে ১টি করে গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। এই গুলির বর্তমান মোট সংখ্যা ৪৬৪টি। হয় কোন প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরীকেই গ্রামীণ গ্রন্থাগার হিসাবে গড়ে তোলা হয় না হলে কোন নূতন লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই গ্রন্থাগারগুলি চালান ১ জন গ্রন্থাগারিক ও ১ জন সাইকেল পিয়ন। এর ব্যয়ের বরাদ্দ—

(ক)	বাড়ী	৬,০০০ টাকা (এর মধ্যে সরকার ৪,০০০৲ আঞ্চলিক লোকেদের দেয় ২,০০০৲)
(খ)	বইপত্রাদি	২,০০০ টাকা (প্রাথমিক)
	মোট	৮,০০০ টাকা

বিভিন্নখাতে মাসিক খরচের জন্য ৫০ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সরকারের সম্পূর্ণ আর্থিক দায়িত্বে কিন্তু আঞ্চলিক কমিটির পরিচালনায় গত ৬ বছরে ৫০৮টি স্পনসর্ড গ্রন্থাগার (Sponsored public libraries) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই গ্রন্থাগারগুলিতে বিনা চাঁদায় বই বাড়ীতে নিয়ে যেতে দেওয়া হয়।

গ্রন্থাগার উন্নয়ণের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিভিন্ন মহাকুমায় এবং বড় বড় শহর গুলিতে গ্রন্থাগার স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং সমস্ত সহরটির জন্য একটি গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। প্রতিটি থানা এলাকায় ও পঞ্চায়েত এলাকায় গ্রন্থাগার সংগঠনের এবং জেলা, গ্রাম, এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির গ্রন্থাগার কর্ম্মীদের জন্য শিক্ষা দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

এই সমস্ত গ্রন্থাগারের মধ্য দিয়ে সাধারণকে এখন পর্য্যন্ত কি পরিমাণে তৃপ্ত করা সম্ভব হয়েছে তার পরিসংখ্যান নীচে দেওয়া হ'লো।

শ্রেণী	সংখ্যা	পুস্তক সংখ্যা	ব্যবহৃত পুস্তকের সংখ্যা	ব্যবহারকারীর সংখ্যা
রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	১	৩০ হাজার		
জেলা গ্রন্থাগার	১৯	১,৩৬ ,,	৪,০০ হাজার	৩,৩০ হাজার
আঞ্চলিক গ্রন্থাগার	২৪	৫০ ,,	১,০০ ,,	৭০ ,,
গ্রামীণ গ্রন্থাগার	৪,৬৪	২,৩২ ,,	৪,০০ ,,	৩,০০ ,,
সাধারণ চাঁদা আদায়কারী গ্রন্থাগার (সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত)	১,০০০	২,৫০০ ,,	৪,০০০ ,,	৫,০০ ,,
মোট	১,৫০৮	২,৯৪৮ হাজার	৪,৯০০ হাজার	১,২০০ হাজার

[সমস্ত তথ্য শ্রীনিখিল রায়ের An outline for the Library Development scheme for West Bengal প্রবন্ধ হ'তে নেওয়া। প্রবন্ধটি যে পত্রিকায় ছাপা হয়েছে তার নাম The Journal of the Indian Library Association ; Vol. 3 No. 1 Pages 33-40. প্রবন্ধটির একটি অনুবাদ পত্রিকার এই সংখ্যায় প্রকাশিত হলো।]

(খ) মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে কোন মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নেই। বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটি ও কলিকাতা কর্পোরেশন এদিকে তাঁদের কর্তব্য সম্পাদন করেন কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য করে। এ সাহায্যের পরিমান প্রয়োজনের তুলনায় যৎসামান্যই !

(গ) জনপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলি

পশ্চিমবঙ্গের জনপরিচালিত গ্রন্থাগারগুলির বেশীরভাগই নানা সামাজিক আন্দোলনের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেছে। এঁদের খরচের অধিকাংশই সদস্যদের

চাঁদা থেকে কুলাতে হয়। এঁদের অধিকাংশের কাজ চলে অবৈতনিক কর্মীদের সাহায্য নিয়ে। সরকার ও মিউনিসিপ্যালিটির কাছ থেকে যে সাহায্য এঁরা পান তা আদৌ যথেষ্ট নয়।

(ঘ) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

পরিষদ প্রথম যুগে গ্রন্থাগারব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তাকে সরকার এবং জনসাধারণের কাছে বোঝাবার চেষ্টা করে এসেছে। সেই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা যখন অন্ততঃ পরিপূর্ণ মৌখিক স্বীকৃতি পেয়েছে, তখন পরিষদের কর্মধারাকে এই বাঞ্ছিত গ্রন্থাগারব্যবস্থাকে সম্ভব এবং স্থায়ী করবার দিকে প্রয়োগ করা হয়েছে। বিভিন্ন দেশের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে পরিষদের কর্তৃপক্ষের মনে হয়েছে যে, কোন আইনের সুনির্দ্ধারিত ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হ'লে এ গ্রন্থাগারব্যবস্থাকে প্রয়োজনের উপযোগী করাও সম্ভব নয় বা স্থায়ী করাও সম্ভব নয়। তাই পরিষদের বর্তমানের কর্মধারায় সবচেয়ে জোর দেওয়া হয়েছে এই গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের চিন্তায়। এই চিন্তা সঠিক কি না তার বিচারের জন্য আমাদের সমস্ত দেশের গ্রন্থাগারব্যবস্থার বর্তমানের সঙ্কটকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার।

গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সঙ্কট

রাজ্যের এই সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল্যায়ন করলে কতকগুলি বিশেষ বিশেষ ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা চোখে পড়ে ঃ

(ক) সরকারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ত্রুটি

(১) বিনা চাঁদার গ্রন্থাগারব্যবস্থার আজও গোড়াপত্তন হয়নি বলা চলে। (২) গ্রন্থাগার কর্মীদের প্রদত্ত বেতন আজও প্রয়োজনের চেয়ে অনেক নীচে। (৩) বে-সরকারী জনপরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলি কিভাবে নিজেদের এই রাজ্যব্যাপী গ্রন্থাগারব্যবস্থার সঙ্গে মিশিয়ে দেবে তা আজও নির্ধারিত হয়নি। (৪) সমগ্র গ্রন্থাগারব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার কোন সুষ্ঠু চিন্তা এখনও করা হয়নি বলে প্রতীয়মান হয়।

পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার আইন—

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের প্রথম চেষ্টা করেন স্বর্গীয় মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়। তিনি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে তৎকালীন আইন সভায় একটি গ্রন্থাগার আইন বিল উত্থাপনের জন্য পেশ করেন। কিন্তু বিদেশী সরকারের প্রতিকূলতার জন্য বিলটি প্রত্যাহার করে নেন।

পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য একটি খসড়া বিল উত্থাপন করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বিধান সভার ব্যবহারিক নিয়মানুযায়ী তা উত্থাপন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপের দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি খসড়া গ্রন্থাগার আইন গৃহীত হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে এই সমস্ত কথা বিবেচনা করে একটি গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের অনুরোধ করা হয়।

১৯৫৯ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত Library Advisory Committee-র রিপোর্টে গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের নির্দেশ আছে।

সর্বভারতীয় একটি মডেল আইন প্রণীত হচ্ছে বলে শোনা গেছে। কিন্তু আজও পশ্চিমবঙ্গে কোন গ্রন্থাগার আইন প্রণীত হয়নি।

গ্রন্থাগার আইনের বিরুদ্ধে প্রধান যুক্তি করভার—

আইনমত এবং সুপরিকল্পিতভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে চালাতে হলে যে গ্রন্থাগার করের ব্যবস্থা থাকবে একথা আমরা মেনে নিই। কিন্তু এই করের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুক্তি দিয়ে অনেক সময় আমাদের মনকে সমস্ত আইনের প্রতি বিমুখ করে তোলার চেষ্টা চলে। যুক্তিগুলি এই—

(১) এটি একটি নূতন কর।

(২) এই কর দরিদ্র সাধারণের জীবনে নূতন চাপ ও নূতন কষ্টের সৃষ্টি করবে।

(৩) এই করের সাহায্যেও যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হবে না।

এই উক্তিগুলির যাথার্থ বিচার করে দেখবার জন্য প্রথমেই ভাবতে হবে আমরা পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চাই কিনা। তা যদি চাই তবে আইন ও করের বিকল্প প্রস্তাব সরকারের দপ্তরের মঞ্জুরীকৃত অর্থে টিকে থাকা বেশী সুবিধার কিনা তা বিচার করে দেখবার। কারণ

(১) গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে সাহায্য করবার জন্য সরকারী অর্থ জন-

সাধারণের কাছ থেকেই সংগৃহীত হবে। কিন্তু স্বনামে সংগৃহীত না হলে এই অর্থ সুচিহ্নিত হবে না। ফলে বিভিন্ন দপ্তরের বা বিভিন্ন নেতৃস্থানীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তিদের ইচ্ছা এবং চিন্তার প্রভাবে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার যোগানের অর্থের পরিমাণে অনিশ্চয়তা আসতে পারে।

(২) এই করের ভার জনসাধারণের মধ্যে যাঁরা সম্পত্তি কর দেন তাঁদের উপরই পড়বে। কিন্তু জনসাধারণের অন্য অধিকাংশ কর না দিলেও গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সুযোগ পাবার আইন সঙ্গত অধিকারী হবেন।

(৩) যাঁদের উপর করের চাপ পড়বে তাঁদের অনেকেই বর্তমানের চেয়ে বেশী প্রপীড়িত হবেন না। বর্তমানে প্রায় সব ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারের নিম্নতম চাঁদার হার মাসিক ২৫ নঃ পঃ অর্থাৎ বছরে ৩৲ টাকা। বই নেওয়ার সুবিধে পান মাত্র ১ জন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের খসড়া আইন মতে ঐ পরিমাণ কর দেবেন একমাত্র তাঁরাই যাঁরা এখন বছরে ১০০৲ টাকার সম্পত্তি কর দিয়ে থাকেন। কিন্তু এতে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পাবেন পরিবারের প্রত্যেকেই।

(৪) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার খরচকে শুধুমাত্র এই কর মারফৎ সংগৃহীত অর্থে মেটাবার জন্য বর্তমানের গ্রন্থাগার করের পরিকল্পনা করা হয়নি। এর সঙ্গে কেন্দ্রীয় সাহায্য এবং রাজ্য সরকারের সাহায্য রাখতেই হবে। কিন্তু গ্রন্থাগার করের ব্যবস্থা থাকলে অর্থের পরিমাণ সুচিহ্নিত হয়ে যাবে এবং ব্যয় নির্দ্ধারণের জন্যও এই করই একটি মোটামুটি মাপকাঠির কাজ করবে।

সম্মেলনের অভিমতে—

এই সম্মেলনকে তাই বিচার করতে হবে যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় স্থায়ীত্ব এবং পূর্ণতা আনার জন্য, গ্রন্থাগারকর্মীদের জীবনকে স্বচ্ছন্দ ও নিরুদ্বিগ্ন করার জন্য গ্রন্থাগার আইনের আশু প্রবর্তন প্রয়োজন কিনা।

এই আইনের প্রবর্তন প্রয়োজন হলে অন্যান্য রাজ্যের আইনকে বিচার করে, পশ্চিমবঙ্গের নানা বেসরকারী খসড়া আইনকে বিচার করে এবং গ্রন্থাগার পরিষদ ও অন্যান্য গ্রন্থাগার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিয়ে উপযুক্ত গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের এবং জনসাধারণের তরফ হ'তে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

(খ) মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অভাব

কলিকাতার মত বিরাট শহরে মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা না থাকা নিশ্চয়ই গৌরবের নয়। কলিকাতা কর্পোরেশনের নেতৃবৃন্দ একাধিকবার এই শহরে মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থা চালু করার কথা বলেছেন কিন্তু আজও তাকে রূপ দেওয়া এই পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। সাময়িক অল্পাধিক অর্থ সাহায্য করে মিউনিসিপ্যালিটিগুলি যে কর্তব্য পালন করার কথা ভাবেন তাকে নিশ্চয়ই ঠিকমত কর্তব্য পালন করা বলা যায় না।

(গ) জনপরিচালিত গ্রন্থাগার সমূহের অসহায়তা

(১) মুখ্যতঃ চাঁদার উপর নির্ভরশীল বলে এবং দেশের শিক্ষার হার ও পারিবারিক আয়ের পরিমাণ বেশ নীচু বলেই আমাদের দেশের গ্রন্থাগারগুলির পক্ষে অর্থের স্বাচ্ছল্য লাভ করা আদৌ সম্ভব নয়। (২) বিভিন্ন জিনিসের দামের সংগে বইএর দাম এবং বাঁধাইয়ের খরচ অত্যন্ত বেড়ে যাওয়ায় সমস্ত গ্রন্থাগারগুলির জীবনে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। (৩) সমাজ জীবনে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি হবার ফলে অবৈতনিক কর্মীর সংখ্যা আগের তুলনায় অত্যন্ত কমে গিয়েছে। যাও আছে তাও স্বল্প সময়ের, ফলে অর্থ সংকট এবং কর্মী সঙ্কট অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গ্রন্থাগারগুলিকে দুর্বল করে দেয় এবং স্বল্পায়ু করে দেয়।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উপায়হীনতা

একই অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্য গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মধারা বহুলাংশে ব্যাহত হয়ে চলেছে। (১) বাংলা ভাষায় গ্রন্থাগার বিদ্যার বই প্রয়োজন হলেও অর্থের অভাবেই তা ছাপা সম্ভব হয় না। (২) বিভিন্ন মানের গ্রন্থাগার বিদ্যা শিক্ষিতের প্রয়োজন থাকলেও এবং সে শিক্ষা দানের যোগ্যতা পরিষদের যথেষ্ট থাকলেও কেবলমাত্র অর্থাভাবে পূর্ণ সময়ের কর্মী নিয়োগ করে উপযুক্ত কর্মধারা গ্রহণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। (৩) সমস্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তন সুচিন্তিত না হওয়ার ফলে সাময়িকভাবে গ্রন্থাগার কর্মীর যোগান বাজারের উপযুক্ত মূল্যের চাহিদাকে অনেকটাই ছাড়িয়ে যায়। ফলে শিল্প কুশল কর্মীরা অল্প বেতনের চাকুরী নিতে বাধ্য হন এবং তাঁদের মধ্যে বেকার সমস্যা দেখা দেয়। পরিষদকে এই কারণে শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমের দিকে রাখতেই

হয়। (৪) গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে জনমানসে ঠিকমত প্রতিফলিত করতে হ'লে যে পরিমাণ অর্থের দরকার তার এক ভগ্নাংশ মাত্রই গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে ব্যয় করা সম্ভব। ফলে সাধারণ লোকের মধ্যে সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার জন্য উপযুক্ত অনুভূতির সঞ্চার আজও হয়নি।

সঙ্কটের মূল রূপ—

সমগ্র গ্রন্থাগার ব্যবস্থার এই সংকটকে আলোচনা করলেই দেখা যাবে যে এর প্রধানতম কারণ দুটি—(১) অপরিমিত ও কম-বেশী অনিশ্চিত অর্থ, (৩) অনিশ্চিত অবৈতনিক কর্মী এবং অনুপযুক্ত পারিশ্রমিকে নিযুক্ত বেতনভুক কর্মী। এই দুয়ের কারণই মুখ্যত অর্থের অভাব এবং সঠিক পরিকল্পনার অভাব।

সমাধানের পথ—

এই অর্থের যোগান মূলত দুই ভাবে করা সম্ভব (১) সরকারী দপ্তরের অর্থ মঞ্জুরী মারফৎ এবং (২) কোন নির্দিষ্ট আইনের সাহায্যে কর নির্ধারণ করে।

সরকারী দপ্তর মারফৎ পরিচালনের ত্রুটি মূলতঃ (১) সরকারী তহবিল থেকে ব্যয় পদ্ধতি প্রয়োজন অনুযায়ী ও সুনির্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী নাও হতে পারে। অনুসৃত নীতি এই অর্থে অনিশ্চিত হলে গ্রন্থাগারগুলির জীবনে ও তাদের কর্মীদের জীবনে অবাঞ্ছিত সংকটের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। (২) সরকারী পরিচালনে জনসাধারণের অল্পাধিক প্রতিনিধির বন্দোবস্ত থাকলেও জনসাধারণকে এর দায়িত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন করতে পারে না। (৩) এই পরিচালনে কেন্দ্রীভূত দপ্তরের পরিচালনার সহজাত ত্রুটি থাকবেই।

আইন—

আইনের প্রয়োজন প্রধানতঃ কয়েকটি কারণে (১) আইন উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে পরিপূর্ণ সামাজিক স্বীকৃতি দেবে। (২) গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ব্যয়নির্বাহের অর্থ সুচিহ্নিত হয়ে যাবে। সরকারী পরিচালনে দল বা ব্যক্তি পরিবর্তনে ব্যয় বরাদ্দের কোন অসুবিধাকর পরিবর্তন ঘটবে না। (৩) গ্রন্থাগার কর্মীদের জীবনে অবাঞ্ছিত অর্থনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হবে না। (৪) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শিক্ষা বিতরণকে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রসারণপরিকল্পনার সংগে তাল মিলিয়ে চালান সম্ভব হবে। (৫) গ্রন্থাগার মারফৎ জনসেবার মান ক্রমশঃ উঁচু হতে থাকবে। (৬) সমস্ত গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মধ্যে স্থায়িত্বের চিহ্ন আসবে।

পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা

নিখিল রঞ্জন রায়

প্রথম অধ্যায় :

রাজ্যসরকার কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা ১৯৫০-৫১ সালে প্রথম গৃহীত হয়। সূচনায় ১,০৬,১০০৲ টাকা বিভিন্ন সাধারণ চাঁদার গ্রন্থাগার (Subscription library) গুলির পুস্তক সংগ্রহ ও আসবাবপত্রাদি উন্নয়নের জন্য ব্যয় হয়। একই সময়ে সদ্য-স্বাক্ষরদের (neo-literates) পরবর্তী শিক্ষার সুব্যবস্থা করার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে, বিভিন্ন সমাজশিক্ষা কেন্দ্রগুলির সঙ্গে যুক্ত বা সংশ্লিষ্টভাবে কতকগুলি পাঠকক্ষ ও গ্রন্থাগার কেন্দ্র স্থাপনের জন্য আর্থিক সাহায্য করা হয়। তদবধি এই খাতে রাজ্যশিক্ষা বাজেটে বাৎসরিক ১,৪০,০০০৲ টাকা আর্থিক সাহায্যদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই আর্থিক সাহায্যদানের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধারণ চাঁদার গ্রন্থাগারগুলিকে পরিপুষ্ট ক'রে তাদের কার্যব্যবস্থা যাতে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারে ও শিক্ষার অগ্রগতিতে সাহায্য করতে পারে তারই ব্যবস্থা করা। সরকারের কাছ থেকে এই আর্থিক সাহায্য পাওয়ার জন্য গ্রন্থাগারগুলিকে কতকগুলি সর্বনিম্ন সর্ত পূরণ করতে হয়। এইভাবে গ্রন্থাগারগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

'ক' বিভাগ

(১) গ্রন্থাগার একটি অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান হবে।
(২) একটি স্বীকৃত পরিচালক মণ্ডলীর দ্বারা পরিচালিত হবে।
(৩) নিজস্ব গৃহ অথবা সম্ভাব্য ভাড়া-বাড়ী থাকবে এবং সেখানে পাঠ-কক্ষের সুব্যবস্থা থাকবে।
(৪) ১০,০০০ বা অধিক পুস্তক সংগ্রহ থাকবে।
(৫) বাৎসরিক ৩,০০০৲ টাকার বাজেট থাকবে।
(৬) হিসাব পত্রাদি সুরক্ষণ এবং বাৎসরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।
(৭) ২০০ বা অধিক সংখ্যক নিয়মিত সদস্য থাকবে।

'খ' বিভাগ

(১—৩) 'ক' বিভাগের অনুরূপ
(৪) ৩০০০ বা অধিক পুস্তক সংগ্রহ থাকবে।
(৫) ১,০০০৲ টাকা বাৎসরিক বাজেট থাকবে।
(৬) হিসাবপত্রাদি সুরক্ষণ ও বাৎসরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে।
(৭) ১০০ বা অধিক সংখ্যক নিয়মিত সদস্য থাকবে।

'গ' বিভাগ

গ্রামীণ গ্রন্থাগার (Rural library) 'গ' বিভাগের অন্তর্গত। নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য থাকবে ঃ

(১) সুপরিচালনা ব্যবস্থা

(২) পাঠের জন্য সম্ভাব্য সুব্যবস্থা।

(৩) ৫০০ বা অধিক পুস্তক সংগ্রহ।

(৪) ৩০০৲ টাকার বাৎসরিক বাজেট।

(৫) হিসাবপত্রাদি সংরক্ষণ ও পরীক্ষার ব্যবস্থা।

প্রায় ১,০০০ সাধারণ চাঁদার গ্রন্থাগার সরকারের শিক্ষা বিভাগ থেকে বাৎসরিক আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে। গ্রাম্য গ্রন্থাগার (village library) গুলি জাতীয় উন্নয়ন খাতে সাহায্য পায়।

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ

প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমাপ্তির মুখে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভে গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার দ্বিতীয় অধ্যায় সূচিত হয়। ভারত সরকারের কাছ থেকে পরিপূরক আর্থিক সাহায্য (matching grant) পাওয়া যায়। দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ভিতর পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ গ্রন্থাগার উন্নয়নের নিম্নরূপ চিত্রটি পাওয়া যায় ঃ

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (State Central Library)

|

জেলা গ্রন্থাগার

|

মহকুমা গ্রন্থাগার — আঞ্চলিক (Area) গ্রন্থাগার (নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলে)

|

গ্রামীণ গ্রন্থাগার (Rural Libraries) (থানা বা ব্লক হিসাবে)

|

গ্রাম্য (Village) গ্রন্থাগার (পঞ্চায়েত হিসাবে)

|

পুস্তক বিতরণ এবং পুস্তক সংগ্রহণ কেন্দ্র
(Delivery) (Deposit)

রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার :

রাজ্যের সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সংগঠন ও উন্নয়ন ব্যবস্থার পরিচালনা ও সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে ৫৬-এ, ব্যারাকপুর ট্রাংক রোড, কলিকাতায় একটি পুরাতন গৃহে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়। গৃহটি সংস্কার করে বাসোপযোগী করার জন্য ৬০,০০০৲ টাকা ব্যয় হয়। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের জন্য প্রারম্ভিক ব্যয় :—

১।	পুস্তক ...	১,৫০,০০০৲
২।	আসবাবপত্রাদি ও সরঞ্জাম	১,০০,০০০৲
৩।	গ্রন্থযান (Book van)	২৫,০০০৲

১ জন পরিচালক (Director), ১ জন গ্রন্থাগারিক, ৪ জন সহকারী গ্রন্থাগারিক, ১০ জন গ্রন্থাগার-সহকারী (Library Assistant), কতিপয় কেরাণী ও অন্যান্য কর্মী নিয়ে এর কর্মী পরিষদ গঠিত। কতিপয় কর্মী নিযুক্ত করা হয়েছে। গ্রন্থাগারটিকে উপযোগী করার জন্য প্রাথমিক কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। গ্রন্থাগারটি এপ্রিল মাস থেকে চালু হওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

জেলা গ্রন্থাগার :

সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের পরেই জেলা গ্রন্থাগার। ১৯টি জেলা গ্রন্থাগার এ পর্যন্ত স্থাপিত হয়েছে। ১৫টি জেলায় ১টী করে, এবং বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণায় তিনটি বৃহৎ জেলায় প্রত্যেকটিতে অতিরিক্ত ১টী ক'রে জেলা গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। বৃহত্তম জেলা ২৪ পরগণার লোক সংখ্যা ও পরিধির দিক দিয়ে বিবেচনা ক'রে তৃতীয় ১টী গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়। ১৯টী জেলা গ্রন্থাগারের কাজ ভালভাবেই চলছে।

জেলা গ্রন্থাগারের জন্য প্রারম্ভিক ব্যায় :

গৃহ—	৭৮,০০০৲
পুস্তক—	১২,০০০৲
আসবাবপত্রাদি ও সরঞ্জাম—	১৫,০০০৲
গ্রন্থযান—	২৫,০০০৲
	১,৩০,০০০৲

১ জন গ্রন্থাগারিক, ২ জন গ্রন্থাগার সহকারী, ২ জন গ্রন্থাগার কর্মী (library attendants), ড্রাইভার, ক্লিনার, দারোয়ান, নাইট গার্ড, পিয়ন ও দপ্তরী মোট ১১ জন নিয়ে জেলা গ্রন্থাগার কর্মী পরিষদ গঠিত।

বাৎসরিক ব্যয় ঃ

পুস্তক ও পত্রপত্রিকা—	৩,০০০৲
আনুষঙ্গিক খরচ—	৪,০০০৲

জেলা গ্রন্থাগার কার্যকরী রাখার জন্য বাৎসরিক ১৮,০০০৲ টাকা ব্যয় হয়। যদিও সরকার জেলা গ্রন্থাগারকে আর্থিক সাহায্য দেন, তবুও এর সংগঠন ও পরিচালনা ব্যবস্থা জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ নামে একটি স্বাধীন সংস্থা দ্বারা হয়ে থাকে। সরকার হিসাবপত্রাদি পরীক্ষা, তত্ত্বাবধান এবং পরিদর্শনাদির মাধ্যমে কর্তৃত্ব করে থাকেন।

আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ঃ

পরিকল্পনা ও সংগঠনের দিক দিয়ে আঞ্চলিক গ্রন্থাগারগুলি প্রায় জেলা গ্রন্থাগারের সদৃশ। কেবলমাত্র আঞ্চলিক গ্রন্থাগার ৫।৬ মাইল বিস্তৃত একটী ক্ষুদ্র অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের সংগে গ্রামাঞ্চলের নিভৃততর ও অতিদূর প্রদেশে অবস্থিত কতকগুলি শাখা গ্রন্থাগার সংযুক্ত। এবং এই সমস্ত শাখা গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় পুস্তক ভাণ্ডার থেকে পাঠকদের পুস্তক সরবরাহ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে এ পর্যন্ত ১২০টী শাখা গ্রন্থাগার সংযুক্ত ২৪টি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে। অখণ্ড শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা। (integrated educational development Scheme)

যা বুনিয়াদী বিদ্যালয়, সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র ও শিক্ষক শিক্ষণ শিক্ষালয় নিয়ে গঠিত, আঞ্চলিক গ্রন্থাগার তারই একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে শিক্ষা উন্নয়নকে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা। আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের জন্য প্রারম্ভিক ব্যয় ঃ

গৃহ—	২৫,০০০৲
পুস্তক—	৮,০০০৲
আসবাবপত্রাদি এবং অন্যান্য—	৮,০০০৲
	৪১,০০০৲

কর্মী :

১ জন গ্রন্থাগারিক

সাইকেল পিয়ন

মাসিক ব্যয় :

আনুষঙ্গিক খরচ— ৪০৲

প্রতিটী শাখা গ্রন্থাগারের জন্য আনুষঙ্গিক খরচ—১০৲

শাখা গ্রন্থাগারগুলি স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক দ্বারা পরিচালিত। কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রাদি এবং পুস্তক সরবরাহ করা হয়। সংগঠন ও কার্যপ্রণালীর দিক দিয়ে আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের সমতুল্য দু'টী কেন্দ্রীয় সরকার-স্পনসর্ড (Govt. sponsored) গ্রন্থাগার অখণ্ড শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা অঞ্চল বাণীপুর ও কালিম্পংএ স্থাপিত হয়েছে। এই দু'টি গ্রন্থাগারে কর্মী ও আসবাব-পত্রাদি আঞ্চলিক গ্রন্থাগারের চেয়ে কিছু বেশী হারে দেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগার :

গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি জেলা গ্রন্থাগার কার্যব্যবস্থার ভিত্তি বা বুনিয়াদ। এ পর্যন্ত প্রত্যেকটি থানায় একটি ক'রে গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনায় হয় একটী চালু গ্রাম্যচাঁদার গ্রন্থাগারকে গ্রামীণ গ্রন্থাগারে উন্নীত করা হয়েছে অথবা নূতন একটী গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারের জন্য প্রারম্ভিক ব্যয় :

গৃহ— ৬,০০০৲ (৪,০০০৲ সরকার প্রদত্ত সাহায্য
২,০০০৲ স্থানীয় দেয় সাহায্য)

পুস্তক, আসবাব-পত্রাদি—২,০০০৲

৮,০০০৲

কর্মী :

১ জন গ্রন্থাগারিক

১ জন সাইকেল পিয়ন

মাসিক ব্যয় :

আনুষঙ্গিক খরচ—৫০৲ (স্থায়ী)

আঞ্চলিক এবং গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলি সরকার স্পনসর্ড এবং এর সমস্ত আর্থিক ব্যয়ভার সরকারের। কিন্তু সংগঠন ও পরিচালনা ব্যবস্থা স্থানীয়

পরিচালক মণ্ডলীর দ্বারা হয়ে থাকে। সরকার এইগুলির তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন করে থাকেন। গত ছ'বছরে পশ্চিমবঙ্গে মোট ৫০৮টি সরকার-স্পনসর্ড সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হয়েছে। এই সমস্ত গ্রন্থাগারে বিনামূল্যে পাঠকক্ষের ব্যবহার ও গৃহে পাঠের জন্য পুস্তক দেওয়া হওয়া হয়। অধিকাংশ গ্রন্থাগারে অবাধ অধিগম্য (open access) পদ্ধতি চালু আছে।

গ্রন্থাগারের জন্য বিশেষ সাহায্য ঃ

কতগুলি প্রাচীন ও প্রখ্যাত সাধারণ চাঁদার গ্রন্থাগারের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও কার্যব্যবস্থার প্রসারকল্পে সরকার কর্তৃক নিয়মিত (recurring) এবং অনিয়মিত (non-recurring) আর্থিক সাহায্য প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে উল্লেখ্য ঃ—

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা।
(২) উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার, হুগলী।
(৩) রামমোহন লাইব্রেরী, কলিকাতা।
(৪) পশ্চিমবঙ্গ সমাজ সেবা সমিতি, কলিকাতা।
(৫) বাঁশবেড়িয়া সাধারণ গ্রন্থাগার, হুগলী।
(৬) খিদিরপুর মাইকেল মধুসূদন লাইব্রেরী।

এছাড়াও, কলিকাতার তিনটি বিখ্যাত গ্রন্থাগার, রামকৃষ্ণ মিশন ইনসটিটিউট অফ কালচার, রেভঃ পি, সি, মজুমদার পাবলিক হল এ্যান্ড লাইব্রেরী এবং রামকৃষ্ণ মিশন অদ্বৈত আশ্রম লাইব্রেরী বহুলাংশে সরকারী অর্থ সাহায্য দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ ব্যবস্থার জন্য সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ এবং হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদকে নিম্নহারে আর্থিক সাহায্য দিয়ে থাকেন ঃ—

(১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়— ১২,০০০৲ (বাৎসরিক)
(২) বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ— ৩,০০০৲ ,,
(৩) হাওড়া জেলা গ্রন্থাগার পরিষদ— ১,৫০০৲ ,,

গ্রামের গ্রন্থাগারিকদের স্বল্পকালীন শিক্ষা দেওয়ার একটি পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১ কোটী ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করার পরিকল্পনা আছে।

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ

অর্থ সংগৃহীত হ'লে তৃতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা নিম্নরূপ হবে ঃ

(১) বিভিন্ন মহকুমা, প্রখ্যাত শহর এবং শহরাঞ্চলে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা।

(২) কলিকাতার সাধারণ গ্রন্থাগার উন্নয়ন ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক (zonal) গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা।

(৩) সমস্ত পঞ্চায়েত ও থানায় যাতে গ্রামীণ গ্রন্থাগার স্থাপনের ব্যবস্থা

(৪) জেলা, গ্রাম এবং উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির জন্য একটী গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় ২,৫০০ টী অঞ্চল পঞ্চায়েতের প্রত্যেকটিতে একটি ক'রে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রত্যেকটি ব্লকে একটি ক'রে স্পনসর্ড গ্রন্থাগার স্থাপন করা হবে, যা ব্লক অঞ্চলে কেন্দ্রীয় পুস্তক ভান্ডার রূপে কাজ করবে। নগর ও সহরাঞ্চলে সাধারণ গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয় সাধনের দিকে অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হবে। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংগে যুক্ত গ্রন্থাগারগুলিকে সংগঠিত ও উন্নীত করা জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে।

ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্পনসর্ড এবং চাঁদার-গ্রন্থাগারগুলির মাধ্যমে ৪৯,০০,০০০ পুস্তক পাঠের জন্য সরবরাহ করা হয় এবং এর দ্বারা ১২,০০,০০০ জন পাঠক উপকৃত হন। জনসাধারণ কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গের গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা সাদরে গৃহীত হয়েছে। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জনসাধারণের দ্বারা গৃহ, পুস্তক এবং আসবাবপত্রাদির জন্য জমি ও অর্থদান এই পরিকল্পনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি এবং অগ্রগতির সংগে সংগে আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত চাঁদার গ্রন্থাগারগুলিকে এই পরিকল্পনার আওতায় আনা সম্ভব হবে। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, রাজ্যের সমস্ত লোক যাতে অতি সহজে গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পায় তার ব্যবস্থা করা। শাসনতন্ত্রের নির্দেশানুযায়ী রাজ্য শিক্ষা পরিকল্পনা যা ৬-১১ বৎসর বয়স্ক শিশুদের মধ্যে শতকরা ৭০% জনের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে এবং আগামী তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অবাধ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করছে, গ্রন্থাগার উন্নয়ন পরিকল্পনা সেই শিক্ষা পরিকল্পনার সংগে

যুক্ত। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান উন্নীত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা রাজ্যের শিক্ষা পরিকল্পনার পরিপূরক এবং এই ব্যবস্থা সত্যকারের জনশিক্ষার হাতিয়ার রূপে ব্যবহৃত।

পরিশিষ্ট

বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রন্থাগার	গ্রন্থাগারে সংখ্যা	মোট পুস্তক সংগ্রহ	মোট পুস্তক ব্যবহৃত বা প্রদত্ত	গ্রন্থাগারের দ্বারা মোট উপকৃত জনসাধারণের সংখ্যা
১। রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার	১	৩০,০০		
২। জেলা গ্রন্থাগার	১৬	১,৩৬,০০০	৪,০০,০০০	৩,৩০,০০০
৩। আঞ্চলিক গ্রন্থাগার	২৪	৫০,০০০	১,০০,০০০	৭০,০০০
৪। গ্রামীণ গ্রন্থাগার	৪৬৪	২,৩২,০০০	৪,০০,০০০	৩,০০,০০০
৫। সরকার কর্তৃক সাহায্য প্রাপ্ত চাঁদার সাধারণ গ্রন্থাগার	১,০০০	২৫,০০,০০০	৪০,০০,০০০	৫,০০,০০০
		২৯,৪৮,০০০	৪৯,০০,০০০	১২,০০,০০০

Journal of the Indian Library Association পত্রিকার Vol. 3 No. 1 সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি অনুবাদ করেছেন শ্রীমঙ্গল প্রসাদ সিংহ।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের নিকট পরিষদের স্মারকপত্র

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের হার পরিবর্তন সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রস্তাব সম্পর্কে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের স্মারকপত্র

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রস্তাব

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
ওল্ডমিল রোড, নিউ দিল্লী।

নং এফ ৬৩-২/৬০ (এস এস)   ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৬১

রেজিষ্ট্রার মহোদয় সমীপেষু

বিষয়ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের হার পরিবর্ত্তন।

মহাশয়,

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের হার উন্নয়নের যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন তাহা আপনাকে জানাইবার জন্য আমার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। বেতনের হার পরিবর্ত্তনের বিষয়ে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষার সহিত যুক্ত কর্মীদের সমতুল্য ধরিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের মধ্যে যাঁহারা জুনিয়র তাঁহাদের বেতনের হার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারের অনুরূপ হইবে; গ্রন্থাগারের যাঁহারা সিনিয়র বৃত্তিকুশলী কর্মী তাঁহাদের বেতনের হার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা অনুযায়ী রিডার বা অধ্যাপকের বেতনের হারের অনুরূপ হইবে। এই সব বেতনের হার পাইতে হইলে গ্রন্থাগার কর্মীদের যে সব ন্যূনতম যোগ্যতা প্রয়োজন তাই নিম্নে উল্লিখিত হইল।

বৃত্তিকুশলী (জুনিয়ার) (লেকচারার)

প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর বি.এ./বি.এস সি/বি.কম. ডিগ্রী সহ প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রী ইন লাইব্রেরী সায়ন্স (দুই বৎসরের কোর্স) অথবা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর এম.এ/এম.এস সি ডিগ্রী সহ প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাচিলার ডিগ্রী ইন লাইব্রেরী সায়ন্স বা এক বছরের ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরী সায়ন্স।

বৃত্তিকুশলী (সিনিয়ার) (রীডার)

(ক) প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর বি.এ/বি এস সি/ বি.কম ডিগ্রী সহ প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রী ইন লাইব্রেরী সায়ন্স (দুই বৎসরের কোর্স) অথবা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর এম.এ./এম.এস সি ডিগ্রী সহ প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাচিলার ডিগ্রী ইন লাইব্রেরী সায়ন্স বা এক বছরের ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরী সায়ন্স

(খ) গ্রন্থাগারিক হিসাবে পাঁচ বৎসরের অভিজ্ঞতা বা বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মী হিসাবে দায়িত্বশীল পদে পাঁচ বৎসর অধিষ্ঠিত থাকার অভিজ্ঞতা

বৃত্তিকুশলী (সিনিয়ার) (প্রফেসর)

(ক) প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর বি.এ./বি.এস সি/বি.কম ডিগ্রী সহ প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রী ইন লাইব্রেরী সায়ন্স (দুই বৎসরের কোর্স) অথবা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর এম.এ./এম.এস সি ডিগ্রী সহ প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাচিলার ডিগ্রী ইন লাইব্রেরী সায়ন্স বা এক বছরের ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরী সায়ন্স

(খ) গ্রন্থাগারিক হিসাবে কমপক্ষে দশ বৎসরের অভিজ্ঞতা বা বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মী হিসাবে দশ বৎসর অধিষ্ঠিত থাকার অভিজ্ঞতা

(গ) গবেষণা কাজের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে স্বীকৃতি বা বিশেষ কর্মসূচী অনুযায়ী কাজের অভিজ্ঞতা

গ্রন্থাগারিকদের বেতনের হার পরিবর্ত্তনের ফলে যে পদ্ধতিতে বেতন নির্ধারণ হইবে এবং যে অতিরিক্ত ব্যয়ভার দেখান হইবে তাহা অনুমোদিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদের সম্পর্কে নির্দ্দিষ্ট নীতি অনুযায়ী হইবে।

কমিশন ইহাও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে যাঁহারা বৃত্তিকুশলীনন এমন ধরণের কর্মীদের বেতনের হার পরিবর্ত্তনের প্রশ্নটি তাঁহাদের বিবেচ্য নয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের অনুরোধে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের হার পরিবর্ত্তনের প্রশ্নটি বিবেচিত হইবে।

আপনার বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার সমূহের বৃত্তিকুশলী কর্মীদের বেতনের হার উন্নয়নের যে সুপারিশ করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে কোন প্রস্তাব থাকিলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের বিবেচনার জন্য তাহা প্রেরণ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

আপনার বিশ্বস্ত
পি. জে. ফিলিপ
সচিবের পক্ষে

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের স্মারকপত্র

সচিব,
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন,
ওল্ড মিল রোড, নিউ দিল্লী—১।

বিষয়ঃ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের হার পরিবর্তন।

মহাশয়,

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের বেতনের হার পরিবর্তন সুপারিশ করার জন্য আমরা আপনাকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষকদের সম-মর্যাদায় অন্তর্ভুক্ত করা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সিদ্ধান্ত বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু এই বৃত্তির মুখপাত্র হিসাবে আমরা এই পরিকল্পনাটি সম্পর্কে আমাদের মতামত ও সুপারিশ পেশ করিতে চাই। আশা করি আপনি এই সুপারিশসমূহ অনুগ্রহপূর্বক বিবেচনা করিবেন ঃ—

(১) আপনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে একজন গ্রন্থাগার কর্মীকে তখনই বৃত্তি কুশলী বলিয়া ঘোষণা করা হইবে যখন তাঁহার (ক) প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর বি, এ ; বি, এস সি ও বি, কম ডিগ্রী সহ প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাষ্টার ডিগ্রী ইন লাইব্রেরী সায়ন্স (দুই বৎসরের কোর্স) থাকিবে অথবা

(খ) প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর এম, এ ও এম, এস সি ডিগ্রীসহ প্রথম অথবা দ্বিতীয় শ্রেণীর ব্যাচিলর ডিগ্রী ইন লাইব্রেরী সায়ন্স অথবা এক বৎসরের ডিপ্লোমা ইন লাইব্রেরী স্যয়েন্স থাকিবে।

(২) আমরা মনে করি একজন কর্মীকে বৃত্তিকুশলী বলিয়া ঘোষণা করার এই নীতি বোধগম্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা মনে করি একজন গ্রন্থাগার কর্মীকে বৃত্তিকুশলী বলা যাইতে পারে যদি তিনি

(ক) কোন অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হইয়া থাকেন

(খ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা (এক বৎসরের) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

আমরা আমাদের এই মত সমর্থনে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের মতামত উল্লেখ করিতেছি ঃ

"বৃত্তি কুশলী কর্মীদের জন্য, অর্থাৎ যাঁহারা গ্রন্থাগারে বৃত্তিমূলক কাজে নিয়োজিত থাকেন তাঁহাদের জন্য ইহাই সুপারিশ করা যাইতেছে যে তাঁহাদের কম পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক এবং এক বৎসর বৃত্তিমূলক ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হইতে হইবে।" (ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির রিপোর্ট পৃঃ ৬৬)

বৃত্তি কুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের জন্য—

(৩) উপরে উল্লিখিত এই ন্যূনতম যোগ্যতার (স্নাতক ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা) অস্বীকৃতির ফলে এবং আপনার স্মারকলিপিতে তাঁহাদের জন্য কোন বেতনের হার উল্লেখ না থাকার ফলে বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে নিয়োজিত বৃত্তি কুশলী কর্মীদের শতকরা ৯৫ বা ততোধিক কর্মী কোন প্রকার উপকার ও লাভ হইতে বঞ্চিত হইলেন, যদিও তাঁহারা প্রত্যেকেই গ্রন্থাগারে বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক কাজে এক বৎসর হইতে ১৫ বৎসর বা ততোধিক বৎসর ধরিয়া নিয়োজিত আছেন।

(৪) বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী সহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে যাঁহাদের ডিপ্লোমা আছে অথচ গ্রন্থাগারে ব্যবহারিক কাজের কোন অভিজ্ঞতা নাই

এমন ধরণের কর্মীদের পক্ষে বৃত্তিকুশলী (জুনিয়র) পদে নিয়োজিত হইবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যে সব কর্মীদের ইহা অপেক্ষা কম শিক্ষা-মূলক যোগ্যতা আছে স্নাতক (পাস কোর্স) সহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা ; স্নাতক (অনার্স) সহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা ; গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী (অনার্স ব্যতীত) ; স্নাতকোত্তর ডিগ্রী (তৃতীয় শ্রেণী) সহ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা ইত্যাদি) অথচ দীর্ঘদিন গ্রন্থাগারে ব্যবহারিক কাজের অভিজ্ঞতা আছে এমন ধরণের কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ হইতে কোন উপকারই পাইলেন না।

(৫) একজন গ্রন্থাগার কর্মী ও একজন শিক্ষকের চাকুরীর সর্ত্তাবলীর মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। একজন শিক্ষককে সপ্তাহে ১০-১৫ ঘণ্টা ক্লাস লইতে হইবে। কিন্তু একজন গ্রন্থাগার কর্মীকে সপ্তাহে কমপক্ষে ৪০—৪৫ ঘণ্টা কাজ করিতে হয় অধিকন্তু শিক্ষকদের তুলনায় তাঁহারা অনেক কম ছুটি পান। ইহা ছাড়াও শিক্ষকরা অন্য একটি বিভাগে কাজ করিয়া এবং পরীক্ষার উত্তরপত্র পরীক্ষা করিয়া অর্থ উপার্জন করিতে পারেন। এমতাবস্থায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্ত (প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী) কোন ব্যক্তি গ্রন্থাগারিকের বৃত্তি গ্রহণ অপেক্ষা নিঃসন্দেহে শিক্ষাদানের বৃত্তি বা অন্য কোন বৃত্তি (যেখানে অধিক অর্থ উপার্জন সম্ভব) গ্রহণ সমীচীন মনে করিবেন ; আরও এক বৎসরের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা গ্রহণ তাঁহার নিকট আকর্ষণীয় মনে নাও হইতে পারে।

(৬) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর সাথে অনার্স ডিগ্রির সুপারিশ আমাদের নিকট অপ্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়। বিদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর পাঠ্য বিষয় শিক্ষার অন্যান্য বিষয়ের পাঠক্রমের ন্যায় অন্যতম মূল পাঠ্য বিষয় বলিয়া বিবেচিত। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্তরা অন্যান্য বিষয়ের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্তদের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। আপনার সুপারিশ অনুযায়ী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের দুই বৎসরের স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রাপ্ত অথচ অনার্স নাই এমন ব্যক্তিরা কোন বেতনের হারই পাইবেন না। অধিকন্তু তাঁহাদের পক্ষে আর অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াও সম্ভব নয়, কেননা ভারতের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের প্রচলিত নিয়মকানুন অনুযায়ী কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পাইলে আর অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। এই কারণে আমরা মনে করি

গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে যাঁহারা বিশেষ ভাবে জ্ঞান অর্জন করিয়াছেন (অর্থাৎ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী পাইয়াছেন) তাঁহাদের সম্পূর্ণভাবে বৃত্তিকুশলী কর্মী হিসাবে গ্রহণ করা উচিত এবং এই ক্ষেত্রে অনার্সের সর্ত্তাবলী থাকা উচিত নয়।

(৭) ভারতবর্ষের মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে (অর্থাৎ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী দেওয়া হয় এবং এই কারণেই উপরে উল্লিখিত সুপারিশের ফলে গ্রন্থাগার কর্মীরা উপকৃত হইবেনা। এই অবস্থায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মীদের যথাসম্ভব প্রয়োজনীয় গুণাবলী অর্জন করার জন্য ভারতবর্ষের তিনটি কেন্দ্রে তিনটি প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ে (কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ) অবিলম্বে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রীর প্রবর্তন হওয়া উচিৎ।

যে সব ব্যক্তি মুখ্য গ্রন্থাগারিক বা গ্রন্থাগারিক পদে বর্তমানে অধিষ্ঠিত আছেন তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির যদি প্রয়োজনীয় গুণাবলী নাও থাকে তবুও তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের ন্যায় বেতন ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের প্রধানকে অবিলম্বে অধ্যাপকদের ন্যায় বেতনের হার না দিলে আপনার সুপারিশ অনুযায়ী বিভিন্ন বৃত্তি কুশলী কর্মীদের বিভিন্ন বেতনের হারে নিয়োগ করা সম্পর্কে অসুবিধা দেখা দিতে পারে।

সবশেষে আমরা আবার কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক বৃত্তি কুশলী কর্মীদের (যাঁদের ন্যূনতম যোগ্যতা স্নাতক ডিগ্রী ও গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা আছে) অবস্থা সম্পর্কে বিবেচনার আবেদন জানাইতেছি। এই কর্মী সর্বপ্রকারের বৃত্তিমূলক কাজ করিয়া থাকেন এবং ভারতবর্ষের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রাণ স্বরূপ। ইঁহাদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় এবং এমনকি বৃত্তি কুশলী কর্মী হওয়া সত্ত্বেও অনেক ক্ষেত্রে মাসিক ১০০৲ টাকা মাহিনা পাইয়া থাকেন। এই সব কর্মীদের কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতা ও বৃত্তিমূলক গুণাবলীর যদি স্বীকৃত না হয় তাহা হইলে ইঁহাদের মধ্যে এমন হতাশা দেখা দিতে পারে যাহা পরিণামে আমাদের দেশের সুস্থ ও দৃঢ় শিক্ষাব্যবস্থার পরিপূরক আদর্শ এবং সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ববস্থাকে যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। এমন অবস্থায় আমরা আপনার নিকট এই সুপারিশ সমূহ সংশোধন করিতে অনুরোধ করিতেছি এবং একজন গ্রন্থাগার কর্মীকে নিম্নলিখিত

ন্যূনতম গুণাবলী থাকিলে বৃত্তি কুশলী বলিয়া ঘোষণা করা হউক : (ক) স্নাতক ডিগ্রী (খ) গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতক ডিগ্রী (এক বৎসরের ডিপ্লোমা কোর্স) (গ) কোন স্বীকৃত গ্রন্থাগারে কমপক্ষে দুই বৎসর কাজের অভিজ্ঞতা এবং এই সব কর্মীদের বৃত্তি কুশলীর (জুনিয়র) বেতন দেওয়া হউক। আমরা আশা করি আমাদের সুপারিশ সমূহ আপনার সুবিচার পাইবে।

আপনার বিশ্বস্ত
বিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক
বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

এই অনুলিপি নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের নিকট প্রেরণ করা হইল :

(১) চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (২) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্যবৃন্দ (৩) ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথন (৪) ডঃ কে, এল, শ্রীমালি (৫) সম্পাদক, শিক্ষা বিভাগ, ভারত সরকার (৬) সম্পাদক, ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ (৭) সম্পাদক, ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার সংস্থা ও তথ্য সরবরাহ কেন্দ্র (৮) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার (৯) বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক (১০) সম্পাদক, রাজ্য গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহ (১১) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ (১২) পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কলেজের গ্রন্থাগারিক (১৩) ডঃ নীহার রঞ্জন রায় (১৪) শ্রীসোহন সিং (১৫) শ্রী বি, এস, কেশবন (১৬) অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর (১৭) শ্রী এস, পার্থসারথী (১৮) ডঃ বিধান চন্দ্র রায় (১৯) রায় হরেন্দ্র নাথ চৌধুরী (২০) ডঃ ডি, এম, সেন (২১) বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের গ্রন্থাগার কমিটির সদস্যবৃন্দ ।

পরিষদ কথা

পরিষদ কার্যালয়ে কিপ দম্পতি

আমেরিকার বিখ্যাত গ্রন্থাগারিক দম্পতি মিঃ ও মিসেস লরেন্স জে, কিপ হুইট লোন কর্মসূচী অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষামূলক গ্রন্থাগার সমূহ পরিদর্শনে এসেছেন। মিঃ ও মিসেস কিপ হুইট লোন কর্তৃপক্ষ ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের যুক্ত উদ্যোগে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের বিভিন্ন সমস্যাবলী আলোচনা করার জন্য ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে যে ৪টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয় তাতেও তাঁরা যোগদান করেন। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কাউন্সিলের পক্ষ হতে তাঁদের এক অনুষ্ঠানে আপ্যায়িত করা হয়। মিঃ ও মিসেস কিপ ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থার অগ্রগতির কথা উল্লেখ করেন এবং আশা করেন গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার কর্মীদের যুক্ত উদোগে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার আরও অগ্রগতি হবে। ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও ভারতীয় বিশেষ গ্রন্থাগার সংস্থা ও তথ্য সরবরাহ কেন্দ্রের যুক্ত উদ্যোগেও মিঃ ও মিসেস কিপকে এক চা-চক্রে আপ্যায়িত করা হয়।

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে পরিষদের প্রদর্শনী

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষ হতে অংশ গ্রহণ করা হয়। এই প্রদর্শনীর মূল বিষয়বস্তু ছিল বর্তমান গ্রন্থাগার আন্দোলনের মূল বক্তব্য, বাংলা পুস্তক প্রকাশের বর্তমান অবস্থা ইত্যাদি। প্রদর্শনীতে প্রচুর জন সমাগম হয়। প্রদর্শনীর অঙ্গ সজ্জা করেন শিল্পী শ্রী পিন্টু রুদ্র।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারের সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা সভা

বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সমস্যা সম্পর্কে আয়োজিত গত মাসের আলোচনা সভায় বক্তৃতা দান করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়। উক্ত বিষয় সম্পর্কে শ্রীঅজিত মুখোপাধ্যায়ের পরবর্তী বক্তৃতা শীঘ্রই আয়োজিত হবে।

গ্রন্থাগার সংবাদ

কলিকাতা ঃ

নারিকেলডাঙ্গা সার গুরুদাস ইনষ্টিট্যুটের হীরক জয়ন্তী

নারিকেলডাঙ্গা সার গুরুদাস ইনষ্টিটিউট-এর ষাট বৎসর পূর্তি উপলক্ষে গত ১১ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত নয় দিন ব্যাপী হীরক জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। ১১ই ফেব্রুয়ারী উৎসব উদ্বোধন করেন ডঃ কালিদাস নাগ। পরবর্তী ৮ দিনে শরীর চর্চা প্রদর্শনী, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, লোক সঙ্গীত, গীতিনাট্য ও নাট্যাভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ডঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী, ডঃ সাধন ভট্টাচার্য, স্বাস্থ্য মন্ত্রী অনাথবন্ধু রায়, মেয়র শ্রীকেশব বসু, শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীহুমায়ুন কবীর প্রভৃতি বক্তৃতা করেন। উৎসব উপলক্ষে হীরক জয়ন্তী স্মারক পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। পুস্তিকায় শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, শ্রীবিনয় ঘোষ, শ্রীত্রিপুরা শঙ্কর সেনশাস্ত্রী প্রভৃতির বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

তরুণ প্রগতি সংঘ। কলিন ষ্ট্রীট

সংঘ ভবনে সম্প্রতি গ্রন্থাগার বিষয়ে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন ডক্টর দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। সংঘের সম্পাদক শ্রীশ্রীদামচন্দ্র সাহা জনজীবনে গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন। পশ্চিম বঙ্গে অবিলম্বে গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের দাবি জানিয়ে সভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। সর্বশ্রী গৌরাঙ্গ সুন্দর সাহা, ননীগোপাল দাস, অনুপম সাহা এবং নিত্যানন্দ চক্রবর্তী বক্তৃতায় অংশ গ্রহণ করেন।

চব্বিশ পরগণা ঃ

বনগ্রাম সাধুজন পাঠাগার

মেঘনাদ বধ কাব্যের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে সাধুজন মন্দিরে এক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় এই উপলক্ষে এক তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ পাঠ করেন।

নাট্যকার শচীন্দ্র সেনগুপ্তের দেহাবসানে পাঠাগারে এক শোক সভার আয়োজন হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীননী দাসগুপ্ত। সংগীত, আবৃত্তি ও বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে শচীন্দ্রনাথের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়।

গোবিন্দকাটি সাধারণ পাঠাগার

গত ২০শে জানুয়ারী পাঠাগারের উদ্যোগে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে গ্রন্থাগারকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে দিবসব্যাপী এক কার্যসূচী পালিত হয়। প্রত্যুষে পাঠাগার হতে এক প্রভাতফেরী গ্রাম পরিক্রম করে। অপরাহ্ণে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন বক্তা গ্রামাঞ্চলে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রয়োজন ও প্রসারের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। সভায় বহু জনসমাগম হয়েছিল।

বাঁকুড়া ঃ

মহেশপুর রামকৃষ্ণ পাঠাগারের বার্ষিক সভা ও নির্বাচন

গত ৮ই এপ্রিল শ্রীরবিলোচন গুপ্তের সভাপতিত্বে পাঠাগারের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিগত বর্ষের কার্যাবলীর বিবরণী পঠিত ও আলোচিত হয়। জেলা বোর্ড থেকে পাঠাগারটিকে পঞ্চাশ টাকা সাহায্য দান করায় সকলে আনন্দ প্রকাশ করেন। পরিশেষে পাঠাগারের নূতন কার্যনির্বাহক সমিতি গঠিত হয়।

হুগলী ঃ

হরালদাসপুর সাধারণ পাঠাগার ও ভুপেন্দ্র পাঠ নিকেতন

গত ১৪ই মার্চ পাঠাগারের অষ্টাদশ বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিগত বর্ষের কার্যবিবরণী থেকে পাঠাগারের নানামুখী কর্মতৎপরতার পরিচয় পাওয়া গেল। পাঠাগারটি এতদঞ্চলের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিসাবে সর্বসাধারণের মধ্যে প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ঐদিনের সভায় পাঠাগারের নূতন কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

বার্তা বিচিত্রা

ভারত সরকার কর্তৃক গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির কয়েকটি সুপারিশ গৃহীত

(গ্রন্থাগারের নিজস্ব সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত)

নয়াদিল্লী, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১ঃ আজ রাজ্য সভায় ভারত সরকার নিয়োজিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রশ্নোত্তর করা হয় ঃ

শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী নিগম ঃ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাইবেন গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির কয়টি সুপারিশ সরকার গ্রহণ করিয়াছেন এবং কার্যকরী করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন।

ডঃ কে, এল, শ্রীমালী ঃ গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির ১৭টি সুপারিশ সরকারের বিবেচনাধীন ছিল। নিম্নলিখিত ৯টি সুপারিশ সরকার গ্রহণ করিয়াছেন এবং বিভিন্ন রাজ্য কর্তৃপক্ষকে এই সুপারিশসমূহ কার্যকরী করিতে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে ঃ

(১)	ভারতের প্রতিটি নাগরিকের নিকট গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিঃশুল্ক (বিনা চাঁদা মূলক) হওয়া বিধেয়।	৪র্থ অধ্যায় ১ম সুপারিশ
(২)	দেশের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা নিম্নরূপ হওয়া উচিত ঃ জাতীয় গ্রন্থাগার, রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার, ব্লক গ্রন্থাগার, পঞ্চায়েৎ গ্রন্থাগার।	৪র্থ অধ্যায় ২য় সুপারিশ
(৩)	গ্রন্থাগার আন্দোলন প্রসারের জন্য গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহ অত্যাবশ্যকীয়। ভারত সরকার ও রাজ্য সরকার সমূহের উচিত শক্তিশালী গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহ গঠনে উৎসাহ দান করা।	৫ম অধ্যায় ২য় সুপারিশ

(৪) সরকারের উচিত নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যের জন্য গ্রন্থাগার পরিষদ সমূহকে আর্থিক সাহায্য করা ঃ

(ক) মূল কার্যালয়ের জন্য বাড়ী ভাড়া।

(খ) একজন সর্বক্ষণের বা পার্ট টাইম সম্পাদক বা অফিসের কর্মচারীর জন্য অর্থ সাহায্য।

(গ) গ্রন্থাগার আন্দোলনের পক্ষে সাধারণ ভাবে উপযোগী এমন কোন কর্মসূচী যে সম্পর্কে সরকার উদ্যোগী হইতে ইচ্ছুক।

} ৫ম অধ্যায় ৩য় সুপারিশ

(৫) দেশের সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা থাকা উচিত এবং ইহা ছাড়াও সাধারণ গ্রন্থাগার সমূহ ও চাঁদামূলক গ্রন্থাগার, স্কুল গ্রন্থাগার, বিভাগীয় ও গবেষণা গ্রন্থাগার এবং বিশ্ব-বিদ্যালয় গ্রন্থাগারের মধ্যে সহযোগিতা থাকা উচিত।

৫ম অধ্যায় ৪র্থ সুপারিশ

(৬) যতদিন না সাধারণ গ্রন্থাগারে সুষ্ঠু সূত্রানুসন্ধান ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ততদিন পর্যন্ত সরকারের বিভাগীয় গ্রন্থাগার ও বিশেষ গ্রন্থাগার সমূহের উচিত বিভিন্ন বিষয়ের উপর মন্তব্য সহ পুস্তক তালিকা নির্মাণ করিয়া এবং বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নের উত্তর দান করিয়া সাহায্য করা।

৫ম অধ্যায় ১০ম সুপারিশ

(৭) বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের উচিত সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার সহিত নিম্নলিখিত ভাবে সাহায্য করা ঃ (ক) জনসাধারণের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রয়োজনে বিভিন্ন বিষয়ের উপর পুস্তক তালিকা সরবরাহ করা। (খ) জনসাধারণের মধ্যে অত্যন্ত আগ্রহশীল পাঠকদের নিয়মিত সভ্য হিসাবে তালিকাভুক্ত করা।	৫ম অধ্যায় ১১শ সুপারিশ
(৮) কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচিত প্রতি বৎসর কমপক্ষে একটি সর্বভারতীয় সেমিনার বা কর্মালয় সংগঠিত করা এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক সেমিনার সংগঠিত করার জন্য আর্থিক সাহায্য করা (এই সুপারিশটি এই সংশোধন সহ গৃহীত হয় যে এই কাজের দায়িত্ব ভারতীয় গ্রন্থাগার পরিষদের হাতে ন্যস্ত থাকা উচিত)	৬ষ্ঠ অধ্যায় ১১(ক) নং সুপারিশ
(৯) বিভিন্ন স্তরে গ্রন্থাগারের কর্মী নির্বাচনের কাজে মুখ্য গ্রন্থাগারিকের সংযুক্ত থাকা উচিত।	৬ষ্ঠ অধ্যায় ১৯নং সুপারিশ

নিম্নলিখিত ৫টি সুপারীশ সরকারের বিবেচনাধীন—

৪র্থ অধ্যায় সুপারিশ নং ২৪, ২৫, ২৬

৯ম অধ্যায় সুপারিশ নং ৩, ৮

নিম্নলিখিত ৩টি সুপারিশ গ্রহণ করা হয় নাই—

৪র্থ অধ্যায় সুপারিশ নং ২৭

৫ম অধ্যায় সুপারিশ নং ১২

৯ম অধ্যায় সুপারিশ নং ১

সম্পাদকীয়

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের কর্মী সমস্যা

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভারতবর্ষের সহস্রাধিক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বৃত্তিকুশলী কর্মীদের বেতনের হার পরিবর্তন সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ প্রকাশিত হয়েছে। সুপারিশটি একদিক থেকে অভিনন্দনযোগ্য। এই প্রথম ভারতবর্ষের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষকদের ন্যায় বেতন ও মর্যাদা দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষের গ্রন্থাগার আন্দোলনেব পক্ষে ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। আমরা এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। গ্রন্থাগারের অনুরাগী পাঠকদের আমরা এই সংখ্যায় প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রস্তাব ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সুপারিশটি অনুধাবন করতে অনুরোধ করছি।

কিন্তু এই সুপারিশের মধ্যে ন্যূনতম যোগ্যতাবলীর প্রশ্ন তুলে এমন একটি অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে যার ফলে শতকরা ৯৫ জন বা ততোধিক বৃত্তি কুশলী গ্রন্থাগার কর্মী উন্নত ধরণের বেতনের হার পাওয়ার সর্ব প্রকার সম্ভাবনা হতে বঞ্চিত হয়েছেন।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে স্নাতক ডিগ্রী প্রাপ্ত গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের বৃত্তি কুশলী কর্মীদের দীর্ঘদিনের শিক্ষা, পরিশ্রম ও অভিজ্ঞতার যথাযথ মর্যাদা না দেওয়ার ফলে এক জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালর মঞ্জুরী কমিশন এই কর্মীদের বৃত্তি কুশলী হিসাবে স্বীকৃতি দেননি আর কোন বেতনের হারও সুপারিশ করেননি।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যদি এই মনে করে থাকেন যে ভারতবর্ষের শিক্ষামূলক গ্রন্থাগারের কর্মী বাহিনীর যে অতি সামান্য অংশ মঞ্জুরী কমিশনের নির্ধারিত যোগ্যতাবলীর সর্ত্ত পূরণ করেছেন শুধু তাঁদের বেতনের হার পরিবর্তন করলেই সুষ্ঠু ও উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা যাবে তা নিশ্চিতভাবে ভুল চিন্তা প্রসূত।

আমরা মনে করি দেশের জাতীয় অগ্রগতির সাথে তাল রেখে চলতে হলে যে উন্নত ধরণের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজন তার অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় সর্ত্ত হল শিক্ষিত, অভিজ্ঞ, সেবাপরায়ণ, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন, প্রয়োজনীয় বেতন ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত বৃত্তি কুশলী কর্মী বাহিনী।

কিন্তু বাস্তবের চিত্র অন্যরূপ। দু একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত স্পনসর্ড কলেজের গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা প্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা ১৩০—১৮০ টাকা বেতনের হারে রয়েছেন, আর প্রথম নিয়োগে সব মিলিয়ে পান ১৫০।১৬০ টাকা। কলকাতা, বিশ্বভারতী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সব কর্মীরা নির্দিষ্ট বেতনের হার বা গ্রেডে আছেন, তাঁদেরও বেতনের হার অন্যান্য অফিস কর্মচারীদের চেয়ে কোন তফাৎ নেই, যদিও তাঁদের অধিকাংশ গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত, অভিজ্ঞ বৃত্তি কুশলী কর্মী।

যাদবপুরের অবস্থা আরও খারাপ। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। ৪।৫ বছর ধরে কাজ করেও তাঁদের অধিকাংশ কর্মী গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও সব মিলিয়ে মাসিক ১২০৲ টাকা বেতন পান। তা ছাড়া ২।৩ মাস পর পর তাঁদের চাকুরীর সময় কাল বর্দ্ধিত করা হচ্ছে, স্থায়ী কর্মী বাহিনী গড়ে তোলার কোন উদ্যোগই নেই।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। অথচ এই বৃত্তি কুশলী কর্মীদের সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন একদম নীরব।

মঞ্জুরী কমিশন বৃত্তি মূলক কর্মীর যে সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং যে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম যোগ্যতাবলীর কথা বলেছেন তা যথেষ্ট বিতর্ক মূলক। বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রী এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের মূল হতে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রাপ্ত কর্মীদের বৃত্তি কুশলী বলে ঘোষণা না করার পিছনে কি যুক্তি থাকতে পারে?

প্রসংগক্রমে উল্লেখযোগ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্যদেশে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী (এম, এস) প্রাপ্ত কর্মীদের বৃত্তি কুশলী কর্মী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য অন্য কোন বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী থাকার প্রয়োজন নেই। ঐ দেশের ছাত্রছাত্রীরা স্নাতক হওয়ার পর সোজাসোজি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বছরের এম, এস কোর্সে ভর্ত্তি হতে পারেন এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত এই সব কর্মীরাই বৃত্তি কুশলী বলে স্বীকৃত। একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে এই এম, এস কোর্স আমাদের দেশের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সের সমতুল্য। হয়ত পাঠ্যতালিকা, শিক্ষাদান পদ্ধতি ও পরীক্ষা পদ্ধতির মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকতে পারে।

আমাদের প্রশ্ন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান ও ব্যবস্থায় উন্নত ঐ সব দেশে এম, এস, ডিগ্রী প্রাপ্ত কর্মীরা যদি বৃত্তি কুশলী হিসেবে স্বীকৃত হতে পারেন এবং

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে যথেষ্ট দায়িত্বপূর্ণ পদ ও মর্যাদায় থাকতে পারেন, তা হলে আমাদের দেশেই বা স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা প্রাপ্ত কর্মীরা বৃত্তি কুশলী হিসেবে কেন স্বীকৃত হবেন না ?

সমস্ত বিষয়টি বিশ্লেষণ করে এই কথা বলা চলে যে ভারতবর্ষের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের বিরাট সংখ্যক বৃত্তি কুশলী কর্মীদের সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশে যথেষ্ট অবিচার করা হয়েছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের স্মারকলিপিতে ঠিকই বলা হয়েছে যে সমস্ত বিষয়টি পূর্ণ-বিবেচিত না হলে আর্থিক সংকটে জর্জরিত কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট হতাশা ও ক্ষোভ দেখা দিবে যা পরিণামে সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থাকে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত করবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের কাছে তাই আমরা আবেদন জানাচ্ছি সমস্ত বিষয়টি পূর্ণবিবেচনা করে, এই কর্মীদের বৃত্তি কুশলী বলে ঘোষণা করে যথাযথ বেতন ও মর্যাদা দেওয়া হোক।

গ্রন্থাগার বৃত্তিকে এই সামাজিক ও আর্থিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার কাজে বৃত্তি কুশলী কর্মীদের নিজস্ব ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। নিজেদের আরও শিক্ষিত, অভিজ্ঞ ও সেবাপরায়ণ করে তুলে জনমানসে এই বৃত্তির গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলতে চাই। আমাদের দেশে অনেক বৃত্তি কুশলী কর্মীর এই বৃত্তি ও বৃত্তিমূলক সংগঠন সম্পর্কে একটা সাধারণ নিস্পৃহতা, ঔদাসিন্য ও অবজ্ঞা রয়েছে। এই মনোভাব শুধু গ্রন্থগারিকতার সামাজিক আদর্শের পরিপন্থী বা সুষ্ঠু গ্রন্থাগার ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতীয় অগ্রগতির পথে অন্তরায় নয়, আমাদের বা এই বৃত্তির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীদের ব্যক্তিগত উন্নতি ও অগ্রগতির পথেও অন্তরায়। ভারতের গ্রন্থাগার ব্যবস্থা পরিদর্শনরত জনৈক অভিজ্ঞ মার্কিন গ্রন্থাগারিক বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের এক ঘরোয়া বৈঠকে ঠিকই বলেছেন, বৃত্তি কুশলী কর্মীদের সংগঠনের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা আর নিজেদের আরও অভিজ্ঞ, শিক্ষিত ও কর্তব্যপরায়ণ করার মাধ্যমেই একমাত্র কর্মীদের যথাযথ বেতন ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। দেশ বিদেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনের ইতিহাসও এই সাক্ষ্য দেয়। তাই আজ সব বৃত্তি কুশলী কর্মীদের সংঘবদ্ধ হবার দিন এসেছে। বিভিন্ন কর্ম প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের মধ্যে আগামী দিনের সুখী ভবিষ্যতের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। এই গতিকে রুদ্ধ করার সাধ্য কারও নেই।

গ্রন্থাগার

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

চৈত্র ঃ ১৩৬৭

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন

পঞ্চদশ অধিবেশন

বিষ্ণুপুর—বাঁকুড়া

এ' বৎসর পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য গ্রন্থাগার সম্মেলনের পঞ্চদশ অধিবেশন বিগত ইষ্টারের সময় (৩১শে মার্চ—১লা এপ্রিল) বাঁকুড়া জেলার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বিষ্ণুপুর সহরের রামানন্দ মহাবিদ্যালয় ভবনে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। সারা রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল হতে তিনশতাধিক প্রতিনিধি ও দর্শকবৃন্দ সম্মেলনে যোগদান করেন। সভাপতিত্ব করেছিলেন প্রখ্যাত জননেতা ও সমাজসেবী শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়।

বিষ্ণুপুর সাধারণ গ্রন্থাগারের আমন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় এবারের সম্মেলন আহূত হয়। তাঁদের আন্তরিক আতিথেয়তা ও অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবকদের নিষ্ঠা ও কর্মকুশলতা খুবই হৃদয়স্পর্শী হয়।

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও বিভিন্ন সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্র-পত্রিকা সংবাদ পরিবেশন করেছেন ও সম্পাদকীয় নিবন্ধে সম্মেলন সম্পর্কে পর্যালোচনা করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন জেলা গ্রন্থাগার ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের সম্মেলনে যোগদানের অনুমতি ও যাতায়াতের ব্যয় মঞ্জুর করেছেন।

সম্মেলনে যোগদানের সুবিধার্থে রেল কর্তৃপক্ষ স্বতন্ত্র কামরার ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আমরা নানারূপ সাহায্য পেয়েছি।

পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। অনিবার্য কারণ বশতঃ যেসব ত্রুটীবিচ্যুতি লক্ষিত হয় তজ্জন্য আমরা দুঃখিত।

সম্পাদক

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ

সম্মেলনের ধারা বিবরণী

৩১শে মার্চ

প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন

সম্মেলনের প্রারম্ভে সকাল ৮টায় বিষ্ণুপুরের বিশিষ্ট জননেতা শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ রায় সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত এক প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। গ্রন্থাগার আন্দোলন সম্পর্কিত প্রাচীরপত্র ও বাঁকুড়া জেলার লেখকদের গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি সেখানে প্রদর্শিত হয়।

উদ্বোধন অধিবেশন

পশ্চিম বঙ্গ সমাজ শিক্ষা প্রাধিকারিক শ্রীনিখিলরঞ্জন রায় সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন যে সম্মেলন আত্মবিশ্লেষণমূলক হওয়া উচিত। গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে বিচার ও বিশ্লেষণের জন্যে সম্মেলনই সর্বাপেক্ষা উপযোগী ক্ষেত্র। রাজ্যের সাম্প্রতিক সেন্সাস রিপোর্ট উল্লেখ করে তিনি বলেন যে পশ্চিম বাংলায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৩২ জন অথচ সাক্ষরের সংখ্যা মাত্র ৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। বিপুল আয়োজন ও অর্থব্যয় সত্ত্বেও নগণ্য ফলের পরিমাণ দুশ্চিন্তার কারণ হয়েছে। বর্ত্তমান কার্য-প্রণালীর যথোচিত পরিবর্তন আবশ্যক বলে তিনি মনে করেন। গ্রন্থাগারের সঙ্গে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্ষীণ যোগাযোগের কথা উল্লেখ করে শ্রী রায় বলেন যে পঠনপাঠনে ইচ্ছা ও উন্নত রুচির সৃষ্টি এবং মানুষকে স্বশিক্ষায় প্রবৃত্ত হতে উদ্বুদ্ধ করার কাজে গ্রন্থাগারের সঙ্গে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়োজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্য আকাদামি কর্তৃক বাংলা সাহিত্যের কোনও বই বর্তমান বৎসরে পুরস্কৃত না হওয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শ্রী রায় বলেন যে উন্নত সাহিত্য সৃষ্টির পেছনেও গ্রন্থাগারের ভূমিকা উপেক্ষনীয় নয়। তাঁর মতে প্রতিকূল পরিবেশে নিরুৎসাহ বোধের পরিবর্তে বিচার বিশ্লেষণ করে নতুন কর্মপন্থা গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। জাতীয় শিক্ষা বিস্তারে গ্রন্থাগারের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। মূল শিক্ষা ধারার সঙ্গে গ্রন্থাগারের কার্যক্রম সমন্বিত হলে শিক্ষা ব্যবস্থা সাফল্যের পথে অগ্রসর হবে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণ

সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীরাধাগোবিন্দ রায় প্রতিনিধি ও অভ্যাগতদের স্বাগত জানিয়ে বলেন ঃ

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে সমাগত গ্রন্থাগারিক সুধীবৃন্দ, আপনাদের বিষ্ণুপুরে শুভাগমনে বিষ্ণুপুরবাসীর পক্ষ হইতে আপনাদিগকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। আপনাদিগকে যথাযোগ্য সাদর আপ্যায়ন করিবার শক্তি সামর্থ আমাদের নাই। ত্রুটি বিচ্যুতি নিজ গুণে ক্ষমা করিয়া আমাদের আন্তরিক অভ্যার্থনা গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। কাল-চক্রের বিবর্ত্তনে একদা উন্নতির উচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত মল্লভূম রাজধানী বিষ্ণু-পুরের অধিবাসীবৃন্দ আজ সত্যই বিপর্যস্ত। রেশম শিল্প, কাংস্য শিল্প, শঙ্খ শিল্প, লাক্ষা শিল্প এবং অন্যান্য বহু প্রকার কুটীর শিল্পে সমৃদ্ধ বিষ্ণুপুর-বাসীগণ .একদিন মল্লভূমের বহির্দেশ হইতে বহু অর্থ অর্জ্জন করিতে সমর্থ ছিল। বস্ত্র শিল্পের প্রতিযোগিতায় কুটীর শিল্প আজ সর্ব্বত্র ধ্বংসোন্মুখ। কুটীর শিল্পের পতনের সহিত বহু সংখ্যক কুটীর শিল্পী আজ নিরন্ন, দরিদ্র, তদুপরি সরকার বাহাদুর জমি সংক্রান্ত আইন প্রবর্ত্তন করিয়া দরিদ্র দেশবাসীগণকে জমি বিতরণ করিবার যে পথ গ্রহণ করিয়াছেন তাহার ফলে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণীর বহুলাংশ অত্যধিক বিপন্ন। সামাজিক কাঠামো বৈপ্লবিকভাবে বিপর্য্যস্ত। বাংলা দেশের অন্যান্য জেলা অপেক্ষা সাজা পদ্ধতি বাঁকুড়া জেলায় বহুলভাবে প্রবর্ত্তিত থাকায় বাঁকুড়ার মধ্যবিত্ত শ্রেণী সমধিক বিপন্ন। এইরূপ দুরবস্থার মধ্যেও বিষ্ণুপুরবাসী আমরা আপনাদের শুভ সমাগমে সত্যই অত্যধিক প্রীত ও আনন্দিত। বিষ্ণুপুরের অতীত ঐতিহ্যের গৌরবময় স্মৃতি আমাদের দুঃখপূর্ণ বর্ত্তমান অবস্থাতেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে হতাশ করিতে পারে নাই। কালের বিবর্ত্তনে বর্ত্তমান যতই কঠোর, রূঢ়, নির্ম্মম ও বেদনাত্মক হোক না কেন, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা আমাদিগকে বর্ত্তমান অবস্থাকে সহ্য করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতেছে।

বাংলা দেশের স্বাধীনতার শেষ রঙ্গভূমি মল্লভূমের শৌর্য্য, বীর্য্য, দেশপ্রাণতা, ধর্ম্মনিষ্ঠার কাহিনী আপনাদিগকে কিছু কিছু জ্ঞাত করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। মল্লভূমের শক্তিশালী নৃপতিবৃন্দ এগার শত বৎসরের অধিককাল পূর্ব্বে অরণ্যানী বেষ্ঠিত এই মল্লভূমে আর্য্য সভ্যতার প্রবর্ত্তন করেন। কয়েক শত বৎসরের কর্ম্ম-

প্রচেষ্টা ঐতিহাসিক আলোক পাতে সমুজ্জ্বল নহে। খণ্ড খণ্ড যুদ্ধ, লুণ্ঠন ইত্যাদির ঝঞ্ঝাট এই অঞ্চলে অতিশয় প্রবল ছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে মল্লভূমে বৌদ্ধ জৈন এবং শাক্ত ধর্মের আচার বিচার পূজা পদ্ধতি ক্রিয়া অনুষ্ঠান প্রভৃতি প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা এই সত্যের বহুল সমর্থন করিতেছে। আমরা শ্রীশ্রীচৈতন্য দেবের আবির্ভাবের পর বৈষ্ণব ধর্ম ও কৃষ্টির বিস্তারে সমুজ্জ্বল মল্লভূমের কাহিনী ও তথ্য আপনাদের কিছু নিবেদন করিতেছি।

বিষ্ণুপুরের মহারাজ বীর হাম্বিরের নাম বাংলাদেশে সমধিক প্রসিদ্ধ। গোস্বামী প্রবর শ্রীশ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রণীত শ্রীশ্রীচৈতন্য চবিতামৃত গ্রন্থ শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য মহাপ্রভু প্রমুখ কতিপয় বৈষ্ণব আচার্য্য বৃন্দাবন হইতে গৌড়িয় বৈষ্ণব সমাজের সমর্থন লাভের জন্য বিষ্ণুপুর হইয়া চরিতামৃত গ্রন্থসহ বহু বৈষ্ণব প্রামাণিক গ্রন্থ নবদ্বীপে বিষ্ণুপুর পথে লইয়া যাইতেছিলেন। বিষ্ণুপুরের সন্নিকটে এই সমস্ত অমূল্য গ্রন্থরাজি মহারাজ বীরহাম্বিরের সৈনিকদল লুন্ঠন করিয়া রাজার গ্রন্থাগারে লইয়া যায়। প্রভুপাদ শ্রীশ্রীনিবাস আচার্য্য গোস্বামী প্রমুখ বৈষ্ণব আচার্য্যবৃন্দ বহু অনুসন্ধানের পর বীরহাম্বিরের রাজদরবারে উপস্থিত হন। তেজপ্রভা সমুজ্জ্বল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর উপস্থিতিতে মহারাজ বীরহাম্বিরের রাজ সভার চাঞ্চল্যের সঞ্চার হয়। আচার্য্য মহাপ্রভু বিস্ময়ের সহিত অবলোচন করেন রাজ সভায় তখন "রাস পঞ্চাধ্যায়ী গ্রন্থ" বিষ্ণুপুরের রাজপন্ডিত পাঠ করিতেছিলেন। গ্রন্থ পাঠে কোনরূপ বিঘ্ন না হয় এই চিন্তায় আচার্য্য প্রভু শ্রদ্ধার সহিত গ্রন্থ পাঠ শ্রবণে মনোনিবেশ করেন। ব্যাখ্যার কোন কোন বিকৃতি শ্রবণে অজ্ঞাতসারে আচার্য্য মহাপ্রভুর অংগ চাঞ্চল্য লক্ষিত হয়। ভক্ত রাজপন্ডিত বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া অতি শ্রদ্ধার সহিত তেজপুঞ্জ কলেবর আচার্য্যের নিকট গ্রন্থ ব্যাখ্যার প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। আচার্য্য মহাপ্রভু অনুরুদ্ধ হইয়া তৎগত ও তন্ময় চিত্তে এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন। এই ব্যাখ্যা শ্রবণে মহারাজ বীরহাম্বির এবং সভাস্থ যাবতীয় সুধীবৃন্দ আচার্য্য চরণে আত্মনিবেদন করেন। এই ঘটনা বিষ্ণুপুরে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। মহারাজ বীরহাম্বির শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাপ্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। লুন্ঠিত পুস্তক রাজি আচার্য্য দেবকে প্রত্যার্পণ করিয়া রক্ষী সমভিব্যাহারে সমস্ত পুস্তক গন্তব্যস্থানে প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করেন।

শ্রীশ্রীশ্রীনিবাস মহাপ্রভু কিছুকাল পরে রাজগুরুরূপে বিষ্ণুপুরে বসবাস করেন। মহারাজ বীরহাম্বির তাঁহার নির্দেশক্রমে শ্রীশ্রীকালাচাঁদ দেব বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। আচার্য্য মহাপ্রভুর বিষ্ণুপুরে বসবাসের ফলে বহু খ্যাতনামা বৈষ্ণব সাধক বিষ্ণুপুরে শুভাগমন করিতেন। বিষ্ণুপুরে যাবতীয় বৈষ্ণবী উৎসব সাড়ম্বরে সম্পন্ন হইত। বিষ্ণুপুর এবং মল্লভূমে অসংখ্য মন্দির নির্ম্মাণ হয়। সুঠাম রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বিষ্ণুপুর বৈষ্ণব তীর্থে পরিণত হয়। মহারাজ বীরহাম্বির রাজ বৈরাগীরূপে শেষ জীবন বৃন্দাবনে অতিবাহিত করেন। বীরহাম্বির রচিত বহু ভক্তিমূলক পদাবলী বৈষ্ণব গ্রন্থে পাওয়া যায়। বৃন্দাবনে মহারাজ বীরহাম্বির দেহ রক্ষা করেন। তাঁহার মঠ বৃন্দাবনে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

বিষ্ণুপুরের মহারাজ রঘুনাথ সিংহ সমধিক শক্তিশালী ও ক্ষত্রিয় বৃত্তি সম্পন্ন ছিলেন। শুনা যায় তিনি মুর্শিদাবাদের নবাবের আহ্বানে একবার রাজধানী মুর্শিদাবাদে সমাগত হন। নবাব বাহাদুরের একটি বলশালী অশ্বকে পোষ মানাইয়া তিনি খ্যাতনামা অশ্বারোহী হিসাবে নবাব কর্ত্তৃক "সিংহ" উপাধি প্রাপ্ত হন। এই মহারাজা নিকটস্থ চেতবরদারের রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার কন্যা সাধ্বী চন্দ্রপ্রভার পাণি গ্রহণ করেন। এই শক্তিশালী রাজা রঘুনাথ সিংহ লালবাঈ নাম্নী এক মুসলমান রমণীর প্রতি প্রেমাসক্ত হন। ব্রাহ্মণ প্রধান বিষ্ণুপুরে এই ঘটনায় বিশেষ চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এইরূপ লাবণ্য সম্পন্না রমণী একটী পুত্র প্রসব করেন। জিঘাংসাবশতঃই হোক বা দুর্ম্মতি বশতঃই হোক এই কুটিলা রমণীর প্ররোচনায় মহারাজ তাঁহার পুত্রের হিন্দুদের ন্যায় অন্নপ্রাশন দিবার পরিকল্পনা করেন এবং এই অন্নপ্রাশন উপলক্ষে বিষ্ণুপুরে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবার দুরভিসন্ধিও পোষণ করেন। রাজকার্য্যে অমনোযোগী রঘুনাথ সিংহের রাজকার্য্য রাণী চন্দ্রপ্রভার অনুমতি-ক্রমে রাজভ্রাতা পরিচালনা করিতেন। বিষ্ণুপুরের ব্রাহ্মণগণ নিরুপায় হইয়া মহারাণী চন্দ্রপ্রভার শরণাপন্ন হন। সবিশেষ অবগত হইয়া মহারাণী চন্দ্রপ্রভা ব্রাহ্মণদের ধর্ম রক্ষা করিবার আশ্বাস প্রদান করেন। নানা কৌশলে মতিভ্রষ্ট স্বামীকে রাজ অন্তঃপুরে আনয়ন করেন। রাজার নিকট সকরুণ আবেদন করিয়া ব্রাহ্মণদের জাতিনষ্ট করিবার এই হীন মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করিবার জন্য কাতর আবেদন করেন। ব্রাহ্মণগণ এবং রাজভ্রাতা, রাণীর এই আবেদন ব্যর্থ হইলে রাজার প্রাণনাশ করিবে এই অভিসন্ধি মহারাণীর অজ্ঞাত ছিল না। সকল

প্রার্থনা ব্যর্থ করিয়া মহারাজ অন্তঃপুর হইতে বহির্দেশে আগমন করিলে রাজভ্রাতার আদেশে ক্রমে রক্ষীগণ রাজাকে হত্যা করে। মহারাণী চন্দ্রপ্রভা স্বামীর অন্তিমকালে তাঁর চরণ সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বামীর ধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার প্রাণনাশে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন এই কথা রাজাকে জ্ঞাত করেন। মহারাজ রঘুনাথ সিংহের অন্তিমকালে চৈতন্য উদিত হয় এবং তিনি স্ত্রীকে অন্তরের সহিত আশীর্ব্বাদ করেন এবং আবেগকম্পিত কণ্ঠে ঘোষনা করেন 'তুমি সতী' স্বামীর ধর্ম রক্ষা করিয়া তুমি নারীত্বের অক্ষয় গৌরব অর্জন করিলে। তুমি সতী নামে এই অঞ্চলে খ্যাত হইবে।

মল্লভূমের জনচিত্তের ভিতর প্রবেশ করিয়া অতীত ঐতিহ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি। অতীতের গর্ভে বর্ত্তমান এবং বর্ত্তমানের গর্ভে ভবিষ্যৎ যুগ যুগান্ত ধরিয়া প্রবাহিত হইতেছে এই অতীত ঐতিহ্যের বিশিষ্ট কেন্দ্রে পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগারিক সুধীবৃন্দ আপনারা এক মহান উদ্দেশ্য লইয়া সমবেত হইয়াছেন। গ্রন্থাগারের ভিতর দিয়া জনচিত্তকে সমুন্নত করিবার পূতঃ পন্থা স্থিরীকরণ আপনাদের মহান উদ্দেশ্য। মুদ্রাযন্ত্রের আবিস্কার করিবার বহু পূর্বে মানবচিত্তের ভাবধারাকে সংঘবদ্ধ করিয়া পুস্তক বা পুঁথি রচনা আবিষ্কৃত হইয়াছে। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশে কোন আদিম যুগে পুস্তক রচনার সূত্রপাত হইয়াছে তাহা সঠিক ভাবে না জানিলেও পুস্তক রচনার ভিতর মানব সভ্যতা বিকাশের মহান আবিস্কার অসীম শক্তিশালী। বিষ্ণুপুরের ভিতর বহু প্রাচীন কাল হইতে হস্তলিখিত পুস্তক বা পুঁথির গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হবার কথা আমরা অবগত আছি। মল্লভূমের প্রত্যেক উচ্চ জাতীয় বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সজ্জনের গৃহে প্রাচীন পুঁথি সংরক্ষিত ছিল এবং এখনও আছে। তালপত্রে এবং তুলট কাগজে সুবিন্যস্ত পরিস্কার অক্ষরে পুঁথি লেখার কলাকৌশল এই অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। তিন চারিশত বৎসর লিখিত পুঁথি বেশ ভাল অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান যুগে আমেরিকা ও পাশ্চাত্য দেশে জনশিক্ষার পক্ষে গ্রন্থাগারের অবদান অপরূপ ও অদ্ভুত। ভারতবর্ষে গ্রন্থাগারকে জনশিক্ষার পথে নিয়োগ করার ইতিহাস খুব প্রশংসার্হ নহে। স্বাধীনতা লাভের পর গ্রন্থাগারের বিস্তার সম্বন্ধে প্রচেষ্ঠা জাগ্রত হইয়াছে। আক্ষরিক জ্ঞান জন সমাজে সমধিক বিস্তৃতি লাভ না করার দরুণ গ্রন্থাগারের বিস্তার ব্যাহত

হইয়াছে। আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন নরনারীর সংখ্যা আমাদের দেশে খুব কম। এইরূপ অবস্থায় গ্রন্থাগার স্থাপন করিলেও অধিক সংখ্যক গ্রাহক পাওয়ার সম্ভাবনা কম। বাংলার পল্লীগ্রাম সমূহে বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে আক্ষরিক জ্ঞান সম্পন্ন করিবার প্রচেষ্টা সেরূপ সফলতা লাভ করিতে পারে নাই। পল্লীর দরিদ্র জনসাধারণের ভিতর শিক্ষালাভ করিবার স্পৃহা তাদৃশ জাগ্রত হয় নাই। রোগ, শোক, দুঃখ দারিদ্র্য পীড়িত অসংখ্য নরনারী অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণ হইতে অব্যাহতি লাভ না করিলে বিদ্যালাভ স্পৃহা জাগরিত হয় না। রাষ্ট্রনায়কগণের দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা সম্যক ব্যর্থ না হইলেও বিশেষ সফলতা লাভ করে নাই। সমাজ সেবকগণের নিরক্ষরতা দূরীকরণের চেষ্টাও আশানুরূপ সকল হয় নাই। পুস্তক পাঠ করিবার সামর্থ উপযোগী শিক্ষা জনসাধারণের ভিতর সমাজ সেবকগণ প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই। এইরূপ অবস্থায় গ্রন্থাগার স্থাপন করিয়া পল্লীগ্রামসমূহে জ্ঞান বিতরণ করিয়া গণচিত্ত উদ্বোধনের প্রচেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা কম। এই অবস্থার ভিতর গ্রন্থাগার স্থাপনের প্রচেষ্টা বিঘ্নসংকুল। গ্রন্থাগারিক সুধীবৃন্দ মহোদয়গণকে এই বিঘ্ন সমাকুল অবস্থার ভিতর পথ অনুসন্ধান করিতে হইবে।

আমরা শুনিয়াছি বর্ত্তমান জাতীয় সরকার State Library, District Library, Area Library, Mobile Library ইত্যাদি পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া গ্রন্থাগার বিস্তারের শুভ পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছেন। উদ্দেশ্য সাধু ও মহৎ সন্দেহ নাই; প্রাণবন্ত দেশসেবক ও সমাজ সেবক গণের অকৃত্রিম সহযোগিতা ব্যতীত এই কর্ম্মে সফলতা লাভ করা সুকঠিন। জাতীয় সরকারের নিকট অর্থ উপার্জ্জন প্রত্যাশায় নিযুক্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা এই মহৎ কর্ম্মে সফলতা লাভের আশা কম। আমরা অতীব দুঃখের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি স্বাধীনতা লাভের পর জনচিত্তের ভিতর দেশগঠন করিবার অকৃত্রিম উদ্‌যোগ জনসমাজে পরিস্ফুট হয় নাই। দেশ স্বাধীন হইয়াছে—ইংরেজ কবল মুক্ত হইয়াছে ইহাই দেখা দেয়। জাতীয় জনক মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে ইংরেজ কবল মুক্ত হইবার জন্য ভারতবর্ষে যে মহিমাময় উদ্যম জনসাধারণের ভিতর স্ফূর্ত্ত হইয়াছিল তাহা স্বাধীনতা লাভের পর অন্তর্হিত হইয়াছে। স্বাধীনতা আসিয়াছে—স্বরাজ আসে নাই। স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের জাতীয় কাঠামো সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়াছে। পাশ্চাত্য বিমুখতা অন্তর্হিত হইয়াছে তৎপরিবর্ত্তে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ জীবনের প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে। পোষাক পরিচ্ছদ, আহার-বিহার,

রীতি-নীতির ভিতর অন্ধ পাশ্চাত্য অনুকরণ প্রবল বেগে প্রবেশ করিয়াছে। জাতীয় বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া পাশ্চাত্য জাতির পরিত্যাক্ত আবরণ এই পরাধীন জাতি গ্রহণ করিয়াছে। বিধাতার মঙ্গলময় বিধানে যদি স্বরাজ সংগঠন করিবার মহতী প্রচেষ্টা জনসাধারণের ভিতর জাগ্রত না হয় তাহা হইলে নিজ বৈশিষ্ট্য হারা ক্লীব জাতির পক্ষে অভ্যুত্থান সুদূর পরাহত। গ্রন্থাগার আন্দোলনের ভিতর দিয়া শুভবুদ্ধির জাগরণ জাতির মধ্যে আনয়ন করিতে পারিলে জাতির অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

গ্রন্থাগারের ভিতর রেডিওর মাধ্যমে বিশিষ্ট বাণী সেবক ও শুদ্ধাত্মা জাতিগঠনকারী দেশসেবকদের বাণী প্রচার দ্বারা জাতীয় জীবনকে উদ্বুদ্ধ করিবার প্রয়াস করা উচিত বলিয়া মনে করি। গ্রন্থাগারকে কেন্দ্র করিয়া পল্লীর জনসাধারণের সহিত আন্তরিক সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে। দেশবাসী যুবক যুবতীগণকে দেশ সংগঠনে স্বরাজ প্রতিষ্ঠায় উদ্‌যোগী হইবার মহান ব্রতে দীক্ষিত করিতে হইবে। কথাবার্তা, পবিত্র সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক নাটক, প্রাণবন্ত কথকতা, সুরচিত প্রেক্ষা প্রদর্শনীর দ্বারা জাতীর জীবনে নবজাগরণ আনয়ন করিতে হইবে। বর্ত্তমানের হাল্‌কা সিনেমা সঙ্গীত প্রভৃতি তরল আমোদ প্রমোদ বর্জন করাইতে হইবে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পর সমগ্র বাংলা দেশে জাতীয় জাগরণের যে মহিমাময় ভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল বর্তমান দেশ সংগঠনের যুগে সেই উদ্যম সেই প্রেরণা সেই ত্যাগ সেই আত্মোৎসর্গের আবাহণ করিতে হইবে। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ভিতর যে মহিমাময় ভাবধারা আনয়ন করিয়াছিলেন দেশ গঠনের এই যুগে সেইরূপ সমুন্নত ভাবধারা জনসমাজের ভিতর জাগ্রত করিতে হইবে। ইহা ভুলিলে চলিবে না প্রত্যেক দেশ ও প্রত্যেক জাতির এক নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্যের ভিতর বিশ্ববিধাতা দেশের ও দেশবাসীর বিশ্ব লীলাক্ষেত্রে গতিপথ স্থির করিয়াছেন। ভারতবর্ষের বৈশিষ্ট্য যুগযুগান্ত ব্যাপী। অসংখ্য মহাপুরুষ যুগে যুগে ভারতের পুতঃবক্ষে এই বৈশিষ্ট্য তারস্বরে ঘোষণা করিয়াছেন। এই বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান বা আবিষ্কার করিবার প্রয়োজনীয়তা নাই। প্রত্যেক ভারতবাসী অনুসন্ধান করিলে এই বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট পরিচয় নিজের অন্তর হইতে পাইবে। গণচিত্তকে জাগ্রত ও সমুন্নত করিবার পদ্ধতি ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই গ্রন্থাগার আন্দোলনের

ভিতর দিয়া গ্রন্থাগারিক সুধীবৃন্দ যদি এই সম্মেলনে এই শুভ পদ্ধতির প্রবর্তনের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সচেতন হন তাহা হইলে পুণ্যভূমি মল্লভূমের এই সম্মেলন সার্থক হইবে। আমার বিনীত নিবেদন এই সম্মেলনে আপনারা এই বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হউন। জগন্মাতা আপনাদের সহায়তা করিবেন। ইহা বিধাতার নির্দেশ।

"লাইব্রেরীর মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোন পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোন পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোন পথ মানব হৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যেদিকে ধাবমান হও কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধিয়া রাখিয়াছে"—রবীন্দ্রনাথ

এই লাইব্রেরীর মধ্যেই মানুষ আপনাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। তাহার ধ্যান ধারণা, আশা আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞান বিজ্ঞান এককথায় তাহার শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্বাক্ষর সযত্নে সঞ্চিত হইয়াছে এই লাইব্রেরীর মধ্যে। এই লাইব্রেরী যেদিন নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে সেইদিন মানুষের সর্বস্ব বিলুপ্ত হইবে—মানুষের নাম নিঃশেষে মুছিয়া যাইবে এই পৃথিবীর মাটীর বুক হইতে। ইতিহাসের সাক্ষ্য দিতে আর কিছুই থাকিবে না। মানুষ তাহার মন ও মনন জীবনের পৃথিবী রচনা করিয়াছে এই লাইব্রেরীর মধ্যে। মহাকালকে জব্দ করিয়া স্তব্ধ মুখরতা এখানে ইহকাল পরকালকে একাকার করিয়া দিয়াছে। কাল তরঙ্গের অভিযান উপেক্ষা করিয়া অনন্ত মহারঙ্গ এখানে শত সহস্র মন এক সূত্রে বাঁধিয়া চলিয়াছে। কালের রাখালের বাঁশী এখানে কান পাতিলে শোনা যাইবে। সহস্র কণ্ঠ সহস্র ভাষায় সহস্র বৎসরের মধ্যদিয়া এই লাইব্রেরীর মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। শঙ্খের মধ্যে সমুদ্রের শব্দের মত এই লাইব্রেরীর মধ্যে অনন্ত কালের কলশব্দ শোনা যাইবে।

মূল-সভাপতির ভাষণ

সম্মেলনের মূল-সভাপতি শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে বলেন ঃ

বিষ্ণুপুর নামে বাঙালীর হৃদয়ে দোলা লাগে। মদনমোহনের স্থান এই বিষ্ণুপুর। চৈতন্যচরিতামৃতের কত অদ্ভুত স্মৃতি এই বিষ্ণুপুরের সহিত জড়িত। মল্লভূমের বীরগণের কত কাহিনী—স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কি সে বিক্রম। বিষ্ণুপুর বাংলা সংগীতের বহু পুরাতন কেন্দ্র—বাংলার সংস্কৃতি ও শিল্পের অন্যতম প্রধান আশ্রয়। বিষ্ণুপুরের দেবতাকে প্রণাম করে আমি কথা আরম্ভ করি।

যথেষ্ট দ্বিধা ও সংকোচ নিয়ে আজ আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি; একথা প্রারম্ভেই আপনাদের নিবেদন করছি। এ আমার বিনয়-বচন মাত্র নয়; মৌখিক সৌজন্যও নয়—আমার অন্তরের কথা। এই কঠিন কার্যে নিজের অযোগ্যতা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। স্বদেশীর হাটে মাঠে আমাদের দিন কেটে গেছে, স্বাধীনতা-আন্দোলনের পথে সমাজের নানা স্তরের লোকের সংগে সংযোগও ঘটেছে। সেই সূত্রে জীবন-পুঁথি হতে কিঞ্চিৎ পাঠ সংগ্রহের সুযোগ হয়ত ঘটেছে, কিন্তু গ্রন্থাগারের পুঁথির সংগে পরিচয় বলতে যা বুঝায় তা ঠিকমত ঘটেনি। তথাপি বংগীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের যে ভারটুকু আপনারা একান্ত ঔদার্যবশে আজ আমার উপর অর্পণ করেছেন, কুণ্ঠা ও আনন্দের সহিত আমি তা গ্রহণ করতে সাহসী হ'য়েছি এইজন্য যে, পশ্চিমবংগে গ্রন্থাগার আন্দোলন যাঁদের যত্ন, নিষ্ঠা, পরিশ্রম ও অনুরাগের দ্বারা নিয়ত গড়ে উঠেছে সেই সকল উৎসাহী নেতা ও কর্মিগণের সংগে মিলিত হ'বার সুযোগ গ্রহণের আগ্রহ আমার যথার্থই রয়েছে। আপনারা আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।

আকাশে রবির উদয়ের আয়োজনের সংগে নিম্নদেশে পৃথিবীর দিনযাত্রা আরম্ভ হয়। আমরাও আরম্ভ করি আমাদের চিত্তাকাশে উদয়ের কবি রবীন্দ্রনাথের একটি বাণী ধ'রে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "জগৎটা বাণীময় রে, এর যে দিকটাতে শোনা বন্ধ করবি সেই দিক থেকেই মৃত্যুবাণ আসবে।" প্রকৃতপক্ষে কোনো দিক থেকে কাণ না ফিরিয়ে, সকল দিকে কাণ পেতে থাকার অন্যতম প্রচেষ্টা হ'ল এই গ্রন্থাগার আন্দোলন। যে দিকের যে সত্য বাণী কাণের ভিতর দিয়ে মর্মে পেঁছবে, সেই বাণী আমাদের

অমৃতত্বের স্পর্শ দেবে—কাণ ফিরিয়ে নিয়ে অমৃত-বাণীকে বিদায় দিলে মৃত্যুর প্রবেশ-দ্বার মুক্ত হবে। বিশ্ব জুড়ে জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যে বাণী, যে বাণী মানুষের মর্মের গভীরে, তার অনুভূতি ও উপলব্ধিতে ঝংকৃত, যে বাণী মানুষের বুদ্ধি, চিন্তা ও আবিষ্কারে বিধৃত, যে বাণী তার সেবা, প্রেম ও আত্মদানে মহিমান্বিত, সেই বাণী সুষ্ঠুভাবে, বলিষ্ঠভাবে গ্রহণের পথ নির্দেশ করবে এই সব গ্রন্থাগার, যার পরিধিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "যাঁরা শিক্ষালয়ের বাইরে সমস্ত সমাজ জুড়ে আবাঁধা শিক্ষার একটা দিগন্তবিকীর্ণ বৃহত্তর পরিধি।" মানব-মনীষার সীমাহীনতার মধ্যে, তার দিগন্তবিস্তৃত চিত্তরাজ্যের বিস্ময় ও আনন্দ ও কৌতূহলের মধ্যে অবাধ বিচরণের আহ্বান সারা দেশে ঘোষণা করাই গ্রন্থাগার-আন্দোলনকে সার্থক ক'রে তোলবার প্রকৃষ্ট পন্থা। এই পথে জ্ঞান অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে যাতে নিজ দেশ ও সমাজের সম্যক্ ও সত্য পরিচয় লাভ করা যায় এবং সেই পরিচয় দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তরুণ ও কিশোর পাঠকের মনে শুভ কর্মের প্রেরণা সৃষ্টি করে, গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে সেদিকে দৃষ্টি রাখার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। আমাদের এই অতি প্রাচীন দেশকে স্বাধীনতা লাভের পর আবার নবীন হয়ে গড়ে ওঠবার তপস্যা গ্রহণ করতে হবে। সেই তপস্যার শিক্ষা ও প্রেরণা পাবার অন্যতম কেন্দ্র হ'ল গ্রন্থাগার, একথা অবিসংবাদী।

গান্ধীজীও বাণীময় জগৎ সম্বন্ধে বলে গেছেন। তিনি বলেছেন, বিশ্বের হাওয়া যা'তে প্রতিনিয়ত আমার ঘরে অবাধে প্রবেশ করে তার জন্যে আমি ঘরের সকল দোর-জানালা আগাগোড়া খুলে রেখে দেবো—কেবল একটি বিষয়ে সাবধান থাকবো—বাহিরের ঝড়ের বেগে স্বভূমি থেকে আমি যেন বিচ্যুত না হই। প্রকৃতপক্ষে স্বভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে পারলেই পৃথিবীর সকল মানুষ ও সকল চিন্তাকে বলিষ্ঠভাবে গ্রহণ ক'রে লাভবান হওয়া সম্ভব হ'তে পারে। এই মহাসত্যের জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য বহন করেছে বাঙলার ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ। এই অপূর্ব নবজাগরণ বাংলার মনীষার দিক থেকে ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে বাণীময় জগৎকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করবার সর্বতোমুখী চেষ্টার ফলেই সম্ভব হ'য়েছিল। বাংলাদেশে রামমোহন, ভূদেব, মধুসূদন, (মাইকেল) বিদ্যাসাগার, বঙ্কিম, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, জগদীশচন্দ্র-প্রফুল্লচন্দ্র, অরবিন্দ-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহামনীষীগণ "এই সাধনার এ আরাধনার যজ্ঞশালায়" ঋত্বিক—স্বভূমিতে

প্রতিষ্ঠিত থেকে এঁরা বিশ্বকে আপন ঘরে আহ্বান করে এনেছিলেন—এবং বিশ্বপরিচয়ের মধ্যে এঁরা নতুন করে ভারতবর্ষের পরিচয়ও পেয়েছিলেন—রবীন্দ্রনাথের "সেই সনাতন বৃহৎ ভারতবর্ষ" যার কৃশপঞ্জরের অভ্যন্তরে প্রাচীন তপোবনের অমৃত অশোক অভয় হোমাগ্নি এখনও জ্বলছে।

দেশের সঙ্গে সেই নব পরিচয়ের অমৃতফল হ'ল স্বাদেশিকতা—বাংলার হৃদয়সমুদ্র মন্থন করে এর উদ্ভব হ'য়েছিল—নতুন যুগে ভারতবর্ষের নব পথযাত্রায় এই স্বাদেশিকতা আমাদের প্রধান সম্বল হ'য়ে আছে। এই স্বাদেশিকতা সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতাবর্জিত, এই স্বাদেশিকতা প্রসারিত হয়ে, সহজেই বিশ্বমানবকে স্পর্শ করে—এরই দোলা লেগে কবিচিত্ত ঝঙ্কৃত করে গান উঠেছিল—

হে মোর চিত্ত, পুণ্য-তীর্থে জাগরে ধীরে—
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

প্রত্যেকটি গ্রন্থাগারে এই স্বাদেশিকতার মূল সুরটুকু অনুরণিত হতে থাকা চাই। তাহ'লে গ্রন্থাগারে অর্জিত জ্ঞান দেশের কর্মক্ষেত্রে নানাভাবে ফলপ্রসূ হতে পারবে। গ্রন্থাগারের এমন একটি দৃষ্টি থাকা চাই যা লক্ষ্যে অলক্ষ্যে পাঠকদের ইঙ্গিত করবে—

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্

তোমরা একসঙ্গে চলো, একসঙ্গে বলো, তোমাদের মন একসঙ্গে জাগুক। বহু বৈচিত্র্যের মধ্যে পাঠকগণের একচিত্ততার সৃষ্টি করতে পারলে গ্রন্থাগার ধন্য হবে।

রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থাগার পরিচালনায় গ্রন্থাগারিকদের স্থান কোথায় ও কর্তব্য কি নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন "লাইব্রেরিয়ানদের গ্রন্থবোধ থাকা চাই, কেবল ভান্ডারী হলে চলবে না।" গ্রন্থাগারিক অতিথিপরায়ণ হবেন· পাঠক যেন তাঁর সৌজন্যে মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হ'য়ে গ্রন্থাগারকে আনন্দধাম বলে গ্রহণ করতে পারে—গ্রন্থাগার যেন তার নিত্য আনাগোনার জায়গা হয়। আমাদের গ্রামপ্রধান দেশে বড়র চেয়ে ছোটো ছোটো গ্রন্থাগারের উপযোগিতা ও কার্যকারিতা অধিকতর বলেই অনুভূত হয়। সহরে বড় গ্রন্থাগারের প্রয়োজন আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বড় গ্রন্থাগারের একটা বিপদ আছে। বড় গ্রন্থাগারে বই জমিয়ে তুলে পাঠককে এবং জনসাধারণকে তাক্ লাগিয়ে দেবার একটা প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। কাঁড়ি করার একটা নেশা আছে—রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন সংগ্রহ-বাতিক। বই জমা করে কাঁড়ি করে তোলার নেশা যখন প্রবল হয় তখন পুস্তকের

নিত্য-ব্যবহারের দিক থেকে দৃষ্টি ক্রমে সরে যায়। যাঁরা উচ্চ শ্রেণীর পাঠক, অনুসন্ধান ও গবেষণাকার্য যাঁরা করেন, বহুপুস্তক-সমৃদ্ধ বড় লাইব্রেরির প্রয়োজন তাঁদেরই। কিন্তু সর্বসাধারণের জন্য প্রয়োজন ছোট ছোট গ্রন্থাগারের। সেইসব গ্রন্থাগারে প্রত্যেক বিষয়ের বাছা বাছা বই থাকবে—প্রত্যেক বইএর নিজ বৈশিষ্ট্য থাকবে, বইগুলি গ্রন্থাগারিকের আয়ত্তের মধ্যে থেকে পাঠকগণের কাছে সুকৌশলে নিত্য পরিবেশিত হবে এবং তারই সূত্রে পাঠক ও গ্রন্থাগারিকের আদান-প্রদানের সম্পর্ক সুন্দর ও সুদৃঢ় হয়ে গড়ে উঠবে। ছোট ছোট লাইব্রেরিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন "ভোজনশালা, তা প্রত্যহ প্রাণের ব্যবহারে ভোগের ব্যবহারে লাগে।" প্রত্যেক গ্রন্থাগারে বিশেষ পাঠকমণ্ডলী গঠন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব কথাগুলি এইবার উদ্ধৃত করে দিই। কথাগুলি হয়ত আপনারা সকলেই জানেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—"প্রত্যেক লাইব্রেরির অন্তরঙ্গ সভ্যরূপে একটি বিশেষ পাঠকমণ্ডলী থাকা চাই। সেই মণ্ডলীই লাইব্রেরিকে প্রাণ দেয়। লাইব্রেরিয়ান যদি এই মণ্ডলীকে তৈরী করে তুলে একে আকৃষ্ট করে রাখতে পারেন তবেই বুঝব তাঁর কৃতিত্ব। এই মন্ডলীর সঙ্গে তাঁর লাইব্রেরির মর্মগত সম্বন্ধ স্থাপনের তিনি মধ্যস্থ। অর্থাৎ তাঁর উপর ভার কেবল গ্রন্থগুলির নয়,—গ্রন্থপাঠকের। এই উভয়কে রক্ষা করার দ্বারা তিনি তাঁর কর্তব্যপালন করেন—তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দেন।" যাঁরা গ্রন্থাগারের কার্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আছেন, রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি তাঁদের মর্মগত হওয়া আবশ্যক।

বাংলাদেশে বিপ্লব-প্রচেষ্টায় ছোট ছোট গ্রন্থাগার একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিপ্লবের কর্মকেন্দ্ররূপে নানাস্থানে সমিতি স্থাপিত হয়েছিল। প্রত্যেক সমিতির সহিত ভাব-কেন্দ্র সৃষ্টির জন্য এক একটি ছোট লাইব্রেরী যুক্ত থাকতো। লাইব্রেরীতে অল্পসংখ্যক সুনির্বাচিত বই থাকতো, যেমন গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, আনন্দমঠ, ভবানী মন্দির, স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী, রবীন্দ্রনাথের কথা ও কাহিনী, নৈবেদ্য, সংকল্প ও স্বদেশ প্রভৃতি, ম্যাটসিনী ও গ্যারিবল্ডী, জর্জ ওয়াশিংটন প্রভৃতি বীরগণের জীবন কাহিনী, প্রতাপসিংহ, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ প্রভৃতি ভারতীয় বীরগণের জীবন বৃত্তান্ত, দেশের কথা, (সখারাম গণেশ দেউস্কর) ভ্রমণবৃত্তান্ত, চরিতকথা, শিখের বলিদান প্রভৃতি জাতীয় ভাবোদ্দীপক পুস্তকাবলি। পুস্তকের সংখ্যা কোথাও পঞ্চাশ, কোথাও একশত বা দুইশত। পাঁচশত

পুস্তকের লাইব্রেরি বোধহয় খুব কমই ছিল। কিন্তু কি প্রচণ্ড শক্তি ছিল এই ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলির। গ্রন্থাগারের সবগুলি বই অল্পসংখ্যক পাঠকের দ্বারা গভীর শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও যত্নের সহিত অধীত হয়ে পাঠককে বিপ্লবোপযোগী নতুন মানুষ ক'রে গড়ে তুলতে সহায়তা করতো। এই সব গ্রন্থাগারে পাঠকেন্দ্র 'মরাল ক্লাশ' প্রভৃতিতে দেশের স্বাধীনতা, চরিত্রগঠন, সমাজসেবা সম্বন্ধীয় নানা কথার আলোচনায় ছেলেদের মন সমৃদ্ধ হয়ে উঠতো। গান্ধী আন্দোলনের সময়ও এই সব ছোট লাইব্রেরীর প্রসার অব্যাহত ছিল। বাংলাদেশে ছোট ছোট লাইব্রেরির এই গৌরবময় সার্থকতার কথা স্মরণ করতে ও স্মরণ করিয়ে দিতে অতিশয় আনন্দ বোধ করছি।

আজ ১২।১৩ বৎসর হয়ে গেল আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। এই কয় বৎসরে নানা স্তরের বিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও অতিশয় পরিতাপের কথা এই যে, দেশে আজও জাতীয় শিক্ষার যথার্থ ভিত্তি স্থাপন করা সম্ভব হল না। অথচ দেশকে ভাল করে জেনে বুঝে চিনে নিয়ে ভালবাসতে না শিখলে, দেশের জন্য ত্যাগস্বীকারের প্রেরণা না পেলে, দেশগঠন ও দেশরক্ষার উপযুক্ত নাগরিক তৈরি হওয়া কখনই সম্ভব নয়। স্বাধীন দেশে শিক্ষাপ্রচেষ্টা এই দিকে ব্যর্থ হচ্ছে বলেই আমার ধারণা। আমাদের স্কুল-কলেজে নানা দেশের ইতিহাস পড়াবার পুরাণ মামুলি ব্যবস্থা বজায় আছে, কিন্তু দেশ কি করে স্বাধীন হ'ল তার গৌরবময় বিচিত্র ইতিহাস ছাত্রেরা সাধারণতঃ জানে না—সে সব অপূর্ব কথা শিক্ষা দিবার যথার্থ আয়োজন বিদ্যালয়ে নেই, তার প্রয়োজনও অনুভূত হয় না। ভারতবর্ষের প্রতিভাশালী বীর সন্তান ও শহীদগণের জীবনবৃত্তান্ত রীতিমতভাবে পড়াবার কোন ব্যবস্থাও বিদ্যালয়ে নেই। জাতীয় চরিত্র ও স্বাদেশিকতা সম্বন্ধে কোন কথা ছেলেরা বিদ্যালয়ে শেখে না বললেই চলে। প্রথম বয়সে বালকের মন যখন কোমল, নমনীয় ও গ্রহণক্ষম থাকে তখন থেকে এই শিক্ষা তাদের মজ্জাগত হয়ে না গেলে, দেশে অলক্ষ্যে কি বিপুল ক্ষতি উপচিত হয়ে উঠবে তার হিসাবই তখন পাওয়া যাবে না। ইংরেজ আমলে নিষেধের গণ্ডীটানা বিদ্যালয়সমূহে জাতীয় ভাবোদ্দীপক এই সব বই পড়াবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তাই ছোট ছোট লাইব্রেরির সহায়তায় জাতীয়তাবাদীগণ স্বতন্ত্র ভাবে সেই অত্যাবশ্যক কার্য সম্পন্ন করতেন। আজ স্বাধীনদেশে জাতীয়-ভাবের পুস্তকাদি পড়াবার কোন বাধাই কোন বিদ্যালয়ে নেই—তথাপি ব্যবস্থার

অভাবে বিদ্যালয়ে সে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে না। তাই আজও এই ক্ষেত্রে আমাদের গ্রন্থাগারগুলিকে অগ্রণী হয়ে এসে দেশের জাতীয়তা, স্বাদেশিকতা, স্বাধীনতার বিচিত্র ইতিহাস, দেশের সাধনা ও সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আপন হাতে গ্রহণ করতে হবে। গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনের এই এক অতি গুরু দায়িত্ব।

আমাদের স্বাধীন ভারতে সকল প্রদেশেই সর্বত্র গ্রন্থাগার সৃষ্টি করে তোলার দিকে গবর্ণমেণ্ট দৃষ্টি দিয়েছেন—দেশে এ একটা শুভ লক্ষণ এবং আশার কথা। সদরে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সকল স্থাপিত হচ্ছে—গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার স্থাপনের সাড়া ধীরে ধীরে জগছে। সরকার গ্রন্থাগারের গৃহ নির্মাণ ও পরিচালনের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত হয়েছেন। সরকারী সাহায্য একে একে সকল গ্রন্থাগারে এসে পৌঁছবে এই আশা আমরা করবো। এদিকে সাহায্যগ্রহণকারী বিভিন্ন গ্রন্থাগারেরও এই বিষয়ে গুরুদায়িত্ব ও কঠিন কর্তব্য রয়েছে একথাও স্মরণ আজ করতে হবে। সরকারী সাহায্য পাওয়া যখন আদৌ সম্ভব ছিল না সেই ইংরেজ আমলে, আন্দাজ ৮০।৯০ বৎসর বা ততোধিক পূর্বে দেশে জেলাকেন্দ্র বা গণ্ডগ্রামে দুই একটি করে গ্রন্থাগার স্থাপিত হতে থাকে। এই উদ্যোগ শিক্ষিত লোকের স্বল্প সম্বল ও ঐকান্তিকতা সহায়েই সম্ভব হয়। এই কার্যে লোকের যে চেষ্টা তখন জাগ্রত ছিল, আজ অর্থাগম ক্রমশঃ সহজ হয়ে আসায় সেই চেষ্টা শিথিল হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এইজন্য গ্রন্থাগারের উদ্যোগীগণকে গ্রন্থাগার সম্পর্কীয় অন্য বহুকর্মে সেই চেষ্টাকে প্রযুক্ত করে জাগ্রত রাখতে হবে একথা বলাবহুল্য। প্রকৃতপক্ষে একদিকে লোকের উদ্যোগ ও ঐকান্তিকতা এবং অপরদিকে সরকারী সাহায্য এই উভয়ের সুসঙ্গত ও মর্যাদাপূর্ণ সংযোগ ব্যতীত গ্রন্থাগার আন্দোলন ভাল করে অগ্রসর হতে পারবে না।

সুষ্ঠু গ্রন্থাগার-ব্যবস্থা গড়ে তোলবার আইন প্রণয়নের কথা উঠেছে। এই বিষয়ে রঙ্গনাথন্ অগ্রণী হ'য়েছেন। এই চেষ্টাকে আমরা সমর্থন করি। কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, জেলা গ্রন্থাগার এবং গ্রাম-গ্রন্থাগারগুলি যদি এক ব্যবস্থার মধ্যে একসূত্রে গ্রথিত হয় তবে সুবিধা হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে সাবধান ও সজাগ থাকার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। ব্যবস্থা যতই ভাল হউক তা একান্ত কেন্দ্রীভূত হ'লে এবং সরকারী লালফিতার বাঁধনে একান্ত আবদ্ধ হ'লে কার্যে অসুবিধা ঘটবেই। মনে রাখা দরকার, শেষ পর্যন্ত গ্রন্থাগারগুলির প্রত্যেকটি

আপন ভাবে, স্বাধীনভাবে এবং নিরঙ্কুশভাবে কাজ না করলে, শুধু ব্যবস্থা দ্বারা বেশী কিছু করা সম্ভব নাও হতে পারে। কর্মীই হ'ল গ্রন্থাগারের প্রাণ, তার আশা, তার প্রধান সম্বল ও অবলম্বন। সুখের বিষয় গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রে এইরূপ কর্মী দেখা দিয়েছেন। তাঁদের প্রসার ও বৃদ্ধি কামনা করি। দীপ থেকে দীপ জ্বলে। তাদের উদাহরণ থেকে অন্যে প্রেরণা ও শিক্ষা লাভ করুন। এই কর্মীর দলকে সযত্নে রক্ষা করা, উৎসাহ ও পরামর্শ দেওয়া এবং মর্যাদাদান করা সরকারের কর্তব্য একথা বাহুল্য হ'লেও উল্লেখ করছি। এরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন অফিসার বা সরকারী কর্মচারীও আছেন—এ আমাদের আনন্দ ও উৎসাহের কথা।

আমাদের দেশে গ্রন্থাগারের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। কিন্তু পাঠের প্রবৃত্তি তেমন জাগছে না। একটা অতিশয় এলোমেলো ভাব—কেন পড়ব, কি পড়ব এই বিষয়ে কোন পরামর্শ বা নির্দেশ নেই। এবিষয়ে গ্রন্থাগারিকের কর্তব্য কি ও স্থান কোথায় তার আলোচনা সংক্ষেপে করা হ'য়েছে। এখানে আর দুই একটা কথা বলছি। পড়ার প্রবৃত্তি ও অনুরাগ বাল্য ও কৈশোরে জাগাতে হয়—এই বয়সেই অভ্যাসসমূহ গঠিত হয়। ভাল ভাল বই পড়তে পড়তে এই বয়সেই বালকের হৃদয়ে ধীরে ধীরে অলক্ষ্যে আদর্শের প্রতি একটা আকর্ষণ জেগে ওঠে। আমাদের দেশে এখন প্রায় প্রতি বিদ্যালয়ে লাইব্রেরিতে কিশোর সাহিত্যের ভাল বই আছে—আবার অন্যান্য লাইব্রেরিতেও শিশু বিভাগ খোলা হ'য়েছে বা খোলার চেষ্টা হচ্ছে। এই সব লাইব্রেরিতে গ্রন্থাগারিকের বা শিক্ষক মহাশয়ের পরামর্শ ও নির্দেশমত ছেলেরা যদি পৌরাণিক কাহিনী, রামায়ণ, মহাভারত, কাব্য, জীবনী, ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত, স্বাধীনতা-প্রচেষ্টার কথা, দেশের কথা, হাসিখুশীর কথা, বিজ্ঞান ও আবিষ্কারের কথা প্রভৃতি পাঠ করবার অভ্যাস সুরু করে, তবে তাদের মন গ্রন্থাগার অভিমুখী হ'য়ে গড়ে উঠবে এবং ছেলেবেলাতেই উত্তম পুস্তক পাঠের রুচি সৃষ্ট হবে। গ্রন্থাগার-প্রচেষ্টার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে এইখানে—এই শিশু, বালক ও কিশোরের চিত্তক্ষেত্রে।

দেশে এখন নিরক্ষরতা দূরীকরণের ব্যাপক চেষ্টা সুরু হয়েছে। যাঁরা নিরক্ষর থেকে কয় বৎসরের চেষ্টায় সাক্ষর হচ্ছেন, ছোট ছোট লাইব্রেরিতে তাঁদের যথাযোগ্যরূপ পড়ার ব্যবস্থা না করলে পড়ার অনভ্যাসে তাঁরা আবার প্রায় নিরক্ষর হ'য়ে উঠবেন। এখানেও ছোট ছোট লাইব্রেরির কত উপযোগিতা তা মনে রাখা দরকার।

ছোট বড় সকল গ্রন্থাগারেই ভাল ছবি, ছবির বই, এলবাম, পট, প্রাচীরচিত্র যন্ত্রসহযোগে চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা প্রভৃতি রাখা প্রয়োজন। নতুবা ছবির মধ্য দিয়ে ছেলেদের দেশ-বিদেশের সঙ্গে পরিচয় হয়। আগে আপন দেশের সম্যক্ পরিচয় তাদের পাওয়া প্রয়োজন—নতুবা ছবির মধ্য দিয়ে প্রথমেই যদি তারা মাত্র বিদেশের ঐশ্বর্য-বিস্তার, জাঁকজমক, আড়ম্বর ও ফ্যাসনের সহিত পরিচিত হয় তবে তাদের মনে নিজের অকিঞ্চিৎকরতা ও হীনমন্যতার সঞ্চার হবে, রুচিও বিকৃত হবে—এত বড় বিপদ আমাদের আর নেই। চিত্রে আমাদের ছেলেরা আগে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনীর সঙ্গে পরিচিত হোক্, ভারত দর্শন করুক, দেশের সাধু মহাপুরুষ, বীর নেতা ও মনীষীর সঙ্গ লাভ করুক, কণারক ভুবনেশ্বর পুরীর মন্দির দেখুক, মীনাক্ষী কাঞ্চি অরুণাচলম্ চিদম্বরম্ প্রভৃতি মন্দির ও গোপুরম দেখুক, তাজমহল মতিমসজিদ্ দেওয়ানী আম দেওয়ানী খাস দেখুক, অজন্তা ও ইলোরার গুহামন্দির, খাজুরাহো রাজপুতানা ও অমৃতসরের মন্দির, হিমালয়ের ভুবনমোহন সৌন্দর্য, ভারতের বিভিন্ন স্থানের অপূর্ব প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে চিত্রের মধ্য দিয়ে তাদের পরিচয় হোক। নব্যভারতের বিভিন্ন প্রচেষ্টা—নদী নিয়ন্ত্রণ, সেচ পরিকল্পনা প্রভৃতির সহিতও তারা পরিচিত হোক্। তারপর তারই সঙ্গে ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের বীর, মনীষী, বিজ্ঞান সাধকের ছবি এবং তথাকার চিত্র ও ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখে তাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তার লাভ করুক। এই কার্য গ্রন্থাগারের মাধ্যমে সুরু হওয়া দরকার।

কয়েক বৎসর হল কয়েকটি জেলার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে ভ্রাম্যমাণ্ বিভাগ খোলা হয়েছে। এই ভ্রাম্যমাণ বিভাগের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সমধিক। পুস্তক আদান প্রদানের সঙ্গে এই বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন গ্রন্থাগারের পরস্পর পরিচয় ঘটে এবং ক্রমে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আদানপ্রদানের ব্যবস্থায় বিভিন্ন লাইব্রেরির বহুমূল্য পুস্তক বহু পাঠকের হাতে গিয়ে পৌঁছে। আর গ্রাম-গ্রন্থাগারের সহিত আদান-প্রদানের ভ্রাম্যমাণ বিভাগ যে মধ্যস্থের কাজ করে তাতে শুধু বই পড়া হয় না, গ্রাম এবং গ্রাম-গ্রন্থাগারের পরিচালকগণের সহিত ক্রমে একটা হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে পরস্পরের শক্তিবৃদ্ধি ও সহানুভূতির পথ প্রশস্ত হয়। মানুষের কাছে কল্যাণ-কর্মের সূত্রে যাওয়া আসা করলেই মানুষ আপন হয়ে ওঠে। গ্রন্থাগার আন্দোলনে এই আপন করে নেওয়ার শক্তিই সৃষ্টি-ক্ষম ও আনন্দময় হয়। গ্রাম সহরের ব্যবধান ভেঙ্গে নেবারও ইহা অন্যতম পন্থা।

আজকাল কয়েকটি গ্রন্থাগারকে যুক্ত ক'রে একটি ক'রে অঞ্চল গ্রন্থাগার সৃষ্ট হ'য়েছে। অঞ্চল গ্রন্থাগারে তথা জেলায় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে জেলার বিভিন্ন স্থান হতে পুরাতন পুঁথি, প্রত্নতত্ত্বমূলক ভাস্কর্যের নিদর্শনাদি, শিল্পজাত দ্রব্যের নমুনা, পুরাণতত্ত্ব, ইতিহাস বিষয়ে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থাদি রক্ষা করা প্রয়োজন। এই সকল ভবিষ্যতে দেশের ইতিহাস রচনার উপাদানস্বরূপ ব্যবহৃত হতে পারবে।

আর এক কথা। নতুন ভাল বই প্রকাশিত হলেই গ্রন্থাগারের দিক থেকে তার খবর রাখতে হবে এবং তার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটিয়ে দিতে হবে। শিশু বিভাগের জন্যও এই ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন। পুস্তক প্রকাশকগণ এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন—বিভিন্ন গ্রন্থাগার প্রয়োজনমত কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের মাধ্যমে এই বিষয়ে পরস্পরের সহায় হতে পারেন। পাঠকগণের সুবিধা ও সহায়তার জন্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার অথবা বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ বিভিন্ন পর্যায়ের পাঠকের জন্য অবশ্য পাঠ্য কণ্টি পুস্তক-তালিকা প্রস্তুত করতে পারেন। এই বিষয়ে প্রত্যেক গ্রন্থাগারও আপন চেষ্টায় তাঁর নিজের তালিকা প্রস্তুত করতে পারেন। কিশোর ও বয়স্ক উভয়ের জন্য স্বতন্ত্র তালিকা তৈরি করা অবশ্য কর্তব্য।

গ্রন্থাগার আপন পাঠকমণ্ডলী সৃষ্টি করবার জন্য গ্রন্থাগারে পাঠচক্র খুলতে পারেন। কোন কোন গ্রন্থাগারে কোথাও রবীন্দ্র পাঠচক্র, কোথাও গান্ধী পাঠচক্র, অরবিন্দ পাঠচক্র খোলা হয়েছে। সংবাদপত্র ও পত্রিকাদি পাঠের জন্য পাঠকেন্দ্র খোলা দরকার। পাঠকেন্দ্রে বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত প্রধান প্রধান প্রবন্ধের নাম তালিকাভুক্ত করে টাঙিয়ে দিলে পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে ও পাঠে সহায়তা করা হবে। এতদ্ভিন্ন গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে নানা বিষয়িণী বক্তৃতার আয়োজন করা দরকার। এজন্য ভারতীয় সংস্কৃতি বক্তৃতামালা, লোকশিক্ষা বক্তৃতামালা বা অনুরূপ ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রন্থাগার পরিষদ করেছেন। কোন কোন জেলা গ্রন্থাগারও সেই পথ নিয়েছেন। এই শিক্ষণ বিজ্ঞানসম্মত এবং গ্রন্থাগার পরিচালনায় এর উপযোগিতা সমধিক। এরূপ শিক্ষণ এক্ষণে আবশ্যিক হওয়াই প্রয়োজন।

গ্রন্থাগারে যে সকল কর্মী চাকরি করেন—এরূপ কর্মীর সংখ্যা নতুন ব্যবস্থায় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাবে—তাঁদের চাকরি সম্বন্ধে সরকারী সুব্যবস্থা হওয়া

অত্যন্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তাঁদের চাকরি পাকা হওয়া, চাকরিতে উন্নতি হওয়ার পথ খোলা, প্রভিডেন্ট ফন্ড প্রভৃতির ব্যবস্থা করা এখনই দরকার। এই কাজ বিলম্বিত হ'য়ে আছে।

গ্রন্থাগার সম্মেলনে অনেক কথাই বলবার থাকে—সকল কথা বলতে গেলে অতিবিস্তারের অপরাধ এসে পড়ে। সে অপরাধ হয়ত ইতিমধ্যেই আমার ঘটেছে। সুতরাং এইবার শেষ করি।

বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ১৯২৪ সালে। সে সময় উদ্যোগীগণের পুরোভাগে ছিলেন ৺কুমার মুণীন্দ্র দেবরায় মহাশয়। দেবরায় মহাশয়কে ও তাঁর সহকর্মিগণকে আজ আমরা শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করছি। তাঁদের আশীর্বাদ আমাদের পাথেয় স্বরূপ।

এইবার কবির কথা বলে শেষ করি

দুঃসহ ব্যথা হয়ে অবসান
জন্ম লভিছে কি বিশাল প্রাণ।
পোহায় রজনী, জাগিছে জননী
বিপুল নীড়ে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।

ভারতের এই নবজাগরণ যেন আমাদের গ্রন্থাগার আন্দোলনকে সর্বভাবে সঞ্জীবিত করে তোলে—বিধাতার নিকট এই আমার প্রার্থনা।

উদ্বোধন অধিবেশনে অন্যান্যদের ভাষণ

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের সভাপতি শ্রীতিনকড়ি দত্ত রবীন্দ্র জন্ম শতবর্ষ পূর্তি বৎসরে এই সম্মেলনের তাৎপর্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পরিষদের প্রথম সভাপতি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গ্রন্থাগার আন্দোলনের সম্পর্কের কথা উল্লেখ করেন। তিনি জানান যে পরিষদ এতদুপলক্ষে একটি স্মারক গ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করেছেন।

বেতনভুক গ্রন্থাগার কর্মীদের যথোচিত বেতন ও সামাজিক মর্যাদার দাবী জানিয়ে শ্রী দত্ত এবিষয়ে অন্যান্য দেশ ও মাদ্রাজ প্রভৃতি রাজ্যের তৎপরতার উল্লেখ

করেন। উপেক্ষিত শিশু ও কিশোরদের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগারের প্রতি যত্নবান হবার জন্যে তিনি গ্রন্থাগার কর্মী ও সরকারকে আবেদন জানান।

জেলা সমাজ শিক্ষাধিকারিক শ্রীবিশ্বেশ্বর দাশ সমাজ শিক্ষায় গ্রন্থাগারের ভূমিকা বিবৃত করেন। নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রসূত নানা অসুবিধার উল্লেখ করে তিনি গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে অধিকতর সংযোগ ও সহযোগিতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

পরিষদ সম্পাদক শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায় আলোচ্য মূল-প্রবন্ধ উপস্থাপিত করে তার একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দান করেন।

পরিশেষে শ্রীপ্রবীর রায়চৌধুরী সমবেত প্রতিনিধিদের জেলভিত্তিক একটি পরিসংখ্যান পাঠ করেন। শ্রীঅরুণকান্তি দাশগুপ্ত নিম্নলিখিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে প্রাপ্ত শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন ঃ

বিদেশ হতে প্রাপ্ত

ইন্টারন্যাশন্যাল ফেডারেশন অব লাইব্রেরী এসোসিয়েসনস, ফেডারেশন অব ইন্টারন্যাশন্যাল ডকুমেন্টেসন, লাইব্রেরী ডিভিসন ইউনেস্কো, এসোসিয়েসন অব স্পেশাল লাইব্রেরীজ এণ্ড ইনফরমেশন বুরোজ, আমেরিকান স্পেশাল লাইব্রেরীজ এসোসিয়েসন, কানাডিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েসন, লেনিন লাইব্রেরী, স্কুল লাইব্রেরীজ এসোসিয়েসন (ইংলণ্ড), পাকিস্তান লাইব্রেরী এসোসিয়েসন, ওকলাহামা লাইব্রেরী এসোসিয়েসন।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হতে প্রাপ্ত

ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরী এসোসিয়েমন, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন অব স্পেশাল লাইব্রেরীজ এণ্ড ইনফরমেশন সেন্টার্স, রেজিষ্ট্রার—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সম্পাদক-ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরীয়ান, ডঃ এস, আর, রঙ্গনাথন, ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, কলিকাতা, বিশ্বভারতী, বর্ধমান ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ, শ্রীঅনন্তশয়নম আয়েঙ্গার শ্রীঅপূর্ব কুমার চন্দ, শ্রীঅশোক সেন, শ্রীবঙ্কিম কর, শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, এবং আলিগড় ও বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকগণ।

প্রথম কার্যকরী অধিবেশন

৩১শে মার্চ মধ্যাহ্নে সম্মেলনের প্রথম কার্যকরী অধিবেশন শুরু হয়। সভাপতিত্ব করেন শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু। পরিষদের পক্ষ হতে শ্রীফণিভূষণ রায় আলোচ্য মূল-প্রবন্ধ (ফাল্গুণ সংখ্যায় প্রকাশিত) প্রতিনিধিদের নিকট উপস্থাপিত করেন। শ্রী রায় প্রবন্ধের একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা দান করেন। প্রবন্ধে প্রদত্ত তথ্যাদি সম্পর্কে কেহ কেহ সন্দেহ প্রকাশ করলে শ্রীনিখিল রঞ্জন রায় সেবিষয়ে উত্তর দেন (শ্রী রায়ের একটি প্রবন্ধ থেকে তথ্যগুলি উদ্ধৃত হয়েছিল)।

আলোচ্য প্রবন্ধের মূল বক্তব্যের যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রতিনিধিদের অনেকেই প্রশ্ন উত্থাপন করেন। স্থির হয় প্রবন্ধটির ৫টি বক্তব্যের উপর আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবেঃ (১) গ্রন্থাগার আইন, (২) সরকারী গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ত্রুটি, (৩) মিউনিসিপ্যাল গ্রন্থাগার ব্যবস্থাব অভাব, (৪) জনপরিচালিত গ্রন্থাগার সমূহের অসহায়তা, (৫). বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের উপায়হীনতা।

আলোচনার সুবিধার্থে প্রতিনিধিদের নিম্নলিখিত ৪টি দলে বিভক্ত করা হয়। দলীয় পরিচালকেরা দলের মতামত সম্মেলন পরিচালন সংসদের নিকট প্রেরণ করেন।

প্রথম দল

পরিচালক ঃ শ্রীফণিভূষণ রায়
প্রতিবেদক ঃ শ্রীশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়
মোট প্রতিনিধি ঃ ৫২ জন

দ্বিতীয় দল

পরিচালক ঃ শ্রীগনেশ ভট্টাচার্য
প্রতিবেদক ঃ শ্রীনির্মল চৌধুরী
মোট প্রতিনিধি ঃ ৫৩ জন

তৃতীয় দল

পরিচালক ঃ শ্রীশিবশংকর মিত্র
প্রতিবেদক ঃ শ্রীমতী বাণী বসু
মোট প্রতিনিধি ঃ ৫৩ জন

চতুর্থ দল

পরিচালক ঃ শ্রীরামরঞ্জন ভট্টাচার্য
প্রতিবেদক ঃ শ্রীঅরুণকান্তি দাশগুপ্ত
মোট প্রতিনিধি ঃ ৫৩ জন

প্রকাশ্য অধিবেশন

প্রথম কার্যকরী অধিবেশনের পর অপরাহ্নে এক প্রকাশ্য অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় বিশিষ্ট জননেতা শ্রীরামনলিনী চক্রবর্তী সভাপতিত্ব করেন।

সভায় শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু, শ্রীগোপালচন্দ্র পাল, শ্রীসুধীর লাহা, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি ভাষণ দান করেন।

বিচিত্রানুষ্ঠান

সন্ধ্যায় আয়োজিত এক সাংগীতিক অনুষ্ঠানে স্থানীয় বহু কুশলী শিল্পী অংশ গ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুর নিবাসী বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি ও অংশ গ্রহণে অনুষ্ঠান খুবই উপভোগ্য হয়।

১লা এপ্রিল :

দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশন

প্রথম পর্যায়

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন সকালে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশনের প্রারম্ভিক পর্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরিচালিত জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও পদমর্যাদার উপর শ্রীবিজয়ানাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীনগেন্দ্রনাথ সামন্ত ও শ্রীঅনিল কুমার দত্ত (জেলা গ্রন্থাগারিক হুগলী) কর্তৃক লিখিত তিনটি প্রবন্ধের ভিত্তিতে আলোচনা হয়।

আলোচনার সূত্রপাত করে শ্রীপ্রবীর রায় চৌধুরী বলেন যে সরকারী প্রচেষ্টায় যে গ্রন্থাগার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার সর্বাপেক্ষা বিসদৃশ বিষয় হোল কর্মচারীদের বেতনের স্বল্পতা। গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের মোট বেতন মাসিক ৭৫৲। তাও সবসময় তাঁরা নিয়মিত পান না। গ্রন্থাগারের কার্যপন্থা নির্ধারণে গ্রন্থাগারিকের মতামত গ্রহণ করা হয় না। গ্রন্থাগারের কার্যনির্বাহক সমিতিতে গ্রন্থাগারিকদের কোন স্থান নেই।

শ্রীসুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের শিক্ষণের ধারা ও উন্নত মান প্রসঙ্গে যথোচিত ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন। স্থানীয় ইতিহাস রচনা ও তথ্য সংকলনে তাঁরা যথেষ্ট সাহায্য করতে পারেন। তিনি বীরভূম জেলা গ্রন্থাগারের পরিচালনায় সংকলিত ইউনিয়ন ক্যাটালগ প্রস্তুতির উল্লেখ করেন।

শ্রীবিজলী সরকার গ্রামবাসীদের মধ্যে গ্রন্থাগারের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির বিভিন্ন উপায় বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন যে পর্যাপ্ত সরকারী সাহায্য না পেলেও উপকারিতা লাভ করলে জনসাধারণ অর্থ-সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসবে।

শ্রীসরোজ হাজরা বলেন যে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণের চাহিদা ও তার মান

সম্পর্কে অবিলম্বে সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। যেসব গ্রন্থাগার বর্তমানে রয়েছে সেগুলির উন্নতি সাধন না করে নূতন নূতন গ্রন্থাগার স্থাপন অর্থহীন বলে তিনি মনে করেন।

শ্রীফণিভূষণ রায় বলেন যে শিবির শিক্ষণের সময় ও মান সর্বক্ষেত্রে এক নয়। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের পরিচালনাধীনে অনুষ্ঠিত হলে শিক্ষণের সমান ও উন্নত মান বজায় রাখা সম্ভব। তিনি আরও বলেন যে সাময়িক উৎসাহ উদ্দীপনায় যা গড়ে ওঠে তার আয়ু অল্পকালের। উৎসাহের সঙ্গে তাই প্রয়োজন অর্থের ব্যবস্থা এবং গ্রন্থাগারিকদের সামাজিক মর্যাদার স্বীকৃতি।

শ্রীনিতাই চন্দ্র বসু বলেন যে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাদির ফলাফল ও তার বিবরণ পরিষদের দেওয়া উচিত। পরিষদ অন্তর্ভুক্ত গ্রন্থাগারগুলি পরিষদের সাহায্যে প্রাচীর পত্রের মাধ্যমে জনশিক্ষায় উদ্যোগী হতে পারে।

শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য বলেন যে অধিকাংশ গ্রন্থাগার সরকারী সাহায্য পান না, তাঁদের বেতনভুক কর্মীও নেই। ক্লাস নাইন পর্যন্ত পড়েছেন যেসব কর্মী তাঁদের শিক্ষণদানের প্রশ্নও পরিষদের বিবেচনা করা উচিত।

শ্রীপ্রমীলচন্দ্র বসু বলেন যে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে কার্যকরী করার জন্যে সাধ্যমত চেষ্টা করা দরকার। কর্মীরা যদি নিজ নিজ সমস্যা পরিষদের গোচরে আনেন তাহলে বিভিন্ন উপায়ে এবং থানা, মহকুমা ও জেলার ভিত্তিতে আহূত সভায় সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা যেতে পারে।

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় এতাবৎকাল বিভিন্ন জেলায় অনুষ্ঠিত শিবির শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রশংসা করে বলেন যে ভাল কাজে সব সময় কর্মী পাওয়া যায় না। বিনা পারিশ্রমিকেও যে আবার ভাল কর্মী পাওয়া যায় না তা নয়। কিন্তু তা অনির্দিষ্ট ও অনিশ্চিত কালের জন্যে। কাজেই এর সুষ্ঠু সমন্বয়ের জন্যে চাই উপযুক্ত বেতনে উপযুক্ত কর্মী।

দ্বিতীয় পর্যায়

এই পর্যায়ে সূচীকরণে বাংলা নামের সমস্যার উপর শ্রীগণেশ ভট্টাচার্য একটি প্রবন্ধ (অন্যত্র মুদ্রিত) পাঠ করেন।

আলোচনায় শ্রীঅভয় সরকার, শ্রীতিনকড়ি দত্ত, শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি অংশ গ্রহণ করেন।

তৃতীয় পর্যায়—

দ্বিতীয় কার্যকরী অধিবেশনের তৃতীয় ও শেষ পর্যায়ে ছোটদের গ্রন্থাগার সম্পর্কে শ্রীমতী বানী বসু ও শ্রীভূপেশচন্দ্র বসু দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

অতঃপর অধিবেশনের বিরতি হয়।

জেলা ভিত্তিক কর্মী বৈঠক

সমাপ্তি অধিবেশনের পূর্বে প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ জেলার সমস্যাদি সম্পর্কে আলোচনার জন্যে জেলাভিত্তিক কয়েকটি দলে বিভক্ত হন। স্বীয় মুখপাত্র মারফৎ বিভিন্ন দল তাঁদের প্রস্তাবাদি সমাপ্তি অধিবেশনে পেশ করেন।

সমাপ্তি অধিবেশন

১লা এপ্রিল অপরাহ্ণে সম্মেলনের সমাপ্তি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম কার্যকরী অধিবেশনে নির্বাচিত বিভিন্ন দলের পরিচালকদের নিকট হতে প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে চূড়ান্ত প্রস্তাবাদি এই অধিবেশনে আলোচিত ও গৃহীত হয়। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন প্রতিনিধির নিকট হতে পূর্বে প্রাপ্ত কয়েকটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

মূল প্রতিবেদক : শ্রীগোবিন্দলাল রায়

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবাবলী

পশ্চিম বাংলার সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রস্তাব

১। পঞ্চদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের সুচিন্তিত অভিমত এই যে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কলিকাতা পৌরাঞ্চলে অবিলম্বে কেন্দ্রীয় পৌর গ্রন্থাগার স্থাপন করা হউক এবং সমগ্র কলিকাতা পৌর এলাকায় সুসংবদ্ধ নিঃশুল্ক পৌর গ্রন্থাগার ব্যবস্থা স্থাপনের উদ্যোগ করা হউক। বিভিন্ন সভা সমিতিতে কলিকাতা পৌর প্রতিনিধিদের এই সম্বন্ধে আশ্বাস সত্ত্বেও আজও তাঁহারা এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে অগ্রসর হন নাই, এ সম্বন্ধে কলিকাতার গ্রন্থাগারগুলিতে উপযুক্ত জনমত সৃষ্টির জন্য আহ্বান করা হইতেছে এবং পৌর প্রতিনিধিদের অবহিত করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

সম্ভব ক্ষেত্রে অন্যান্য জনবহুল শহরাঞ্চলে মিউনিসিপ্যালিটিগুলির উদ্যোগে বিনা চাঁদার গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়া উচিত।

২। স্বর্গীয় মুনীন্দ্রদেব রায় মহাশয়, অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রমুখ ব্যক্তিরা আইন সভায় আমাদের রাজ্যের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগার বিল উত্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্গীয় গ্রন্থগার সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে পশ্চিমবঙ্গের জন্য একটি গ্রন্থাগার আইন প্রবর্তনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। নবদ্বীপে দ্বাদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে ডঃ রঙ্গনাথন কর্তৃক রচিত গ্রন্থাগার বিলের একটি খসড়া প্রচার করিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির নির্দেশেও গ্রন্থাগার আইন প্রণয়নের নির্দেশ আছে।

এই সম্মেলন লক্ষ্য করিতেছে যে এতৎসত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কোনও রূপ গ্রন্থাগার আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার খাতে অধিকতর অর্থ মঞ্জুর করা হইয়াছে। উপযুক্ত আইনের ভিত্তিতে সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার পরিকল্পনা না থাকিলে অর্থের সদ্ব্যায় হইবার সম্ভাবনা কম। এই কারণেও গ্রন্থাগার আইনের আশু প্রবর্তন একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

সমস্ত কথা বিবেচনা করিয়া এই সম্মেলন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ও গ্রন্থাগার সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন অন্যান্য ব্যক্তিরা প্রতিষ্ঠানের সাহায্য লইয়া উপযুক্ত গ্রন্থাগার আইন অবিলম্বে বিধিবদ্ধ করিবার জন্য পুনরায় অনুরোধ করিতেছে।

৩। গ্রন্থাগার আইনের প্রবর্ত্তন তরান্বিত করিবার জন্য এই সম্মেলন বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও গ্রন্থাগার কর্মীদের নিম্নলিখিত পন্থাগুলি অবলম্বন করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছে।

(ক) অনুকূল জনমত গঠন করিবার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে আলোচনা সভার অনুষ্ঠান, পত্র পত্রিকায় প্রচার, গণস্বাক্ষর গ্রহণ।

(খ) আইন সভার স্থানীয় প্রতিধিদের গ্রন্থাগার আইনের আশু প্রবর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবহিত করা।

(গ) বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির সহিত যোগাযোগ করিয়া গ্রন্থাগার আইনের আশু প্রবর্ত্তনের স্বপক্ষে মত গঠন করা।

(ঘ) রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ।

৪। যে কোন অবস্থায় একক গ্রন্থাগার অপেক্ষা সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার কার্যকারিতা অনেক বেশী। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্মেলনের অভিমত এই যে বর্ত্তমান জেলা কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও জেলায় অবস্থিত সরকার প্রবর্ত্তিত গ্রামীণ গ্রন্থাগার সমূহ, উপযুক্ত সংখ্যক গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞ ও কর্মী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার প্রতিনিধি এবং জনসাধারণের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি জেলা গ্রন্থাগার বোর্ড গঠন করা হউক। এই বোর্ডের মনোনীত সদস্যের সংখ্যা সমগ্র সংখ্যার ⅓ অংশের অধিক হওয়া উচিত হইবে না। এই ব্যবস্থার অন্তর্গত গ্রন্থাগারগুলিকে সম্পূর্ণ নিঃশুল্ক করিতে হইবে।

সাধারণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থায় নিয়োজিত কর্মীদের বেতন ও মর্যাদা সম্পর্কে প্রস্তাব

১। পঞ্চদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন মনে করে যে গ্রন্থাগারিকদের পক্ষে সেবা পরায়ন মনোভাব সম্পন্ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং সেবা ধর্ম্মের কথা বিস্মৃত হইয়া অন্য বিষয়কে প্রাধান্য দিলে গ্রন্থাগার সংগঠন কখনো সার্থক হইবে না।

এই সম্মেলনের মতে ঐ সেবা কার্য যথাযথভাবে করিতে হইলে গ্রন্থাগারিকদের বেতন ও মর্যাদার সুব্যবস্থা থাকা একান্ত প্রয়োজন।

এই সম্মেলন জেলা ও আঞ্চলিক গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষকে এই বিষয়টি বিবেচনা করিয়া গ্রন্থাগারিককে নিজ নিজ গ্রন্থাগার কমিটির সম্পাদক পদে নির্বাচিত করিতে, তাঁহাদের জন্য গ্রন্থাগার উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ মত বেতনক্রম ও চাকুরীর নিয়মাবলী প্রবর্তন এবং স্থায়ী চাকুরীতে নিযুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতেছে।

২। সম্মেলনের মতে বর্তমানে গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষণ ব্যবস্থার অভাব আছে। এই অভাব দূরীকরণের জন্য সরকার ও বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের যুক্তভাবে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

পশ্চিম বাংলার বৃত্তিকুশলী গ্রন্থাগার কর্মীদের শিক্ষণ সম্পর্কে প্রস্তাব

১। পঞ্চদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন এই অভিমত প্রকাশ করিতেছে যে ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার স্কুলের পাঠক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি,

পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে ব্যাপক অনুসন্ধান ও সমীক্ষা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের উদ্যোগে, ভারতের বিশিষ্ট গ্রন্থাগারিক, গ্রন্থাগার স্কুলসমূহের প্রতিনিধি এবং গ্রন্থাগার পরিষদসমূহের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হওয়া উচিত। এই কমিটি গ্রন্থাগার স্কুল সমূহের পাঠক্রম, শিক্ষাদান পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে প্রমাণীকরণের সুপারিশ করিবে।

২। এই সম্মেলন অনুরোধ করিতেছে যে বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ পরিচালিত গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ ব্যবস্থায় নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের সমীক্ষা করিয়া যথাসত্বর সম্ভব প্রয়োজনমত পরিবর্তনের ব্যবস্থা করা হউক ঃ

১ পাঠ্য বিষয়, ২ শিক্ষাদান পদ্ধতি, ৩ পরীক্ষা পদ্ধতি.

এই বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থাগার পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

৩। সম্মেলন গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণে অগ্রণী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবিলম্বে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে এম, এ ও ডক্টরেট ডিগ্রী প্রবর্তনের জন্য অনুরোধ

বাংলা নামের সূচিকরণ সমস্যা সম্পর্কে প্রস্তাব

বাংলা নামের সূচিকরণ সমস্যার বিভিন্ন দিক আলোচনা করিয়া এই সম্মেলন বাংলা নামের সংলেখ উপাদান নির্বাচনের জন্য নিম্মলিখিত উপধারাটি অনুমোদন করিতেছে ঃ

"বাঙ্গালী নামের ক্ষেত্রে আদ্যনামই সংলেখ উপাদান হইবে"।

কলেজ ও বিদ্যালয়ে বৃত্তিকুশলী কর্মী নিয়োগ সম্পর্কে প্রস্তাব

পঞ্চদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রস্তাব করিতেছে যে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় সমূহে অবিলম্বে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে শিক্ষিত বৃত্তিকুশলী কর্মী উপযুক্ত বেতনসহ নিয়োগ করা হউক।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সমস্যা

বিজয়নাথ মুখোপাধ্যায়

[সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনে এই প্রবন্ধটি আলোচিত হয়]

নতুন ভারত গ'ড়তে হ'লে আমাদের সবার আগে মন দিতে হবে নতুন মানুষ গড়ায়। দেশের সরকার কৃষি-শিল্পের উন্নতির যে ব্যবস্থাই করুন না কেন, মানুষের সহযোগিতা ছাড়া সে আয়োজন কখনই সার্থক হ'তে পারে না। দুরন্ত দুরাশার মধ্যেও দুর্জয় বিশ্বাস বুকে রেখে নতুন জ্ঞানের অস্ত্র হাতে নিয়ে ভবিষ্যতের দীপ বর্তিকার দিকে লক্ষ্য রেখে চ'লতে না পারলে নতুন ভারত গ'ড়ে তোলার সাধনা কখনও সিদ্ধ হ'তে পারবে না। আমাদের দেশের কৃষি-শিল্প নিয়ে যাঁরা আছেন তাঁদের মধ্যে জ্ঞান ও বিশ্বাস সংক্রামিত করাই আমাদের দেশ গড়ার কাজের প্রথম ধাপ।

আমাদের গ্রামীণ গ্রন্থাগার গুলোর উপরই এই গুরুতর দায়িত্বের অনেকখানি নির্ভর ক'রবে। ভারতের অধিকাংশ লোক গ্রামবাসী কৃষি কিংবা ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পের কাজে নিযুক্ত। ঐ গুলোর উন্নতির যথাযথ উপায় সম্বন্ধে আমাদের জনশক্তিকে অবহিত ক'রতে না পারলে দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির আশা বাতুলতা মাত্র। কিন্তু অক্ষরজ্ঞানহীন অগণিত নরনারীর কাছে নতুন জ্ঞানের, নতুন আশার, নতুন বিশ্বাসের কথা পোঁছে দেবার কাজে খুব সহজ নয়। অথচ আমাদের গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলো ছাড়া অর কোন প্রতিষ্ঠান এখন নেই যা এই দায়িত্ব নিতে পারে। তাই কঠিন হ'লেও এ দায়িত্ব আমাদের গ্রামের গ্রন্থাগারগুলিরই।

সুখের বিষয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় গ্রামীণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উপর জোর দেওয়া হ'য়েছে—এবং আমরা আশা করি, অদূর ভবিষ্যতে ভারতের দূর দুরান্তের গ্রামগুলোও গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ থেকে বঞ্চিত হবে না।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারের গুরুত্বের কথা মনে রেখে আজ আমাদের এর সমস্যাগুলো বিচার ক'রে দেখ্‌তে হবে। গোড়া থেকেই যদি আমরা এই সমস্যাগুলো বুঝে সেইমত চ'লতে পারি তা' হ'লে ভবিষ্যতের অনেক মেরামতী, দাগরাজি কাজের দায় এড়াতে পারব।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সাফল্যের প্রায় সবখানিই নির্ভর ক'রবে গ্রন্থাগারিকের যোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতার উপর। গতানুগতিক জীবনে অভ্যস্ত, নতুনের প্রতি সন্দেহাকুল গ্রামবাসীকে নতুন পদ্ধতির কথা বলা এবং সেই দিকে উদ্বুদ্ধ করা সোজা কাজ নয়। গ্রন্থাগারিকের পক্ষে প্রবীণ কৃষককে কৃষি বিদ্যার কথা ব'লতে যাবার আগে বলবার পদ্ধতি সম্বন্ধে বেশ সজাগ থাকতে হবে। একে ত' পুঁথিগত বিদ্যার উপর সাধারণ লোকের বিশ্বাস কম, তার উপর ছাপা অক্ষরের প্রতি যে মোহটুকু মানুষের মনে থাকে নিরক্ষর লোকদের কাছে তার সাহায্যেও এগুনো যাবে না। এমন অবস্থায় জন-সংযোগের বিষয়-জ্ঞান শুধু নয়-কৌশলটাও গ্রন্থাগারিকের আয়ত্তাধীন থাকা দরকার। মানুষের প্রতি ভালবাসা গ্রন্থাগারিকের প্রধান গুণ হওয়া দরকার। বস্তুতঃ ধর্মপ্রচারকরা যেমন প্রেম, আপন-করা ভাব, অনন্ত বিশ্বাস, অসীম ধৈর্য্য আর তিতীক্ষা নিয়ে নিজেদের কাজ ক'রে যান—গ্রন্থাগারিককেও আজ ঠিক ঐ সব গুণ অবলম্বন ক'রে কাজ ক'রতে হবে। গতানুগতিক জীবনের কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষকে নতুন ভারত গড়ার ধর্মে দীক্ষিত ক'রতে এই রকম একনিষ্ঠ কর্মীদেরই আজ গ্রন্থাগারিক ব্রত গ্রহণ ক'রতে হবে।

গ্রন্থাগারিকদের দায়িত্বের কথা ছাড়াও—তাঁদের কাজ করার অনুকূল অবস্থার কথা আজ আমাদের ভাবা দরকার। যদি মানুষকে নতুন জ্ঞানের ধর্মে দীক্ষা দিতে হয়—তা' হ'লে গ্রন্থাগারিকের বাঁধা সময়ে গ্রন্থাগার খুলে ব'সে থাকলেই চ'লবে না। তাঁকে ব্যক্তি মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে, তাঁর সমস্যা বুঝতে হবে, কোন পথে, কোন সময়ে সাহায্য ক'রলে সেই সাহায্য তাঁকে নিশ্চিত আকৃষ্ট ক'রতে পারবে সে চিন্তা ক'রতে হবে—সে বিষয়ে অনুশীলন ক'রতে হবে এবং তদনুযায়ী প্রস্তুত হ'তে হবে। এ ক'রতে হ'লে চাই উপযুক্ত উপকরণ, চাই কাজ করার অবাধ অধিকার, নিজের গ্রাসাচ্ছাদন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ততা এবং উপযুক্ত শিক্ষা ও যোগ্যতা। আমরা আশা করি আমাদের দেশের অবস্থার কথা মনে রেখে গ্রন্থাগারের পক্ষে উপযুক্ত উপকরণ সরবরাহের দিকে সরকারকে উদ্বুদ্ধ করা কঠিন হবে না।

কিন্তু গ্রন্থাগারিকের অধিকার, তাঁর গ্রাসাচ্ছাদন ও শিক্ষা ও যোগ্যতার সমস্যা এত সহজে মিটবে ব'লে মনে হয় না। আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষকের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের প্রয়োজন, অন্ততঃ নীতি হিসাবে মেনে নিয়েছি। কিন্তু গ্রন্থাগারের ব্যাপারে কমিটির নির্দেশকে

গ্রন্থাগারিকের অভিমতের চেয়ে গুরুতর ব'লে মনে করি। শুধু তাই নয় অনেক জায়গাই কমিটিতে গ্রন্থাগারিক সম্পাদক ত' ননই—সহকারী সম্পাদক ও নন এমন কি কমিটির সভ্য পর্যন্ত নন। সুতরাং কমিটির অভিমতকে প্রভাবিত করবার সুযোগ পর্যন্ত তাঁকে দেওয়া হয় না। তা'তে গ্রন্থাগারের প্রত্যক্ষ সমস্যার ভিত্তিতে কমিটির মত গঠিত হ'তে পার্‌ছেনা। কমিটিকে সম্মত করাতে পার্‌ব এই বিশ্বাস নিয়ে গ্রন্থাগারিক অত্যন্ত জরুরী সিদ্ধান্তও গ্রহণ ক'র্‌তে পারেন না—এবং পাঠক সাধারণের কাছে যে মর্যাদা থাকলে তিনি পাঠকদের সুবিধা অসুবিধা জেনে তা' দূর করার দায়িত্ব নিতে পারেন তাতে তাঁকে দেওয়া হ'চ্ছে না। সরকারী স্কুল কলেজ সব জায়গায়ই প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষকে কমিটির সম্পাদক করা হয়। স্কুলের প্রয়োজন অনুযায়ী তিনি সেই সব কমিটির সভা আহ্বান করেন এবং সভ্যদের মত অনুযায়ী কাজ ক'রতে অগ্রসর হন। আমরা মনে করি সরকার এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট নন। স্কুল কলেজের ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা যখন অসুবিধার সৃষ্টি করে নি' তখন সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জেলা ও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের ক্ষেত্রেও এ ব্যবস্থা সফল হবে ধ'রে নেওয়া যায় ব'লেই মনে হয়। কলেজের সুবিধার জন্য আপন আপন গ্রন্থাগার কমিটির সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রন্থাগারিকের উপর ন্যস্ত হওয়া, গ্রন্থাগারিকের সাফল্যের জন্য বিশেষ প্রয়োজন বলেই মনে হয়।

অধিকার ও দায়িত্বের পর গ্রন্থাগারিকদের কাজ করার দ্বিতীয় সর্ত হ'চ্ছে গ্রাসাচ্ছাদন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ততা। গ্রন্থাগারিক-বৃত্তি অর্থকরী নয়, সেবাধর্মী। এর পুরস্কার ত্রিতল অট্টালিকা নয়—কৃতজ্ঞ মানুষের অন্তরের অভ্যর্থনা। সুতরাং অর্থ লিপ্সুদের এ বৃত্তি কোন দিনই সন্তুষ্ট ক'র্‌তে পারবে না—আর লোক নির্বাচনের সময় এই দিকে দৃষ্টি রাখতেই হবে। কিন্তু যাকেই নিযুক্ত করা হোক্ না কেন, তাকে আবশ্যিক গ্রাসাচ্ছাদানের চিন্তা থেকে মুক্তি দিতে হবে। আমাদের দেশের বেকারী ও আর্থিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে কোন লোককে নামমাত্র বেতনে নিযুক্ত করা যেতে পারে। স্রোতে-ভাসা মানুষ তৃণখন্ডের মত সেই সামান্য বেতনের কাজকে সাময়িক ভাবে আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ ক'রতেও পারে—কিন্তু সত্যই ত' তৃণকে আশ্রয় ক'রে স্রোতের টানে বাঁচা যায় না। তাই অনন্যোপায় মানুষকে সামান্য অর্থে নিযুক্ত ক'রুলেও তার কাছ থেকে নিশ্চিন্তভাবে কাজ আশা করা যায় না। ঐ কাজটা থাকে তার অবলম্বনের মত—এবং সে খোঁজে আরও পরিপূরক কাজ। ফলে একনিষ্ঠতা

না থাকায় গ্রন্থাগার ব্রতের উদ্‌যাপন এই কর্মীর দ্বারা সম্ভব হ'য়ে ওঠে না।

পারিশ্রমিকের স্বল্পতাই কিন্তু গ্রন্থাগার কর্মীদের একমাত্র সমস্যা নয়। অনেক সময় পারিশ্রমিক প্রদান সম্বন্ধে সময়ের অনিয়ম আরও বেশী সমস্যা। যা' পাই তা'তেই চ'লে না—আরও পাবার চেষ্টায় থাক্‌তে হয়—তার উপর যা পাই সময়ে পাই না—ফলে ধার ক'রতে হয়, উত্তমর্ণদের কটু বাক্য শুন্‌তে হয়, এমন যদি অবস্থা হয় তা' হলে কেমন ক'রে একনিষ্ঠভাবে কাজ করা সম্ভব হবে? কর্তৃপক্ষ জানেন গ্রন্থাগারিকদের যা বেতন তাতে তাঁদের পক্ষে কোন সময়েই প্রাত্যহিক ব্যয় বহুকষ্টে সংকুলান করা ছাড়া আর কিছুই সম্ভব নয়। এমন অবস্থায় বেতন সময়মত না পেলে তাঁদের চলে কেমন ভাবে? হয়ত নিয়মের জট এখানে এমনভাবে পেকে আছে যে সেই জট ছাড়িয়ে বেতনের আসার পথকে নির্বাধ করা সম্ভব হ'চ্ছে না—কিন্তু এটা যদি আমরা করতে না পারি তা' হ'লে আমরা কাজ চালাব কি ক'রে? কতকগুলো নিরুপায় মানুষকে দিয়ে সেবা-ধর্মের কাজ চালানো সম্ভব কি? অথচ বেতনের সময়টা ঠিক মত মেনে চ'লতে না পারলে নিরুপায় ও অযোগ্য মানুষ ছাড়া কে এই গ্রন্থাগার বৃত্তিতে লেগে থাকবে। বস্তুতঃ দেরীতে বেতন পেলে অনেককেই সুদ দিয়ে টাকা ধার ক'রে সংসার চালাতে হয়। বেতনের সামান্য টাকা থেকে বেশ খানিকটা অংশ সুদের জন্য বৃথা দিতে হ'লে গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকের বেতনের যে অংকটা আমাদের কাছে দেখানো হয় তারও অনেকটা ক'মে যায় না কি?

বেতন বা অধিকারের সমস্যা ছাড়াও গ্রামীণ গ্রন্থাগারের আর একটি এবং হয়ত সব চেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে শিক্ষা বা যোগ্যতার। একে গ্রন্থাগারবৃত্তি গ্রহণের উপযুক্ত আদর্শবাদী লোক পাওয়াই সোজা কথা নয়, তার উপর তার যে সব চারিত্রিক গুণ উল্লেখ করা হ'য়েছে সে গুলোর অনুশীলন করাতে হ'লে যে নেতৃত্বের প্রয়োজন তাও খুব সুলভ নয়। তা' ছাড়াও গ্রন্থাগারিকের কাছে আশা করা হবে বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞানের—আশা করা হবে তাঁর বৃত্তির কৌশলের। আমাদের গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের মধ্যে বিস্তৃত জ্ঞান সম্পন্ন ও গ্রন্থাগার বিদ্যায় শিক্ষিক লোক সৃষ্টি করার জন্য আমাদের কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হবে। প্রত্যেক গ্রন্থাগারিককে গ্রন্থাগার-বিজ্ঞানের মোটা কথা, সাধারণ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান, আক্ষরিক জ্ঞান বর্জিত লোকদের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ পদ্ধতি, আপন আপন অঞ্চলের কৃষি-শিল্পের বিভিন্ন সমস্যা, পৌর কর্তব্য ও

সরকারী উদ্যোগ প্রভৃতি বিষয় জানিয়ে দিতে হবে। এর জন্য শিক্ষণ ব্যবস্থা থাকা দরকার। বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শেখানোর যে ব্যবস্থা আছে—তা' এঁদের উপযুক্তও হবে না দরকারও হবে না। এঁদের জন্য পৃথক শেখানোর ব্যবস্থা করা দরকার। দেশের সরকার এবং গ্রন্থাগার পরিষদ পরস্পর সহযোগিতা ক'রে যদি এ কাজে হাত দেন তবেই এর সমস্যা মিটতে পারে।

গ্রামীণ গ্রন্থাগারিকদের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের নানা পথ থাকে। অনেক সমস্যা হয়ত একে সমাধান ক'রতে পারেন না—অপরে করেন। তাই প্রত্যেক অঞ্চলের গ্রন্থাগারিকদের নিয়ে বছরে বা অন্ততঃ দু'বছরে একবার একটা আলোচনা চক্রের আয়োজন করা দরকার। এই রকম আলোচনা চক্রের ব্যবস্থা ক'রতে পারলে পরস্পরের আলোচনার ফলে সকলেরই জ্ঞান যে শুধু বাড়ে তাই নয় প্রত্যেকে নিজের নিজের গ্রন্থাগারকে আরও ভাল ক'রে গড়ে তোলার প্রেরণাও সংগ্রহ করেন। এই আলোচনা চক্রের আয়োজন করার দায়িত্বও সরকার ও গ্রন্থাগার পরিষদকে যুক্তভাবে গ্রহণ করতে হবে।

গ্রন্থাগারিকের যোগ্যতা সংরক্ষণের একটা প্রধান উপায় হ'চ্ছে অধীত বিদ্যার পুনরালোচনার ব্যবস্থা। তিন বৎসর বা পাঁচ বৎসর পর পর গ্রন্থাগারিকদের পুরাণো আদর্শ, পুরানো জ্ঞান, অধীত বিদ্যার একবার ক'রে পুনরালোচনা হওয়া দরকার। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান প্রয়োগ বিজ্ঞান। প্রকৃতির রাজ্যের নিয়ম আবিষ্কার এর লক্ষ্য নয়। পাঠককে সব চেয়ে কম সময়ের মধ্যে তার প্রয়োজনীয় বিষয় জানিয়ে দেবার প্রকৃষ্ট উপায় আবিষ্কার করাই এর লক্ষ্য। এ পথে এ ক্রমেই অগ্রসর হ'চ্ছে। পুনরালোচনার ব্যবস্থায় গ্রন্থাগারিককে নবাবিষ্কৃত পদ্ধতিগুলো জানিয়ে দেওয়া হবে এবং আগে শেখা বিষয়গুলোকে আবার ঝালিয়ে দেওয়া হবে। যে আদর্শবাদ গ্রন্থাগারিক বৃত্তিতে সাফল্যের প্রধান প্রয়োজন—আলোচনার মাধ্যমে, একই বৃত্তিভুক্ত সকলের একত্রিত হওয়ায় তা' সব সময়ই উদ্দীপ্ত থাকবে—স্তিমিত হ'তে পারবে না। গ্রন্থাগার পরিষদের পক্ষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পরিচয়টুকু মাত্র করিয়ে দিয়ে আপনার দায়িত্ব শেষ হ'ল মনে ক'রলে চ'লবে না। সরকারের সহযোগিতায় একে অধীত বিদ্যার পুনরালোচনার ব্যবস্থাও করতে হবে।

মোটের উপর গ্রন্থাগারিকদের যথোচিত নির্বাচন, কার্যে অবাধ অধিকার, গ্রাসাচ্ছাদন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ততা ও শিক্ষা ও যোগ্যতা অর্জনের যথোচিত ব্যবস্থা করতে না পারলে গ্রামীণ গ্রন্থাগার ব্যবস্থা থেকে উপযুক্ত সুফল আশা করা দুরাশা মাত্র।

সূচীকরণের বাংলা নাম

গণেশ ভট্টাচার্য

॥ ০০ বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত শব্দের ব্যাখ্যা ॥

আখ্যা সংলেখ (Title entry) : গ্রন্থের নাম যে সংলেখের শীর্ষ।

গ্রন্থকার সংলেখ (Author entry) : গ্রন্থকারের নাম যে সংলেখের শীর্ষ।

চাহিদা (Reader's approach) : পাঠকের দিক থেকে সূচীতে নামের কোন বিশেষ অংশে গ্রন্থকারকে খুঁজে পেতে চাওয়ার স্বাভাবিক প্রণবত্য।

ধারা (Rule) : কোন বিশেষ সমস্যার সমাধানে সংহিতার অন্তর্ভুক্ত নির্দেশ।

নাম-মধ্য (Midname) : পাশ্চাত্য অনুকরণে নাম-মূলকে ভেঙে দু'ভাগে ভাগ করে কোন কোন গ্রন্থকার নামের একটা মধ্য ভাগের সৃষ্টি করেছেন। সাধারণতঃ নাম-মূল ও নামান্তের মধ্যে এর অবস্থান। সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামে 'চন্দ্র' অংশটি নাম-মধ্য।

নাম-মূল (Personal name) : বাংলা নামের যে বিশিষ্ট অংশ মূলতঃ ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রীকরণ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত—সাধারণতঃ নামের আদ্যাংশ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে 'বঙ্কিমচন্দ্র' অংশটি নাম-মূল।

নামান্ত (Surname বা Family name) : বাংলা নামের পদবী—সাধারণতঃ নামের শেষ অংশ। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামে 'চট্টোপাধ্যায় অংশটি নামান্ত।

বাংলা নাম : বাঙ্গালী গ্রন্থকারের নাম।

বিষয় সংলেখ (Subject entry) : গ্রন্থের বিষয় সূচক শব্দ বা শব্দ সমষ্টি যে সংলেখের শীর্ষ।

মুখ্য সংলেখ (Main entry) : মূল সংলেখ। সাধারণতঃ গ্রন্থকার সংলেখ। নিয়মানুগ দেয় গ্রন্থ সম্বন্ধীয় সমুদয় তথ্য এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

শীর্ষ (Heading) : সংলেখের শীর্ষে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দ সমষ্টি।

শীর্ষান্তর সংলেখ (Reference entry) : এক শীর্ষ থেকে অপর শীর্ষের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যে সংলেখ লিখিত হয়।

সংলেখ (Entry) : সূচীকরণ উদ্দেশ্যে নিয়মানুগ পরিবেশিত গ্রন্থ সম্বন্ধীয় সমুদয় তথ্য।

সংলেখ উপাদান (Entry element) : অনুবর্ণ সজ্জায় (Alphabetical sequence) সংলেখের যে শব্দটি প্রথম বিবেচ্য—অধিকাংশ ক্ষেত্রে শীর্ষের প্রথম শব্দটি।

সংহিতা (Catalogue code) : নিয়মানুগ সূচীকরণের নির্দেশনামা।

॥ ০১ আলোচ্য বিষয় ॥

সূচীকরণের লক্ষ্য ও নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা নামের কোন অংশটি সংলেখ উপাদান বলে বিবেচিত হওয়া উচিত—আলোচনা কেবলমাত্র তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ। এখানে বলা প্রয়োজন যে, এ প্রবন্ধে একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিষয়টির একটি সামগ্রিক আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। বিষয়টির জটিলতা ও গুরুত্ব বিবেচনায় আলোচনার সার্থকতা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ের উপর নির্ভরশীল। সে অর্থে এ' প্রবন্ধ আলোচ্য বিষয়ের সামগ্রিক সার্থক আলোচনা বলে দাবী করার স্পর্ধা রাখে না। বিষয়টির উপর যুক্তি নির্ভর বিভিন্ন মতামত আহ্বান এবং তারই ভিত্তিতে সমস্যাটির সুষ্ঠু সমাধান এ' প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

॥ ০২ ভূমিকা ॥

গত দুই দশকের মধ্যে সূচীকরণের মূল তত্ত্ব সম্বন্ধীয় আলোচনায় পাশ্চাত্য জগতে এক নতুন উৎসাহের সঞ্চার হয়েছে। এই নব আন্দোলন ক্রমশঃ আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছে—বিভিন্ন দেশ আপন আপন সংহিতার বিভিন্ন ধারা সংশোধনে প্রবৃত্ত হয়েছে। ইফ্‌লা (IFLA) একখানি আন্তর্জাতিক সংহিতা প্রনয়ণের সম্ভাবনা নিরূপনে, অর্থাৎ বিভিন্ন সংহিতার পারস্পরিক অসঙ্গতি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কোন সাধারণ নীতি নির্ধারনে প্রবৃত্ত হয়েছে। পাশ্চাত্য সংহিতাগুলিতে আমাদের দেশের আঞ্চলিক সূচীকরণ সমস্যাগুলি খুব স্বাভাবিক কারণেই প্রাপ্য গুরুত্ব লাভ করে নি। কারণ, প্রণেতাদের সে সুযোগ ছিল না; আর তার প্রয়োজনও তাঁরা তেমন বোধ করেন নি। কিন্তু আমাদের কাছে এর প্রয়োজন অপরিহার্য। সুচিন্তিত লক্ষ্য ও সুবিবেচিত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা নামের উপযোগী ধারা সংহিতায় সংযোজিত হওয়া দরকার।

॥ ০৩ সূচীকরণের লক্ষ্য ॥

সূচীকরণের লক্ষ্যগুলির সার্থকতা সংহিতার উপযোগিতার উপর নির্ভরশীল। সে অর্থে সূচীকরণ ও সংহিতার ধারা নির্ধারণের লক্ষ্য একই। সূচীকরণের লক্ষ্য মূলতঃ দুটি ঃ

প্রথমতঃ গ্রন্থাগারে পাঠকের প্রয়োজনীয় গ্রন্থখানির অবস্থান (আছে কিং নেই) নির্ণয়ে সহায়তা করা ;

দ্বিতীয়তঃ কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থকার প্রণীত এবং কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর কি কি গ্রন্থ ; এবং কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থের কোন্ কোন্ সংস্করণ ও কি কি ভাষার অনুবাদ গ্রন্থাগারে আছে পাঠককে সে সম্বন্ধে অবহিত করা।

'কাটার' সূচীকরণের লক্ষ্যগুলিকে আরও বিশদভাবে প্রকাশ করেছেন; যেমন—

১ কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ গ্রন্থাগারে তার প্রয়োজনীয় গ্রন্থের অবস্থান সম্বন্ধে সন্ধান দেওয়া যদি তার

　　ক গ্রন্থকারের নাম　　অথবা

　　খ আখ্যা　　অথবা

　　গ বিষয়　　জানা থাকে।

২ কোন বিশেষ গ্রন্থাগারে

　　ঘ কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থকার প্রণীত　　অথবা

　　ঙ কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর　　অথবা

　　চ কোন নির্দিষ্ট রূপ (Form), ভাষা বা মানের কি কি গ্রন্থ আছে—সে তথ্য পরিবেশন করা।

৩ কোন বিশেষ গ্রন্থের

　　ছ সংস্করণ বা আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য　　অথবা

　　জ প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধীয় নির্বাচনে সহায়তা করা।

॥ ০৩১ লক্ষ্য সাধনের উপায় ॥

উপরোক্ত লক্ষ্যগুলি সাধনের নিম্নলিখিত উপায় 'কাটার' নির্দেশ করেছেন ঃ

১ গ্রন্থকার সংলেখ (ক ও ঘ এর জন্য) ;

২ আখ্যা সংলেখ (খ এর জন্য) ;

৩ বিষয় ও শীর্ষান্তর সংলেখ (গ ও ঙ র জন্য) ;

৪ রূপ (Form), ভাষা ও মান সম্বন্ধীয় তথ্য পরিবেশন (চ এর জন্য) ;

৫ সংস্করণ ও প্রকাশন সম্বন্ধীয় তথ্য পরিবেশন (ছ এর জন্য) ;

৬ টীকা সংযোজন (জ এর জন্য) ;

সংহিতা প্রণেতারা এই লক্ষ্যগুলি এবং তা' সাধনের উপায়গুলি মেনে নিয়েছেন।

॥ ০৪ সংহিতা ॥

সংহিতা এই উপায়গুলির নির্দেশনামা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে সূচীকরণে নীতি হিসেবে পাঠকের যুক্তি সঙ্গত প্রয়োজনকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে ; এবং সংহিতার বিভিন্ন ধারা সর্বাধিক পাঠকের প্রয়োজনের দিক লক্ষ্য করেই নির্ধারিত হবে। অঞ্চলভেদে পাঠকের চাহিদার বিভিন্নতা অস্বাভাবিক নয়। কোন বিশেষ ভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থের সর্বাধিক ব্যবহার যদি কোন বিশেষ অঞ্চলের পাঠকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, সে ক্ষেত্রে একদিকে যেমন সংহিতার উপযোগিতা আঞ্চলিক চাহিদার বৈশিষ্ট্যের প্রতি আরোপিত গুরুত্বের উপর নির্ভরশীল ; অপরদিকে আঞ্চলিক চাহিদার উপর গুরুত্ব আরোপ করে যে সংহিতা প্রনয়ণ করা হবে, সূচীকরণ সেই সংহিতা নির্ভর হয়ে আঞ্চলিক গ্রন্থকারদের প্রণীত গ্রন্থসমূহের সহজ ও সর্বাধিক ব্যবহার সম্ভব করবে।

॥ ০৫ আঞ্চলিক সমস্যা ॥

আখ্যা সংলেখ, বিষয় সংলেখ প্রভৃতি লিখন বা কোন সংলেখে সংস্করণ, প্রকাশন সম্বন্ধীয় তথ্য পরিবেশনে আঞ্চলিক সমস্যাগুলি তত গুরুত্বপূর্ণ নয় ; অথবা "গ্রন্থকার যেখানে নির্দিষ্ট—ব্যক্তিই হউক বা সংস্থাই হউক—মুখ্য সংলেখ সেখানে গ্রন্থকারের নামে হইবে"—এই সাধারণ ধারাটি মেনে নিতেও কোন আঞ্চলিক সমস্যার বাধা নেই। প্রকৃত সমস্যা ব্যক্তি গ্রন্থকার সম্বন্ধে। প্রশ্ন—বাংলানামের কোন অংশ সংলেখ উপাদান বলে বিবেচিত হবে ?

॥ ০৬ সংলেখ উপাদান নির্বাচনের নীতি ॥

সংলেখ উপাদান নির্বাচনের একটি সুসম নীতি নির্ধারিত হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত নীতিটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে :

নামের যে যে অংশ সংলেখ উপাদান বলে বিবেচিত হলে সূচীকরণের উদ্দেশ্য

সার্থক হয়, তাদের মধ্যে পাঠকের চাহিদা যে অংশের উপর অপেক্ষাকৃত বেশী, সেই অংশই মূখ্য সংলেখের সংলেখ উপাদান বলে বিবেচিত হবে। এই নীতির প্রয়োগ হবে পর্যায়ক্রমে, এবং বিভিন্ন পর্যায়ে প্রয়োগের মধ্যে পারস্পরিক সংগতি থাকবে। সমগ্র পাঠককুলের চাহিদা এক না হওয়াই স্বাভাবিক। সে ক্ষেত্রে সর্বাধিক পাঠকের চাহিদাই বিবেচ্য।

॥ ১ সমস্যার পর্যায়ক্রম ॥

নীতি প্রয়োগের পূর্বে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সমস্যার স্বরূপটি জানা দরকার। বাঙালী গ্রন্থকার ও পাঠক সম্বন্ধে বিতর্ক ছাড়াই তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। যেমন—

ক সর্বাধিক বাঙালী গ্রন্থকার বাংলায় গ্রন্থ রচনা করেন।

খ বাংলা-ভাষা-জ্ঞানীদের মধ্যে বাংলা গ্রন্থের ব্যবহার সীমাবদ্ধ।

গ বাংলা-ভাষা-জ্ঞানীদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা সর্বাধিক।

সমস্যার প্রথম পর্যায়ের ভিত্তি এই সিদ্ধান্তগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত; অর্থাৎ বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনাকারী বাঙালী গ্রন্থকার এবং তাদের সম্বন্ধে বাঙালী পাঠকের চাহিদা—প্রথম পর্যায়ের সমস্যা।

উপরোক্ত সিদ্ধান্তগুলি ছাড়াও এই সম্বন্ধে আরও দুটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন—

ঘ বহু বাঙালী গ্রন্থকার বাংলা ভিন্ন অপর ভাষায়, বিশেষত ইংরেজীতে গ্রন্থ রচনা করেন।

ঙ ইংরেজী ভাষা-জ্ঞানী বাঙালী ছাড়াও অন্য দেশীয় ইংরেজী ভাষা-জ্ঞানীদের মধ্যে এই সব গ্রন্থের ব্যবহার বিস্তৃত।

সমস্যার দ্বিতীয় পর্যায়ের ভিত্তি এই সিদ্ধান্ত দুটির উপর প্রতিষ্ঠিত; অর্থাৎ ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থ রচনাকারী বাঙালী গ্রন্থকার এবং তাদের সম্বন্ধে পাঠকের চাহিদা—দ্বিতীয় পর্যায়ের সমস্যা।

পারস্পরিক সংগতি বিধানের উদ্দেশ্যে পর্যায়ক্রমে এই সমস্যাদ্বয়ের সমাধান নির্নীত হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সমস্যার সমাধানে প্রথম পর্যায়ের সমস্যার সমাধানের প্রভাব অস্বীকার করা চলবে না। সুতরাং পর্যায়ক্রমে বাংলা নামের গঠন অনুসারে পাঠকের চাহিদার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অবহিত হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে একটি সমীক্ষা করা যেতে পারে। সমীক্ষার

সুবিধার্থে বাংলা নামকে দু' ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। যেমন—

ক ভারতীয় ভাষা উদ্ভূত বাংলা নাম ;

খ অভারতীয় ভাষা উদ্ভূত বাংলা নাম।

॥ ২ ভারতীয় ভাষা উদ্ভূত বাংলা নাম : প্রথম পর্য্যায় ॥

॥ ২১ এক শব্দ বিশিষ্ট বাংলা নাম (আদি যুগ) ॥

বাংলা নামের গঠন পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাংলা নামের কোন দ্বিতীয় অংশ ছিল না। একটিমাত্র শব্দই ব্যক্তিকে নির্দেশ করতে ব্যবহৃত হত। একটি শব্দ বিশিষ্ট নামের গ্রন্থকারের সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে খুব বেশী নয়। জয়দেব, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি এবং চৈতন্যোত্তর বাংলা সাহিত্যের বৈষ্ণব কবিদের নাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পর্যায়ের। নামের কোন দ্বিতীয় অংশ না থাকায় পাঠকের চাহিদা ঐ শব্দেই সীমাবদ্ধ। সুতরাং কোন বৈশিষ্ট্যও নেই ; সংলেখ উপাদান নির্বাচনে কোন সমস্যাও নেই।

॥ ২২ পদবীযুক্ত বাংলা নাম ॥

নামের সঙ্গে যখন পদবী যোগ হ'লো, তখন থেকে নামের দুটি অংশ দেখা গেল। সাধারণতঃ প্রথম অংশটি ব্যক্তিকে স্বতন্ত্রীকরণ উদ্দেশ্য প্রদত্ত, অর্থাৎ নাম-মূল ; এবং দ্বিতীয় অংশটি পদবী, (অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যক্তির বর্ণ বা জাতি জ্ঞাপক), অর্থাৎ নামান্ত। অবশ্য নামের প্রথম অংশটি সর্বত্র নাম-মূল নয়। যেমন—কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয় এবং রায় হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী নামে 'কুমার' ও 'রায়' অংশ দুটি নাম-মূল নয়। নামের যেখানে দুটি অংশ চাহিদার বৈশিষ্ট সেখানে অবশ্য বিবেচ্য। নামের দুটি অংশের মধ্যে পাঠকের চাহিদা নাম-মূলের উপর—বিনা বিতর্কে একথা স্বীকৃত। কোন বিশেষ উদাহরণের পরিবর্তে বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা কর্তৃক প্রকাশিত "পুস্তকের তালিকা", যাতে ৮৩টি প্রকাশকের প্রকাশিত প্রায় ৪,০০০ গ্রন্থের নাম আছে, তার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বাঙগালী গ্রন্থকারের নাম করা যেতে পারে।

॥ ২৩ নাম-মধ্য সমন্বিত বাংলা নাম ॥

পাশ্চাত্য অনুকরণের নামমূলের অংশ বিশেষ বিচ্ছিন্ন করে নামের একটি মধ্যভাগ সৃষ্টির প্রবণতা দেখা দেয় ইংরেজ আমলে। এই অংশটিকে বলা যেতে

পারে নাম-মধ্য। নাম-মধ্য ব্যবহারের রীতি—বিশেষ করে বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থে—কিছুকাল থেকে খুবই কম দেখা যাচ্ছে। এ রকম তিনটি অংশ বিশিষ্ট হওয়ায়ও পাঠকের চাহিদার রূপান্তর ঘটে নি।

॥ ২৪ নাম-মধ্য বর্জিত বাংলা নাম ॥

নাম-মূলের যে অংশকে নাম-মধ্য বলে পৃথক করা যায় বহু গ্রন্থকারের ক্ষেত্রে সেই অংশকে বর্জন করার একটা প্রবণতা কিছুকাল থেকে দেখা যাচ্ছে। যেমন—নারায়ণ সান্যাল, সুবোধ ঘোষ, বিমল মিত্র ইত্যাদি। কিন্তু এ বিপর্যয়েও পাঠকের চাহিদার রূপান্তর ঘটে নি।

॥ ২৫ এক শব্দবিশিষ্ট বাংলা নাম (সমকালীন) ॥

পদবী বর্জিত এক অংশ বিশিষ্ট নামের ব্যবহার অতি আধুনিক প্রবণতা। এই ধরণের গ্রন্থকারদের সংখ্যা এখনও পর্যন্ত খুব বেশী না হলেও কিছু কিছু উদাহরণ আহরণ করা যায়। যেমন—জানবো এবার জগতটাকে-র গ্রন্থকার অশোককুমার; কথা ও কথালী-র গ্রন্থকার বাণীকুমার। এ ধরণের নামে কুমার অংশটি বহু ক্ষেত্রে সাধারণ (common)। এক শব্দ বিশিষ্ট হওয়ায় এ ধরণের নাম সম্বন্ধীয় চাহিদা কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না।

॥ ২৬ মুসলমান নাম ॥

বাঙ্গালী মুসলমানদের নাম অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভারতীয় ভাষা উদ্ভূত হলেও কিছু কিছু ভারতীয় ভাষা উদ্ভূত নাম-মূল সমন্বিত মুসলমান নাম দেখা যায়। যেমন—সনাতন গাজী, ফকির চৌধুরী, গগণ মুন্সী, কাজী অণিরুদ্ধ ইসলাম, কাজী সব্যসাচী ইসলাম, পার্বতী হোসেন ইত্যাদি। এই সব নামের ক্ষেত্রেও চাহিদা নাম-মূলের উপর।

॥ ২৭ সিদ্ধান্ত ॥

উপরোক্ত সমীক্ষার ভিত্তিতে আমরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে, বাংলা নামের বহু বিপর্যয় সত্ত্বেও নাম-মূলের উপর বাঙ্গালী পাঠকের চাহিদার রূপান্তর ঘটে নি।

॥ ২৮ সংলেখ উপাদান ॥

পাশ্চাত্য সংহিতাগুলিতে Surname-কে পাশ্চাত্য নামের সংলেখ উপাদান বলে গ্রহণ করার স্বপক্ষে যে সকল যুক্তি দেখা'ন হয়েছে নিম্নলিখিত যুক্তি দুটি তাদের মধ্যে অন্যতম এবং প্রধান ঃ

ক পাশ্চাত্য পাঠকের চাহিদা Surname-এর উপর ;

খ ব্যক্তিকে নির্দিষ্টকরণে Forename অপেক্ষা Surname অনেক বেশী কার্যকরী ; কারণ, পাশ্চাত্য নামে Forename-এর সংখ্যা Surname-এর তুলনায় নিতান্তই অল্প ।

বাংলা নামের ক্ষেত্রে অবস্থাটা সম্পূর্ণ বিপরীত ; অর্থাৎ

ক বাঙগালী পাঠকের চাহিদা নাম-মূলের উপর ;

খ ব্যক্তিকে নির্দিষ্টকরণে নামান্ত অপেক্ষা নাম-মূল অনেক বেশী কার্যকরী ; কারণ, বাংলানামে নামান্তের সংখ্যা নাম-মূলের তুলনায় নিতান্তই অল্প ।

অতএব বাংলানামের ক্ষেত্রে নাম-মূলকেই সংলেখ উপাদান হিসেবে গ্রহণ করা যুক্তিসঙগত ।

॥ ৩ ভারতীয় ভাষা উদ্ভূত বাংলা নাম ঃ দ্বিতীয় পর্যায় ॥

॥ ৩১ বাঙ্গালী গ্রন্থকার ও ইংরেজী গ্রন্থ ॥

বাঙগালী গ্রন্থকার কেবলমাত্র বাংলাতেই গ্রন্থ রচনা করেন না, অপর ভাষায়ও করেন—বিশেষ করে ইংরেজী ভাষাতেত বটেই । যাঁরা ইংরেজীতে গ্রন্থ রচনা করেন, আখ্যা পৃষ্ঠায় নাম লেখার রীতি অনুযায়ী তাঁদেরকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

ক যাঁরা রোমান বর্ণমালায় নিজেদের সম্পূর্ণ নাম-ব্যবহার করেন । যেমন—Understanding India's Economy-র গ্রন্থকার Dhiresh Bhattacharya ; Gandhism-এর গ্রন্থকার Priyaranjan Sen প্রভৃতি ।

খ যাঁরা রোমান বর্ণমালায় নাম-মূল বা নাম-মূল ও নাম মধ্যর আদ্যক্ষরমাত্র ব্যবহার করে' পদবীটি সম্পূর্ণ লেখেন। যেমন—The Great Sentinel-এর গ্রন্থকার S. C. Sen Gupta ; Delhi and its Monuments-এর গ্রন্থকার S. N. Sen ; Indian Constitutional Docoments-এর গ্রন্থকার A. C. Banerjee প্রভৃতি ।

॥ ৩২ নির্ভরযোগ্য রীতি ॥

বাঙ্গালী গ্রন্থকার ইংরেজীতে গ্রন্থ রচনা করেছেন,—এবং নামের ব্যবহারে কোথাও কোথাও পাশ্চাত্য রীতি অনুসৃত হয়েছে, এ ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের নামের কোন্ অংশ সংলেখ উপাদান বলে বিবেচিত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে অনুরূপ একটি সমস্যার অবতারণা করা যেতে পারে। মনে করা যাক পাশ্চাত্য অনেক গ্রন্থকার বাংলা শিখেছেন এবং বাংলায় গ্রন্থ রচনা করছেন। এই সব গ্রন্থের আখ্যা পৃষ্ঠায় নামোল্লেখের ব্যাপারে বিভিন্ন গ্রন্থকার বিভিন্ন রীতি অনুসরণ করেছেন। মনে করা যাক 'জর্জ বার্ণাড শ' এই শ্রেণীর গ্রন্থকারদের মধ্যে একজন। তিনি তাঁর ইংরেজী গ্রন্থে নাম ব্যবহার করেছেন G. B. Shaw, কিন্তু তাঁর বাংলা গ্রন্থে ব্যবহার করেছেন 'জর্জ বার্ণাড শ'। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—'জর্জ বার্ণাড শ' নামের কোন্ অংশ সংলেখ উপাদান হবে? যদি বলা যায় যে, ইংরেজী গ্রন্থের ক্ষেত্রে Shaw এবং বাংলা গ্রন্থের ক্ষেত্রে 'জর্জ' সংলেখ উপাদান হবে—তা' হলে নিশ্চয়ই তা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। কারণ, সূচীকরণের লক্ষ্য ও নীতিতে এর অনুমোদন নেই। যে কোন একটি মাত্র অংশকে গ্রহণ করতে হবে এবং এই সংলেখ উপাদান নির্বাচনের ব্যাপারে গ্রন্থকারের স্বদেশীয় রীতিই সর্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য। Preposition এবং Article, Prefix হিসেবে যুক্ত পাশ্চাত্য Compound Surname-এর ক্ষেত্রে সংলেখ উপাদান নির্বাচনে এই নীতিই অনুসৃত হয়েছে।

॥ ৩৩ অপরিণত চাহিদা ও নীতি বিরোধী ধারা ॥

যদি বলা হয়—যে সব বাঙ্গালী গ্রন্থকার ইংরেজীতে গ্রন্থ রচনা করেন তাঁদের সম্বন্ধে পাঠকের চাহিদা নামান্ত বা পদবীর উপর; এবং যেহেতু সংলেখ উপাদান নির্বাচনে পাঠকের চাহিদার উপরই সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা উচিত; অতএব এই সব গ্রন্থকারদের ক্ষেত্রে নামান্ত বা পদবী সংলেখ উপাদান বলে বিবেচিত হবে—তাহলে বাস্তব অবস্থা পর্যালোচনা করে এ উক্তির সত্যতা নিরূপিত হওয়া উচিত।

এখানে পাঠক দুই শ্রেণীর :

ক　অবাঙ্গালী,

খ　বাঙ্গালী।

॥ ৩৩১ অবাঙ্গালী পাঠক ও চাহিদা ॥

অবাঙগালী পাঠকদের মধ্যে এ ধরণের চাহিদার কারণ ঃ

ক প্রচলিত সংহিতাগুলিতে বাংলা নাম সম্বন্ধীয় উপযোগী কোন ধারা নেই ;

খ আমরা এখনও পর্যন্ত যুক্তি সমর্থিত এবং প্রয়োগে উপযোগী বলে প্রমাণিত কোন ধারা গ্রহণ করি নি ;

গ নামের ব্যবহারে বাঙগালী গ্রন্থকারদের মধ্যে রীতিগত বিভিন্নতা বর্তমান ; এবং এই সব কারণে—

ঘ অবাঙগালী পাঠক বাংলা রীতি সম্বন্ধে অবহিত নয় ; এবং

ঙ পাশ্চাত্য রীতিদ্বারা প্রভাবান্বিত সূচীকার বাংলা নামের সংলেখ উপাদান নির্বাচনের ব্যাপারে তার পূর্ণ স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করে।

॥ ৩৩২ বাঙ্গালী পাঠক ও চাহিদা ॥

বাঙগালী পাঠকদের সম্বন্ধে জানা দরকার যে,

ক কোন্ শ্রেণীর পাঠকদের মধ্যে এই চাহিদা দেখা যায় ;

খ বাঙগালী পাঠককুলের তুলনায় এই শ্রেণীর পাঠকদের সংখ্যা কত ;

গ এই চাহিদার কোন উল্লেখযোগ্য কারণ আছে কিনা ; এবং

ঘ এই চাহিদা এক চেটিয়া কিনা।

বাঙগালী গ্রন্থকার প্রণীত ইংরেজী গ্রন্থের মধ্যে বেশীর ভাগই পাঠ্য পুস্তক এবং পাঠ-সহায়িকা। এই সব গ্রন্থের অধিকাংশ পাঠক ছাত্র। এই সব ছাত্রদের মধ্যে যারা স্কুল পর্যায়ের তাদের মধ্যে গ্রন্থাগার ব্যবহার করার প্রবণতা—যে কোন কারণেই হোক—খুবই কম। তা ছাড়া এই পর্যায়ের ছাত্রদের মধ্যে গ্রন্থকার সম্বন্ধীয় চাহিদা কোন স্পষ্ট রূপ নেয় নি। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্রদের মধ্যে যারা গ্রন্থাগার ব্যবহার করে, সমগ্র ছাত্র সংখ্যার তুলনায় তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম। এই পর্যায়ের ছাত্রদের মধ্যে কিছু কিছু গ্রন্থকার সম্বন্ধে এই ধরণের চাহিদা দেখা যায়।

এইসব ছাত্রেরা তাদের পাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধীয় তথ্য সংগ্রহ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত "List of Text books" থেকে। অধ্যাপকদেরও ঐ একই সূত্র। একটু পরীক্ষা করলেই দেখা যায় যে এই সব তালিকাগুলি কত ত্রুটীপূর্ণ। গ্রন্থ সম্বন্ধীয় তথ্য পরিবেশনে কোন নীতির বালাই এই সংকলনগুলিতে নেই।

আবার চাহিদাও একচেটিয়া পদবীর উপর নয় ; এবং তার কারণও একদিকে ঐ ত্রুটীপূর্ণ সূত্র থেকে তথ্য সংগ্রহ ; অপরদিকে নাম-মূলের উপর স্বাভাবিক প্রবণতা। যে সব গ্রন্থকার সম্বন্ধে চাহিদা নাম-মূলের উপর উদাহরণ স্বরূপ তাদের কয়েকজনের নাম করা যেতে পারে। যেমন—

a Indian economics-এর গ্রন্থকার Amlan Datta

b Origin and development of Bengali language-এর গ্রন্থকার Sunitikumar Chattopadhyay

c Indo British economy-র গ্রন্থকার Nirmalchandra Sinha

d Aspects of Indian religious thought-এর গ্রন্থকার Shashibhushan Dasgupta

e Post war Europe through Indian eyes-এর গ্রন্থকার Sureshchandra Bandyopadhyay

f A visit to China-র গ্রন্থকার Shailakumar Mukhopadhyay

g At the cross roads-এর গ্রন্থকার Nripendrachandra Bandyopadhyay

h Gandhism-এর গ্রন্থকার Priyaranjan Sen

i Studies in Indian economic problems-এর গ্রন্থকার Nabagopal Das

j Basic surgery-র গ্রন্থকার Amiyakumar Sen.

এই ধরণের আরও অনেক গ্রন্থকারের নাম করা যেতে পারে।

উপরোক্ত পর্যালোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা চলে যে, বাংলা নাম সম্বন্ধীয় কোন উপযোগী ধারা গৃহীত না হওয়ায় এবং তথ্য সংগ্রহের সূত্র ত্রুটীপূর্ণ থাকায় বাঙ্গালী গ্রন্থকার প্রণীত ইংরেজী গ্রন্থের পাঠকদের মধ্যে চাহিদার তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং পদবীর উপর পাঠকের চাহিদাকে কোন প্রকারেই পরিণত বলা চলে না ; বরং এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা চলে যে উপযুক্ত নির্দেশে এ চাহিদার রূপ পরিবর্তন করা সম্ভব। সংহিতায় বাংলা নামের উপযোগী ধারা সংযোজন করে, ত্রুটীপূর্ণ সূত্রের সংশোধন করে এ সমস্যার সমাধান খুঁজতে হবে। স্বল্প সংখ্যক পাঠকের ততোধিক স্বল্প-সংখ্যক গ্রন্থকার সম্বন্ধে অপরিণত চাহিদার প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে সংহিতায় সাধারণ নীতি ও প্রথা বিরোধী ধারা সংযোজন কখনই যুক্তিসংগত হবে না।

॥ ৩৪ গ্রন্থকারের একাধিক নামজনিত সমস্যা ও সমাধান ॥

একই গ্রন্থকার প্রণীত বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থে ব্যবহৃত নামের বিভিন্নতা সূচীকরণে যে সমস্যার উদ্ভব করে তার সমাধানে পরস্পর বিরোধী ধারা গ্রহণ সূচীকরণের নীতি বিরোধী। সূচীকরণের অন্যতম লক্ষ্য—কোন বিশেষ গ্রন্থাগারে কোন নির্দিষ্ট গ্রন্থকার প্রণীত কি কি গ্রন্থ আছে সে সম্বন্ধে তথ্য পরিবেশন। সেই উদ্দেশ্যে গ্রন্থকারের নামের একটি মাত্র রূপ (FORM)কে সংলেখ শীর্ষ হিসেবে গ্রহণ করাই নীতি। শীর্ষ নির্বাচনের এই নীতি সংলেখ উপাদান নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে—কোন্ রূপটি গৃহীত হবে? এ সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে বাংলা নামের রূপ-বৈশিষ্ট্য জানা দরকার; অর্থাৎ বাঙ্গালী গ্রন্থকারদের নামের ব্যবহারে কি ধরণের বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় তা জানা দরকার। বিভিন্নতাগুলি মোটামুটি এই রকমের:

ক গ্রন্থকার ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করেন; এবং উভয় ক্ষেত্রেই নামের মাতৃভাষার রূপটি ব্যবহার করেন। যেমন— কৃষ্ণপদ ঘোষ; পদার্থবিদ্যা ও OPTICS-এর গ্রন্থকার।

খ গ্রন্থকার ইংরেজী ও বাংলা উভয় ভাষাতেই গ্রন্থ রচনা করেন; এবং বাংলা রচনায় নামের মাতৃভাষার রূপটি ও ইংরেজী রচনায় পাশ্চাত্য অনুকরণে নাম ব্যবহার করেন। যেমন—প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত: মাধ্যমিক রসায়ন; P. C. RAKSHIT: ORGANIC CHEMISTRY.

গ গ্রন্থকার কেবলমাত্র ইংরেজী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন; এবং পাশ্চাত্য অনুকরণে নাম ব্যবহার করেন। যেমন—N. C. MUKHERJEE: HIGHER ALGEBRA.

ঘ গ্রন্থকার কেবলমাত্র ইংরেজীতে গ্রন্থ রচনা করেন; এবং নামের মাতৃভাষার রূপটি ব্যবহার করেন। যেমন—JADUNATH SINHA: INTRODUCTION TO INDIAN PHILOSOPHY.

যে ক্ষেত্রে নামের ব্যবহারে মূল মাতৃভাষায় ব্যবহৃত নামের সঙ্গে কোন পার্থক্য নেই, সমস্যার জটিলতা সেখানে অপেক্ষাকৃত কম। কিন্তু যেখানে পার্থক্য স্পষ্ট জটিলতা সেখানেই বেশী। প্রচলিত

সংহিতাগুলিতে ঠিক এই সমস্যার সমাধান না থাকলেও অনুরূপ সমস্যার সমাধান আছে। যে সকল গ্রন্থকার কেবল ছদ্মনামে গ্রন্থ রচনা করেন বা একই সঙ্গে প্রকৃত ও ছদ্মনামে গ্রন্থ রচনা করেন তাঁদের সম্বন্ধীয় সমস্যা এই সমস্যার অনুরূপ। এই সমস্যার সমাধানে যে ধারা নির্ধারিত হয়েছে তাতে গ্রন্থকারের প্রকৃত নামের মাতৃভাষার রূপকেই সংলেখ শীর্ষ হিসেবে গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। যেখানে প্রকৃত নাম সংগ্রহ করা সম্ভব নয় কেবলমাত্র সেই ক্ষেত্রেই এই ধারার ব্যতিক্রম অনুমোদন করা হয়েছে। সংলেখ উপাদান নির্বাচনে বাংলা রীতি অনুসরণ করে এই ধারা গৃহীত হলে আমাদের সমস্যার যুক্তিসঙ্গত ও কার্যকরী সমাধান সম্ভব। মূল নামের সঙ্গে গ্রন্থকারের ব্যবহৃত নাম বন্ধনীযুক্ত করে ব্যবহারের রীতি অতিরিক্ত নির্দেশ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে—[PRATULCHANDRA RAKSHIT] (P. C. Rakshit.)

॥ ৪ বাংলা নাম নির্দেশিকা ॥

এখন একটি প্রশ্ন উঠতে পারে যে, বাংলা নামের সূচীকরণে এসব নির্দেশ মানতে গেলে সূচীকারের সর্বাগ্রে জানা দরকার যে, গ্রন্থকার বাঙ্গালী। বাঙ্গালী সূচীকারদের পক্ষে সেটা সম্ভব হলেও, অবাঙ্গালী, বিশেষ করে বিদেশীদের পক্ষে তা কি করে সহজসাধ্য ভাবা যায়? তাছাড়া একাজে সহায়ক কোন নির্দেশিকাও (REFERENCE TOOL) নেই।

এ প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই বলা চলে যে, সূচীকারকে অবশ্যই জানতে হবে যে, গ্রন্থকার বাঙ্গালী; কারণ গ্রন্থকার কোন দেশীয় সেটা না জেনে সংলেখ লিখন প্রচলিত কোন সংহিতাই অনুমোদন করে না। আঞ্চলিক কোন প্রথা বা রীতি যেখানেই সমস্যার সৃষ্টি করেছে, সেখানেই গ্রন্থকার কোন্ দেশীয় সেটা জেনে নেবার নির্দেশ সংহিতাগুলিতে রয়েছে। যেমন, PREPOSITION এবং ARTICLE, PREFIX হিসেবে যুক্ত পাশ্চাত্য COMPOUND SURNAME-এর ক্ষেত্রে সংলেখ উপাদান নির্বাচনের পূর্বে জেনে নিতে হয়—গ্রন্থকার ইংরেজ না ফ্রেঞ্চ না ইটালিয়ান না স্কান্দিনেভিয়ান।

দ্বিতীয়ত উপযুক্ত নির্দেশিকা থাকলে, গ্রন্থকার যে বাঙ্গালী সেটা জানা দুঃসাধ্য নয়; এবং এ জাতীয় কোন নির্দেশিকা সংকলনও কিছু অসম্ভব নয়। কারণ, এক শব্দ বিশিষ্ট বাংলা নাম কোন সমস্যার সৃষ্টি করে না; আবার একাধিক শব্দবিশিষ্ট বাংলানামের এমন একটি বিশিষ্ট অংশ আছে যা একাজে

বিশেষ সহায়ক। সে অংশটি বাংলা নামের পদবী। গুপ্ত, দত্ত, চৌধুরী, সিংহ প্রভৃতি কয়েকটি পদবী বাদ দিলে অন্যান্য বাংলা পদবীর সঙ্গে অন্যদেশীয় পদবী বা ঐ জাতীয় শব্দের কোন মিল নেই। সুতরাং বাংলা পদবীর কোন পূর্ণাঙ্গ সংকলন এই সমস্যার সমাধানে সহায়ক; এবং সংকলন করাও কিছু দুঃসাধ্য নয়।

॥ ৫ অভারতীয় ভাষা উদ্ভূত বাংলা নাম ॥

সমস্ত বাংলানাম ভারতীয় ভাষা উদ্ভূত নয়। বিভিন্ন বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মধ্যে অভারতীয় ভাষা উদ্ভূত বাংলানামের সংখ্যাও কম নয়; বিশেষ করে মুসলমান ও খ্রীষ্টানদের মধ্যেত বটেই।

॥ ৫১ নামের গঠন ও চাহিদা ॥

গঠন অনুসারে এই শ্রেণীর নামকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—

ক ভারতীয় ও অভারতীয় সংমিশ্রণ;

খ সম্পূর্ণরূপে অভারতীয়।

ভারতীয় ও অভারতীয় সংমিশ্রণের উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত নামগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে:

হিন্দুনাম: লিলি ভট্টাচার্য;
শেলী সরকার;
জর্জ চৌধুরী; প্রভৃতি।

মুসলমান নাম:
সনাতন গাজি;
ফকির চৌধুরী;
গগন মুন্সী;
কাজী অনিরুদ্ধ ইসলাম;
কাজী সব্যসাচী ইসলাম;
পার্বতী হোসেন; প্রভৃতি।

খ্রীষ্টান নাম:
জোসেফ্ মণ্ডল;
ষ্টিফেন দাস; প্রভৃতি।

ভারতীয় ও অভারতীয় সংমিশ্রণ হলেও গঠন বৈশিষ্ট্যে এ নামগুলি সাধারণ বাংলা নামের অনুরূপ ; এবং এগুলি সম্বন্ধে চাহিদাও নাম-মূলের উপর।

সম্পূর্ণরূপে অভারতীয় ভাষা উদ্ভূত বাংলা নামের উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত নামগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। এগুলির অধিকাংশই মুসলমান নাম। খ্রীষ্টান নামও কিছু কিছু দেখা যায়।

মুসলমান নাম ঃ

আবদুর রশিদ ;
আবদুর রহমান ;
কাজী আবদুল ওদুদ ;
আবদুল কাদির ;
আবুল হাসানৎ ,
ইবনে ইমাম ;
এস ওয়াজেদ আলী ;
কাদের নওয়াজ ;
কাজী নজরুল ইসলাম ;
নেশাদ বানু ;
বন্দে আলী মিঞা ;
সৈয়দ মুজতবা আলী ;
মুজফ্ফর আহমদ ;
রেজাউল করীম ;
বেগম সামসুন নাহার ;
হুমায়ুন কবীর প্রভৃতি।

খ্রীষ্টান নাম ঃ

আরনল্ড খ্রীষ্টিন ;
ডেভিড মুরমুর প্রভৃতি।

মুসলমান নামের গঠনে যথেষ্ট জটিলতা আছে। সে কারণে সংহিতা প্রণেতাদের কাছে মুসলমান নাম সত্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। নামের গঠনে সাধারণ কোন রীতি আবিষ্কার করা সম্ভব হলেও এ কথা স্বীকার না করে পারা যায় নি যে পাঠকের কাছে গ্রন্থকারের পরিচিতি আঞ্চলিক প্রথাদ্বারা প্রভাবান্বিত। সুতরাং কোন একটিমাত্র সাধারণ ধারায় মুসলমান নামের

সমস্যার সমাধান এখনও অনিশ্চিত। প্রচলিত সংহিতার কোন কোনটিতে এ সম্বন্ধে যে ধারা গৃহীত হয়েছে তা প্রত্যক্ষভাবে সারা দুনিয়ার মুসলমান নাম সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। কেবলমাত্র আরবী, ফারসী ও তুর্কী গ্রন্থকার, যদি তাদের বাসভূমি হয় কোন মুসলমান অধ্যুষিত দেশ, অথবা তাদের মাতৃভাষাই যদি হয় তাদের রচনার একমাত্র বা শ্রেষ্ঠ মাধ্যম তা হলে তাদের ক্ষেত্রে ঐ ধারা প্রযোজ্য হবে। এ ধারা পরোক্ষভাবে গ্রন্থকার পরিচিতির ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রথা ও রীতিকেই স্বীকৃতি দিচ্ছে।

বাঙগালী মুসলমান নামের গঠন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, কোন কোন ক্ষেত্রে নামের প্রথম অংশটি কোন সম্মান সূচক শব্দ। যেমন—কাজী, সৈয়দ, বেগম ইত্যাদি। এই সব ক্ষেত্রে সম্মানসূচক শব্দের পরবর্তী অংশটি সাধারণত নাম মূল। নাম মূল কখন কখন যৌগিক রূপও গ্রহণ করে। নাম মূলের অনুগামী অংশটি অবস্থান বিবেচনার পদবীর সঙ্গে তুলনীয়।

বাঙগালী মুসলমান গ্রন্থকারদের মধ্যে অধিকাংশই বাংলায় গ্রন্থ রচনা করেন। বাংলা ভাষা জ্ঞানীদের মধ্যে তাদের রচিত গ্রন্থের ব্যবহার সীমাবদ্ধ। বাংলা ভাষা জ্ঞানীদের মধ্যে বাঙগালীর সংখ্যা সর্বাধিক। সুতরাং সংলেখ উপাদান নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাঙগালী পাঠকের চাহিদাই সর্বাগ্রে বিবেচ্য। বাঙগালী মুসলমান লেখকদের সম্বন্ধে বাঙগালী পাঠকের চাহিদা নাম মূলের উপর।

আরনল্ড খ্রীষ্টিন বা ডেভিড মুরমুর জাতীয় নামগুলি পুরোপুরি পাশ্চাত্য নাম ; নামধারী বাঙগালী—এটা নিতান্তই আকস্মিক ঘটনা মাত্র। ব্যক্তিগত পরিচয় না থাকলে এদেরকে বাঙগালী বলে ভাবা অসম্ভব। যদিও এই ধরণের কোন বাংলা নাম এখনও পর্যন্ত কোন সমস্যার সৃষ্টি করে নি ; তবুও ভবিষ্যতে সৃষ্টি করতে পারে এবং সে ক্ষেত্রে এগুলি সাধারণের ব্যতিক্রম বলে বিবেচনা করাই যুক্তিসঙগত হবে।

॥ ৬ উপসংহার ॥

সমগ্র আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্তই যুক্তিসিদ্ধ থাকে যে বাংলা-নামের ক্ষেত্রে পাঠকের চাহিদা নাম মূলের উপর। অতএব বাংলা নামের সংলেখ উপাদান নির্বাচনের উপধারাটি নিম্নলিখিত রূপে সংহিতার অন্তর্ভুক্ত করা হোক ঃ

॥ বাংলা নামের ক্ষেত্রে সংলেখ উপাদান হবে নাম-মূল ॥

ছোটদের গ্রন্থাগার ঃ শিল্প ও বিজ্ঞান ভবন

ভূপেশ দাশ

[সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্যায়ে এই প্রবন্ধটি পঠিত হয়]

বাংলাদেশে গ্রন্থাগার রয়েছে অনেক। এগুলো প্রায় সমস্তই সার্বজনীন গ্রন্থাগার অর্থাৎ আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই এর সভ্য হতে পারে। ছোটদের জন্য এককভাবে গ্রন্থাগার খুব কমই রয়েছে। সাধারণতঃ সার্বজনীন গ্রন্থাগারগুলোতেই ছোটদের জন্য একটি পৃথক বিভাগ খোলা হয়। এতে ছোটদের উপযোগী এবং অনুপযোগী কিছুসংখ্যক বই থাকে। এই বিভাগের কার্যধারা সভ্যদের মধ্যে লেনদেনের ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ।

এই প্রবন্ধে আমি সুধীবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি ছোটদের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রন্থাগার গড়ে তোলার দিকে। শিশুমনের প্রবণতা খান কয়েক রহস্য রোমাঞ্চ জাতীয় পুস্তকের মধ্যে সীমায়িত না রেখে তার বর্ধিষ্ণু মনের ক্রমবর্ধমান চাহিদার পূরণকল্পে জীবনের বৈচিত্র্যময় জ্ঞানের আস্বাদ তাকে দিতে হবে। আর এই জন্যই প্রয়োজন ছোটদের জন্য একক ও পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থাগারের।

বর্তমান যুগ হচ্ছে শিল্প ও বিজ্ঞানের বিস্ময়কর অগ্রগতির যুগ। বিজ্ঞান ও শিল্পসাধনা এ যুগের অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমাদের শিক্ষা বিভাগ বিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন করে ঢেলে সাজিয়েছেন। সাজাবার পদ্ধতি নিয়ে অনেক অনুকূল-প্রতিকূল আলোচনা বা তর্ক চলতে পারে কিন্তু এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারবে না কেউ। যথার্থ শিক্ষার প্রসারে টেকনিকাল ও বিজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান অপরিহার্য।

ভূমিকা আর না বাড়িয়ে আমি প্রস্তাব করছি ছোটদের জন্য গ্রন্থাগার স্থাপনের সঙ্গে আমাদের দৃষ্টি ছোটদের শিল্প ও বিজ্ঞান ভবন গড়ে তোলার দিকেও পড়ুক।

শিল্প ও বিজ্ঞান ভবন ছোটদের গ্রন্থাগারের একটি বিভাগ হিসেবেও খোলা যেতে পারে। আলাদাভাবে করতে পারলে তো কথাই নেই।

আজকাল উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুল গুলোতে টেকনিকাল ও বিজ্ঞান ক্লাস খোলার জন্য স্কুলের গ্রন্থাগারে ও পরীক্ষাগারে উক্ত বিষয়সমূহের পুস্তক পত্রপত্রিকা ইত্যাদি এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি রাখা সুরু হয়েছে। সমগ্র চাহিদার তুলনায় এ ব্যবস্থা খুবই অপ্রচুর। এই অপ্রাচুর্য দূর করবার জন্য পাড়ায় পাড়ায় তরুণদের জন্য এই ধরণের গ্রন্থাগার তথা পরীক্ষাগার স্থাপনের প্রয়োজন

রয়েছে। শুধু তাই নয়, স্কুলের বিজ্ঞান-ক্লাসের ছাত্র ছাড়া অন্যান্য ছেলেরাও ...তে ছোটবেলা থেকেই বিজ্ঞান ও শিল্পমুখী হয়ে ওঠে এবং ভবিষ্যতে দেশের এ সম্বন্ধে উন্নতির কর্ণধার হতে পারে সেজন্যও বিজ্ঞান ভবনের প্রতিষ্ঠা নাম সম্বন্ধে ...র্য। গ্রন্থাগার আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য শিক্ষার সম্যক প্রচার ও তাদের ...সার এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণ। দেশের লোককে বিজ্ঞানমুখী করে তোলাও তার অন্যতম উদ্দেশ্য বৈ কি।

সাধারণতঃ দেখা যায় ছোটদের গ্রন্থাগারে বা বিভাগে কিছু রহস্য রোমাঞ্চ, ভ্রমণকাহিনী, আজগুবী ন্যাকা ন্যাকা গল্প ইত্যাদিই স্থান পেয়ে থাকে। এ ছাড়া যে আর অন্য কিছু ছোটদের পাঠ্য হতে পারে এসম্বন্ধে আমাদের কোন ধারণাই নেই।

ছোটদের গ্রন্থাগার তথা বিজ্ঞান ভবন স্থাপনের ব্যাপারে সর্বাগ্রে সরকারকে এগিয়ে আনতে হবে। কেন না এতে বেশ কিছু খরচপত্রের প্রয়োজন। এ খরচপত্র শেষ পর্যন্ত সুদে-আসলে উঠে এলেও বিবিধ সমস্যা জর্জরিত আমাদের পক্ষে প্রথম দিকে বহন করা দুঃসাধ্য। অবশ্য দুঃসাধ্য হলেও আমাদের এই অনিবার্য প্রয়োজনীয় ব্যাপারটি নিয়ে মাথা ঘামাতেই হবে এবং বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের মারফতে সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এর অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

ছোটদের গ্রন্থাগার তথা বিজ্ঞান ভবনের কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত সূচী দিয়ে এই প্রস্তাব প্রবন্ধ শেষ করি। এতে থাকবে ছোটদের পাঠযোগ্য শিল্প ও বিজ্ঞানবিষয়ক দেশী-বিদেশী বই, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ক'রে হাতেকলমে শিক্ষালাভের জন্য গবেষণাগার ও উপযুক্ত শিক্ষক, দেশের বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার দেখাবার ব্যবস্থা এবং ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ বা ছায়াচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান। এককথায় এই সংস্থাটি হবে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠান।

এতক্ষণ ধরে যা বলতে চেয়েছি তা হচ্ছে এই, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার আন্দোলনের দৃষ্টি পাড়ায় পাড়ায় ছোটদের গ্রন্থাগার স্থাপনের দিকেও পড়ুক। এবং ছোটদের গ্রন্থাগার তথাকথিত কয়েকখানা মাত্র রহস্যরোমাঞ্চ পুস্তকসর্বস্ব মামুলি গ্রন্থাগারে পর্যবসিত না হয়ে শিল্প ও বিজ্ঞান বিভাগের সংযোজনায় সমৃদ্ধ ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে কিশোর মনের অশেষ কল্যাণ সাধন করুক।

গ্রন্থ সমালোচনা

সোনার আলপনা ॥ চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ এভারেষ্ট বুক হাউস, কলকাতা-১২ ॥ দাম আট টাকা ॥

"সোনার আলপনা" মূলত বিদেশী সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের কেন্দ্র করে কয়েকটি খণ্ড খণ্ড আলোচনার সংকলন। ফরাসী, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান, রাশিয়ান, জার্মাণ ও ইংরেজী সাহিত্যের কয়েকজন কৃতীমান ঔপন্যাসিক ও কবির বিচিত্র জীবনকথা ও সাহিত্য আলোচনায় রচনাগুলি উজ্জ্বল। শুধুমাত্র জীবনী বা শুধুমাত্র সমালোচনা হলে এই ছোট ছোট লেখাগুলো হয়ত পাঠকের এত প্রিয় হোতনা। এর সঙ্গে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এক সুন্দর অথচ ঘনিষ্ঠ অনুভূতি, লেখকের সংযত আবেগ ও সাহিত্যের প্রতি অকুণ্ঠ ভালবাসা। প্রত্যেকটি রচনাই মর্মস্পর্শী ও ব্যক্তিগত শ্রদ্ধানিবেদনে ভাস্বর। বইটির নামকরণ হয়েছে কীটসের কবরের পর যে কয়টি কথা লেখা আছে তারই অনুসরণে ও অর্থাৎ Here lies one whose name was writ in water—'জলের আলপনা' শতাব্দী অতিক্রম 'সোনার আলপনা'য় পরিণত হ'ল, কীটস যে এখন বিশ্বসাহিত্যের একজন অনন্য কবি এই স্বীকৃতিই বইটির নামকরণের পরিচয় বহন করছে। বিশেষ করে এই তরুণ কবির বেদনার্দ্র জীবনকথা যে লেখককে কতদূর অভিভূত করেছে নামকরণ থেকে তারও উপলব্ধি হবে।

বইটি সম্পর্কে কয়েকটি মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক হবেনাঃ প্রথমত, যে সকল লেখককে তিনি আলোচনায় স্থান দিয়েছেন তাতে বোঝা যায় যে কোন দেশের সাহিত্য বা জাতির সাহিত্য নয়, বরং বিশেষ বিশেষ ভাষায় রচিত সাহিত্যই তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তু। যথা, অর্নেষ্ট হেমিংওয়ে আমেরিকান সাহিত্যিক হলেও ইংরাজী সাহিত্যের আসরে আলোচিত হয়েছেন। দ্বিতীয়ত, মোটামুটিভাবে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিকদের নিয়ে লেখক আলোচনা করেছেন। তৃতীয়ত, এমন সাহিত্যিকদের নির্বাচন করেছেন যাঁরা বর্তমান সময়ের জীবন ও সাহিত্যের পর গভীর প্রভাব ফেলেছে। চতুর্থত, গল্প লেখক ঔপন্যাসিকই তাঁর আলোচনায় বেশী জায়গা জুড়েছে।

অন্যদিকে, লেখক যেভাবে এসকল রচনাগুলি সাজিয়েছেন তাতে প্রথমত এ সম্বন্ধে হয় তিনি সাধারণ পাঠকের কাছে চিত্তাকর্ষকভাবে যে-সকল সাহিত্যিকদের নাম সম্বা করিয়ে দেবার প্রাথমিক দায়িত্বের কথাই সর্বাগ্রে ভেবেছেন, দুরূহ তাদে লোচনায় তিনি যেন ইচ্ছে করেই অগ্রসর হননি। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত জীবন যে তাঁর সাহিত্য বোঝবার পক্ষে সহায়ক একথাও তিনি স্মরণে রেখেছেন। তৃতীয়ত, প্রাঞ্জল ভাষায় ও চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনায় এবং বিখ্যাত গল্পগুলির সারাংশ দিয়ে তিনি পাঠকদের কাছে সেসকল সাহিত্যিকদের সহজেই খুব ঘনিষ্ঠ করে দিয়েছেন। সর্বশেষে গ্রন্থপঞ্জী দিয়ে উৎসাহী পাঠকের অশেষ উপকার করেছেন।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে বইটি প্রথমেই এই সাধারণ সূত্রকে অতি সহজে দাঁড় করিয়েছে যে পৃথিবীর সকল ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মৌল আবেদন এক—দেশকালনিরপেক্ষ এর প্রভাব এবং সৌন্দর্যসাধনায় ও জীবন দর্শনে এক ভাষার লেখক অন্য ভাষার লেখকের সমগোত্রীয়। এখানে তাঁরা কেউই পৃথক অস্তিত্ব নন। এবং এই সঙ্গে আরও একটি কথা পাঠকদের স্মরণ করতে বলি যে সাহিত্য জীবন থেকে বিচ্যুত কল্পনাবিলাস নয়, জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের ফলস্বরূপ ঘনিষ্ঠ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক দর্শন। বস্তুত অভিজ্ঞতা ব্যতিরেকে যে সাহিত্য তা কল্পনাধিলাস ছাড়া আর কিছু নয় এবং কালের বিচারে তার আবেদন নিতান্তই সীমায়িত।

কবিতার প্রতি আমার ব্যক্তিগত পক্ষপাত থাকবার ফলেই হয়ত আমি আশা করেছিলাম যে কীটস্ বা ডসন-এর মত আরও কয়েকজন কবি এই বইতে স্থান পাবেন—যাঁদের জীবন এঁদের চাইতে কম অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ নয় এবং বিংশ শতকে আমরা আবার নতুন করে যাঁদের রচনার পাঠোদ্ধার করছি।

এমন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর সাহিত্যের বই বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়ে লেখক আমাদের অশেষ উপকার করেছেন।

—অরুণ ভট্টাচার্য

সম্পাদকীয়

গ্রন্থাগার পত্রিকার দশম বর্ষ পূর্তি

'গ্রন্থাগার'-এর এই সংখ্যাটি তার দশম বর্ষ পূর্ণ করল। পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের দুর্নিবার গতি এই দীর্ঘ দশ বৎসরে পত্রিকাটীকে উত্তরোত্তর জীবনীশক্তি যুগিয়েছে। রাজ্যব্যাপী সংগঠিত গ্রন্থাগার আন্দোলনে এই পত্রিকার প্রয়োজন ও গুরুত্ব তার ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও জনপ্রিয়তার কষ্টি-পাথরে প্রমাণিত হয়েছে।

পরিষদ তথা গ্রন্থাগার আন্দোলনের মুখপত্র 'গ্রন্থাগার' পত্রিকার মূল্যায়ন বিচ্ছিন্নভাবে করা যায় না। বিগত দশকের গ্রন্থাগার তৎপরতার পূর্ণ প্রেক্ষাপটে পত্রিকার মূল্যায়ন হওয়া সমীচীন।

পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে এই সংখ্যা প্রকাশের অন্তবর্তীকালে পশ্চিম বাংলার গ্রন্থাগার আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক দ্রুত ও বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। দুটি পাঁচ সালা যোজনার ফলাফল যাই হোক না কেন দেশব্যাপী তার কর্মচাঞ্চল্যের ঢেউ অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় এক্ষেত্রেও এসেছে। গ্রন্থাগারকে লোকে অবসর বিনোদনের কেন্দ্র হিসাবে দেখার পরিবর্তে নিত্য ব্যবহার্য ও সমাজ-জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে দেখতে শুরু করেছে। সরকারী, আধাসরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টায় বহু নোতুন গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুদূর গ্রামের রাস্তায় পড়ছে গ্রন্থযানের চাকার চিহ্ন; সুসংবদ্ধ গ্রন্থাগার ব্যবস্থার প্রবর্তনে সরকার সচেষ্ট হয়েছেন। গ্রন্থাগারিকতা বৃত্তি প্রসার লাভ করছে। বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের কর্মপরিধি ও পরিমাণ তাই বহু গুণে বেড়ে গেছে; সর্বজনের জন্যে নিঃশুল্ক গ্রন্থাগার ব্যবস্থার দাবীতে পরিষদ জনমত সৃষ্টির ব্রত গ্রহণ করেছে। পরিষদের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধির দরুণ ত্রৈমাসিক পত্র 'গ্রন্থাগার'কে মাসিকে রূপান্তরিত করার প্রয়োজন দেখা দেয় পাঁচ বৎসর পূর্বে।

পশ্চিম বঙ্গে গ্রন্থাগার ব্যবস্থার ক্রমোন্নয়নের ফলে পত্রিকার গুরুত্ব যেমন বেড়েছে তার চাহিদার বৈচিত্র্যও বেড়েছে। পরিষদের মধ্যে একদিকে যেমন আছেন গ্রামীণ ও স্বেচ্ছাসেবা কর্মীরা অন্যদিকে তেমনি আছেন বৃত্তিকুশলী কর্মীরা; শেষোক্তদের মধ্যে আছেন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মী, বৈজ্ঞানিক

ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগার কর্মী এবং সাধারণ, শিশু ও কিশোর গ্রন্থাগারের কাজের প্রকৃতি ও প্রয়োজন এঁদের এক ও অভিন্ন নয়। তাই সর্বপ্রকার
এ সম্বং
...ঙ্গে পত্রিকার সঙ্গতি রক্ষা বাঞ্ছনীয়।
নাম সম্ব
তাদে

পত্রিকার বর্তমান বিষয়-বৈচিত্র্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে গ্রন্থাগারিক .শক্ষণের ছাত্রছাত্রী বিশেষ করে যাঁরা বাংলায় অধ্যয়ন করতে চান তাঁদের জন্যে উপযোগী প্রবন্ধ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান-সম্পর্কে অনেকেই মৌলিক ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ দিয়ে পত্রিকাটিকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। বেতনভুক কর্মীদের অভাব-অভিযোগ এবং তাঁদের বেতন ও পদ-মর্যাদা সম্পর্কে প্রকাশিত বহু সংবাদ ও নিবন্ধ অনেকের মনে বিশেষ উৎসাহের সৃষ্টি করেছে। গ্রন্থ ও তার আনুষঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা বহু লোকের প্রশংসায় সার্থকতা লাভ করেছে। দেশবিদেশের গ্রন্থাগার তৎপরতা বিষয়ে কর্মীদের অবহিত রাখা এবং পরিষদের সঙ্গে সদস্যদের নিয়মিত সংযোগ রক্ষা পত্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

পত্রিকার উন্নত মান এবং যথাসময়ে প্রকাশ পরিষদের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের উপর নির্ভর করে। নানাবিধ অসুবিধার জন্যে ইদানিং পত্রিকার প্রকাশন বিলম্বিত হচ্ছে; বিষয়ের ভারসাম্যও ক্ষুণ্ণ হতে দেখা যায়। এর অন্যতম কারণ পত্রিকার লেখকগোষ্ঠী প্রসার লাভ করেনি; অথচ কুশলী কর্মীর সংখ্যা ক্রমেই স্ফীত হচ্ছে। সকল কর্মী ও গ্রন্থাগার অনুরাগী ব্যক্তি এবং বৃত্তিতে নবাগতদের এবিষয়ে যত্নবান হতে অনুরোধ করি।

বিনা পারিশ্রমিকে যাঁরা প্রবন্ধ ও সংবাদ প্রেরণ করে পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই, বিজ্ঞাপনদাতা ও অন্যান্য পৃষ্ঠপোষকদেরও নিবেদন করি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। পত্রিকা প্রকাশনের জন্যে ভারত সরকারের দু' হাজার টাকা অর্থ সাহায্য পাওয়ায় আমরা অত্যন্ত উপকৃত হয়েছি।

সকলের শুভেচ্ছা ও সহযোগিতায় পত্রিকার মান উন্নত হোক এবং পাঠকদের চাহিদা মেটানোর মধ্যে দিয়ে পরিষদের মুখপত্রটি সার্থকতা লাভ করুক দশম বর্ষ পূর্তিকালে এই কামনা জানাই।